প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৯২

প্রচ্ছদ :
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রকাশক :
তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্থক প্রকাশনী
৪০, মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড
কলকাতা-৭০০ ০৬০

মুদ্রক :
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
বদ্রীদাস টেম্পল রোড,
কলকাতা

প্রবীণের কথা শোনো :   কাব্যচর্চা মাধুকরী, শিল্পই সন্ন্যাস ;
এ পণ্যে ব্যবসা নেই, এ পসরা চলে না হে কারবারে চুরিতে।

সম্পাদকের বক্তব্য

কবি বিষ্ণু দে-র আশি বছর পূর্তি স্মরণে এই গ্রন্থ সংকলন প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থ প্রকাশে উত্থক প্রকাশনীর কাছে, অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে আমিই প্রস্তাব করেছিলাম। অরুণবাবুর সৌজন্যের অনুরোধে সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হল। প্রকাশনীর দুঃসাহসও স্মরণযোগ্য। দায়িত্ব গ্রহণে সংকোচ ছিল। আমাদের দেশেও শিল্প বিকোয় তার জনপ্রিয়তা-ভিত্তিক ব্যবসায়িক সাফল্যে অথবা কিউরিও-মূল্যে। বিষ্ণু দে জনপ্রিয় কবি নন। বিষ্ণু দে-র কিউরিও-মূল্যের জোরে তাঁকে নিয়ে যেখানে ব্যবসা শুরু সেখানে পাওয়া যাবে না কবি ও কবিতাকে।

বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত। সেই পরিচয়ে তাঁকে কিছু বুঝেছি, কিছু জেনেছি,—এ-দাবি করা চলে। তাঁর কালের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিবান বহু মানুষ বিষ্ণুদে-র সঙ্গে মিশেছেন,কিন্তু কারও ওপর ভর করে সুযোগ সুবিধে করে নেওয়া, সম্পত্তি-বিত্ত-প্রতিপত্তি লাভ তিনি কখনও করেননি। সে কারণেই সংকোচ ছিল এই উদ্যোগে নিজের নাম জড়াতে।

কিন্তু, পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙলার দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি—জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দে-র কাব্যের বহুমাত্রিকতা—প্রেম, সাম্যবাদ, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনীতি-সমাজমনস্কতা, সাংগীতিক ঐতিহ্য, বিশ্বসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাসচেতনা, দেশপ্রেম, লোক-উপাদান ইত্যাদির সমন্বয়ে যে কাব্যিক পরিমণ্ডল তাঁর রচনায়, তা বাঙালীর সাংস্কৃতিক সম্পদকে ঐশ্বর্যবান করেছে। বিষ্ণু দে-র কবিতা অবহেলিত হলে বাঙালী সংস্কৃতিরই ক্ষতি হবে। সেই ক্ষতি সম্পর্কে সকলে সচেতন হবার প্রয়াসেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

কিন্তু, লেখকসূচীর দিকে তাকালে, সম্পাদনার কি-ই বা দায়িত্ব ছিল? তথ্য বা স্মৃতি-বিভ্রান্তি-জনিত উদ্ধৃতির ভুল বা কলম-পিছলে-আসা বানানের সংশোধন। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্ব দিতে হবে কবিতা সম্পর্কে আলোচনার অংশগুলিতে—বিষয় নির্বাচন ও বিষয় অনুসারে উপযুক্ত লেখকের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ। এ-ব্যাপারে আমি তৃপ্ত। প্রথিতযশা লেখকেরা বলামাত্রই অন্য কাজ ফেলে লেখা তৈরি করে দিয়েছেন। বিনা অনুরোধেও এসেছে দু' একটি লেখা! প্রতিটি রচনা হয়তো পাঠককে সমভাবে তৃপ্ত করবে না। কিন্তু সকল লেখকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছি। সমস্ত বক্তব্যই লেখকদের নিজস্ব। নানা দিক থেকে আলোচনায় কবি বিষ্ণু দে-র এক সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছি।

আর একটি বিশাল কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিষ্ণু দে-র কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ-উল্লেখের অর্থসূচী সংকলন। বহুজনের প্রয়াসে এই তালিকা প্রস্তুত

হল, যদিও তা অসম্পূর্ণ এবং বারে বারে সংশোধন করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ভুল এবং অর্থ নিয়ে মতান্তর থেকে গেল। এ সূচনামাত্র।

গ্রন্থটি প্রকাশে অতিরিক্ত দেরি হল। অর্থসংকট, ছাপাখানার নানা অসুবিধা প্রভৃতি ব্যক্তির দুর্লঙ্ঘ্য কারণসমূহে এই বিলম্ব। সেকারণে সমস্ত লেখকের কাছে আমি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

বিষ্ণু দে-র লেখা সমগ্র ছোটগল্প এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হল—যা আগে কোথাও একত্রে প্রকাশিত হয়নি।

শ্রদ্ধেয়া প্রণতি দে লিখেছেন কবির বিভিন্ন কবিতার মুহূর্ত—রচনাটি পরবর্তী বিষ্ণু দে-গবেষণায় অপরিহার্য।

বিষ্ণু দে-র অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, কবিতা, আলোকচিত্র—সব কিছুই বিভিন্ন জনের অকৃপণ দানে সংগৃহীত, কিছুই আমাদের কিনতে হয় নি। অধ্যাপক পবিত্র সরকার বিষ্ণু দে-র কাব্যসংগ্রহ সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেও আমাদের ক্রমাগত উৎসাহ যুগিয়েছেন। অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী, অধ্যাপক রবিন পাল, অধ্যাপিকা মালতী ঘোষ নানা ভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছেন। 'একুশে' প্রকাশনীর শ্রীকাজল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতেই হয়। এঁদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ও রামকৃষ্ণ প্রিণ্টার্সের কর্মীদের।

যাঁর সহযোগিতা, সহায়তা ও সাহায্য ছাড়া এই সংকলন সম্ভব হত না, তিনি কবিপত্নী শ্রদ্ধেয়া প্রণতি দে, তিনি আমার ধন্যবাদজ্ঞাপনের উর্দ্ধে।

শুদ্ধির চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল থেকে যাওয়ায় পীড়িত বোধ করছি।

সুজিৎ ঘোষ

জানুয়ারি, উনিশশ' একানব্বই।

সূচীপত্র



স্মৃতিপটে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তিস্নান

পঞ্চাশ বছর না হলেও প্রায় তার কাছাকাছি সময় জুড়ে যার সঙ্গে আমার ছিল অন্তরঙ্গ সাহচর্য, বেশ কিছু পরিমাণে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও যার সঙ্গে আমার ছিল সর্ব চিন্তা কর্ম ও আনন্দের অংশীদারী, সেই স্বনামধন্য কবি বিষ্ণু দে সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সহজ নয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তার শূন্য পদ্মাসন পূরণ হতে যে অনেকদিন লাগবে, তাতে সন্দেহ নেই। বেঁচে থাকলে আজ তার অশীতিবর্ষপূর্তি নিয়ে আনন্দের উপলক্ষ ঘটত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু এখন তার রচনা সম্ভার নিয়ে যথোচিত মনন ও নিদিধ্যাসন। ক'জনকে আমরা জেনেছি বিষ্ণুর মতো "চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তিস্নান"-এর আজীবন প্রয়াসে, ক'জনকে জেনেছি "রবি করোজ্জ্বল নিজদেশে" "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত"-এর ব্যাপ্তি ও বেদনাকে প্রকাশ করতে ক'জনের কাছ থেকে পেয়েছি তার মতো অন্বিষ্ট যুগের ছবি : "সেইদিন পাব মিশ্র আগুনে বরফে / নতুন দিনের মল্লার-ভেজা কবিতা" ?

এত অজস্র কথা মনে এসে ভিড় করছে যে লেখার ঠিক খেই ধরতে পারছি না। "তরী হতে তীর" নাম দিয়ে আমার "পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়-এর বৃত্তান্ত"-এ বিষ্ণুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা আছে আমাদের পরিচয়ের প্রথম অধ্যায়কালে। সেই সম্পর্কে পরবর্তীকালেও কখনও কোনও গ্লানির লেশমাত্র স্পর্শ লাগে নি। দেশের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, ভারতবর্ষের মায়া কাটানো দূরে থাক তাকে বুকের মধ্যে সঞ্চিত রেখে, একই সঙ্গে মার্ক্সবাদের বিশ্ববীক্ষাকে গ্রহণ করে বিবিধ শুভকর্মে ব্যাপৃতি এই কবির জীবনের নিয়ত মূলমন্ত্র ছিল বলে আমাদের উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কার্ড-ধারী সদস্য তিনি কখনও ছিলেন না;

তাকে সেভাবে টানার চেষ্টাও আমরা করি নি। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বদা ও সর্বক্ষণ-মার্ক্‌স্‌-কথিত "The Party in the grand histc rical sense of the term"-এর অঙ্গীভূত। তাই ১৯৭২ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্তির পর দিল্লীতে নানা সভাসমিতির আহ্বান উপেক্ষা করে বিষ্ণু গিয়েছিল পার্টির কর্মকেন্দ্র অজয় ভবনে, যেখানে পার্টি তাকে সম্বর্ধনা জানায়, উপহার দেয় রক্তপতাকা, আর প্রতিদানে পায় "In the Sun and In the Rain" শীর্ষক বিষ্ণুর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধ সংগ্রহের গ্রন্থকারসত্ব! এখানে একটু অনুচ্চ স্বরে জানাই যে বইটি বিষ্ণু উৎসর্গ করেছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক পুরণচাঁদ জোশী এবং আমাকে। আরও না বলে পারছি না যে তার এক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থও উৎসর্গিত হয়েছিল অনেকদিন আগে একই সঙ্গে মনস্বী কবি ও 'পরিচয়' এর প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং আমাকে! এটা বিশেষ করে মনে পড়ল সেদিন এক বাংলা দৈনিকের মন্তব্য থেকে যে সুধীন্দ্রনাথ এবং আমার অবস্থান যে একেবারে দুই বিপরীত মেরুতে। বৈপরীত্য আর ঐক্য নিয়ে বিতণ্ডা যে চায় চাক্, বিষ্ণু চেয়েছিল একটু মজা করতে - সে তো লিখে গেছে ঃ

> "পেতে চাই স্তব্ধ শান্ত পৃথিবীতে শুচি মহাকাশে,
> দুদিকে মরাই ভরা, সুগভীর শহর দু'পাশে,
> যেখানে মানুষ মুক্ত, প্রতি ব্যক্তি সংলগ্ন প্রত্যাশে,
> শতায়ু বিনাই প্রতি মানুষ অমর।"

আমার আশঙ্কা এই যে বিষ্ণুর সান্নিধ্যই দায়ী, যে ত্রিশের দশকে কবিতা ব্যাপারে বিজ্ঞ বলে একটা জনশ্রুতি আমার সম্পর্কে গজিয়ে উঠেছিল। তার আগ্রহ ও সহায়তা না থাকলে ১৯৩৯ নাগাদ সময়ে আমার আর এক বন্ধু (গভীর অর্থ ভিন্নরুচি হলেও) আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে নামতাম না। এই প্রযত্নে অপর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন প্রথিতযশা বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু নানা কারণে, ঠিক আমার বোধগম্য নয় কেন, পরে রুষ্ট হয়ে বুদ্ধদেববাবু সেই সংকলনকে সরিয়ে তার প্রকাশনকেই একটি "non-event"-এ পরিণত করেন (হয়তো বাংলাভাষার কোনো ভবিষ্যৎ গবেষক এর উদ্ধার ঘটাতে পারেন ভবিষ্যতে)।

এই সুবাদে মনে পড়ছে ১৯৫৪ সালে মস্কো শহরে সোভিয়েট লেখকসংস্থার সদর দফ্‌তরে তখনকার বিখ্যাত Boris Polev i ("The Story of a Real Man" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা) আমাকে সোল্লাসে আলিঙ্গন করেছিলেন জেনে যে নানাবিধ লেখার মধ্যে আমার আছে দুটি (বিপরীত মেরুর ?) কাজ—স্টালিন প্রমুখ কয়েকজনের লেখা সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির বিপুল ইতিহাসের বাংলা তরজমা, আর আধুনিক বাংলা কবিতার

সঞ্চয়ন সম্পাদনা। প্রথম কর্মটির জন্য অধুনা গর্বাচভীয় বিচারে আমার কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ বোধ করা উচিত। কিন্তু না, জোর গলাতেই বলব বিন্দুমাত্র লজ্জা আমার এব্যাপারে নেই। বরং আছে একটু গর্ব, যা গতযুগের এক পুরোধা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার আমার মনে জাগিয়েছিলেন "বাঙালীর বাচ্চা" ছ'শো পাতার বই লিখে "বাহাদুরের কাজ" করেছে বলে। আধুনিক কবিতা সংকলন সম্পর্কে আমার মনে অবশ্য সংকোচ এখনও যায় নি। বাস্তবিকই বিষ্ণুর মতো বন্ধুর প্ররোচনায় আমি তখন অনধিকার প্রবেশই করেছিলাম ঐ-কর্মে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমার মেয়ে রিনি যখন জন্মায়, তখন "কোনো বন্ধু কন্যার জন্মে" আখ্যা দিয়ে বিষ্ণু একটি কবিতা লেখে। "রূপসীর মেয়ে" বলে নবজাতককে সম্বোধন করে তিনি লেখেন: "পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার লাস্যে / সমসুযোগের সহজ জীবনে আসবে"—আরও যোগ দেন: "জানি হে নবীনা! তোমার যুগের কর্মে / আত্ম-গ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে।" হ্যাঁ, এতকাল পরে একটু অপ্রতিভের মতোই বুঝি যে সবাই ভাবতাম আমাদের প্রতীক্ষাপূরণে বড়ো বেশি বিলম্ব বুঝি নেই। সেদিনের অতি-সারল্য (naivete) অল্পাধিক সকলের মনেই বোধ হয় ছিল, বিষ্ণুরও। তবু কেমন যেন অস্বস্তি লাগে যখন বিষ্ণুর অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন চলছে তখন ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবর্ষপূর্তি নিয়ে খাস্ প্যারিস থেকে আজকেরই এক প্রধান বাঙালী কবি রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন সেই বিশ্রুতকীর্তি বিপ্লবের ব্যর্থতাই বুঝি ইতিহাসে প্রকট, ইত্যাদি আপ্ত বাক্যের উত্থাপন করে। সে কথা থাক্। রুশবিপ্লব বিষয়ে হঠাৎ মনে পড়ছে বিষ্ণুর "সংবাদ মূলত কাব্য" গ্রন্থের অন্তর্ভূত একটি কবিতা যা আমারই ছেলে, 'লামুর জন্য' বলে উল্লিখিত—এতে রয়েছে 'স্টেশনের দৃশ্য' যার শেষ পংক্তি হল: "তাই কি দেশের ছেলে-মেয়ে থাকে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে এই ফিন্‌লাণ্ড স্টেশনে"। কবিকুলে কজনের স্থির জ্ঞান ছিল: "স্রোত চলে সূর্য জ্বলে"—কজন জানতেন নিরবধি কাল আর বিপুলা এই পৃথ্বীতে নব-জীবনের উদ্ভবকে কেউ রোধ করতে পারে না—তবে সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে তো কোনো স্থাণু, স্থায়ী, সংগ্রামরহিত স্ববিরোধমুক্ত সমাজ সত্তার স্থান নেই।

কথা শেষ করি। স্বর মৃদু, কণ্ঠ অনুত্তোলিত অথচ জীবন-সত্যের সন্ধানে অবিরাম, বিশ্বরূপদর্শনে পুলকিত অথচ জগৎ ও জীবন নিয়েই হৃষ্ট চিন্তায় গভীর, চেতনায় স্বচ্ছ এই কবি শব্দের যোজনায় যে সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, পরিমাণে ও গুণগত বিচারে আর সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন শোভায় তা হল অপরূপ। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য জগতে হয় তো একাধিক শৃঙ্গ যা নিয়ে আমাদের গর্ব; তার একটির তুঙ্গে রয়েছেন বিষ্ণু দে। আমাদের এই বাংলা ভাষার কবিকাহিনী নিয়ে অহংকারের পরিসীমা থাকবে কেন? সেই

কবিকুলে পরম গরিমার জ্যোতি নিয়ে তিনি রয়েছেন। বাংলা আর বাঙালী তাকে কখনও বিস্মৃত হবে না।

কলকাতা ১৯/৭/৮৯

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি বন্ধু বিষ্ণু দে

আজ থেকে ষাট বছর আগে আমি বিলেত থেকে ফিরে অবিভক্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত হই। বহরমপুর যাবার পথে কলকাতায় কয়েকদিন কাটাই। উঠি ক্যালকাটা হোটেলে। 'পথে প্রবাসে' লিখে ইতিমধ্যে আমার কিছু নাম হয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা করতে যাঁরা আসেন তাঁদের একজন ছিলেন বিষ্ণু দে। সেই প্রিয়দর্শন তরুণটিকে আমার প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে যায়। সেটা তাঁর কাব্যকৃতির জন্যে নয়। তাঁর স্নিগ্ধ কমনীয় ভাবাকুল কবিসুলভ বদনের তথা মার্জিত পরিশীলিত সুরুচিপূর্ণ বাগবৈদগ্ধ্যের জন্যে। তখনো তিনি কলেজের ছাত্র, কিন্তু কাব্য সাহিত্যের অধ্যয়নে সহপাঠীদের চেয়ে অগ্রসর। তাঁকে আমি বলি, "বাঙালী লেখকরা এত বেশী ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন কেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমরা বাঙালীরা বাইলিঙ্গুয়ল"।

আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু নিজেও তো কম ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতুম না।

এর কিছুকাল পরে বিষ্ণু আমাকে তাঁর "উর্বশী ও আর্টেমিস" পাঠিয়ে দেন। আমি আরো বিরক্ত হই ভারতীয় মিথের সঙ্গে গ্রীক মিথের সমীকরণ দেখে। এ যেন সেই বাইলিঙ্গুয়াল থেকে এক কদম বাইমিথোলজিকাল। উর্বশী অপ্সরা। আর্টেমিস ওরফে ডায়না দেবী। উর্বশীর একাধিক বিবাহ। আর্টেমিস চিরকুমারী। কাউকে ভালোবাসেন না, কারো ভালোবাসা পছন্দ করেন না। ভারতীয় মিথোলজিতে এঁর জুড়ি নেই। বিষ্ণু বোধ হয় বৈসাদৃশ্য দেখাতেই চেয়েছিলেন। বিপরীত আদর্শের সংঘাত।

পরে দেখা গেল তিনি এলিয়টের সঙ্গে কার্ল মার্কসের সমীকরণ ঘটাতে চেয়েছেন। পুরোপুরি মার্কসিস্ট হতে তিনি চান নি বা পারেন নি। তাঁর কবিসত্তা কুণ্ঠিত হয়েছে।

পুরোপুরি এলিয়টপন্থীও তিনি হননি, হতে চান নি। তাঁর এই দ্বৈত সত্তা তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করেছিল। তাঁর দিক থেকে সেটাই তাঁর স্বধর্ম। তিনি বিস্তর বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেন। যাঁদের কবিতার অনুবাদ, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মাও জে দং। বিদেশী হলেও আত্মার আত্মীয়।

বিষ্ণুর এইসব আত্মার আত্মীয়রা আমার আত্মার আত্মীয় ছিলেন না। অথচ তিনি স্বয়ং ছিলেন আমার আত্মার আত্মীয়। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত" তিনি আমাকেই উৎসর্গ করেন। সেই গ্রন্থের জন্যে তিনি পান সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার তথা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

এর আগেই আমার 'নূতন বারান্দা'র একটি অংশ আমি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করেছিলুম। সে গ্রন্থের কয়েকটি কবিতাও ছিল তাঁর সঙ্গে জড়িত। পরে যখন আমার প্রবন্ধগ্রন্থ 'চক্রবাল' উৎসর্গ করি তখন দেখি বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে। তিনি বইখানি হাতে নিলেন, কিন্তু নিজের নামটি লক্ষ করলেন কিনা বোঝা গেল না। তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ। তাঁর শারীরিক অবস্থাও আরোগ্যের অতীত হয়। একদিন কানে এল তিনি মৃত্যুশয্যায়। গিয়ে দেখি একটু আগেই তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি শান্তিতে শয়ান।

অনুজের মতোই আমি তাঁকে ভালোবাসতুম। তিনিও আমাকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতেন। পার্টিশনের পরে আমি যখন কলকাতায়, তিনি একদিন এসে বলেন তাঁকে কলকাতার বাইরে বদলী করার চেষ্টা চলেছে। তাতে তাঁর সমূহ ক্ষতি হবে। তিনি কলকাতার মানুষ। তাঁকে যেন কলকাতায় রাখা হয়। আমি যেন অমুককে একটু বলি। আমাকে বলতে হয় না। তাঁর বদলী রহিত হয়। কিন্তু তাঁকে সেই সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ ওরফে মৌলানা আজাদ কলেজেই ফেলে রাখা হয়। যদিও তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের যে কোনো অধ্যাপকের মতো যোগ্য। ইংরেজিতে তিনি যামিনী রায় সম্বন্ধে লিখেছিলেন। অন্যান্য শিল্পীদের সম্বন্ধেও। দিল্লী থেকে তাঁকে ডাকা হতো সরকারের ক্রয়যোগ্য চিত্র নির্বাচন করতে। সেই সূত্রে তিনি বাইরে যেতেন। নইলে যা কুনো! নিমন্ত্রণসত্ত্বেও রাশিয়ায় যান নি। আমাকে একবার ফ্রান্সে যাবার জন্যে একটা ফেলোশিপ গ্রহণ করতে বলা হয়। ছ'মাসের জন্যে। বয়স পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হওয়া চাই। আমার বয়স তার বেশি। তাই আমি সেই প্রস্তাবটা বিষ্ণুকে পাঠিয়ে দিই। লিখি প্যারিসে ছ'মাস কাটানোর এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। তিনি অনিচ্ছুক। জীবনে কোন দিন তাঁকে ইউরোপীয় পোশাক পরতে দেখা যায় নি। পাশ্চাত্য বসনের মতো পাশ্চাত্য অশনেও অনীহা ছিল না তো?

পার্টিশনের কয়েক বছর পরে রাজস্থান থেকে এক কবি কলকাতায় আসেন। রাজস্থানীরা তাঁকে সম্বর্ধনা দেন। আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় বিষ্ণু এসে উপস্থিত। "শুনলুম আপনিও নিমন্ত্রিত। আপনার সঙ্গেই যাব। জায়গাটা আমার অচেনা।" যেতে যেতে সঙ্কোচের সঙ্গে বলেন, "আমি তো গণ্যমান্য কবি নই। দুরূহ কবি। বরাবর অবহেলিত। অবহেলাই স্বাস্থ্যকর।" ইংরেজীতে বলে স্যালুটারি নেগলিজেন্স।

এ নিয়ে তাঁর অভিমান ছিল। পশ্চিমবঙ্গে কেউ তাঁকে কোনো পুরস্কার দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে না। ক্ষমতা যখন বামপন্থীদের হাতে এল তখন তাঁর স্বদলের নেতারাও তাঁর জন্যে কেউ কিছু করেছিলেন বলে শুনিনি।

তাঁর সঙ্গে তাঁর মতবাদ নিয়ে মাঝে মাঝে হাসি তামাসা হতো। একবার আমি বলি, "শ্রেণীশূন্য সমাজ যারা চায় তাদের উচিত চাষার মেয়ে বিয়ে করা।" তা শুনে তাঁর নাসিকা কুঞ্চিত হয়। তিনি বলেন, "তা হলে যে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।" তার মানে গায়ের গন্ধ সহ্য হবে না। বোঝা গেল মানসিকতাটা বুর্জোয়া শ্রেণীর।

কখনো তাঁকে ময়লা কাপড় জামা পরে থাকতে দেখিনি। সব সময়েই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, ধোপদুরস্ত। অথচ সাদাসিধে। কথাবার্তা সুপরিমিত। অনেক সময় দুটি একটি বাক্যে সারতেন। রসিক পুরুষ। একবার আমি জানতে চাই তাঁর দশা কেমন হবে—যদি জনতার কোপে পড়েন।

তিনি হেসে বলেন, "শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকের সিনার মতো। ওরা আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হবে। আমি কবি, আমি সিনা দ্য পোয়েট। চক্রান্তকারী সিনা নই, কবি সিনা। ওরা কবি সিনাকেও রেহাই দেবে না। ওরা তাঁকে ছিঁড়ে ফেলবে তার খারাপ কবিতার জন্যে।"

তেমন পরিস্থিতি সত্যি সত্যি একদিন দেখা দেয়। তাঁর পাড়ার হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়ে মুসলমানদের তাড়া করে। একটি মুসলমান ছেলে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে গেলে হিন্দুরা তার মাথা তাক করে ঢিল ছোঁড়ে। সে ডুব দেয়। কিন্তু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আবার মাথা তোলে। তখন আবার ঢিল। শেষ পর্যন্ত মারা যায় সেই ছেলেটি। তার একমাত্র অপরাধ সে মুসলমান। বিষ্ণু তাঁকে বাঁচাতে পারেন না।

কিন্তু আরেকটি মুসলমানকে বাঁচাতে হিন্দুদের পেছনে ধাওয়া করেন। নিজেই মারের চোটে জখম হন। তখনকার মতো সেরে গেলেও মারের চোটটা চাপা থাকে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে চাড়া দেয়। মৃত্যুর একাধিক কারণের একটি এই পুরনো জখম। জীবনে অন্তত একটি বীরোচিত কাজ করেছিলেন শান্ত শিষ্ট এই কবি।

দেওঘরের কাছে রিখিয়া গ্রামে বিষ্ণুরা গিয়ে ছুটি কাটাতেন। সেখানে একখানা ডেরা ছিল তাঁদের। কলকাতায় ফিরে আসতেন তরতাজা হয়ে। কিন্তু শেষের দিকে বিষ্ণু একটা দুর্ঘটনায় আহত হন। সেটাও নাকি তাঁর মৃত্যুর আরো এক কারণ। কল-কাতায় ফিরে এসে শয্যাশায়ী ছিলেন অনেক দিন। তাঁর সহধর্মিণী প্রণতি প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষা করেন। চিকিৎসারও ক্রটি ছিল না। অকালেই বিদায় নিলেন কবি।

কবি নেই, কবিতা আছে। কবিরা থাকেন না। তাঁদের কবিতাই থেকে যায়। বিষ্ণুর বেলায়ও তাই হয়েছে ও হবে। এখনো তাঁর কবিতার মূল্যায়নের সময় আসে নি। তাঁর সময়ের থেকে তিনি এগিয়েই ছিলেন। এখনো রয়েছেন। জনগণের মান-সের দিক থেকেও এগিয়ে। শ্রমিক কৃষক যখন বিপ্লব সফল হয়ে সমসমাজ গড়বে তখন তাঁর অস্তিত্ব হবে তাদেরও অস্তিত্ব।

বরেন্দ্র প্রসাদ রায়

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে'র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৩২ সালের শেষের দিকে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যে এম, এ ক্লাসের ছাত্র। যে কালে ম্যাথু আর্নল্ডের দেওয়া Culture কথাটির সংজ্ঞা ছিল—Sweetness and light—যেটা আজ নিশ্চয়ই "তারিখগ্রস্ত", হয়ত প্রত্যাখ্যাত। তবুও মৌচাক থেকে নেওয়া উৎপ্রেক্ষাটি প্রয়োগ করে বলতে পারি যে বিষ্ণু দে'র মতো মাধুর্যমণ্ডিত প্রতিভা আমি খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি।

ভদ্রলোক আমাদের থেকে বছর দুইয়ের বড় ছিলেন। দু'বছর আগে বি, এ পাশ করে তিনি তাঁর পিতার অফিসে attorney হওয়ার জন্য articled clerk হন, কিন্তু বেশী দিন যাওয়ার আগেই সে পথ ছেড়ে এম, এ ক্লাসে যোগ দেন। আজ মনে করতে পারি, ভাগ্যিস তিনি সাহিত্যের রাস্তায় আবার ফিরে এসেছিলেন, তাই সারাজীবন পরের গোয়ালে ধোঁওয়া না দিয়ে, চিনির বলদগিরি না করে, আজ তিনি বাংলা সাহিত্যের (যাকে সম্প্রতি নীরদ চৌধুরী মহাশয়ের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি পৃথিবীর সেরা বলে অভিহিত করেছেনে) একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

বিষ্ণু দে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখেন নি তাঁরা তাঁর অল্প বয়সের ছবি থেকে বুঝতে পারবেন। ১৩৩৩ সালেই তাঁর প্রথম কবিতাগুলির সংগ্রহ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০ ছেলেমেয়ের ক্লাসে তিনি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, তিনি বিয়ে করেছিলেন "অনেক চিত্তকে কাঁদিয়ে" আমাদেরই একটি সহপাঠিনীকে)। কিন্তু মানুষটি খুব লাজুক ছিলেন। অধ্যাপকের থেকে তিন বেঞ্চির আগে বসতেন না। ক্লাসে কোনও নোট নিতে তাঁকে

দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। অধ্যাপকের কোনও প্রশ্নের উত্তরে সকলে যখন নিরুত্তর সেই সময় দু'একবার উত্তর দিতে শুনেছি। একবার কোনও বড় ছুটির আগে একটা প্রীতি সম্মেলনে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা আবৃত্তি করতে বলায় তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করে পারেন নি। সকলে ভাবছিল যে উর্বশী বা সোনার তরী ধরনের কোনও কবিতা শোনাবেন কিন্তু কোন-ক্রমে "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস" কবিতাটির চার লাইন পড়ে ফিরে এসে আসন নিয়েছিলেন।

অথচ তাঁর মধ্যে একটা সুন্দর, প্রচ্ছন্ন ও পরিচ্ছন্ন sense of humour ছিল। এক-দিন আমি Hamlet এর বিশ্ববিশ্রুত soliloquy থেকে "The undiscovered country from whose bourn no traveller returns, puzzles the will" কথাগুলি উল্লেখ করে বলেছিলাম যে এটা কি আশ্চর্য নয় যে তার কয়েক সীন আগেই Hamlet-এর তাঁর পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছিল? বিষ্ণু দে বলেছিলেন যে সর্বজনবিদিত mixed metaphor "to take up arms against a sea of troubles" এর মত ঐ কথাগুলিও soliloquyটি উদ্গারণের সময় Hamlet এর ঘোর বিকারাচ্ছন্নতার জন্য: হয়ত তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বাভাষ। (সেটা সত্য না কপট তা বোধ হয় এখনও Computer ব্রতীরাও সাব্যস্ত করতে পারেন নি!)

ঐ রকম সময়ে বিষ্ণু দের কবিতা নিয়ে শনিবারের চিঠিতে অনেক শ্লেষাত্মক সমালোচনা বের হত প্রায় নিয়মিত। তারই উল্লেখ করে আমাদের একজন প্রিয় বন্ধু প্রাণবল্লভ সেন বিষ্ণু দেকে মাঝে মাঝে কিছুটা কৃত্রিম বিরুদ্ধ প্রশ্ন করতেন। মনে আছে একবার হাসতে হাসতে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে বিষ্ণু দে বলেছিলেন "প্রাণবল্লভবাবুও আমার ভক্ত। কিন্তু তিনি আমাকে পেতে চান তিন জন্মে শত্রুভাবে, কারণ বিষ্ণুকে মিত্রভাবে পেতে সাত জন্ম লাগে।"

বিষ্ণু দে তাঁর লেখা "ঘোড়সওয়ার" কবিতাটি আমার নামে উৎসর্গ করে আমাকে অপ্রত্যাশিত সম্মান ও প্রীতি দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নিকট শুনেছি যে সে সময় তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। "চোরাবালি" নাম দিয়ে যে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হয় তাতে "ঘোড়সওয়ার" কবিতাটিই ছিল প্রথম। সেই বইটি আমাকে উপহার দেওয়ার সময় কালি দিয়ে লিখেছিলেন—"My desolation does begin to make / A better life ?" Cleopatraর এই মর্মন্তুদ বাক্যটি (দুই মিত্রের মধ্যে) কৌতুকে পরিণত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব শেষের জিজ্ঞাসা চিহ্নটিতে। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি—একজন পড়তে নিয়ে যান, আর তারপরে যা হয়।

"ঘোড়সওয়ার" কবিতাটির সম্পর্কে আর একটি কথা। অন্য কবিতাগুলির মধ্যে চারটি কবিতা যথাক্রমে প্রথিতযশা আবু সয়ীদ আইয়ুব ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সর্বজন আদৃত সমর সেনকে ও দেশগৌরব শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আমার মত নগণ্য ও বিশেষতঃ "double dyed advisor to the Capitalists" ব্যক্তির স্থান পাওয়া কি সত্যই শ্লাঘার বিষয় নয়?

বিষ্ণু দে'র কবিতা ও অন্যান্য লেখার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে তাঁর মূল্যায়ন, আমার থেকে উপযুক্ততর ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু একটা কথা আমার বরাবর মনে হয়েছে যে তিনি যাকে বলা হয় স্বভাব কবি তা ছিলেন না। তিনি প্রভূত পড়াশুনা করেছিলেন, বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য (বিশেষতঃ ইংরাজি) ভাষার কাব্য ও সাহিত্যে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞান ছিল। কবি য়েটসের পর ইংরাজি কবিতার জন্য টি, এস্ এলিয়ট নোবেল প্রাইজ পান। যে সময়ের কথা লিখছি সে সময় এলিয়টের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দিগন্ত বিস্তৃত ও গগনস্পর্শী। আমার মনে আছে যে অপূর্ব চন্দ মহাশয়ের কাছ থেকে একখানি Magazine-এ লেখা Seneca in Elizabethan Translation প্রবন্ধটি বিষ্ণু দে আমাকে পড়তে দেন। আমি তার পূর্বে এলিয়টের কোনও লেখা পড়ি নি হয়ত নামও শুনি নি। সেটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়। কারণ বোধ হয় এলিয়ট সম্বন্ধে ভারতীয় কোনও পত্রিকায় সমালোচনা প্রথম বের হয় আনুমানিক ১৯৩৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরিচয় পত্রিকায় লেখা "ঐতিহ্য ও টি এস এলিয়ট" শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধে। বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এলিয়টের The Journey of the Magi কবিতাটি অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দেন—তাতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে অনুবাদটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করে প্রকাশ করেন। এটা আমার শোনা কথা। কিন্তু নিশ্চিত জানি সেটা এই যে বিষ্ণু দে'র মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষকদের প্রবাদপুরুষ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও দর্শন ও সাহিত্যে সমভাবে নিষ্ণাত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের এলিয়টের লেখার সহিত পরিচয় বা অন্ততঃ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বলা বাহুল্য বিষ্ণু দে উভয়েরই অতি প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং আমি আজও মনে করতে পারি যে এম এ পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার দিনই প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় তাকে এলিয়টের উপর গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে সময় দুজন প্রখ্যাত কবি ও লেখক এলিয়টের উৎকর্ষের প্রবক্তা ছিলেন—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে—তবে রাজেশ্বর সুধীন্দ্রনাথের ছিল "অখণ্ড অবসর ও অপার দৈবানুগ্রহ" যেটা বিষ্ণু দে'র ছিল না।

এলিয়টের গদ্য রচনার সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর কবিতা আমি নিজে নিজে ঠিক সবটা বুঝে উঠতে পারতাম না, সেইখানে বিষ্ণু দে'র সঙ্গে আলোচনায় আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল। এলিয়ট দুরূহ কবি এ কথা বোধ হয় অনস্বীকার্য। তখন সদ্য প্রকাশিত I A Richards এর Principles of Literary Criticism পুস্তকে এলিয়টের কবিতার উপর একটি প্রবন্ধে লেখক "Music of ideas" বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন। যার ব্যঞ্জনা, যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম সেটা বিষ্ণু দে'র সাহায্যে। ঐ বইটিতে এলিয়টের নাতিদীর্ঘ একটি কবিতার মধ্যে ১২টি allusion আছে এই কথা বলা ছিল। বিষ্ণু দে ১১টি পর্যন্ত বের করেছিলেন এম, এ পরীক্ষার অল্প আগে বা পরে। এবং বলেছিলেন যে ঐ allusion গুলি পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখা যায় যে ছোট একটি কবিতার মধ্যে একখানি আস্ত নভেল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যদিও Westminster Abbey-র Poets Corner-এ তাঁর পাশাপাশি Auden-এর প্রস্তর ফলক দেখেছি তবুও মনে হয় যে তাঁর দেশে এলিয়টের যুগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তিনি বেঁচে আছেন মূলতঃ CATS Musical-টিতে। CATS এর টিকিট তিনমাসের আগে না কিনলে পাওয়া যায় না অথচ The Murder in The Cathedral মাঝে মাঝে অভিনীত হয় খুবই জনবিরল প্রেক্ষাগৃহে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের বেঁচে থাকা চিত্রাঙ্গদা আর তাশের দেশের মধ্যে! অভিজ্ঞ দু একজনের কাছে শুনেছি যে দুরূহতা এই অবস্থার একটি কারণ। সম্প্রতি কলকাতায় এলিয়টের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এলিয়ট অনুরাগীদের মধ্যে ক' জন বিষ্ণু দে'র মতো বারটি allusion উদ্ঘাটন করতে পারেন তা জানি না—একটি প্রবন্ধে কৌতুক অনুভব করেছি যাতে লেখক বলেছেন যে এলিয়টের কবিতা আস্বাদনের একটা আনন্দ হচ্ছে কবিতাটি না বুঝতে পারায়। সম্প্রতি Sir Stephen Spender কলকাতায় বলে গেছেন যে এলিয়টকে জিগ্যেস করায় তিনি বলেছিলেন যে objective correlative কথাটির মানে তিনি ভুলে গেছেন—কিন্তু এই নিয়ে সে যুগে আমাদের কি মাতামাতি ছিল।

আমি অভ্যস্ত লেখক নই। যে সময়ের কথা লিখলাম তাই উল্লেখ করে, বিষ্ণু দে মহাশয়ের স্ত্রী আমাকে লিখেছিলেন যে সে সময় আমি তাঁর স্বামীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম এবং সে কথাটি তাঁর শোনা তাঁর স্বামীর মুখে। বিষ্ণু দে আজ কয়েক বছর হল পরলোকগমন করেছেন। "I weep as I remember how oft' you and I / Had tired the Sun with talking and sent him down the sky" কথাটির ধরনের প্রজ্ঞাঘন খেদোক্তি আমার ছোটমুখে শোভা পাবে না। তাই এই প্রবন্ধটি শেষ করছি তাঁর সঙ্গে যোগসূত্রের একটি ঘটনায়, সেটা এই যে তিনি ও আমি এম, এ পরীক্ষায়

একজনের কাছে প্রায় ফেল করি। সেকালে এম্, এর অষ্টম পেপারের বিষয় বস্তু ছিল Essay লেখা। বিষ্ণু দে ও আমি প্রশ্নপত্র থেকে একই বিষয় বেছে নিই— The Influence of Tradition on Literature-Essay paper এর কাগজ পর পর দু জন পরীক্ষক দেখতেন এবং তাঁদের দেওয়া নম্বরের average সংখ্যাটি mark-sheet এ যোগ হ'ত। অন্যূন ৬০ নম্বরে প্রথম শ্রেণী, ৪৫ নম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণী ও ৩৬ নম্বরে তৃতীয় শ্রেণী নির্ধারিত হ'ত। পরীক্ষকদের একজন ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এবং যতদূর মনে হয় তিনি বিষ্ণু দে'কে ৬৮ ও আমাকে ৬৪ দিয়েছিলেন। অন্য পরীক্ষকটি ঐ একই খাতা দেখে আমাকে দিয়েছিলেন ৩০, বিষ্ণু দে কে ৩২। অর্থাৎ দুজনেই ফেল। সেই সময় এই ঘটনাটি নিয়ে কিছুটা চাঞ্চল্য ঘটেছিল এবং প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় পরে আমার উত্তরপত্রটি দেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ আমি লিখেছিলাম যে গ্রীক ট্র্যাজেডির একটি ধ্রুপদী নীতি ছিল—মানুষের শোচনীয় পরিণতির শুরু হয় "Hubris" বা অহংকারে এবং মধ্যের কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে পর্যবসিত হয় "Ate" বা ধ্বংসে। মধ্যের স্তরগুলি আমি ভুলে গেছি কিন্তু মনে আছে যে গীতোক্ত "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ···বুদ্ধিনাশাদ্ প্রণশ্যতি" শ্লোক দুটির প্রতি ক্লাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে দুটি চিন্তার মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল আছে। সে যা হোক আমার পরীক্ষকের মুস্কিল হয়েছিল "Ate" কথাটি নিয়ে। লিখতে হয়ত ভুল হয়েছে ভেবে তিনি margin-এ প্রশ্ন করেছিলেন "Hate ?" তার পর সংশোধন করে দিয়েছিলেন "Hatred" কথাটি বসিয়ে। "Ate" কথাটি গ্রীক হলেও Shakespeare Julius Caesar এ ব্যবহার করেছেন। পরীক্ষা প্রহসনের এটি একটি উদাহরণ। কিন্তু সে যাই হোক যাঁর কবিতা ও অন্যান্য মৌলিক রচনা এখনকার বাঙলা ভাষার এম্, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ও পরে গবেষণার বিষয়, সেই বিষ্ণুদের সঙ্গে Essay paper এ ফেল করে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হতে পেরেছি সেই ব্যক্তির মতো যার সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—স আত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলী চকার।

প্রতিভা বসু

সৌন্দর্যের প্রতীক বিষ্ণু দে

আমি যখন বিষ্ণু দেকে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়েস বোধহয় কুড়ি বাইশের বেশী হবে না। কান্তি ঘোষের সঙ্গে একটা গানের আসরে এসেছিলেন। যেখানে এই আসর বসেছিলো সেই জায়গাটার নাম সোদপুর, যে বাড়িতে বসেছিলো সেই গৃহস্বামীর নাম আমার মনে নেই, পেশায় বোধহয় ইঞ্জিনিয়ার, সোদপুরে তাঁর ফার্ম। সম্ভবত স্বাধীন ব্যবসা করছিলেন তিনি সেখানে। আমার মামার বন্ধু, অনেক দিন একসঙ্গে জার্মানীতে ছিলেন। সেই সুবাদেই আমাকে চেনেন, সেই সুবাদেই এই গানের আমন্ত্রণ।

আমি তখন ঢাকাতে থাকি, কলকাতা এসেছিলাম গ্রামোফনে গান দিতে। এই ভদ্রলোক খবর পেয়ে কার মধ্যস্থতায় আমাকে গান গাওয়াতে নিয়ে এসেছিলেন মনে নেই। আমি বিষ্ণুদের নাম জানতাম না, জানবার মতো নাম তাঁর তখনো হয়নি কিন্তু রূপ ছিলো মুগ্ধ হবার মতো। গান করতে বসলে আমাকেই শুধু পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, 'ইনি প্রতিভা সোম' কিন্তু শ্রোতাদের কারো নাম আর ঘোষণা করা হলোনা। শ্রোতার আধিক্য নেহাৎ মন্দ ছিলোনা, সেজন্যই সম্ভব হয়নি। তখন কান্তি ঘোষ বেশ বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডারও খ্যাতি ছিলো, নজরুল ইসলামের কাছে আমি তাঁর কথা অনেক শুনেছিলাম। কেউ একজন তাঁকে চিনিয়ে দিল। তখন এরকম টিকিট কেটে গানের আসর হতো না। যারা সঙ্গীতপিপাসু শুধু তাঁদেরই আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে এসব আসর বসতো। এটা আমার বিবাহের পূর্ববর্তী অধ্যায়। পরবর্তী অধ্যায় আমাদের বিবাহের অনতিপরেই বিষ্ণু দের বিবাহ। আমাদের নতুন সংসার তখন রসারোডের ফ্ল্যাটে গোলাম মহম্মদ ম্যানসনস্-এ। তার উল্টো-দিকেই ক্যালকাটা গার্লস্ স্কুল অথবা কলেজ, লাল একটা দোতলা বাড়ি, বুদ্ধদেব বললেন

ঐ বাড়িতে আজ বিষ্ণু দের বিয়ে হচ্ছে, আমার নিমন্ত্রণ আছে। ততোদিনে আমার বিষ্ণু দের নাম মুখস্ত। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতি পত্রিকার পাতায় পাতায় তাঁর কবিতা। কিন্তু এই বিষ্ণু দে আর সেই মনোহর যুবক বিষ্ণু দে যে একই ব্যক্তি তা আমি তখনো জানতাম না। একদিন বিষ্ণু দে এলেন, বুদ্ধদেব আমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এঁর কবিতা পড়েছ?

বিষ্ণু দেকে দেখে আমার পরিচিত বলে বোধ হচ্ছিলো। সেই কুড়ি বাইশ বছরের যুবকটিকে এতোদিনেও মনে রাখার কথা নয়। মনে থাকতো যদি কেউ আলাপ করিয়ে দিত। কিন্তু একজন অত সুন্দর যুবককে ভুলে থাকলেও নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি, তাই দেখেই স্মৃতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু দের ভঙ্গি খুব লাজুক ছিলো। সেই ভঙ্গিতেই দু' একটা কথা বললেন। নববিবাহিত ব্যক্তি, বেশীক্ষণ বসবার মতো সময় হাতে ছিলো না, তাই তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। আমিও চিন্তা করে পেলাম না কোথায় দেখেছি।

বিষ্ণু দে কোনো কোনো ব্যক্তি বিষয়ে খুব মজা ক'রে গল্প বলতে পারতেন। খুব নিচু গলায় কথা বলতেন। যেদিন আসতেন সেদিন হঠাৎ হঠাৎ বুদ্ধদেবের অট্টহাসিতে ঘর ফেটে যেতো, অপরপক্ষের কণ্ঠস্বর কানে আসতো না। কখনো কখনো কৌতূহলী হয়ে আমি সাংসারিক কাজে বিরতি দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসতাম। বিষ্ণু দের গল্প শুনে আমিও গলা মিলিয়ে হাসতাম কিন্তু যিনি কথক তাঁর হাসি চোখ ছাড়িয়ে ঠোঁটের বাঁকে এসে জমা হয়ে থাকতো, শব্দ হতো না। শ্রোতার হাসি থামলে তিনি আবার শুরু করতেন। বড়ো বড়ো টানা চোখের দৃষ্টি সব সময়েই আনত। বিশেষত কোনো মহিলা ঘরে ঢুকলে। আমি তখনো মহিলাদের অন্তর্গতই ছিলাম বিষ্ণু দের কাছে। সুতরাং আমাকে দেখলেও হেসে দৃষ্টি নত করতেন। একদিন গল্প করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কার গল্প বলছি বুঝতে পারছেন তো?'

বুদ্ধদেব ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় পাগল। আমিও কম হাসছি না। এই প্রশ্নে অবাক হয়ে বললাম 'কার গল্প?'

'আপনার সেই সোদপুরের ভদ্রলোকের।'

'সোদপুর', কে সে? আমার মাথায় তখন সোদপুরও নেই সোদপুরের ভদ্রলোকও নেই।

বিষ্ণু দে বললেন, 'মনে নেই? আপনার গান হয়েছিলো সেখানে, আমি আর কান্তি ঘোষ গিয়েছিলাম—ভদ্রলোক ওখানে জমি জায়গা নিয়ে কী সব করছিলেন—।'

'ওহ্‌হো, তাই বলুন। আমি প্রায়ই ভাবি আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—কিছুতেই ধরতে পারি না।'

এতোদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার খুব সুখ হলো। বিষ্ণু দে-র মতো সুন্দর মানুষকে একবার দেখলে কি আর ভোলা যায়? অবশ্য তাঁর শেষ জীবনে আমি বহুকাল তাঁকে দেখিনি। হিসেব করলে প্রায় বিস্মৃতির যুগ। কিন্তু আমার মনে বিষ্ণু দে এখনো সেই যুবকের চেহারা নিয়েই বেঁচে আছেন।

ভবতোষ দত্ত

সহকর্মী বিষ্ণু দে

১৯৩৫ এর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। রিপন কলেজে আশাতীত ভাবে ছাত্র-সংখ্যা বাড়ছে, অনেক নতুন অধ্যাপক প্রয়োজন। ইণ্টারভিউ-র জন্য ডাক পেয়ে এসেছি। আমাদের বসানো হয়েছে নীচের তলার অন্ধকার এক ঘরে। তিন চারটে দল চাকরিপ্রার্থী আলাদা আলাদা বসেছেন—অধ্যাপক নেওয়া হবে অর্থনীতিতে, ইংরেজিতে এবং আরো কয়েকটা বিষয়ে। চারদিকে তাকাতে চোখে পড়ল ইংরেজির প্রার্থীদের মধ্যে একটা চোখে পড়ার মতই চেহারা। দীর্ঘদেহ, ললিত কান্তি, আয়ত চোখ, মুখে একটু হাসি, গায়ে ধবধবে সাদা আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি। কলেজের সুপারিনটেনডেনট ব্যাঘ্র বিক্রম সুধীর বাবু নেমে প্রার্থীদের ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর ডাক শোনা গেল—"বিষ্ণু দে"। দীর্ঘদেহ তরুণটি উঠে দাঁড়ালেন।

নামটা অবশ্যই শোনা ছিল, কারণ ছাত্রজীবনেই তাঁর "উর্বশী ও আর্টেমিস" কাব্যগ্রন্থ সাড়া জাগিয়েছিল। সে-সময়টাতে রবীন্দ্র-প্রতিবাদী কবি-রা বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'অতি আধুনিক' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনানন্দ দাশ আরো নতুন সুর সৃষ্টি করছেন। আর বিষ্ণু দে আনছেন একটা নতুন ভঙ্গী এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা কবিতার সংযোগ। বিষ্ণুবাবুকে সেই প্রথম দেখলাম এবং দেখেই আকৃষ্ট হলাম। কবিতার চেয়ে কবি-র আকর্ষণ-ই প্রবলতর মনে হোল।

বিষ্ণুবাবু আর আমি দু'জনেই রিপনে কাজ পেলাম। বর্ধমান থেকে সেখানকার প্রথাগত কর্তব্য শেষ করে আসতে আসতে আমার এক সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এসে দেখি বিষ্ণুবাবু কয়েকদিন আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন। আমাদের প্রাথমিক সমস্যা হোল বসবার জায়গা নিয়ে। তিনতলা সিঁড়ির মুখে অধ্যাপকদের যে ঘরটি ছিল তাতে আমাদের জায়গা হয় না, আর সে-ঘরটি দখল করে থাকেন তাঁরা, যাঁদের আমাদের একজন সহকর্মী নাম দিয়েছিলেন "রোমান সেনেটরর্স।" আমরা "ফালতু"-রা জায়গা পেলাম পাশের একটি ক্লাস ঘর থেকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা একটা চিলতে ঘরে। সেখানেই একটা টেবিল আমরা দখল করে নিলাম।

এই টেবিলটা পরে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। আমাদের আগের বছর এসেছেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত আর নন্দলাল ঘোষ। আমার আর বিষ্ণুবাবুর পরের বছর এলেন প্রমথ বিশী, অজিত দত্তের পদত্যাগের পরে। তার পরের বছর এলেন হীরেন মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নৃপেন চট্টোপাধ্যায়। আমরা ক্লাস করতাম প্রচুর, আড্ডা দিতাম প্রচুরতর। প্রমথ বিশী সাহিত্য, রসালো গল্প আর কংগ্রেসি রাজনীতি দিয়ে সবাইকে উচ্চকিত করে রাখতেন। হীরেনবাবু তাঁর মার্জিত, গভীর মন্তব্যে এব সরস সাধারণ আলোচনায় সবাইকে মুগ্ধ করে রাখতেন। নন্দলাল ঘোষ সব কিছুতে তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সব আলোচনাতে একটা মধুর রস সংযোগ করতেন। বুদ্ধদেব বসু কথা বলতেন কম-কিন্তু মাঝে মাঝে অট্ট-হাসিতে ভেঙে পড়তেন।

আড্ডার প্রধান উপজীব্য পরচর্চা। বিষ্ণুবাবু এতে যোগ দিতেন পরম আনন্দে এবং খ্যাতনামা অনেকের বিষয়ে অবিশ্বাস্য সব রসালো গল্প বলতেন। তাঁর ধরন-ধারণ ছিল বিশিষ্ট। পোষাক-আশাকে ছিমছাম, চলনে-কথনে শান্ত, পরিশীলিত। তখন তিনি একদিকে ইংরেজি আধুনিক কাব্যরসে নিমগ্ন অন্যদিকে মার্কসবাদে প্রত্যয়ী। কিন্তু কখনো তর্ক করতেন না। একটু ছোট তির্যক মন্তব্য, মুখের স্থির চাপা হাসির সামান্য একটু বিস্তার—তাতেই অন্য অনেকের তর্ক থেমে যেত। তাঁরই বিখ্যাত কবিতা অনুকরণ করে আমাদের একজন লিখেছিলেন—"জনসমুদ্রে লাগালে জোয়ার জনযুদ্ধের গানে। মদিরেক্ষণ চোখে সে কী রাঙা রঙ। জাপানি বোমারু কাঁটা বুনে দিল অনন্ত-শয্যায়। চাপা হাসিটি তো তবু মিলালো না মোনালিসার!"

রিপন কলেজে যোগ দেবার অল্প পরেই—বোধহয় ১৯৩৬ এ—তাঁর "চোরাবালি" বইটি প্রকাশিত হয়। সারা জীবন বিষ্ণুবাবু অনেক কবিতা লিখেছিলেন। অনেক নতুন নিরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই "চোরাবালি" তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বই। আমাদের মুখে মুখে ঘুরত অনেক কবিতার অংশ—"কাঁপে তনুবায়ু কামনায়

থরোথরো। কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার / হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো / হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার। কিংবা, "কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ / স্মরণের নীল পরপার / হতোস্মি হবে জয়গান / ডুববে অহম কশ্চিৎ। দুর্গম দিন ক্ষুরধার। রাত্রিও হবে ক্ষীয়মান।" আবার একটু আধটু "লেগপুল"-ও করতাম—সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে "অলাতচক্রে চক্রমণ" বা "অপাপবিদ্ধমস্নাবির" জাতীয় বাক্যাংশ ব্যবহার করে। বিষ্ণুবাবু রাগ করতেন না—ক্ষমাসুন্দর চোখে আমাদের উৎপাত সহ্য করতেন। এটুকু অবশ্য জানতেন যে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অসীম।

রিপন কলেজের সাধারণ ছাত্র তাঁর সাহিত্য-পাঠনের গুণ বিচার করতে পারত না। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগী। তাঁর পরে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়েছেন। তরুণ ছাত্র-কবিদের তখন দু'ভাগে ভাগ করা হোত— "বৌদ্ধ" ও বৈষ্ণব। সহকর্মী শিক্ষকদের উপরে বিষ্ণুবাবুর প্রভাব পড়ল—কিন্তু যা দেখা যেত তার মধ্যে মেকি-র অংশ ছিল অনেকটা। হঠাৎ দেখা যেতে আরম্ভ করে যে প্রবীণ অধ্যাপকেরা (যাঁরা শিক্ষকজীবন আরম্ভ করবার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের "সিলেকসনস্" ছাড়া আর কিছু পড়েন নি) হাতে নিয়ে ঘুরছেন এলিয়ট, আর্ডেন, এজরা পাউণ্ড। উদ্দেশ্য ছিল অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে দেখানো যে তাঁরা কত আধুনিক। অধ্যক্ষ ঘোষ সবই বুঝতেন, তাঁর অশেষ স্নেহ ছিল বিষ্ণুবাবুর উপরে। "চোরাবালি" তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। আমাদের রিপন কলেজে কাজের শেষদিকে (আমরা প্রায় একই সঙ্গে চলে আসি) ইংরাজী বিভাগে এসেছিলেন বীরেন্দ্র বিনোদ রায় এবং হামফ্রি হাউস। হাউস বিষ্ণুবাবুর মধ্যে একজন সমগোত্রীয় খুঁজে পেয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় অনেক ইংরেজ তরুণ কবি-সাহিত্যিক-সাহিত্যবোদ্ধা এদেশে এসেছিলেন। জন আরউইনের সঙ্গে যোগাযোগ এখানেই হয়েছিল। পরে দুজনে একত্রে যামিনী রায়ের জীবনী লেখেন। আর একজন "বৈষ্ণব" ইংরেজ মার্টিন কার্কম্যানের সঙ্গে লণ্ডনে আমার আলাপ হয়েছিল।

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল শিল্পী যামিনী রায়ের আর বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসুর। আর ছিল "পরিচয় গোষ্ঠী"—যেখানে তিনি নিয়মিত সভাসদ্। আমাকে কয়েকবার বলেছিলেন পরিচয়ের বৈঠকে যেতে, কিন্তু আমি সাহস পাইনি। একবার একটা ইংরাজী বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলাম ইংরাজীতে। বিষ্ণুবাবু বললেন ওটা বাংলা করে দিতে। কিন্তু আমি বলেছিলাম, পরিচয়ের ভাষাশৈলীতে আমি পৌছতে পারব না। পরে দেখি বিষ্ণুবাবু নিজেই ওটা বাংলা করেছেন, যার ফলে জিনিষটার রূপান্তর হয়ে গিয়েছিল। আমি স্বনামে প্রকাশে আপত্তি জানানোতে বিষ্ণুবাবু লেখাটা

"বিশ্বতোষ দত্ত" নাম দিয়ে ছেপেছিলেন। ওঁর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের সেই বিখ্যাত বাড়ীতে অবশ্য আমি অনেকবার গিয়েছি। আড্ডা বসতো সেখানেও—তবে নিয়মিত নয়।

কলেজের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিষ্ণুবাবুকে কখনো দেখতাম না। অবশ্য বুদ্ধদেব বাবুকেও নয়, এঁদের দুজনকে নিয়ে কলেজের রুটিনে একটা মজার জিনিষ থাকত। "লঙ্গার ন্যারেটিভ পোয়েমস্" নামের একটি কবিতা-সংকলন পড়াতেন বিষ্ণুবাবু। "শর্টার ইংলিংশ স্টোরিজ" পড়াতেন বুদ্ধদেব। রুটিনে লেখা থাকত—"লঙ্গার—বি. দে" আর শর্টার—বি. বোস"। যারা দুজনকেই দেখেছেন তাঁরা রুটিনের এই অপরিকল্পিত রসিকতার অর্থ বুঝতেন। রিপন কলেজের জনবহুল ক্লাশে পড়াতে বিষ্ণুবাবু আরাম পেতেন এটা বলা যায় না। তাঁর গভীর বিশ্লেষণ গ্রহণ করবার মত ছাত্র রিপনে কয়েকজন সর্বদাই থাকত, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রের কাছেই তিনি ছিলেন দুর্বোধ্য। ইংরাজী বিভাগের সহকর্মী অধ্যাপকদেরও অনেকে বিষ্ণুবাবু বা বুদ্ধদেব বসুকে উঁচু স্থান দিতে রাজি হতেন না। কিছু করে উঠতে পারতেন না, কারণ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ছিলেন সবার উপরে।

এই বিষ্ণু-বুদ্ধ বিরোধী দলটি সুযোগ পেলেন ১৯৪২-এর শেষে, যখন বোমাতঙ্কে পলায়নপর ছাত্র ও অধ্যাপক মিলে কলেজে সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করলেন। তারা স্থির করলেন দিনাজপুরে— অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে জাপানি বোমার থেকে অনেক দূরে-কলেজের একটা শাখা খোলা হবে এবং কলেজের অধ্যাপকদের কয়েকজনকে সেখানে বদলি করা হবে। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং কয়েকমাস পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। তখন যাঁরা কলেজের কর্তৃত্বভার পেলেন তাঁরা চাইলেন বিষ্ণুবাবু আর বুদ্ধদেবকে বদলি করতে। বুদ্ধদেব রকমসকম দেখে আগেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুবাবুকে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ডেকেছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌সটিট্যুটের প্রকাশক-সম্পাদক রূপে। সেখানে সম্ভবত তাঁকে সংস্থার রিপোর্টগুলির ভাষা সংশোধন করতে হোত। একবার শুধু দেখেছিলাম খবরের কাগজে প্রকাশিত "পাত্র-পাত্রী" বিজ্ঞাপনের একটা পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা একজন গবেষক ও বিষ্ণুবাবুর নামে একটা বাংলা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ঠিক মনে পড়ছে না—পরিচয়ে, না সাহিত্য পত্রে।

এর পরে ১৯৪৪ এর সেপ্টেম্বরে বিষ্ণুবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার আগের বছর আমি চলে এসেছি ইসলামিয়া কলেজে। প্রেসিডেন্সিতে বিষ্ণুবাবুর নিয়োগ অনেকের মনঃপূত হয়নি—সরকারি চাকরির জন্য যে স্তরের পরীক্ষার নম্বর প্রয়োজন সেটা নাকি তাঁর ছিল না, কিন্তু সব দেখেশুনেই রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বিষ্ণুবাবুকে সাদরে গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনও লোক চিনতে ভুল করেনি। তারপর এল ১৯৪৭ এর আগস্টে দেশ বিভাগ। ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। অল্প দু'একজন ছাড়া তাঁদের সবাই চলে গেলেন পূর্বপাকিস্তানে। নতুন পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কলেজে অনেক অদলবদল হোল। এই সুযোগে একটা প্রবল গোষ্ঠী বিষ্ণুবাবুকে ইসলামিয়াতে বদলি করে দিলেন। বাকি চাকরি জীবন—বোধ হয় ১৯৭০ পর্যন্ত—ঐ কলেজেই কাজ করেন। কলেজটির নাম হোল প্রথমে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ তারপর মৌলানা আজাদ কলেজ। ১৯৫৮ তে বিষ্ণুবাবু "সিনিয়র সার্ভিস"--এ উন্নীত হলেন।

ইসলামিয়াতে ১৯৪৭-৪৮ এ আমি আর বিষ্ণুবাবু আবার সহকর্মী হলাম। বিদেশ থেকে ফিরে আমার নিয়োগ হোল প্রেসিডেন্সিতে, ১৯৫০ এ। দু'জন দুই কলেজে কিন্তু দেখা হোত মাঝে মাঝে। এর পরে আমি যখন রাজ্য সরকারের শিক্ষা-দপ্তরে আসি, তখনও দেখা হোত। কখনো কখনো আমার বাড়িতে চলে আসতেন। হয়তো হাতে থাকত নতুন কোনো বই—কখনো "মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা," কখনো "সংবাদ মূলত কাব্য"। বুঝতে পারতাম তাঁর দেহ ভাঙতে শুরু হয়েছে। শেষ দেখা হয় বোধ হয় ১৯৮১ তে। বর্ধমান থেকে নন্দলাল ঘোষ এসেছিলেন। বললেন, চলুন বেণী আর বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। বেণীর বাড়ী গিয়ে শুনলাম তিনি হাসপাতালে। বিষ্ণুবাবুকে বাড়িতে পেলাম। সুপরিচিত "ভাস্বর তনু" তখন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। মনে বিষাদ নিয়ে দু'জনে ফিরে এলাম।

শেষের দিকে মনে হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যয়ে দ্বিধা জেগেছে। যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা বোধ হয় সার্থক হয়নি। আমার মনে বাসনা জেগেছে যে প্রশ্ন তিনি "মহাশ্বেতা"-তে করেছিলেন সেই প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—"তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয় / স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?" এই প্রশ্ন অ-জিজ্ঞাসিত। অনুত্তরিত থেকে গেল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি কি তোরণ দেখতে পেয়েছিলেন ?

অশোক মিত্র

'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে'

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, কৈশোরের উপান্তে অস্থির আমি, আধুনিকতায় প্রবেশ করেছিলাম বিশেষ একটি কবিতার বিশেষ একটি পংক্তির জাদুস্পর্শে। ঐ বিশেষ পংক্তিটি আমার কাছে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিল। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সেই কবিতা—যা অবশ্য তার আগেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো সংখ্যায় ছাপা হয়ে গিয়েছিল—, বিষ্ণুবাবুর সেই আশ্চর্য পংক্তি আমার কাছে এখনো তার অপ্রশমিত মোহিনী মায়া নিয়ে প্রতিবার হাজির হয়, একই কাহিনী প্রতিবার, আমার বুদ্ধি শাণিততর হয়, আমার আবেগের শরীরে আরো অঢেল অনেক আনন্দ সংপৃক্ত হয় প্রতিবার।

'আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা'। আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন / কথা। আবহাওয়া নিয়ে / ভাবনাহীন কথা। আবহাওয়া, নিয়ে, ভাবনাহীন, কথা। আবহাওয়া, ভাবনাহীন, নিয়ে, কথা। অন্ত্যানুপ্রাস, বর্ণের হ্রস্বিত স্বরবর্ণের প্রয়োগ, অথচ পাশাপাশি একটি বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণের জিভের ডগায় ঘুরে ফিরে বেড়ানো, প্রায় জীবনানন্দের সেই বিড়ালের মতো। আবহাওয়া, ভাবনাহীন। 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন ··'। ঝটকা মেরে ঠিক তার পরেই: 'দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে'। 'কী যে', 'ভিজে'; আরো একটু বাদে, 'নিজে'। আধুনিকতা কাকে বলে আমার বুঝতে বাকি রইলো না।

রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা, কবিতায় বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টান্তিত প্রকরণ, কিন্তু বিষ্ণুবাবু আমাদের, ঐ একটি পংক্তির, ঐ কয়েকটি শব্দবিন্যাসের মধ্যবর্তিতায়, অনেক, অনেক

দূর পৌঁছে দিলেন, আধুনিক কবিতায় প্রবিষ্ট হলাম আমরা। 'কহিলে তুমি', 'কহিলে'-র সাধু প্রয়োগে কি একটু রঙ্গ লুকিয়ে আছে, তির্যক কোনো অনুষঙ্গ, পূর্বসূরীদের দিকে তাকিয়ে একটু মুখ-ভ্যাঙচানো? অনৈক প্রতীক-রোমান্টিক কোনো আকাট রোমান্টিককে এক হাত নিচ্ছেন? 'কহিলে তুমি', কোন্ বাণী তোমার চন্দনমুখ থেকে নির্গত হলো? 'দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে'। বাকিটুকু তো আর শোনার যেন দরকারই নেই। এবার একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার পর্যায়ে চ'লে যেতে পারি আমরা, নিজ-নিজ কল্পনাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে। কৌতুকে ব্যস্ত হ'তে পারি, অন্যমনস্কতায় আরো-কিছু অলস পংক্তিতে বিহার ক'রে ফিরতে পারি, অবসাদে ধূসর হ'তে পারি। আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথার মতো, আমরা দায়িত্বের অর্গল পেরিয়ে যথেচ্ছাচারী হ'তে পারি। আমাদের জন্য অজুহাত বলুন, উপচার বলুন, তা তো তৈরি। অন্তবর্তী একটি পংক্তির সিঁড়ি পেরোলেই, 'আবেশ-বশে—কথার মাদকতা'। ফের অন্ত্যানুপ্রাস, সেই অনুপ্রাসের ঘোর, সেই ঘোরে বুঁদ হয়ে যেতে পারি এখন, কী যেন কথা এইমাত্র বিষ্ণুবাবু ব্যবহার করলেন, হ্যাঁ, 'মাদকতা'।

রবীন্দ্রনাথ থেকে, যদি ব্যাকরণের বা শব্দব্যবহারের নিরিখে বিচার করা হয়, তেমন-একটা মস্ত দূরে চ'লে যাইনি আমরা। রবীন্দ্রনাথই তো 'বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'র ইশারায় মাতিয়েছেন আমাদের একদা, প্রথা ভেঙে এক ভয়ংকর শঙ্কাকুল নিষিদ্ধ প্রান্তরে বিষ্ণুবাবু অতএব নিয়ে যাননি আমাদের। কিন্তু ব্যাকরণের চেয়েও বড়ো ব্যাকরণ ব্যবহারের ভঙ্গিমা। যে-মুহূর্তে বলা হলো, 'আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন', যোজনের-পর-যোজন অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলাম আমরা। তার পর থেকে, যথার্থই, আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে।

ইতিহাস তার দ্বান্দ্বিক প্রবাহে অবিচল থেকেছে, আমরা, বিষ্ণুবাবুর সৃষ্টিপ্রবাহের তোড়ে ক্রমশ ভেসে গিয়ে, অতিক্রান্ত রাত্রিতে রজনীগন্ধাবনে যে-ঝড় ব'য়ে গেছে, তার বর্ণনায় চকিত হয়েছি, লুণ্ঠিত দ্বারকায় ব্যর্থ গাণ্ডীবের অক্ষম বিলাপ উপলব্ধি করেছি, পার্টির স্লোগানে জোগান দিয়েছি, আইসায়ার দৃষ্টিক্ষেপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে কারো পঁচিশ বছরের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছি, সন্দীপের চরের শরীরে বদ্বীপের মতো জড়িয়ে গেছি, তদ্‌গত প্রার্থনা জানিয়েছি, 'জল দাও আমার শিকড়ে', কিন্তু নতুন ক'রে আর কোনোদিন বুকে চমক বেঁধেনি, 'কহিলে তুমি কহিলে তুমি'-র উচ্চারণ যে-আধুনিকতায় আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল, তা থেকে আর অপসরণ ঘটেনি কখনো। আমার চেতনা উন্মীলনের কাহিনী বিধৃত ক'রে আছে অসম্ভব-অভাবনীয় আধুনিক ঐ পংক্তিপুঞ্জ। আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা। কথার মাদকতা পেরিয়ে অন্যত্র কোথায় যেন পৌঁছে

যাওয়া। ভবঘুরে ঘোরে বেগানা? কিন্তু না, তা তো নয়, এক অমরাবতীর দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, বিষ্ণুবাবু অমরাবতীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের, এখনো আঁকড়ে ধ'রে আছি সেই মায়াবী ভূখণ্ড। অথচ, 'চোরাবালি'-র পরবর্তী সংস্করণগুলি ঘেঁটেও দেখিনি আর কোনোদিন, বিষ্ণুবাবু কবে, চুপিচুপি, 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে' কে 'বল্লে তুমি, বল্লে তুমি কী যে'-তে রূপান্তরিত করেছেন, নাকি আমারই স্মৃতিবিভ্রম, তা নিয়ে মাথা-ঘামানো প্রয়োজন মনে করিনি। হয়তো বিষ্ণুবাবু তাঁর বচনভঙ্গিকে, রঙ্গের অতিরিক্ত প্রসঙ্গে বিসর্জন দিয়েই, আরো ঘরোয়া ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান করতে চেয়েছিলেন, হয়তো আমার স্মৃতিই আমাকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে, কিন্তু না, আমি, নিজে অন্তত, 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে'-র প্রকোষ্ঠেই থেকে যাবো; 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে', যা আমাকে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, এক দমকায় আধুনিকতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

সিদ্ধেশ্বর সেন

তাকে চেনা মনেরই এক জয়

কবি বিষ্ণু দে-কে নানাভাবে তাঁর সৃষ্টির নানাপর্বের দাক্ষিণ্যের অজস্রতায় তো পেয়েছিলাম আমরা আধুনিকের বাংলা কবিতায়—সে উজ্জীবনে, তিনি বলতে চাইবেন পরে সময়ের ধারা-প্রবাহের গতিমুখ বুঝি "একালের কবিতা"—যে নামের অভিধায় একটি কাব্য-সংকলনও সম্পাদনা করলেন তিনি।

শিরোধার্য রবীন্দ্রনাথ, আর তখন তরুণতর উত্তরকালের আমরাও এই সম্মানিত অগ্রজের নির্বাচনে সংকলিত হলাম।

সেই সময়ে আর তার আগে-পরে অনেকবার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের কিছু গাছপালা ও বাগান-ঘেরা তাঁর বাড়িটিতে গিয়েছি,পেয়েছি কবির স্মিত সহাস সৌজন্যে কবি-সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া প্রণতি-দির আতিথেয়তা। তাঁর বয়স্য ও অনুজ কবি ও বিদ্বৎ-জনদের ঘরোয়ায় এই পুরোধা মনীষী কবির সান্নিধ্যে যোগ দিয়ে ধন্য মেনেছি। আমার স্মৃতিতে ধরা আছে এই সব অম্লান টুকরো-ছবি, সমাজ-সাহিত্যের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কবির আলাপচারিতা, কখনো বা সদ্য লেখা তাঁর কবিতার পাঠ শোনা।

কিংবা তারও বহু আগে, আমাদের কৈশোরে, কবি-কে পেয়েছি ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভাঘরে, লেখক ও বিদগ্ধজনদের আলোচনায়, ধরা যাক সেই নান্দনিক—আরাগঁ-গারোদি বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন বিষ্ণু দে। বা তাঁর নতুন প্রকাশিত কবিতাগুলি আমরা পড়ছি ও বন্ধু-সতীর্থরা নিজেদের মধ্যেই মেতেছি আলোচনায়।

আলাদা করে তাঁর বই হাতে আসার আগেই, আমাদের সেই তারুণ্যেই, পড়ে নিয়েছি আধুনিক কাব্যের পথিকৃৎ প্রমুখ কবিদের সঙ্গে তাঁর মননদীপ্ত কবিতাগুলি সেদিনের এক স্মরণীয় সংকলনে—নাম "আধুনিক বাংলা কবিতা।" যুগ্ম-সম্পাদনায় ছিলেন আবু সয়ীদ

আইয়ুব ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি বিষ্ণু দে-রই অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সেটি ছিল ওই কাব্য সংকলনের প্রথম সংস্করণ, কবি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তার প্রকাশকরূপে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি যে ওই সংকলনটির উদ্যোক্তাও ছিল প্রগতি লেখক সংঘ, যে সাহিত্য-আন্দোলনের প্রবক্তাদেরও একজন ছিলেন কবি বিষ্ণু দে। কলকাতায় সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলনই (১৯৩৮) ছিল সে প্রকাশনার উপলক্ষ। এই সংকলনেরও পুরোভাগে বাংলা কাব্যের "শাশ্বতভাবে আধুনিক" কবি-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ।

মনে পড়বে, "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধের (কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এ পত্রস্থ) উপসংহারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কথা: "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা ."

বাংলা কবিতার আধুনিক পর্বের তিরিশের পুরোযায়ী কবিদের এই "মোহমুক্ত দেখা" নিয়েই কাব্য নির্মিতির প্রথম সোপান ও উত্তরণ, যা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় হয়েছিল— আমরা দেখে গিয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে জীবনানন্দ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অরুণ মিত্র ও পরবর্তী কবিকুলতিলকদের। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তো দীর্ঘায়ত, আপাতত নয়।

বরং এখন বলি কবির জন্মদিনের কথা।

প্রথম, বিষ্ণু দে তখন পূর্ণ গৌরবে পরিণত বয়সে, তাঁর জন্মোৎসব বেশ বড় করেই হল, দক্ষিণ কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে; মনে আছে সে কবি-সম্বর্ধনার সুধী-সভায় খ্যাতনামা লেখক-কবি শিল্পী গুণীজনের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল এঁরা, বিষ্ণু বাবুরও নিকটজন। সভায় সম্বর্ধনা ভাষণের পর বেশির ভাগটাই হল কবির একান্ত প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গান সেতার বাদন এবং অবিরল কবিতা পাঠ, কবি স্বকণ্ঠে কিছু শোনালেন আমাদের অনুরোধে, আর আমরাই তাঁকে শোনালাম আমাদের বাছাই তাঁরই কবিতা অনেকে পাঠ করে। মনে পড়ে, আমি পড়েছিলাম আমার খুবই প্রিয় তাঁর এই কবিতাটি "নিজস্ব সংবাদদাতা"—সে কবিতাটি যখন লিখেছিলেন সে উৎসও আমার জানা, তাঁর "স্মৃতিসত্তা…" বইটির অন্তর্ভুক্ত কবিতা। সেই: "…কিন্তু শুধু রিপোর্টার / কখনও নিইনি ভোট, দেশ স্বাধীন মস্তিতে / ভাঙি নি, কয়েক কোটি মানুষের দুর্ভাগা কপালে / হানি নি রাজ্যের লোভ ক্ষমতার কেরামতে সুখে / …" যে কবিতায় একদিকে দেখি …"শুধু নীরক্ত শ্বেতাঙ্গ রৌদ্র," অন্যদিকে সেই মন্দিরের…"বেদীর পিছনে দেখি বেঁচে আছে কালো পাথরের ধাপে / হিম অন্ধকারে একা কয়েকটা কাঠ-চাঁপা / মৃত্যুহীন

গোরোচনা বাহারের গন্ধের প্রতাপে / আর বাঁদিকের কোণে দেখি সজল মাটির একটি কলসী মুখচাপা”··· ।

তাঁর এই কবিতা-শরীরের ভিতরের সত্তার মতো দৃশ্য-অনুবন্ধটি নান্দনিক সূক্ষ্মতায় আজও প্রথমবার পাঠের মতোই আমাকে শিহরিত করে।

তাঁর আর-একটি জন্মদিন, যখন কবি আর আমাদের মধ্যে নেই।

সেদিন, এই তো বছর ছয়েক আগে, এমনটা হল যে সভাঘরের আলো, একবার নয় বেশ কয়েকবারই জ্বলে উঠে নিভে গেল—মহানগরের জনজীবনেরই সঙ্গী যেন, সেই ভার লাঘবের বৈদ্যুতিকতা, যার নামডাক 'লোডশেডিং'-এ। এ-সভার কথা এর আগেও বলেছি। তবু আবার, এই একটিবারও, এ-নিরালোক আমায় বিরল অভিজ্ঞতায় জাগিয়ে দিল।

সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় এক প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারত্ব আছে। এখানে তা নয়, এখানে এক পরিপাটি সভাতেই আলো-আঁধারির পারিপার্শ্বিকতা। বিষ্ণু দে আজ আমাদের মধ্যে থাকলে নিশ্চয় খুবই পরিহাসে মৃদু বলতে চাইতেন : ভালোই তো!

বেশি চাইতেন না বলতে তিনি, ছোট মন্তব্যেই তাঁর কথার ধার ও ঔজ্জ্বল্য - এ আমরা বহুবার পেতম, শিল্পময় ঘরটিতে এসে—যামিনী রায় আর লোকায়ত টেরাকোটা, তাকঠাসা দেশীবিদেশী বই, আর ··· “বন্ধু বা পরিজন, সেই শিল্পিত ঘরে, সান্নিধ্যে”— লিখেওছিলাম কবিতায়।

এদিনের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য, বলেছি বিরল। কবি আর এখন আমাদের, জীবিতদের মধ্যে নন। দীর্ঘায়ু তাঁর কবিতা।

বিদ্যুৎ নেই, তাতে নৈঃশব্দ্যও। অন্য কবি ও আলোচক, উত্তরসূরী– এঁরা চুপ বাধ্যত। শ্রবণ খোলা আছে।

এরই মধ্যে বেজে উঠল, টেপে ব্যাটারিতে, কবি-কণ্ঠস্বর। কবির জন্মদিনে।

বিষ্ণু দে-র স্বকণ্ঠের সেই পরিশীলিত স্বাভাবিক উচ্চারণ, চেনা অনুষঙ্গ আবার, শুনতে পাচ্ছি তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যপর্বের এক তুঙ্গ সময়ের প্রখরতম দান, দীর্ঘ “অন্বিষ্ট” কবিতা :

“আমারও অন্বিষ্ট তাই
আমি চাই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে-স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্ণা···
···বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন

কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সন্ত ও সজাগ…"

এই "দীপ্ত সন্ত ও সজাগ"—এই নিত্য আত্মসচেতনতার চাপ ও কর্তৃত্বময় কবিত্ব —নিয়ে গেছে আমাদের তাঁর কাব্যের সেই ঘনবদ্ধ নির্মাণের শিল্পে; স্বর থেকে স্বরান্তরে :

"নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে-ওদিকে
কয়েকটি লুকোনো বাল্‌বে
উৎসব জ্বালানো শুধু, আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দু'টি একান্তিক,
যুগান্তের কখন কি কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা…"

আর, যেন দান্তের নরক দর্শনের দুঃসহতাও এ কবিতায় ঘুরে আসে "স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা"-য়। আসে "কী দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া," "যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণার" কথায়, আবার এমনকি "শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদা" উচ্চারণে "নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ-"এর টান-ও।

এখন আমরা জানি এর পরে তাঁর শেষ পর্বেই নির্মাণের আর এক তুঙ্গে পৌঁছবেন বিষ্ণু দে তাঁর "স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত"-এ যার শুরুই হবে এই সম্বোধনে :

"তোমরা নবীন এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা ?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ…"

আবার ফিরেও আসবে তা সে আততির পর চূড়ান্ত ক্ষণে ইনভোকেশনেই :

"রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ"– এই পঙ্‌ক্তিতে।

[আমার মনে পড়াবে এক সন্ধ্যায় বসে আছি আমরা বিষ্ণু বাবুর বসার ঘরে, 'সাহিত্য পত্র'-এর আমলেও যেমন, কি যেবার তিনি জ্ঞানপীঠ" নিলেন, এসেছেন 'নব জীবন'-এর কবি-সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আমাদের প্রিয় বটুকদা, বিষ্ণুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সতীর্থ। তখন সুরারোপ করতে ব্যস্ত তিনি ওই দীর্ঘ মহৎ কবিতা "স্মৃতিসত্তা…"য়, সিম্ফনি-সঙ্গীতে। বটুকদার কণ্ঠ থেকে ভেঙে-ভেঙে সেই "…হে চৈতন্য আ-কা-শ," এখনও কানে বাজবে!]

আলো জ্বলে উঠল। বলছি আবার সেই জন্মদিনের সভাটির কথা, যখন কবি আত্ম

নেই। তবু আচ্ছন্নতার রেশ থাকবে। রেকর্ডে-ধরা তাঁর স্বকণ্ঠে পাঠ তাঁর কবিতটিকেই আলোকিত করে। সেই তিনি, গোড়ার 'চোরাবালি' পর্বেই আধুনিক কাব্যের 'নৈরাত্ম্য সিদ্ধি'তে স্বপ্রতিষ্ঠ।

কবিকণ্ঠে সেদিনের পাঠ শুনতে শুনতে সচেতন শ্রোতার মনে আসতেই পারে এলিয়ট-কথিত "কবিতার ত্রি-স্বর"—এর কথা। প্রথম স্বর কবির নিজের সঙ্গে নিজের কিংবা কারো সঙ্গেই নয়। দ্বিতীয়, কবির সঙ্গে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর, বৃহৎ বা স্বল্প। তৃতীয়, কবি যখন স্রষ্টা, কল্পিত চরিত্রের নাট্যে বলিয়ে নিচ্ছেন কথা।

বিষ্ণু দে কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে, হয়তো সূত্রাকারেই, তাই বলেন: "কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। …আমাদের লেখকরা জানেন যে দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ক্রান্তি। ইণ্টারপ্রিটেশন তাই চেঞ্জ-এ সম্পূর্ণ।"

বলেন সেই দর্শন (মার্কসীয়) যার ভিত্তিই হচ্ছে "চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে। …বিষয়ের বা বস্তু সত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে যাতে জীবনের বহুব্যাপ্ত সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্প ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি।"

তাহলে বুঝেও নিই যে, আমাদের এই প্রধান কবির "একটি সক্রিয়তার দুটি দিক" পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পকর্মীর অনুধাবনীয়-ই হবে।

এই নিবন্ধের শিরোনাম নিয়েছি কবি বিষ্ণু দে-রই কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিতে। কবিতাটি তিনি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে এক জন্মদিনে সম্বর্দ্ধিত করে লিখেছিলেন। : "তাঁকে চেনা মনেরই এক জয়"—কবির নিজের সম্পর্কেও এই কথাটিই উদ্ধৃত করে আমি কৃতার্থ হই।

কবি বিষ্ণু দে যেবার এক "নিথর রাতে, শীতের পথে" আমাদের ছেড়ে গেলেন, তার পরে আমার একটি কবিতার বই "দীর্ঘায়ু অমর তৃষায়" প্রকাশিত হয়, ১৯৮৩-র জানুয়ারীতে। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করি।

কবি তখন অসুস্থ, রোগশয্যায়। বহুবার দেখতে গেছি তাঁকে। ক্ষীণ আশা; ফিরে আসতাম, লিখতাম কিছু কবিতা। তাঁকেই নিবেদিত। বইটি থেকে তারই একটি এখানে তুলে দিতে চাই, শ্রদ্ধায়:

কষ্ট

মন জানে, শতবার সাধে, ফিরে-চাওয়া কি পাওয়াকে—

এবং এই সময়

দেশজে বিশ্বপটেরও গৌরব
ছেয়ে থাকে,
সে নন্দনের প্রসাদে

যেখানে রয়েছে চেনা সাবেকি হৃদয়
প্রকৃতির, আবার মানবিকে-ই বৈভব,
চৈতন্যের দায়
ব্যক্তি ও সমজে দ্বন্দ্ব-রূপারোপে, বাঁধে

তাই-ই, প্রাজ্ঞ সয় ভারাতুর বারোমাস, যদিও বা
বন্দীত্বের শীতই পোহায়
কিংবা গংম-ই—স্বেচ্ছাবন্দী যেন, পিঞ্জরে আকাশ

অচিন পাখিটি তবু ধায় —দুই পাখি—
সাযুজ্যের একটি শাখায়

সেই তো বাঁচায়, চায় দূরে, স'রে বসে
প্রচ্ছন্নের কৌতুক এ—
ভোক্তা ও দ্রষ্টার স্মৃতি মাখে

ততবার, মনে হয়, কার মুক্তি
দুঃখে মুক্তি সুখে মুক্তি, কষ্টে
ও কষ্টের লাঘবে

হৃদয়-ধর্মে তা চুক্তি উত্তরণে, মান্যস্বভাবে, পরিশীলিত
মননে প্রকরণে

স্তরে—স্তরে কত

কৌনিকে
ভাবনায়, সতত
প্রকৃতই রাবীন্দ্রিক অনুষঙ্গে, নদীর
পালিত এক পলল জীবনে

নদীর মতোই পাড় গড়ে, পাড় ভাঙে
নদীটি কী ধায়—

আক্ষেপে, দুঃস্বপ্নে, স্বপ্নেও—গোধূলির
কপিলগুহায়, কে জানে !!

পরিতোষ সেন

আড্ডাপ্রিয় বিষ্ণু দে

হয়ত ১৯৪১-৪২ সাল হবে। গ্রীষ্মের ছুটিতে কর্মস্থল ইন্দোর থেকে কলকাতায় এসেছি। বন্ধুবর রথীন মৈত্র এবং নীরদ মজুমদার জানান যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' মঞ্চস্থ হবে উত্তর কলকাতায় এক হলে। শুনে খুব উত্তেজিত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উদ্বোধনের দিন বন্ধুদ্বয় এবং প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ—এদের সঙ্গে হাজির হলাম। আমাদের পাশে দুজন লোক বসেছিলেন যাঁরা আমি ছাড়া আমার দলের সবাইয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নীরদ পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন বিষ্ণু দে এবং হীরেন মুখার্জী। দু'জনেরই নামের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলাম। বিশেষ করে বিষ্ণু দে-র কবিতার সঙ্গে। আলাপ করে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করেছিলেম। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে ইনি হলেন এমন কবি যিনি নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমার শিল্পীবন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে হাজির হয়ে বুঝলাম যে তাঁর ছোট্ট বসবার ঘরটিতে শিল্পী ছাড়াও নানা বিদগ্ধ জনদের আনাগোনা। ঘরটি ছোট হলেও তাতে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল। চারিদিকের দেয়ালে যামিনী রায় অঙ্কিত নানা পর্বের নানা ছবি, মাটির পুতুলের অসাধারণ সংগ্রহ। লক্ষ্মীর সরা, বইপত্র, কলের গান, রেকর্ড ইত্যাদিতে ঘরটিতে একটি চমৎকার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। যে ঘরটিতে বসেই চোখ এবং মন দুই-ই তৃপ্তি পেত। এখনও মনে পড়ে প্রথম দিনের এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাটি।

এরপর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত লেগেই থাকত। তার প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই বিষ্ণুদা এবং প্রণতিদির যোগ্য উষ্ণ অভ্যর্থনা। তাঁরা উভয়েই আমাদের এত সহজেই আপন করে নিয়েছিলেন যে সেখানে হাজির হওয়ার জন্যে মাঝে

মাঝে বেশ অধৈর্য বোধ করতাম। শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য নিয়ে আমাদের আড্ডা প্রায়ই—খুব জমে উঠত। এইসব বিষয় প্রসঙ্গে বিষ্ণু দা-র সমালোচনাপূর্ণ মতামত এবং বিশ্লেষণ একদিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অন্যদিকে সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় ছিল। আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পকলা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ এবং জ্ঞান ছিল অপরিসীম। আধুনিক ইওরোপীয় ও মার্কিনী কাব্য সম্বন্ধে এবং তা জানবার আগ্রহে আমি তাঁকে প্রায়ই নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুলতাম। তিনি সস্নেহে এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমাকে এসব বুঝতে সাহায্য করতেন। তাঁর এই উদার সাহায্য না পেলে আমার সেই কাঁচা বয়সে টি এস এলিয়টের কিছুই হদিশ পেতাম না।

ছবি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। তাইত একাধারে শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠতা তেমনটাই ছিল তাঁর অনুজ ক্যালকাটা গ্রুপের সব সদস্যদের সঙ্গে। তাছাড়া তিনি নিজেও তো একসময় বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলেন। সেই সময় তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন যে ছবিকে বুঝতে হলে ছবির ভাষা জানতে হবে। এবং সেই ভাষা জানবার একমাত্র উপায় হলো হাতে নাতে রঙ তুলি দিয়ে কাজ করা।

ইওরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, প্রায়ই তিনি Bach, Beethoven, Mozart এঁদের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতেন এবং তাঁদের জীবনী এবং রচনা সম্পর্কে নানা গল্প শোনাতেন। বিষ্ণুদা খুব গোপ্পে লোক ছিলেন। তিনি যেমন গপ্পো শুনতে ভালবাসতেন, তেমনি শোনাতেও ভালবাসতেন। তাঁর মুখে কত লোকের সম্বন্ধে কত মজাদার গল্পই যে শুনেছি যে তার ইয়ত্তা নেই। একেক দিন এমন হতো যে তাঁর আড্ডায় কমল মজুমদার এবং নীরদ মজুমদার উপস্থিত থাকতেন। এমন দিনে হাসির ফোয়ারায় সারা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডটা গমগম করে উঠত। তাঁর এই বৈঠকে যোগ দিতে আসতেন নানা দেশী বিদেশী লেখক শিল্পী গাইয়ে বাজিয়ে এবং আরও কতো রকমের লোক যে তা মনে রাখা দায়। এখনও মনে পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতায় অবস্থিত হাজার হাজার ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ফৌজীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের বিষ্ণুদার বাড়ীতে আনাগোনা। তাঁদের মধ্যে দু একজনের কথা এখনও মনে পড়ে। যেমন জন আরউইন, শাপিরো, বিল আর্চার ইত্যাদি। শাপিরো কবি হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আরউইন, আর্চার-এর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করি না। কলকাতায় বিদেশ কিংবা বাংলার বাইরে থেকে কোন বিদগ্ধ জনের আগমন হলে বিষ্ণুদা-র বাড়ীতে তাঁদের দর্শন পাওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এমন কত লোকের সঙ্গেই যে আমার পরিচয় হয়েছিল যে সেকথা কোনদিনই ভুলব না।

তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমার শিল্পজীবন বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করেছিলে। তাঁর এবং প্রণতিদির কাছে যে স্নেহ মমতা আমি বহুদিন ধরে পেয়েছি তা আমার জীবনে একটা মস্ত সঞ্চয় এবং পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাঁদের কাছে আমার ঋণ কোনদিনই শোধ হবে না।

অনুলিখন : বিবেকানন্দ লাহিড়ী।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

চোখ

আমি এই শহর থেকে লিখছি, যার তুলনা ভূভারতে নেই। না, আক্ষরিক বা যে-কোনো অন্যান্য অর্থেও, এর তুলনা ভারতে তো নেইই, ভূ-তেও নেই। এবং বলা বাহুল্য, ভূতেও নেই, বর্তমানে নেই, এবং ভবিষ্যতে যদি থাকে তো সে-ভবিষ্যৎ যেন কোনো মহানের ক্ষমার যোগ্য হয়, করুণার পাত্র হয়।

এত ধুলো, এত নোংরা, এত শব্দ, এত কৃমি, এবং কৃমিরও অধম কিলবিল করা এত মানুষ সর্বত্র— এবং এরই মধ্যে হাত-পা উত্তোলন, আস্ফালন, ভিড়ের মধ্যে একটু জায়গা ক'রে নেওয়া। এক তালগোল-পাকানো শ্বাসরুদ্ধকর ভরাট ভাঙা কলসী, এখানে কোথায় কার হাত কোন্‌টা, কার পা কোন্‌টা? আর ঐ ধুলো, তা রাজস্থানের শুকনো খটখটে মরুভূমির বালু নয়, তাতে বিবাগীর গৈরিক রং নেই, তা কালীঘাটের কালীর নিশ্বাসে সিক্ত, কালো কাকের চেয়ে কালো, পাঁক নর্দমার মতো সর্দি। সকালে উঠে দাঁত মাজার পর নাক ঝেড়েছেন কখনো? আপনার নাক থেকে কলকাতা বেরোবে।

এবং এ-নোংরা যত-না শারীরিক, তার চেয়ে অনেক সাংঘাতিকভাবে মানসিক। বন্ধু ব'লে মনে করেন কাউকে, সন্ধ্যায় তার বাড়ী যান ভাবের একটু আদানপ্রদান চেয়ে, শুনে আসুন অন্য বন্ধুদের সম্বন্ধে সে কী কথা বলে। ঈর্ষার, খলতার, হীনতার পাঁচালী। এক বিষাক্ত গ্যাস, আগুন-নিশ্বাস।

হেন প্রসঙ্গ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, ততই বিশ্বের মঙ্গল। এখানে ধ'রে রাখতে চাইবেন স্মৃতির কোন্ নির্মল প্রভাত, ভুলে-যাওয়া ভুলতে থাকা কোন্ গানের কলি?

এই কলকাতারই মানুষ ছিলেন তিনি, সম্পূর্ণভাবে কলকাতারই। তবু বিষ্ণু দে ভিড়ে

কখনো যাননি, পর্দার আড়ালেই রয়ে গেলেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে যারা ঢুকেছে, তাঁকে দেখেছে, তিনি তাদের সঙ্গে মিশে কখনো যাননি। গ্রুপ ফোটোর মানুষ তিনি ছিলেন না, হারিয়ে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। অথবা হারিয়েই ছিলেন, প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত, তবে সে-হারানো ছিল তাঁর এমন এক অন্ধকারে, এক অন্য নিশ্বাসের আকাশের ব্যাপ্তিতে-ব্যাপ্তিতে, যা আলোর অধিক। সেই অন্ধকার চাই, বলেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক মৃদু স্বরে, তবু প্রতীতির স্পষ্ট উচ্চারণে। শব্দের ডামাডোলে সে-মৃদুভাষণ শোনার নয়, হয়তো তা হারিয়ে গেছে, হয়তো হারিয়েই আছে, কিন্তু সেই অন্য নিশ্বাসেরই ব্যাপ্তিতে-ব্যাপ্তিতে, যেখানে রয়েছে কত শশী-ভানু, হারায় না কভু অণু-পরমাণু।

এবং সেই না-হারানোর রাজ্য হ'তেই ভেসে আসছে একটি স্মৃতি আজ, বিষ্ণু দে-র সেই চোখের। যেন কোনো কিছুতেই লিপ্ত নয়, তা যেন এই জগতেরই নয়। চেয়ে থাকার সে এমন এক চোখ যা দেখছে কোনো সামনের জিনিস নয়—ধুলো নয়, পাঁক নয়, কৃমি নয়। তাতে আহ্বান এক অনাবিলতার।

তাঁর বেশ নিকটে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর অনেক চিঠি পেয়েছি, তাঁর অনেক বই আমার কাছে আছে—সম্প্রতি কিছু-কিছু বইএর নতুন সংস্করণও বেরিয়েছে, সেগুলিও আছে। সব কিছুরই উপরে আজ ঐ কাজের চেয়ে কালো ধুলো—তবু চোখটা জেগে রয়!

না মনে প'ড়ে উপায় নেই তাঁর অসামান্য সভ্য উপস্থিতি, অবিশ্বাস্য রকম শীলিত শিক্ষিত আচরণ যেমন তাঁর নিকট জনের সঙ্গে, তেমনি যে-কোনো আগন্তুকের প্রতিও—এক নাগরিকতা যা আমাদের অনেকের কাছে আজো অকল্পনীয় ঠেকে। তাঁর পরিবেশের সঙ্গে তাঁকে দেখলে, বিশেষত আমাদের তথাকথিত সাহিত্যিক-শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মন বা মননধর্মিতা অতি সুদূরের জিনিস বলে মনে হ'তে পারে। অথচ তিনি আঁকড়ে ছিলেন কাছের অনেক কিছু, নিরলস প্রয়াসে মেতেছেন দেশের অবহেলিত অনেক কিছুকে প্রাপ্য সম্মান-দানে। উপনিষদের ঋষি হ'তে র‍্যাঁবো, তাঁর পরিক্রমায় বাদ যাননি কেউ। অবশ্য মেতেছেন লেনিনের সিংহকেশরেও—কালের সেও তো কম রূপকালঙ্কার নয়।

তবে আজ অন্য সব কিছু ছাড়িয়ে যেটা আমার মনে জাগে, সেটা ঐ চোখই। আমার মনে হয়, সেই চোখেই মূর্ত তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

অনেক বছর আগে রিখিয়ায় এক সন্ধ্যা। অন্ধকার ততক্ষণে বেশ নেমে এসেছে, বন্ধ ঘরে কোনায় লণ্ঠন জ্বলছে। বাইরে চাঁদ ছিল কিনা মনে নেই, তবু কলের গানে বাজছে বীতোফেনের চন্দ্রকিরণ সোনাটা। বাজাচ্ছেন বিষ্ণু দে, আবিষ্ট শ্রোতা। ঘরে আমিও ব'সে। জানি, ঘরের সামনে হ'তেই প্রান্তরের শুরু, অদূরে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া আকাশে

মাথা উঁচিয়ে। আর ঐ পাহাড়ের পাদদেশে সপ্তাহে একদিন ক'রে হাট বসে, গেঁয়ো মানুষ বেচে-কেনে। শহুরে নয়, কিছু অন্য শব্দে ধ্বনিত হ'তে থাকে প্রান্তর, কিছুক্ষণ। এইসব ছায়াছবি জগতে থাকে, মিলোতে থাকে, যখন বীতোফেন বেজে চলেন কলের গানে —চোঙার মধ্য দিয়ে তিনি আরো জোরে বেরিয়ে আসেন। অল্প আলোয় চোখে যা দেখা যায়, তা ঘরের এটা-ওটা বিন্যস্ত-অবিন্যস্ত জিনিস, এবং সেই ভাবাবিষ্ট মূর্তি একজনের বিশেষত তাঁর সেই চোখ, যা তখন মুদ্রিত। তাঁকে ধরা ত'ার যথার্থ স্থানে, সেই অন্য নিশ্বাসের ব্যাপ্তিতে।

শেষজীবনে বিষ্ণু দে-র যে-মানসিক বিপর্যয় ঘটে, সেটা আমাদের কাছে এক অতীব দুঃখজনক স্মৃতি। আমার ধারণা, এটা না হ'য়ে উপায়ও ছিল না। ত'ার সত্তার এত সুকুমার্য নিদারুণ অকরুণ কলকাতা আর বরদাস্ত করতে পারছিল না—যুদ্ধে অকরুণেরই জয় হল, তবু সম্পূর্ণ জয় নয়। কারণ ত'ার সেই চোখের দৃষ্টি শেষদিন পর্যন্ত অক্ষত থেকেই যায়, মৃত্যুর পারে আজও তা অক্ষতই র'য়ে গেছে।

হেমন্ত মিশ্র

স্মৃতিপটে লেখা

কলকাতা মহানগরীতে এসে বাঙলার যে কয়েকজন প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল কবি বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকালে বহুদিন আগে ভেরিয়ার এলউইনের একটা কথা মনে পড়েছিল—I feel at home with artists. শিল্পীদের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সম্পর্কও ছিল তাই।

আমার প্রথম একক প্রদর্শনীর সময় বিষ্ণু দে রিখিয়ায় ছিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয় তখন তিনি বলেছিলেন—'আপনার ছবি দেখতে খুবই ইচ্ছা করছে। পত্রপত্রিকায় আপনার বিষয়ে পড়েছি ও ছবিও দেখেছি, কিন্তু আমাদের কাগজ-পত্রে ছবির রিপ্রোডাকসন্ ভাল হয়না বলে আপনার ছবি দেখতে যাব।' সেদিন থেকেই দেশী বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুতে আমি সত্যিকারের একজন গুণগ্রাহী হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল বন্ধুকে হারিয়েছি। তাঁর বাড়ীতে ও আমার স্টুডিওতে বসে নানান আলোচনার মধ্যে কাটানো দিনগুলির কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আমার ছবি দেখতে ভাল বাসতেন বলে আমি নতুন কি ছবি আঁকছি তা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে আমায় বাড়ীতে আসতেন। তিনি বলতেন 'স্টুডিওর এই আরাম চেয়ারটিতে বসে ছবি দেখতে ভাল লাগে, শান্তিও পাই।' আমার প্রতিটি ছবির কথা তিনি কিভাবে মনে রাখতেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একদিন তিনি বলেছিলেন—'বহুদিন আগে আপনার একটি ছবি দেখেছিলাম—নীল আকাশ ও টলটলে জল—আজও আমার চোখে ভাসছে।' ভেবে চিন্তে ছবিটা খুঁজে বের করে দেখালে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন। এই ছবিটা তিনি তাঁর স্টাডিতে রেখেছিলেন। সকাল বিকেলের পরিবর্তিত আলোয় ছবিটিতে রঙের খেলা দেখতে তাঁর

যে খুব আনন্দ হত সে কথা তিনি একদিন বলেছিলেন। প্রায় এক যুগ আগে দেখা এই ছবিটি যিনি এমনভাবে মনে রেখেছিলেন তিনি একদিন স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এই কথা ভাবলে মনে হয়, প্রকৃতির এ কি অবিচার !

আমাদের মধ্যে বহু আদান প্রদানের কথা মনে পড়ে। একবার এলিঅটের কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটি নিয়ে বিষ্ণুবাবু আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমার স্ত্রী বীণাকে বললাম —দেখ আমার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছেন। বীণা প্রতিবাদের সুরে বললেন—না, মনে হচ্ছে এটা আমার জন্যই এনেছেন। কবি একটু হেসে বললেন 'দাড়ান, কলমটাতো এখনও বের করিনি।' তারপর ধীরে সুস্থে কলম বের করে লিখলেন—'অবিমিশ্র দম্পতি হৈমন্তীবীণাকে।' বইটা দিয়ে বললেন –'নিন, আশাকরি আর ঝগড়া হবেনা।' কবির এরকম বহু রসোত্তীর্ণ কথা মনে পড়ে। একদিন তিনি বলেছিলেন—'একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তিনি ছবি অাঁকছেন। আমি চুপ করে বসে দেখতে লাগলাম। অাঁকা শেষ হলে তিনি ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- 'কেমন লাগছে?' আমি বললাম খুবই সুন্দর হয়েছে। তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ছবিটা রেখে দিলেন। আমিও কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম। বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হল—ছবিটা তিনি কি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন ? আমার কি ছবিটা চাওয়া উচিত ছিল ? তাহলে কি তিনি খুশি হতেন ? আজও এই ধাঁধার মীমাংসা করতে পারিনি।'

বিষ্ণু বাবুর মুখে শোনা আর একটি কাহিনীও উল্লেখ করছি—'একবার রবীন্দ্রনাথ বরানগরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হতেই জোর একপশলা বৃষ্টি নামতে দেখে নতুন জুতোয় জল ঢোকেনা বলে আগের দিন কেনা জুতো জোড়া পরে বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে রওয়ানা হলাম। বরানগরে পৌছেও বৃষ্টি থামল না দেখে গাড়ীটা রেখেই দিলাম। কবির সঙ্গে আলাপ এমন জমে উঠল যে কিছুতেই আর ওঠা গেল না। এদিকে ট্যাক্সির ভাড়া ক্রমশঃ উঠছে বলে মহা চিন্তায়ও পড়লাম। একবার ভাবলাম কথাটা তাঁকে বলেই ফেলি, পরমুহূর্তে আবার ভাবলাম একথা শুনলে তিনি হয়তো মনে করতে পারেন যে ছোকরাটিতো বেশ, একশ টাকা মাইনেতে অধ্যাপকের কাজে সগু ঢুকেই ট্যাক্সি শুধু চড়ছে না আবার রেখেও দিচ্ছে, তাই বুঝতেই পারছেন, কথাটা আর বলা হল না। এমন সময় রাণী মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথকে খেতে ডাকলেন। তিনি তখন আমাকে বললেন—এসো, তুমি এই চেয়ারটাতে বস, ততক্ষণে আমার খাওয়া হবে আর আলাপও হবে। তখনও কিন্তু ট্যাক্সির কথা বলতে পারলাম না। খাওয়া শেষ হবার পরও বৃষ্টি না থামায় জোড়া-

সাঁকোতে ফেরার জন্য কোন গাড়ী পাওয়া গেল না। বৃষ্টির প্রকোপ বেড়ে আসাতে শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে গোপন কথাটা ফাঁস করে দিলাম। কথাটা শুনে কবি যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—বেশ, তাহলে আর চিন্তা কিসের, চল রওয়ানা হওয়া যাক... '

বিষ্ণুবাবু কোন সময়েই সুবিধা থাকলেও খবর দিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসার ধার ধারতেন না। তাই বেশ কয়েকবার বাড়ীতে এসেও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, যদিও যখন ইচ্ছা হত তখনই এসে পড়তেন। তাঁর আকস্মিক উপস্থিতি আমার খুবই ভাল লাগত। একদিন সন্ধ্যাবেলা হাতে একটি সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হয়ে হাসিমুখে বললেন—'আমার একটি নাতি হয়েছে তাই খবর জানাতে এলাম।' খুঁটিনাটি ব্যাপারও তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না। সবাই আলাপ আলোচনায় মগ্ন থাকলেও কে সিগারেট ধরিয়েছে কিন্তু পাশে এ্যাশট্রে নেই বা কফির পেয়ালা পড়ে রয়েছে এসব দেখা তাঁরই যেন কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। মনে পড়ছে একদিন এক সভায় আমাদের যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল দেখে হলে ঢুকে চুপি চুপি পেছনের চেয়ারে বসতে যেতেই বিষ্ণুবাবুর নজরে পড়ে গেলাম। উনি উঠে এসে বললেন—'আসুন আমাদের কাছে একটি চেয়ার খালি রয়েছে।' সেদিনকার সভায় অনিবার্য কারণে তাঁর এবং আরও দু'এক জনের বক্তৃতা দিতে হল না বলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আমি ভাল করেই জানতাম তিনি বক্তৃতা দিতে ভাল বাসতেন না। নতুন দিল্লীতে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সভাতেও তিনি বক্তৃতার পরিবর্তে কবিতা পাঠ করেছিলেন।

মনে পড়ে চারদিকে জনারণ্য, কোলাহল, 'মাইকে হাঁকে দুষ্ট কুকুর' এর মাঝেও কবি ছিলেন শান্ত সমাহিত। তাঁর এই রূপ প্রথমে আমাকে বিভ্রান্ত করলেও পরে এরই আলোকে তাঁর চরিত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

তিনি যখন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তখন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যেখানে ভাল লাগে সেখানে একটু বেড়িয়ে আসার কথা বলতে তিনি বহু কষ্টে আমার তিনতলায় উঠে এসেছিলেন। তখন তাঁর ঘুরে ফিরে ছবি দেখার শক্তি ছিল না বলে টেবিলের উপরে কিছু ছবি সাজিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তখন বেশি কথাও বলতে পারতেন না। ছবি দেখতে দেখতে শুধু একটি কথাই বলেছিলেন—'কি রঙ কি রঙ!'

কবির সৌজন্যবোধের মতো তাঁর উদার মনোবৃত্তিও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর স্পর্শকাতর প্রাণ সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে ছিল। মনে পড়ে সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত 'রতন মুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প' বইটির ভূমিকায় লেখা তাঁর কয়েকটি কথা —'লজ্জাই বোধ করি যখন দেখি যে প্রতিবেশী আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আমি

ও আমরা শ্রম স্বীকার করিনি। ···আমরা প্রাচীন সম্বন্ধ সত্ত্বেও অসমীয়া বা ওড়িয়া বা হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে, গুজরাটি বা মারাঠি বা পাঞ্জাবী বিষয়ে খুব কম জানি এবং দক্ষিণ ভারতের বিষয়ে আরও কম। আমাদের যে রবীন্দ্রনাথ আছেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য, প্রাপ্য বা অর্জিত নয়।'

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসগ্রাহিতার এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা তাঁকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে রাখত। রিখিয়া থেকে লেখা তাঁর বহু চিঠি আমার অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক চিঠিতেই থাকত রিখিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ—'যদি একবার আপনাদের আনতে পারি তাহলে খুব ভালো লাগবে' এবং এই সঙ্গে 'আপনার ছবি দেখতে ইচ্ছা করে, কোন দিন আশা করি দেখতে পাব, কি বলুন? নিশ্চয় ছবি আরও কিছু এঁকেছেন।'

কবিবন্ধুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন মনে হয়েছিল আমরা আজ শুধু কবিকেই হারালাম, না সেই সঙ্গে একটা 'ইনস্টিটিউশন'ও শেষ হয়ে গেল। মস্তিষ্কের শক্তির সঙ্গে অন্তরের অবাধ মিলন ঘটিয়ে তিনি আমাদের যে ঐশ্বর্য দান করে গেছেন তা কোনদিন হারিয়ে যাবার নয়।

রথীন মৈত্র

বিষ্ণুদা ও আমি

তিনি ছিলেন কবি। ধরেছিলেন জীবনের মহাসঙ্গীত। তাই প্রথমেই তাঁর কথা বলতে গিয়ে মনে হয় সমুদ্রের কথা। জীবনের সূচনায় তাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে আলাপ। আমার দাদা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন সঙ্গীতে এবং ইংরাজীতে এম, এ, শ্রেণী বন্ধু হিসেবে এবং শিল্পী মনের ঐক্যে আমার অগ্রজ ও কবি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সূত্রে অগ্রজ তুল্য কবির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম আমি। শিল্পী জীবনে বুদ্ধিচর্চার বিবিধ বিষয়ে পেয়েছিলাম সহযোগিতা ও সমর্থন। আমার ছবি অঁাকা দেখে সকৌতুক মন্তব্য করতেন চাপা হাস্যে 'বাঃ রথীবাবু তো খুব ভাল এঁকেছেন'। তিনি ছিলেন অনুজ যুবগোষ্ঠীর মধ্যমণি। আজ টুকরো টুকরো অনেক কথাই মনে হয়। আমার শিল্পী জীবনে তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্কের শুরু তা ইংরাজী সাহিত্যের সূত্রে প্রায় '৩৭ এর গোড়ায়। আমি তাঁর কাছে ইংরাজী সাহিত্যের তালিম নেই। একদিন ইংরেজ painter গণের ছবি দেখতে দেখতে বহু আলোচনার শেষে বলেন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়ার কথা। তাঁর এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে বুঝেছিলেন কোন বিবর্তনের নিয়মে মনের প্রতিচ্ছবি ধরা পরে শিল্পের শরীরে। ইতিহাস ও মানব মনে যে দ্বান্দ্বিক ঐক্যে জঙ্গমতায় অন্যোন্য তা তাঁর তৃতীয় নয়ন উদ্ভাসিত প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে পেরেছিল। ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য, শিল্পের সঙ্গে নানা নিয়মে সম্পর্কযুক্ত, একটি অপরটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য, বিশাল জগতকে পর্য্যবেক্ষণের যে পূর্ণ দৃষ্টি জ্ঞানীর লভ্য তা আমি দেখেছিলাম তঁার মধ্যে।

তঁার সঙ্গে শান্তিনিকেতন গেছিলেম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ দর্শনে সদলবলে। সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সেজদা জ্যোতিরিন্দ্র এবং আমি ১৯৩৭-এ।

আমরা ১লা বৈশাখের পূর্বে সংক্রান্তির দিন কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন পৌঁছাই। আমাদের দেখভালের দায়িত্ব ছিল অগ্রজ বান্ধব ক্ষিতীশ রায়ের। তিনি আমাদের মহর্ষি ভবনে রক্ষা করেছিলেন। রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্বভার অর্পেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। মহর্ষি-ভবনের ছাতে জ্যোৎস্নায় অনেক রাত অব্দি বন্ধু বান্ধবসহ জমাটি আড্ডা মেরে ঘুমাতে যাই দ্রুত, কারণ পরদিন প্রাতেই কবিদর্শন। কিন্তু আমার জ্যোৎস্নারাতে নাতিশীতোষ্ণ বাতাসে পাতার শিহরিত খস্‌খস শব্দে আর কোকিলের ডাকে ঘুম হয়নি। যতবার চোখের পাতা বুঁজতে যাই তার ঐ পঞ্চমস্বরে 'কু' আমার মনের মধ্যে কেবল ঝড় তোলে। কাল প্রভাতে কবি সন্দর্শনে যাব তারই না জানি এ আবার কোন বিপদের পূর্বাভাস। দ্বিতীয়-বার পাতা বুঁজতে যাব সেও সপ্তমে ডেকে ওঠে 'কু'। কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণকারী সেই ডাক ব্রহ্মাণ্ডকে যথেচ্ছ ভাষায় গালি দেয়। আমার মনে সপ্তপুরুষ অর্জিত সকল গৌরব ধূলিসাৎ করে। সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি তার ঐ অনবরত কোলাহলমুখর বিপদ সংকেত-কারী সাবধানী 'কু' মন্ত্রণায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কবিবর বিষ্ণু দে মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি প্রশ্ন করেন 'রাতে কেমন ঘুম হল ? আমি বলি 'রাতে কোকিলের চিৎকারে আমি ঘুমাতে পারিনি'। বিষ্ণুদা অবাক বিস্ময়ে বলেন, 'বল কি কোকিলের ডাকে তোমার ঘুম হয়নি' ? ইতিমধ্যে ক্ষিতীশ রায়ের দূত উপস্থিত। আমরা দলবলসহ কবি সন্দর্শন অভিযানে অগ্রসর হলাম। শান্তিনিকেতনী প্রথানুষ্ঠানের নিয়মে প্রভাত ফেরীর শুরু হয়েছে। 'জয় হোক জয়হোক নব অরুণোদয় জয়'।

আমরা অপেক্ষা করলেম গুরুদেবের আবির্ভাবের। গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হলাম। কবিবর বিষ্ণুদা বললেন 'কাল ওর ঘুম হয়নি'। আমি বললাম, 'কাল কোকিলের চিৎকারে আমার ঘুম হয়নি'। কবি পাল্টা প্রশ্ন শুধালেন 'বল কি ? কাল কোকিলের ডাকে তোমার ঘুম হয়নি ?'

আমি ছিলেম পারিবারিক সূত্রে গুরুদেবের পূর্বপরিচিত। আমাদের বোটে তিনি পদ্মাবক্ষে বহুবার পরিভ্রমণ করেছেন। কখনও কখনও বোট চেয়ে পাঠাতেন। আমার কথায় তিনি সকৌতুক দৃষ্টি মেলে ধরেছিলেন। এরপর তিনি ধরলেন আমাদের অগ্রজ-তুল্য ক্ষিতীশ রায় মহাশয়কে। বিষ্ণু দে ও সেজদার সহপাঠী ক্ষিতীশ রায় ছিলেন গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন। গুরুদেব তাঁকে সহসা বললেন 'ক্ষিতীশ তোমার শাস্তি পাওনা আছে। তুমি ভুল করেছ।' ক্ষিতীশদা তো চমকে উঠলেন। চতুর্দিকে সলজ্জ দৃষ্টি মেলে ধরলেন। আমরা না থাকলেই তাঁর ভাল হত। কিন্তু গুরুদেব বলে চলেছেন এবং আমরা অদূরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি। তিনি বলছেন 'ক্ষিতীশ তুমি ভুল করেছিলে, তাই তোমায় দণ্ড দেব, হাত পাত।' ক্ষিতীশদা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি

কাছে এগিয়ে এলেন গুরুদেব বললেন 'হাত পাত'। ক্ষিতীশদা হাত পাতলেন। গুরুদেব ঢোলা আলখাল্লার ভিতর থেকে দণ্ড অর্থাৎ শাস্তিস্বরূপ দণ্ড অর্থাৎ যষ্টিটি ফেরৎ দিলেন। ক্ষিতীশদা এটি আগের দিন ভুল করে দরজার কোনায় রেখে এসেছিলেন।

সে সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিষ্ণুদার এলিয়ট নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মালার্মে এবং তখন অন্যান্য কবিগণও এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচিত হন। ট্রেনে আমরা বিষ্ণুদাকে মধ্যমণি করে যে কজন যাত্রী ছিলাম খুব আনন্দ করি।

এরপর মনে আছে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে কোনারক ভ্রমণ। কোন অর্ক অর্থাৎ কোনারকে সূর্যদেব সমুদ্রের পূব উত্তর কোনা হয়ে উদিত হন। পুরাকালে সূর্যমন্দির সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। সূর্য উদিত হন উপবৃত্তাকারে। লাফিয়ে তিনি চলেন। শিশু যেমন মাথার দিকে উপরে ওঠে। এই উল্লম্ফন উপভোগ্য এবং আমরা গেলাম সূর্যমন্দিরের কারুকার্যখচিত শিল্প নিদর্শন দেখতে। তদানীন্তন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রবি ঘোষ মশাই এবং ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে বিষ্ণুদার কোনারকে ভাস্কর্য ও মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা হয়—যা আমরা খুব উপভোগ করি। সেই সময় আমি ছুটে গিয়ে বালুর ওপর ঝাউগাছ ও ছায়া নিয়ে জল রঙের ছবি আঁকি ও বিষ্ণুদাকে উপহার দিই।

আমাদের পুরী-স্মৃতি তাঁর প্রসঙ্গে উজ্জ্বল ঘটনা। পুরীর সমুদ্রে আমরা সবান্ধবে উল্লসিত উচ্ছ্বাসে ঢেউএ ঢেউএ দোলায়মান সন্তরণ এবং স্নান করেছিলাম। কিন্তু কবি-বর তীরে দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্যে আমাদের স্নানের দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন।

আমার জীবনে বিষ্ণুদার যে কিরূপ গভীর প্রভাব ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপের প্রাণপুরুষ ছিলেন। এর পূর্বে বলা দরকার এ্যান্টি ফ্যাসিস্ত লড়াই এর কথা। প্রতিটি যুদ্ধের সময় নানান পরিবর্তনের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধের সূত্রে নানান নতুন আলো পাই। যুদ্ধের কালে আমাদের দেশে এসেছিলেন বহু বৃটিশ, আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ সৈন্য। আর তাদের মধ্যে ছিলেন যুদ্ধবিরোধী প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। তাঁরা এসেছিলেন বাধ্য হয়ে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বামপন্থী চিন্তাধারার বহু মানুষ। এই সময় প্রখ্যাত লণ্ডন গ্রুপের ম্যাক উই-লিয়মের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁদের সংগ্রহে থাকত সমসাময়িক বৃটিশ ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার বহু নিদর্শন, বই এবং print. আমরা ঐ সূত্রে সেই সকল ছবি দেখতাম। ভাবের আদান প্রদানে একটি বৃহৎ বিশ্বলোক অথবা 'বিষ্ণু' লোক আমরা পাই। তাদের মধ্যে ছিলেন অনেক কবি। তাঁদের সঙ্গে বহু আলোচনায় দেখতাম আমাদের দেশ ও তার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের মনে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। আমরা ফ্যাসিবিরোধী

ও স্বাধীনতাকামী হই। সেই সঙ্গে পুরাতন শিল্প প্রকরণ সম্বন্ধে আমাদের মনে জন্মায় অনাগ্রহ, অনীহা ও বীতরাগ। নতুন কিছু করার সুগভীর বাসনা অন্তরে অন্তরে ব্যথিয়ে তুলছিল। সৃষ্টি না হলেই নয় এমন এক জন্মদানের প্রেরণা উদ্বেজিত হয়েছিল আমাদিগের মধ্যে। যা ছিল জন্মগত তাই উসখুস করছিল বারুদের মতো।

আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপের সবাই বিষ্ণুদার বাড়ী সেই সময় প্রায়ই যেতাম। এবং তিনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেন। তাঁরই সূত্রে আমরা জন আরউইন, ডঃ ভেরিয় এলউইন, এবং উইলিয়াম আর্চার প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচিত হই।

তাঁর ছিল analytical mind, তিনি ছিলেন well informed in different discipline, তাঁর বাক্যে সদাই থাকত wit, humour, pun এর ছড়াছড়ি। তিনি good conversationalist. এমনিতে বাইরে থেকে প্রথমে দেখলে গম্ভীর কিন্তু মিশলে তাঁর সাহচর্যে যে কি মজা তা যারা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা বুঝেছেন। আজ তাঁর অবর্তমানে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অভাব খুব উপলব্ধি করি।

অনুলিখন—বিবেকানন্দ লাহিড়ী।

শানু লাহিড়ী

স্মৃতির মুক্তি

বিষ্ণু বাবুকে রোজই আসা-যাওয়ার পথে দেখতাম, ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতিতে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ও রকম লম্বা চেহারার মানুষটাকে অনেক দূর থেকে দেখলেও বোঝা যেত ঐ বিষ্ণুবাবু আসছেন। প্রশান্ত গম্ভীর চেহারায় এমন একটা সৌন্দর্য ছিল, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁর অত খ্যাতির কথা সে বয়সে সঠিক বোঝার নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছে হতো কাছে গিয়ে কথা বলি, কিন্তু সাহস হত না। পরে জেনেছিলাম, তিনি খুব বড় কবি। যখন আরো একটু বয়স হলো, আমাদের মুখে-মুখে তাঁর কবিতার লাইন ঘুরতো : ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয় ; কিংবা, জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার / হৃদয়ে আমার চড়া। / চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি— / কোথায় ঘোড়সওয়ার ?' এই সব কবিতা এখনো যে চকিত মুহূর্তে মনে পড়ে যায়, তার কারণ এগুলি আমাদের অল্প বয়সের দিনগুলিকে রঙিন করে রেখেছিল।

নীরুদা-দের ক্যালকাটা গ্রুপের সময় থেকে, বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে আমার যাওয়ার শুরু, তখন তাঁর বাড়িতে বড় ধরনের আড্ডা হত—নানা খ্যাত-অখ্যাত লোকজন আসতেন। সেই আড্ডায় বিষ্ণুবাবুর আর একরকম চেহারা ফুটে উঠত ; তাঁর কথা বলার একটা নিজস্ব ধরন ছিল, খুব ভাল লাগত। যখন তিনি কথা বলতেন না চুপচাপ বসে থাকতেন, তখনও তাঁর আর এরকম রূপ ফুটে উঠত যেন। সময় পেলেই তাঁর বাড়িতে চলে যেতাম ; মা বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম শুনলে বিরক্ত হতেন না। তখনকার দিনে বেতারে প্রতি মঙ্গলবার ইংরেজী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বাজানো হতো, আমি আর মা— সে অনুষ্ঠানের নিয়মিত শ্রোতা ছিলাম। একদিন শুনলাম বিষ্ণুবাবুর বাড়িতেও প্রচুর

রেকর্ড আছে, গিয়ে প্রায়ই হাজির হতাম। নিজে থেকে পছন্দ মতো রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতেন। গানের বিষয়ে নিজের মতামত বলতেন।

আমাদের রিখিয়ার বাড়ির কথা শুনে, বিষ্ণুবাবু আর প্রণতিদি, বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। একদিন নীরুদা, তাঁকে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে আনলেন। বাবা-মা দুজনেই তাঁকে খুব সমীহ করতেন। আমাদের সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মাঝে এমন হোল যে, বাবার সঙ্গে নানা ছোটখাটো ব্যক্তিগত কাজের পরামর্শ করার জন্যও তাঁকে বাবার কাছে আসতে দেখতাম।

আমাদের রিখিয়ার বাড়িটি এমনই পছন্দ হয়েছিল, ছুটি পড়লেই সেখানে সপরিবারে চলে যেতেন। যে কদিন থাকতেন আমাদের সঙ্গেই কাটাতেন। একবার আমার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে কলকাতা থেকে তাঁদের সঙ্গী হতে হয়েছিল। তাঁর ছেলে মেয়েরাও তখন খুবই ছোট। রোজ সকাল হলেই তাদের বায়না হত, নদীতে নয় পাহাড়ে যেতে হবে। বেরুলে ফেরার কথা মনে থাকতো না কারো। ফিরে এলে ছেলেমেয়েদের বকুনি দিতেন প্রণতিদি, বিষ্ণুবাবু চুপ করে থাকতেন। রিখিয়ার অনেকগুলো ঘরের মধ্যে একটা নির্জন ঘরে বিষ্ণুবাবু থাকতেন চুপচাপ। ছবিও অাঁকতেন, কখনো সখনো, তাঁর ছবি আঁকা দেখার সুযোগ পেতাম। তাঁর ছবির বিষয় জিজ্ঞাসা করিনি কোনদিন। ছবি আঁকার সময় রঙের দরকার হলে বিষ্ণুবাবু কাউকে বলতেন : যাও শান্তুর কাছে একটু লাল আনো। আমি রসিকতা করে জবাব দিতাম কোন লাল জিজ্ঞাসা করে এসো। প্রায়ই দেখতাম ল্যাণ্ডস্কেপ অাঁকতেন। তাঁর সে সব ছবির রেখা-রঙের বৈশিষ্ট্য কি ছিল এতদিনে কষ্ট করেও মনে করতে পারি না। তাঁর কবিত্বের স্মৃতিটাই সব ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলাম বলে, তিনি স্নেহ করে একটি কবিতাও উপহার দিয়ে ছিলেন, যেটি তাঁর 'নাম রেখেনি কোমল গান্ধার' বই-এর অন্তর্ভুক্ত।

বড় ভাই কনু-দার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল বিষ্ণুবাবুর, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল নীরুদা-র সঙ্গে। নীরুদা-র ছবির প্রদর্শনী হলেই তিনি আসতেন। ছবির বিষয়ে নানা রকম মন্তব্য করতেন, কাছেপিঠে দাঁড়িয়ে শুনতাম। পরে যখন আমি নিজের একক প্রদর্শনী করতাম, তখন খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। ছবি দেখে নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা জানিয়েছেন, বয়স কম ছিল নানা ভাবে উৎসাহিত করতেন। আমি যখন আর্টস্কুলে পড়ছি, তখন একদিন নিজের থেকেই যামিনী রায়ের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। 'কমলা গার্লস' এক সময় পরপর কয়েকটি

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে খুব নাম করেছিল। আমি তখন ঐ স্কুলে আঁকা শেখাতাম, আমিও প্রণতিদির উৎসাহে ঐ সব নৃত্যনাট্যের সাজপোষাক দৃশ্যসজ্জা রচনার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। 'চণ্ডালিকা', 'শাপমোচন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি প্রযোজনায় অনাদিপ্রসাদ শেখাতেন নাচ, গান শেখাতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এইসব নাট্যের ব্যাপারে বিষ্ণুবাবুর দারুণ আগ্রহ দেখতাম। দিনের পর দিন বসে বসে রিহার্সাল দেখতেন, পরামর্শ দিতেন। নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেলে, কার কি রকম হয়েছে সে নিয়ে নানা উপভোগ্য মন্তব্য করতেন। এখন ভেবে অবাক লাগে, আমার কাজগুলি তিনি অপছন্দ করতেন না।

কলকাতায় রায়টের সময় চারিদিকে নানা ভয়াবহ মারাত্মক সব কাণ্ড ঘটেছে। একদিন বিষ্ণুবাবুদের বাড়ির সামনে পুকুরের পাড়ে এক মুসলমান সাধারণ মানুষকে কয়েকজন ধরে এনেছে, দেখতে পেয়েই বিষ্ণুবাবু আর নীরুদা হাজির, তারপর নানা বচসা, শেষ পর্যন্ত তাঁরা মারধর পযন্ত করল এঁদের। বিষ্ণুবাবুর পিঠেও কয়েকটা লাঠির বাড়ি পড়ল। শুনেছি অনেকদিন পর্যন্ত সে নিয়ে শারীরিক কষ্ট পেয়েছেন তিনি।

নীরুদাকে খুব ভালো বাসতেন তিনি। এমন কি মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ বিষ্ণুবাবুকে নীরুদা দেখতে গিয়েছিলেন। কথা বলতে পারেন নি, কিন্তু মুখ চোখে খুশির ভাব ফুটে উঠেছিল এর কিছুদিন পরে নীরুদা হঠাৎ চলে গেলেন, শুনেছি সে সংবাদ শুনে বিষ্ণু-বাবু একেবারে গুম্ হয়ে থাকেন, কিছু সময় ধরে।

বি্‌ণুবাবু নানা গুণে গুণান্বিত মানুষ। হয়তো এত কাছ থেকে দেখেছিলাম বলেই তাঁর মনটা দেখার সুযোগ পাইনি। কাছ থেকে দেখেছিলাম কিন্তু একেবারে কাছাকাছি হতে পারিনি কোনদিন। একটা দূরত্ব থাকতোই। কিন্তু খুব স্নেহ করতেন আমাদের। বিষ্ণুবাবুর কথা মনে হলেই, এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই আসা যাওয়ার পথে, সুদর্শন উঁচু মাপের মানুষটি ধবধবে সাদা ধুতিপাঞ্জাবী পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন।

আশীষ বর্মন

বিষ্ণু দে ঃ ব্যক্তিগত স্মৃতি

বিষ্ণু দের কবিতা নিয়ে বিচার-বিবেচনার ধৃষ্টতা আমার নেই। কাব্যালোচনা আমি সযত্নে এড়াই। কেননা সে কর্মে কাব্যকলা সম্বন্ধে যে মগ্ন বোধ ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমার নেই। এবং দীর্ঘ সাংবাদিকতার সূত্রে নানা বিষয়ে তাৎক্ষণিক রচনা লিখলেও, কবিতা প্রসঙ্গে নিজেকে আদৌ জড়াইনি, যেমন এড়িয়েছি চিত্রকলার আলোচনা বা সঙ্গীত বিষয়ক লেখা। এগুলি আমার এক্তিয়ারের বাইরে, ব্যক্তিগত, সঙ্গোপন ভালো-লাগা-না-লাগায় সীমাবদ্ধ।

অথচ প্রণতি দে (যাঁকে আমি আকৈশোর প্রণতিদি হিসেবে জেনেছি) তিনি জানিয়েছেন যে বিষ্ণুদা সম্বন্ধে আমি কিছু না লিখলে আমার আর মুখ-দর্শন করবেন না। তাঁর দুঃখ ও ক্ষোভ আমি অনায়াসে বুঝি, কেননা আমরা কয়েক'জন বন্ধু, এবং অন্যান্য অনেকে, তিন দশক ব্যাপী, আপন-আপন বুদ্ধি সংবেদনার উদ্বোধনে, তাঁর প্রয়াত স্বামী বিষ্ণু দে-র কাছে গভীরভাবে ঋণী। দিনের পর দিন কাটিয়েছি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। সে-সুযোগ ঘটেছিল বিষ্ণুদারই উদারতায়, তাঁর বহুমুখী জিজ্ঞাসা ও উৎসাহে। তিনি আমার মতো বিক্ষিপ্ত মনের অনুজকেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এ জন্যে নয় যে আমার কাব্য-মনস্কতা গভীর ছিল। সম্ভবত এ প্রশ্রয় তিনি দিয়েছিলেন আমার গল্প-সাহিত্যে আগ্রহ, মার্কসবাদের প্রতি টান ও হয়তো অন্য কিছু লক্ষণে। আমার তৎকালীন দারিদ্র্য-জনিত বুভুক্ষায়ও নিশ্চয়ই তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তার হাত বাড়িয়ে ছিল। আমার জীবনের পঁচানব্বই টাকা মাইনের প্রথম চাকরিই পাই বিষ্ণুদের সুপারিশে, আই, সি, এস অশোক মিত্রের সহৃদয়তায়। এ-সব কথা স্মরণে আমার তাৎপর্য এটুকুই যে তাতে

আমার সীমাবদ্ধতা সম্ভবত স্পষ্ট হবে। প্রণতিদি হয়তো স্নিগ্ধ মনে বুঝবেন যে এ-রচনায় হাত দিতে কেন আমার সমূহ দ্বিধা ছিল।

মুখেও সমস্যাটা তাঁকে ভাসা-ভাসা ভাবে বলে ছিলাম। তাতে তিনি ব্যক্তিগত স্মৃতি লিখতে বললেন। তবে তাই হোক। এতে যদি প্রণতিদির ক্ষোভ ও মনের বিষাদ হ্রাস পায় তাহলে আমি খুশি হব। নিজের অক্ষমতার অস্বস্তি অবশ্য কাটবে না।

কিন্তু বিষ্ণুদাকে জড়ানো স্মৃতিতে, অসংলগ্নভাবে হলেও, কাব্যের কথা আসা অবধারিত হয়ে ওঠে। কেননা আমার প্রথম যৌবনে, বই-পত্রহীন নিঃস্ব প্রাত্যাহিকতায়, কাব্য ও বিবিধ বইয়ের জগৎ তিনিই আমার সামনে খুলে দেন। তাঁর বইয়ের আলমারি আমার জন্যে ছিল সদা উন্মুক্ত। তিনি নিজেও আমায়, আমার রুচির লক্ষণে, বই বের করে দিতেন। তিনিই আমায় প্রথম পড়তে দেন হেন্‌রী জেমস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, প্রুস্ত, টমাস মান ইত্যাদি, আজ যাঁরা কিছুটা আমার নিজস্ব সংগ্রহে স্বরাট। তাঁর কাছ থেকেই আমি মনোযোগ দিয়ে ওয়ার্ডওয়ার্থ, ইয়েটস, এলিয়ট ও কিছু আধুনিক ইংরেজি কবির কবিতা পড়ার সুযোগ পাই।

সম্ভবত এলিয়ট আমায় পেয়ে বসায়, পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমায় তেমন টানত না, যেমন টানে তাঁর গান ও চিত্রশিল্প। বিষ্ণুদাই তখন বেছে বেছে আমায় রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কাব্যগ্রন্থ দিতেন। যা আমার সীমাবদ্ধ মনকে, আজো অনেক বেশি মজায়। উপরন্তু, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার পটে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমার বিশালতা সম্বন্ধে, তিনিই আমায় সচেতন করেন। সে সচেতনতা আমার মূঢ়তা ও যৌবনের অহমিকা লাঘব করলেও, কাব্যাবেগের সংকীর্ণতা হেতু, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই আমার এখনো কম সংহত ও গাঢ় মনে হয়। সম্ভবত তা ব্যক্তিগত কাব্য-চেতনার অগভীরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যুবক বিষ্ণুদের কাব্য আমার বোধে অন্য মাত্রা জুগিয়েছিল। তাঁর উর্বশী ও আর্টেমিস থেকেই আমার মনে হয়েছিল তিনি রবীন্দ্রোত্তর বোধ-ও মননের অন্বিষ্টে মগ্ন। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, অচিন্ত্য বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে আমার তখন তা ততোটা মনে হত না। তারও পরে, জীবনানন্দ দাশের কাব্যের এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি আমায় টানে।

একদা বিষ্ণুদার সব কবিতাই আমায় কম-বেশি মজাত। তাঁর কাব্যবোধ যে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব নিয়মে বিবর্তমান, তা আমি নিজে কাব্য-যুক্তিতে যত না বুঝেছি, তার বেশি আমায় সেটা বুঝিয়ে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—আমার জীবনের আর এক ঘনিষ্ঠ মেরু।

তৎসত্ত্বেও, ষাটোর্দ্ধে এসে, ইদানিং আমায় বিষ্ণুদার কিছু কিছু দীর্ঘ কবিতা বাদে, মূলত তাঁর ছোটো কবিতাগুলিই বেশি টানে। অন্বিষ্ট থেকে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

গ্রন্থের অনেক দীর্ঘ কবিতাই আমার সম্প্রতি আখ্যানধর্মী, স্থানে স্থানে কিছুটা শ্লথ ও বিবরণমূলক ঠেকে। মনে হয় সেগুলিতে বিষ্ণুদের সংহত, গাঢ় প্রকাশভঙ্গী ও বোধ ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, বা বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এটা আমারই ভ্রান্তি অথবা ব্যক্তিগত রুচির কূপমণ্ডুকতা। এমনও হতে পারে যে যে-ভূয়োদর্শনের প্রত্যয়ে বিষ্ণুদার এ-হেন কবিতাগুলি বিধৃত, তাদের উৎসার, তা বর্তমানে অনেক বেশি জটিল এবং বহুমাত্রিক তাৎপর্য পেয়েছে। যেখানে সমাজ-বিবর্তনের মার্কসবাদী মৌল প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত হয়েছে, সে-বিবর্তনের বিচ্যুতি ও খণ্ডিত রূপারোপের সংশয়ও। চৈতন্যের সারল্য ভেঙে যাওয়ার প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব, অগ্রগতির নতুন পথ খোঁজা এবং তৎসংলগ্ন আবিশ্ব-ব্যাপী জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসার সূচনা, কিছুটা হয়তো বিষাদ ও মর্মপীড়নও, আমার মনে হয় বিষ্ণুদার কাব্যেও ছায়া ফেলতে শুরু করে ছিল। আলেখ্য, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে, সেই অন্ধকার চাই, সংবাদ মূলত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক ছোটো, সংহত কবিতাতেই তার ছায়া আছে-- অন্তত আমার তাই মনে হয়। এবং সে-জন্যেই সম্ভবত আমায় সেগুলি বেশি টানে। এ-সব কবিতা যখন কবি লিখেছিলেন, আমার বিশ্বাস, তখন আর তিনি স্টালিনকে নিয়ে বহুকাল আগে লেখা কবিতা আর লিখতে পারতেন না। যদিও এ-কবিতার নিহিত কাব্য-নৈপুণ্য সুধীন্দ্রনাথও প্রশংসা করেছিলেন। আসলে আমরা যখন বিষ্ণুদের মতো কবির রচনা পড়ি, তখন নিছক কাব্য নৈপুণ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া কোনো বৃহত্তর, নৈর্ব্যক্তিক বোধের উদ্বোধন চাই।

কাব্য পাঠে এ-উদ্বোধন ঘটে প্রায়শই আচমকা ; শব্দের নিখুঁৎ সন্নিবেশে, নিহিত অর্থের গাঢ়তায় যে আকস্মিক রূপময়তা উদ্ভাসিত হয় তার পুলকিত গ্রহণে। সে প্রভাবে শব্দগত ব্যাখ্যা অনেক সময়ই হয় তো অচল, অর্থাৎ তা বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে না থাকুক, অন্তত ব্যাখ্যায় ছায়া-ছায়া অস্পষ্টতা এড়াতে পারে না। তবু আমার ইদানিং মনে হয়, সার্থক কাব্যের পিছনে অথবা অন্তঃস্থলে, সতত এক মানবিক দর্শন বা আত্মিকতার (স্পিরিচুয়্যালিটির) অবস্থান থাকে। এ-আত্মিক-মনন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন উচ্চারণে খর্ব হয়; এড়িয়ে যায় সমসময়কালীন, মনুষ্য-নির্ভর জিজ্ঞাসা, বিষাদ ও হর্ষ।

বিষ্ণুদার আলেখ্য থেকে আরম্ভ করে, সেই অন্ধকার চাই গ্রন্থের অনেক কবিতায় যা ছোটো বা নাতিদীর্ঘ, সোভিয়েতের বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের পরবর্তী জটিলতার স্পন্দন আমি পাই। সে-জন্যেই হয়তো, এই নব-জিজ্ঞাসা ও অস্থিষ্টের পটে, তাঁর দীর্ঘ, সহজ প্রত্যয়মূলক কবিতা লেখা কমে এসেছিল। আরম্ভ হয়েছিল আবার নাতিদীর্ঘ ও ছোটো ছোটো, জটিল অভিজ্ঞতায় সংহত কবিতাবলী।

তার মানে এ-নয় যে বিষ্ণু দে তাঁর বিশ্বদর্শন থেকে সরে আসছিলেন। তার মানে

শুধু এই যে তিনি অধীত বিদ্যা ও বোধে, যে সরলীকৃত মার্কসবাদ ১৯৪৮-৪৯ সন থেকে বর্জন করে ছিলেন, শেষ বয়সে তারই জটিল ও প্রশ্নময়, কখনো বিষাদাচ্ছন্ন উপলব্ধি সঞ্জাত, অভিজ্ঞতার কাব্য রূপায়ণে মনস্ক হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যে ১৯৪৮-৪৯ সনে, যখন বিটি রণদিভের নেতৃত্বে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আত্মঘাতী, বামপন্থী বিচ্যুতির উন্মাদনায়, মার্কসবাদের ছলনায়, শিল্প-সাহিত্যের উপর মূঢ় কুঠারাঘাত আরম্ভ করেছিল, তখন প্রায় একা, বিষ্ণু দে তাঁর বন্ধু চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েক জনের সহায়তায়, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আসল সূত্রের সন্ধান দিতে থাকেন। ভবানী সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর মতো নমস্য নেতারাও যখন বেনামে, আত্মহারা অবস্থায়, রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিকেরই মাথা কাটছেন, তখন বিষ্ণু দে-ই ছিলেন অনড় সমৃদ্ধ চিন্তায় ও লেখনীতে, এই বর্বর বিচ্যুতির বিপক্ষে। এবং এ-ঘটনা সেকালে ঘটেছিল যখন মার্কসের মৌলিক, নিজস্ব রচনা ছিল বেআইনী, এবং এদেশে দুষ্প্রাপ্য, নেতারাও বেশির ভাগই সে-সব রচনা পড়ার সুযোগ পাননি। আজ যা ফুটপাতে ঢেলে বিকোয়।

অনেক পরে, কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার ভ্রান্তি মোচন করল, রণদিভের পতন ঘটল, তখন অবশ্য ভবানী সেন, আমার উপস্থিতিতে, বিষ্ণুদার কাছে এসে মার্জনা চান। এবং ধন্যবাদ জানিয়ে স্বীকার করেন যে, সাহিত্যপত্র ত্রৈমাসিক, বিষ্ণুদার প্রায় একক মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সূত্রগুলির জন্যে আপ্রাণ লড়াই করে রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, প্রভৃতি সবার রচনার যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়ার এই চেষ্টা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করলেও, একেবারে মার্কসবাদ-বিরোধী করে তোলেনি। ভবানীবাবু অনুরোধ করেছিলেন বিষ্ণু দে যেন অতঃপর বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের হাল ধরেন। বিষ্ণুদার কাব্যিক মন, নিজস্ব মনন ও রচনার চাপ, সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি। উপরন্তু ততদিনে, বিরাট ও সমৃদ্ধ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—কমিউনিস্ট পার্টিরই আত্মঘাতী উন্মাদনায়।

এই উন্মাদনার আর একটি নেতিমূলক ফল হল বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতায় ভাঙন লাগা। স্টালিনের হিটলারের সঙ্গে পোল্যাণ্ড ভাগ করার চুক্তি সই করার পর থেকেই সুধীন্দ্রনাথ বন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন। তবু উভয়ের পারস্পরিক যোগ ও মননের টান ছিল শিল্প-সাহিত্যগত রুচির নৈকট্যে। সে নৈকট্যবোধও, কমিউনিস্ট পার্টির বাম-বিচ্যুতির দানবীয়তায়, স্টালিনী সরলীকৃত ফরমাণে ও ঝানভের অশিক্ষিত সাহিত্য-তাণ্ডবে, ভীষণ চোট পায়।

সুধীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট বিরোধী হয়ে যান, বিষ্ণু দে তাঁর নিজস্ব মননে তা হতে পারেন নি।

আমি যখন অনেক পরে সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্তের ঘনিষ্ঠ হলাম, হয়তো বা প্রিয়পাত্রও, তখন আবিষ্কার করি যে নানাজনের স্খলিত এবং উদ্দেশ্যমূলক, বিরূপ কথা চালাচালিও বিষ্ণু দে—সুধীন্দ্রনাথের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছেদের একটা কারণ, নিছক আদর্শগত পার্থক্যই নয়। এই কথা চালাচালির নেতিমূলক ফল, উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের সূত্র হয়ে, অনেকটা দূর করতে পেরেছিলাম। ফলে একদিকে বিষ্ণুদার বন্ধুর বাড়ি আসা আবার স্বাভাবিক হতে থাকে, অন্যপক্ষে সুধীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে প্রণতিদির হাতে ফুল্‌কো লুচি খেতে, গল্প করতে, ওঁদের ওখানে আসতে থাকেন। রাজেশ্বরী টের পান যে বিষ্ণুদা তাঁর গানের একান্ত ভক্ত।

আমার কাছে উভয়ের এই যোগাযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব সুখকর ছিল। তার আগে আমি উভয়ের টানাপোড়েনে ছিলাম জীর্ণ, এবং উভয়ত শ্রদ্ধাবনত এবং কৃতজ্ঞ। আমার সে দুঃস্থ, বুভুক্ষু অবস্থায়, দুই সংসারেই আশ্চর্য পরিশীলিত, স্বাভাবিক ছন্দে, অযুক্ত ধারায়, রাতের বা বিকেলের খাবার জুটত। বিকেলের খাবারও পরিমানের ওজনে, আমার রাতের প্রয়োজনও প্রায়ই মেটাতো। স্মৃতির এ-সব পর্ব, আজো আমার গায়ে কাঁটা দেয়। বলা ভালো, সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরীই একদা, সস্নেহ উপরোধে আমায় প্রথম মদ্য পান করান। তারপর সন্ধ্যে বেলা ওঁদের ওখানে থাকলে আমি অনেক সময়ই হুইস্কি খেতাম, এবং তাৎক্ষণিক ফুরফুরে, বোধে ও চেতনায় মনে হত 'সব ঠিক্ হো জায়গা।' তা কিছুটা তো হল বটে, কি ব্যক্তিগত জীবনে অথবা উভয় কবি বন্ধুর মধ্যে।

শিল্প-সাহিত্যের আরো দুটি ভিন্ন মাধ্যম বিষ্ণু দার সংবেদনা উজ্জীবিত করত। চিত্র-শিল্প ও সংগীত। যামিনী রায়ের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর শিল্পের ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। জন আরউইন, ভেরিয়ার এলউইন, কবি লুই ম্যাক্‌নিস এবং আরো কতো দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি যামিনীদার ছবির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে ছিলেন তার ঠিক নেই। এ সব ক্ষেত্রে বহু সময় আমিও লেজুড় ছিলাম। বিষ্ণুদা সম্ভবত আমার সংবেদনার ব্যাপ্তি ঘটানোর চেষ্টা করতেন, হয়তো বৃথাই।

কিন্তু যামিনী রায়তেই তাঁর চিত্রশিল্পের অনুরাগ ও উৎসাহ স্থাণু থাকেনি। তিনি সম্ভবত একজন প্রথম ভারতীয় কবি-বুদ্ধিজীবী, যিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের আশ্চর্য, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা লোকচক্ষে আনার চেষ্টা করেছিলেন। নন্দলাল বসুর শিল্প-সাধনা তাঁকে তেমন টানতো না।

ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা অনেকেই ত'ার বন্ধু ও তিনি সে আড্ডাখানার শিরোমণি ছিলেন। তিনি এ'দের ছবি সম্বন্ধেও অনেকের আগে লিখতে আরম্ভ করেন। নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল ইত্যাদি অনেকেই ত'ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সে-এক আশ্চার্য প্রাণময় সমাবেশ, যেখানে, স্বাভাবিকভাবেই, চিত্র-শিল্পগত অন্বিষ্টে বিভিন্ন ধারা থাকলেও, এক উষ্ণ সহমর্মিতা বিরাজ করত।

ধ্রুপদী ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষ্ণুদাকে, আমার মনে হয়, ভারতীয় ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীত থেকে বেশি টানত। দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সুচিত্রা মিত্রর গানই যে তাঁর ভালো লাগত তা নয়, এ'দের সবার সম্বন্ধে ত'ার একটা ব্যক্তিগত সৌহার্দ স্নেহ বোধ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র ত'ার ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন, এবং অনেকের মতো বিষ্ণুদাও মনে করতেন যে জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গীত-প্রতিভা, নানান ফেরে, সামাজিক দৃষ্টি বহির্ভূত থেকে যায়।

সুচিত্রা মিত্রের মুক্ত, দরাজ গলা, তাঁর কারুকলার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ, সতেজ স্নিগ্ধতা বিষ্ণুদাকে উজ্জীবিত করত। অন্যপক্ষে, রাজেশ্বরী দত্তের ভিন্ন আঙ্গিক, রাগপ্রধান গানের প্রতি ঝোঁক ও তার কঠিন অথচ মরমী উদ্বোধনে তিনি আবিষ্ট হতেন। দেবব্রত বিশ্বাসের গলা ও গায়কী, কাব্যের চিত্রময়তায় ত'ার কাছে ছিল "রাজার মতো"। সেখানে নিজস্ব ইনটারপ্রেটেশান, যদি থেকেও থাকে, তা অবশ্যম্ভাবী ও গ্রহণীয়।

শান্তিকুমার ঘোষ

বিষ্ণু দে : আমার স্মৃতিতে

১৯৪৪-৪৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিষ্ণু দে ছিলেন আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক। ক্লাসে তিনি মৃদুস্বরে প'ড়ে যেতেন শর্ট স্টোরি আর গ্রীক দেবতার মতো তাঁর চেহারা আমরা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতাম এবং নীচু গলায় গল্প করতাম নিজেদের মধ্যে। কেননা, ততদিনে তাঁর কবিতার চমকপ্রদ অনেক পঙক্তি আমাদের মুখে-মুখে ফিরতো। আমরা যে তাঁর কাছে পড়ছি এটাই ছিল গর্বের ব্যাপার।

তারপর খুব কাছাকাছি এসেছি তাঁর এবং এই ঘনিষ্ঠতা অটুট ছিল প্রায় তিন দশকের বেশী সময় জুড়ে। আমাকে তিনি একবার বলেছিলেন, শিক্ষকতা জীবনে বন্ধুত্ব হয় দু-একজন তরুণের সঙ্গে, এই যা লাভ।

কোনো সংকোচ হ'ত না তাঁর কাছে যেতে : কী নিঃশব্দ উষ্ণতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন তিনি। দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড যেখানে শেষ হয়েছে - পুরনো কবরখানার কান ঘেঁষে, একান্ত সেই নির্জন প্রান্তের দোতলা বাড়ীতে সপরিবারে থাকতেন তিনি। বৌবাজারের বনেদী একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে তিনি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আলাদা নিজের মতো বসবাস করার—এরকম ইঙ্গিত করেছিলেন একদা।

শুধুমাত্র কবিতা কেন, তাঁর জীবনযাপনের শৈলী টানতো আমাকে। প্রথম সন্ধ্যায় গিয়ে দেখতাম, স্নান ক'রে সদ্য পাট-ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি প'রে বাইরের ঘরে ইজি চেয়ারে স্মিত মুখে ব'সে আছেন তিনি : সামনের খাটো পাঁচিলে-রাখা টবের সারি থেকে বেলফুলের গন্ধ আসছে আর ঘরে চোঙা-লাগানো সাবেক গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে

বেঠোফেন কিংবা চাইকভস্কির। যখন ছাত্র ছিলাম, আক্ষেপ করেছি তাঁর কাছে, পরীক্ষার চাপ কীভাবে কবিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে আমাকে। বলেছিলেন তিনি, মৃদু হেসে পরীক্ষার সময়ই তো কবিতা লেখার তৃষ্ণা তীব্র হয়ে ওঠে।

জীবিকার দায় অবলীলায় বহন ক'রে তার উর্ধ্বে সৃজনশীলতার এক মহৎ লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সেই অনুসারে তিনি জীবন যাপনের শৈলী, এমন কি, তাঁর প্রতিদিনের কক্ষপথ স্থিরনির্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলেন। অধ্যাপনার জন্য কলেজে যাতায়াত এবং নির্বাচিত গুটি কয় বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া খুব কমই অন্য কারণে তাঁকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখেছি। (পুজো ও গরমের ছুটিতে অবশ্য মাসখানেকের ওপর তিনি সপরিবারে থাকতেন রিখিয়ায়।) প্রতি সন্ধ্যায়, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনের সকালে আসতো সাহিত্যিক, চিত্রকর, গায়ক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ বহু বিশিষ্ট জন। আর আমরা দু-এক জন, যারা বেশীর ভাগ সময় থাকতাম নীরব শ্রোতা, তাঁদের কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনায় যেন অবগাহন ক'রে ঘরে ফিরতাম।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বিষ্ণু দে-র কাছে শুনেছি তাঁর অভিজ্ঞতার একাধিক কাহিনী। কম বয়সে দেওঘরে একবার বালাজী ব্রহ্মচারীর কাছে উপহার পেয়েছিলেন একটি কলম,—কেননা, ততক্ষণে অন্যান্য দর্শনার্থীদের দামী কাপড়-চোপড়, আংটি প্রভৃতি স্মারক সব বিলিয়ে দেওয়া হ'য়ে গিয়েছিল (আর তো কিছু নেই, তুই এই কলমটা নে, বলেছিলেন ব্রহ্মচারী মহারাজ)।

যৌবনে বিষ্ণু দে একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের 'আম্রপালী'-ভবনে কবি তখন প্রশান্ত মহলানবীশের আতিথ্য নিয়েছিলেন। তাঁর সম্প্রতি-আঁকা ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখালেন বিষ্ণু দে-কে। পরে তিনি (বিষ্ণু দে) বুঝতে পেরেছিলেন যে, কবি খুশী হতেন বিষ্ণু দে ছবিটি তাঁর কাছে যাচ্ঞা করলে! বাইরে সে সময় ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন না বিষ্ণু দে কে ছেড়ে দিতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বিষ্ণু দে-কে, কবিতা-রচনা ছাড়া তোমার কি আর কোনো passion আছে? ছাখো, নিসর্গপ্রকৃতি আমাকে এত টানে যে, তার উপর ভর ক'রে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। কি বলো, দাঁড়াই নি?

মনে পড়ে, এক সন্ধ্যায় বিষ্ণু দে আমায় বললেন, চলো, আমরা একটু হাঁটতে বেরোব। বড়ো রাস্তায় ভিড় ব'লে সরু গলি পছন্দ করলেন তিনি বেড়ানোর জন্য। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলার সুবিধা হ'ল তাতে। তিনি বললেন, ছাখো, মেয়েদের গয়নায় যেমন সাবেক ধরন বা রীতি ফিরে আসছে, কবিতায় সেরকম 'তব' 'মম' লাগাতে ক্ষতি কোথায়? লেক মার্কেট থেকে শুরু ক'রে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গড়িয়াহাটে

পৌঁছেছিলাম। মনে আছে, লেক অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যেতে আপত্তি ছিল তাঁর—সেখানকার অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্য।

স্মরণীয় হ'য়ে আছে আমার কাছে এমন একাধিক সকাল-সন্ধ্যা, যখন সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে কাছে থেকে জানার। বরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' যখন সন্থ কলকাতায় পৌঁছেছে, সে সময় দেখেছি, ক'দিন ধ'রে প্রায় সারাক্ষণ পড়েছেন—বইটিকে কাছ-ছাড়া করছেন না। অচিরাৎ লিখলেন কবিতা 'বরিস পাস্তেরনাকের উদ্দেশে'। একান্তে বলেছিলেন আমাদের, কবিতার একটা নিজস্ব ওজন আছে যাতে তা দাঁড়িয়ে যায়, উপন্যাসের যা নেই। বলেছিলেন, ভেবে ছাখো, সোভিয়েট রাশিয়ায় কত পরিবার জীবিকার উপায়, বাসস্থান, মৌল স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধাগুলি অর্জন করতে পেরেছে; এটা কি কিছু কম কৃতিত্ব। পাস্তেরনাকের উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি সম্বন্ধে সে সময় তুমুল তর্ক উঠেছিল বাঙলা সাহিত্যজগতে।

অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যে একটা ভিতরের সম্পর্ক আছে তা আমরা বুঝতাম; কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের একটা শীলিত মানবিক পরিমণ্ডল তাঁর চারপাশে আপনা-আপনি গ'ড়ে উঠতে দেখেছি সব সময়। বহির্বিশ্ব, বিশেষ ক'রে রাশিয়া ও চীনে মানুষের মুক্তির যা কিছু আন্দোলন, তার ঢেউগুলি ধরবার চেষ্টা করতেন তিনি কলকাতায় ব'সে, আবার, একই সঙ্গে, নিজের পরম্পরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শিকড়-সন্ধানী ছিলেন। দুইয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ছিল না তাঁর কাছে: উভয়কে মেলাতে চেয়েছিলেন শিল্পসৃষ্টিতে। তাই মগ্ন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম টি. এস, এলিয়ট ও মাওৎ-সে-তুঙ, পাবলো নেরুদা ও ওয়ালেস্ স্টিভেন্স—দুই গোত্রের কবিরই রচনার অনুবাদ করতে। আসলে, এক বলিষ্ঠ উদার দৃষ্টিতে যা সম্ভব, সাহিত্য চিত্রকলা-ভাস্কর্য-সঙ্গীত-নৃত্য—ভাব-প্রকাশের যাবতীয় মাধ্যম থেকে গ'ড়ে তুলতেন মানস-প্রস্তুতি, যাতে তাঁর প্রহরগুলি ফলবান হয় নব-নব সৃজনশীলতায়। দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে যোগান দেওয়া নয়, তিনি চেয়েছিলেন রচনাবলীকে সমগ্রতা দান করতে।

আমার স্মৃতিতে জাগরূক হ'য়ে আছে বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছিলেন তাঁর দেখা রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতাবান ডান হাতের গঠন-ঋজুতার কথা। যেমন জেনেছিলাম তাঁর কাছে যে, যামিনী রায় কখনো ডান দিকে পাশ ফিরে ঘুমোতেন না, পাছে তাঁর দক্ষিণ হাতের উপর কোনো চাপ পড়ে—এই ভয়ে। আমি অবশ্য দেখেছিলাম আরেক শিল্পীর কুশলী হাত, যে-হাতে ছিল অসামান্য শক্তি ও বিরল যাদুস্পর্শ—সে-হাত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষা-গুরু বিষ্ণু দে-র।

প্রশান্তকুমার ঘোষ

বিষ্ণু দে ঃ যেমন দেখেছি

কৈশোর-শেষে দিল্লীতে ও কলকাতায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বিষ্ণু দে'র কবিতা আমার চেতনাকে নিয়ত খরতর করত। 'সন্দ্বীপের চরে'র ১৫ই আগষ্ট কবিতাটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে-আসা কলকাতার বর্ণনা '৪৭ এর দিল্লীতে দাঙ্গার ভয়াবহ দিনগুলিতে শান্তিমিছিলের সঙ্গী ছিল :

> "বজ্রে ও মাণিকে গাঁথা মধুর মধুর
> এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে
> নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান
> তীর্থযাত্রা এপাড়া ওপাড়া, একান্ত নির্ভর চোখে
> লক্ষ লক্ষ কী দরাজ প্রাণ এ তীর্থশহরে দরগায়…"

"লালকমল-নীলকমলের" সম্মিলিত অভিযানের যে-প্রেরণা বিষ্ণুবাবুর চেতনায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তা ছাত্র-আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও বিস্তারে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে গিয়ে এক গভীর প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এর এক বছরের মধ্যেই এল সাম্যবাদী আন্দোলনের অতিবাম বিচ্যুতির দুঃসময়। সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক সার্থক ও সৎ প্রয়াস-ই তীব্র বিদ্বিষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হল। সেই হিংস্র প্রলাপের মধ্যে বিষ্ণু দে'র কবিতা আমাদের দীপ্ত বিশ্ববিজয়ীর পুরুষকারে উজ্জীবিত করেছে; 'অন্বিষ্ট' বার বার পড়েছি—

> "তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
> কতকাল যে তোমার কানাকানি।
> তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি

দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আসা ইতিহাসের কাল।
বিষ্ণু বলে, এ বুর্জোয়া চাল।"

এভাবেই একটি উদ্বেল দশকে আমার মনে বিষ্ণু দে'র একটি ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ এর মার্চে দার্জিলিং সরকারী কলেজে যোগদান করার পরে আবিষ্কার করলাম যে আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর ছাত্র। তখন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' সবে প্রকাশিত হয়েছে : এর মধ্যে 'নদীর উৎস যদি জানা থাকে' কবিতাটি বার্চ হিলের পথে মার্চের উদ্দাম হাওয়ায় উড়ন্ত অজস্র পাতার ছন্দের সঙ্গে মিলে গিয়ে আবিষ্ট করত আমাকে, "নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে কথার মতন!"

তাই ১৯৬৬র এপ্রিলে যখন মৌলানা আজাদ কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বদলী হয়ে এলাম, তখন যে সব নতুন অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপের সুযোগ। আগেই জেনেছিলাম যে তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেন।

তবে ভয় ছিল মনে। তাঁর লেখা পড়ে, বন্ধুদের কাছে তাঁর কথা শুনে, মনে মনে যে-ছবি এঁকেছি, সাক্ষাৎ পরিচয়ে তা ভুল বলে প্রমাণিত হবে না তো? প্রথম দিন এই আশঙ্কা নিয়েই গিয়েছিলাম। স্টাফ কমনরুমের ভিতরের ঘরটিতে লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে (যাকে আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় 'head of the table' বলা হয়) একটি সাধারণ চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। পরে জেনেছিলাম যে এটি ই তাঁর অভ্যস্ত আসন। সৌম্য, শুভ্র, শান্ত, ঋজু, দৃপ্ত, নম্র.—এমন অনেকগুলি বিশেষণ মনে ভিড় করে আসছিল তাঁকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছিল যে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য জাদু আছে যা এইসব বিশেষণ-কে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। আমার কৈশোর-যৌবনের দিনগুলির স্বপ্ন ও সংগ্রামে বিষ্ণু দের কবিতায় যে 'আনন্দ-নিস্যন্দন আকাশ'-কে আবিষ্কার করেছিলাম, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে মনে হয়েছিল যে তিনি যেন সেই আকাশের-ই উপমা।

প্রথম আলাপেই তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়েছিলাম। আমি তাঁর অনেক ছাত্রের-ই সহপাঠী একথা জেনে অতি সহজেই তিনি আমাকে "তুমি প্রশান্ত"র অন্তরঙ্গতায় টেনে নিয়েছিলেন।

মনে আছে প্রথম দিনেই নানা প্রসঙ্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলেছিলেন যার মধ্যে শ্লেষবিহীন নির্মল আনন্দের জোয়ার ছিল।

এর পরের কয়েকটি বছরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় গভীরতর হ'ল। তিনি এলেই স্টাফ

কমনরুমের আবহাওয়া বদলে যেত। আমরা যারা বয়সে তখন তরুণ তাঁকে ঘিরে বসতাম, তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়ে glasnost বিরাজ করত ছোট ঘরটিতে। প্রবীণ অধ্যাপকেরা-ও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন আড্ডায়। আর তখনকার অধ্যক্ষ মামুদ সাহেব কমন রুমে এলে তো আসর সরগরম হয়ে উঠত! মৃদুভাষী বিষ্ণুবাবুর কোন সরস মন্তব্যে প্রাণবন্ত হাসিতে ফেটে পড়তেন অধ্যক্ষ মামুদ, তারপর শুরু হ'ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা। আলোচনার পরিসর ছিল ব্যাপক ও বিচিত্র পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত থেকে সাম্প্রতিকতম বাংলা কবিতা, বিজ্ঞানের নতুনতম আবিষ্কার থেকে রাজনীতির সূক্ষ্মতম ধূর্ততা—এর কোন কিছুই তাঁর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারত না। নিজে কথা কম বলতেন, আমাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন। Glasnost সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতিতে কেউ কখনও কোন অশালীন মন্তব্য করতে পারত না, ত্রুটি তিনি উপেক্ষা করেছেন, শান্তভাবে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন—কিন্তু যে কোনরকম অভব্যতা তাঁর কাঠিন্যে প্রতিহত হয়েছে। তদানীন্তন কবি-সাহিত্যিকদের প্রয়োজনবোধে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি-গত বিদ্বেষ সেই সমালোচনাকে স্পর্শ করেনি।

ছোট ছোট কত ঘটনা মনে পড়ছে। একবার একটি সামান্য কাজের ভার দিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর সিগারেট লাইটারটি বিকল হয়েছিল,—আমার পরিচিত একটি দোকান থেকে তা সচল করিয়ে এনেছিলাম। লাইটারটি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে আশাতীত উপহার পেলাম, তাঁরই অনুবাদ করা হো চি মিনের কবিতার চারটি পংক্তি, তাঁর হাতের লেখায়।

বিঠোফেনের Ninth Symphonyর (Herbert Karajan পরিচালিত) Berlin Philharmonic Orchestra তখন দুষ্প্রাপ্য। একটি L-P record set আমার কাছে ছিল। কোন এক শীতের সন্ধ্যায় আমার পণ্ডিতিয়ার ফ্ল্যাটে একা এসেছিলেন বিষ্ণুবাবু; তখন এই রেকর্ডটি আমি তাঁকে বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। আজও স্পষ্ট মনে আছে অল্প কথায় আমাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন Schiller এর "Ode to Freedom" কী ভাবে এই symphonyতে 'Ode to Joy"-তে রূপান্তরিত হ'ল। সেই থেকে এই সঙ্গীতের মূর্ছনা জন্মাষ্টমী"র "মৈত্রেয় আত্মসহোদরের" সঙ্গে মিশে গেছে আমার মনে।

তিনটি বছর পার হয়ে ১৭ই জুলাই ১৯৬৯ অবশেষে বিষ্ণুবাবুর অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর নেবার দিনটি এল। তাকে বিদায় দিতে হবে, একথা আমরা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। কিন্তু সরকারী নিয়ম তো অলঙ্ঘ্য। বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে জেনে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'আড়ম্বর করো না।' অতএব অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত সভা হ'ল; তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা তখন তাঁর সহকর্মী তাঁদের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বিদায়-সভায় আড়ম্বর ছিল না ঠিকই, তবে আন্তরিকতা

ছিল। উপস্থিত প্রত্যেকেই বুঝেছিলেন যে কলেজের ইতিহাসে বিষ্ণুবাবুর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ শেষ হয়ে গেল। মামুলী স্তুতি-তে ভরা বক্তৃতা হ'ল না, অন্তরঙ্গ কথোপকথনে জমে উঠ্‌ল আমাদের শেষ আড্ডা বিষ্ণুবাবু-কে নিয়ে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে আমি একটি কবিতা ("কাল রজনীতে এসেছিল যবে বৈশাখী পূর্ণিমা") আবৃত্তি করলাম। কবিতাটি আমার বড় প্রিয়। কিন্তু বিষ্ণুবাবু যখন গাঢ় আন্তরিকতায় বললেন, "আমার কবিতা প্রশান্ত সুন্দর পড়তে পারে," তখন আমার মনে হ'ল যে আমার কৈশোর-যৌবনের সমস্ত কবিতা পড়া সার্থক হয়ে উঠেছে।

২০ বছর কেটে গেছে এই মৌলানা আজাদ কলেজে বিষ্ণু দের সেই বিদায়-সংবর্ধনার পরে। এর মধ্যে আমি কোচবিহারে বদ্‌লী হয়েছি ১৯৭৭ এ, ফিরে এসেছি চুঁচুড়ায় হুগলি মহসিন কলেজের অধ্যক্ষপদে। কলকাতায় যখন এসেছি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভালো লেগেছে অসম্ভব,—কিন্তু মৌলানা আজাদ কলেজের স্টাফ কমন রুমের সেই পরিবেশ আর ফিরে আসে নি। যখনই পেয়েছি তাঁর নতুন লেখা পড়েছি, ফিরে পেয়েছি সেই আনন্দ-নিস্পন্দন আকাশ-কে।

১৯৮০র শেষে খবর পেলাম তিনি গুরুতর অসুস্থ। 'নব-নালন্দা'র এক অনুষ্ঠানে আমার বন্ধু সত্যেশের (ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী) সঙ্গে দেখা হল, তাকে বললাম যে একদিন দেখতে যাব বিষ্ণুবাবু-কে। উত্তরে সে যে-কথা বলেছিল তা আমার বুকে তীরের মতো বিঁধল : "তুমি যে-বিষ্ণু দে-কে চিনতে তাঁকে তো আর দেখতে পাবে না—এখন তোমার না-যাওয়াই ভালো।" মনে পড়ে গেল কী ভয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে গিয়েছিলাম, এবং তিনি কীভাবে আমার সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়-কে তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদু-তে রূপান্তরিত করেছিলেন আমার মনে মনে আঁকা তাঁর ছবির চেয়েও তিনি যে অনেক বড় একথা প্রমাণ করে। কিন্তু সত্যেশের কথা শুনে জানলাম যে এবার তা আর হবার নয়, তাঁর কাছে আমার না-যাওয়াই ভালো।

যে-বিষ্ণু দে-কে আমরা কলেজে দেখেছি "সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে" দীপ্তিমান, তিনি-ই আমার স্মৃতি-তে চিরদিন অমলিন : আমার কর্মব্যস্ত ঘর থেকে মৌলানা আজাদ কলেজের স্টাফ কমনরুমে আড্ডা দিতে যাবার সময় বড় একটা পাই না, কিন্তু যখনই যাই তখনই সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলি তাদের আশ্চর্য সত্তার নিয়ে ফিরে ফিরে আসে। সেখানে বিষ্ণু দে আজও একাধারে শান্ত এবং দৃপ্ত।

উত্তরা বসু

পিতৃস্মৃতি

সবচেয়ে ছোটবেলার কথা যা আমার স্বপ্নের মত ঝাপসা মনে পড়ে তা হচ্ছে একদিন ভোরবেলায় আমাদের ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ির ছোট্ট দোতলার বারান্দাটিতে চুপ্‌টি করে বসেছিলাম। বাবা আমার পাশে বসে বললেন "কী ভাবছিস!" আমি বললাম "বড় হয়ে কী হব তাই ভাবছি!" বাবা বললেন "কেন, আমি তো কবি হব ভেবেছিলাম, তাই হয়েছি। তুই এত ভাবনা করছিস কেন? আমি বললাম "তুমি যা চেয়েছিলে তাই তো হয়েছ, কিন্তু আমি যে শিল্পী হতে চাই, তা হওয়া যে খুব শক্ত!" তখন আমার মোটে পাঁচ বছর বয়স, তাই আমার এই কথাতে আমাদের বাড়ীতে খুব হাসাহাসি হয়েছিল। কিন্তু এখন ভারি লজ্জা হয় যে বাবার একান্ত ইচ্ছে সত্ত্বেও আমার তো সত্যিই শিল্পী হওয়া হলো না এ জীবনে!

আমাদের ছোট্ট বাড়ীটা তখন ভারি সুন্দর ছিল—সামনে পুকুরে কত শালুক ফুটতো। বাড়ী পিছনে প্রিন্স গোলাম মহম্মদদের কবরখানাটাও কত ফুলেও বড় বড় গাছে ভারি সুন্দর সাজানো ছিল। আমরা ঠাকুমা দুই কাকা ও বাবা মায়ের সঙ্গে ভারি সুখে-ছিলাম ছোট্ট বাড়ীতে। হঠাৎ ১৯৪৩ সালে ছোট পিসীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে আমার ঠাকুমা মারা গেলেন। তার কিছুকাল পরে আমার ভাই জন্মালো আমাদের বাড়ীতেই—সেদিন আমাদের দু'বোনের কী আনন্দ! যখন কলকাতায় বোমা পড়ে তখন মা আমাদের দুই বোনকে নিয়ে বেলেতোড়ে যামিনী রায়ের বাড়ীর কাছে একটা বাড়ীতে থাকতেন। বাবা যখন বেলেতোড়ে আমাদের দেখতে যেতেন তখন আমরা দু'বোনে আনন্দে নাচতাম। ১৯৪৬ সালে যখন দাঙ্গা হয় তখনও মা আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে এক দিদার বাড়ী চলে গেছিলেন। বাবা ও নীরু কাকা (নীরদ মজুমদার)

এক আহত পাঠানকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই এমনভাবে কাঁধে বাঁশের নিষ্ঠুর আঘাত পান যে তারপর থেকে চিরদিন বাবা ঐ কাঁধের ব্যথায় কষ্ট পেয়ে গেছেন। আমার বড়কাকা তো ঐ দাঙ্গাজনিত হাঙ্গামার জন্যই অসুস্থ হয়ে বিলাসপুরে যক্ষ্মাস্যানাটোরিয়ামে মারা যান। আমার ছোটকাকাও খুব অল্প বয়সে চাকরী নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেলেন। আমাদের ছোট বাড়িটায় আমরা তিন ভাই বোন ও বাবা-মা রইলাম খালি। ঐ ছোট্ট বাড়িটা কবিতায় ও সঙ্গীতে গম্‌গম্‌ করত সবসময়। আমার মা ছিলেন কমলা গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস আর আমাদের স্কুলে সবসময়েই নাচগানের জলসা হত বটুককাকা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) ও পরে জর্জবাবুর (দেবব্রত বিশ্বাস) নির্দেশনায়। আমরা গান গাইতাম ও বাবা নানা উপদেশ দিয়ে আমাদের নৃত্যগীতোৎসবের সাফল্য বাড়িয়ে তুলতেন।

বাবার পৈতৃক বাড়ি ছিল সংস্কৃত কলেজের উল্টো দিকে কফিহাউসের পাশে আর শ্যামাচরণ দে ছিলেন বাবার ঠাকুর্দার দাদা। শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ একই সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন ও বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমাদের কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে জ্যাঠাবাবু ও জেঠিমাদের সঙ্গে যখন আমরা দেখা করতে যেতাম—আমাদের জেঠিমারা গর্বভরে দেখাতেন কোথায় বসে বিদ্যাসাগর প্রায়ই দ্বিপ্রাহরিক আহার করতেন - রান্নাঘরের পাশটিতে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার প্রপিতামহীদের খুব বন্ধুত্বও ছিল শুনেছি। বাবার সঙ্গে অনেকবার আমরা বাবার আদি বাসস্থান হাওড়া জেলায় পাঁতিহাল গ্রামেও গিয়েছি—সেখানে বিশাল বাড়ি, ঠাকুরদালান ও অন্দরমহল অবাক হয়ে দেখেছি—প্রায় দুশো আড়াইশো বছরের পুরানো বাড়িটির ইটগুলি কেমন সরুসরু, চোর ধরার জন্য সিঁড়ির মাঝখানে কেমন অদ্ভুত এক কপাট। তখন পাঁতিহাল যেতে হত মার্টিন বার্ণের ছোট্ট রেলে – সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা—বাবার তো মাথা হেঁট করে উঠতে হত—এত ছোট্ট কামরা। একবার মা ডোমজুড় স্টেশনে নেমে ফিল্ম রোল কিনছে, আর ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে দেখে আমি এত জোরে "মা" বলে কেঁদে উঠলাম যে মা শুনে দৌড়ে এসে উঠলো। বাবা সর্বদা অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাঁতিহাল যেতে ভালবাসতেন—ওখানে গেলেই খুব ডাব নারকোল ও আম খাওয়া হত। আমি ছোটবেলায় খুব অসুস্থ থাকতাম বলে আমি সবসময়ে স্টেশনে থেকে বাড়ি অবধি পাল্কি করে যেতাম আর বাকি সবাই পায়ে হেঁটেই যেতেন। একবার যামিনীরায় আমাদের সঙ্গে আইলিন অ্যাডাটা-কে সঙ্গে নিয়ে বাবার এক বন্ধুর গাড়ীতে করে পাঁতিহাল গিয়েছিলেন—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা কারণ ছবিজেঠু (যামিনী রায়) নিজের স্টুডিও ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। ছবিজেঠু ছিলেন আমাদের, বিশেষ করে বাবার ও

আমার, সবচেয়ে আপনজন। আমরা প্রতিসপ্তাহে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে না গেলে উনি খুব দুঃখিত হতেন, আবার চিঠি পাঠিয়ে ডেকে পাঠাতেন। খুব ছোট্টবেলায় বাবার সঙ্গে ছবিজেঠুর বাগবাজারের বাড়িতে গিয়েছি—যেন স্বপ্নের মত ঝাপসা মনে পড়ে। বালিগঞ্জ প্লেসে ওঁর নতুন বাড়ি ও স্টুডিও হবার পর একদিন মা আমাদের কমলা গার্লস স্কুলের অনেক ছাত্রীদের নিয়ে বাবার সঙ্গে যামিনী রায়ের ছবি দেখাতে গেলেন। আমি তখন সিক্স বা সেভেনে পড়ি। ছবিজেঠু আমাদের কাগজ তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে বলতেই আমি চটপট একটি বিড়াল মাছের চিন্তা করছে এমন একটি ছবি এঁকে দিলাম। বাবা ও ছবিজেঠু কী খুশী! সেই থেকে শুরু হল বাবার সঙ্গে আমার ছবিজেঠুর বাড়ি যাওয়া ও ছবি আঁকা শেখা—প্রত্যেক ছুটির দিনে। বাবার খুব ভাল লাগত যে আমি ছবিজেঠুর স্টাইলে ছবি আঁকতে পারছি—আমিই ছিলাম ওঁর একমাত্র ছাত্রী। বাবার সঙ্গে ছবিজেঠুর ছবি নিয়ে কত আলোচনা হত, কতরকম গল্প হত আমি বছরের পর বছর কাছে বসে শুনতে পেয়ে কত যে আনন্দ পেয়েছি! যখন আমি ব্রেবোর্নে পড়ি—১৯৫৫-'৫৭ সালে তখন কতদিন বাবার চিঠি নিয়ে ছবিজেঠুর বাড়ি চলে গেছি একলাই।

১৯৪৩-৪৪ সালেই জন আরউইনের সঙ্গে বাবা একটি বই লেখেন যামিনী রায় সম্পর্কে যা গুণীমহলে খুব কদর পেয়েছিল। ঐ সময়ে জন আরউইন ছিলেন গভর্নরের সেক্রেটারী – বাবার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে প্রায়ই আমাদের গভর্নরের বাড়িতে পার্টিতে একজিবিশন ইত্যাদিতে যাবার সুযোগ জুটে যেত। ওখানেই একবার ঘরোয়া আসরে বালা সরস্বতীর নাচ দেখেছিলাম। বাবা সর্বদা সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে গভর্নরের বাড়িতে যেতেন, তখন আমাদের স্বাধীনতা আসেনি বলে বাবাকে ঐ পোষাকে কী দারুণ বিশিষ্ট মনে হত, আর সবাই তো যেতেন স্যুটেট বুটেট হয়ে। জন ছাড়াও চল্লিশের দশকে আমাদের বাড়িতে নিত্যঅতিথি ছিলেন মার্টিন কর্কমান, পার্শি ও এপ্রিল মার্শাল, শীলামাসী ও অডেন (কবি অডেনের ভূতত্ত্ববিদ্ ভাই) মিনিমাসী ও লিন্‌ডসে এমার্সন ইত্যাদি। বাবামায়ের সঙ্গে প্রায়ই ইংরেজ বন্ধুদের পার্টিতে গিয়ে ভাল ইংরেজি বলতে না পারার জন্য কী যে লজ্জা পেতাম!

চল্লিশের দশকে আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজই আসতেন ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা —তারা প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের কাকার মতন। নীরুকাকা (নীরদ মজুমদার) তো আমার বাবার প্রাণের বন্ধু ছিলেন। আমরাও সর্বদা ওদের বাড়ি গিয়ে দাদুদিদার কাছে কত আদর-যত্ন পেয়েছি। ১৯৪৫ সালে মা খুব অসুস্থ হওয়ায় নীরুকাকা আমাদের রিখিয়ায় (দেওঘরের কাছে একটি গ্রামে) নিয়ে যান—সেখানে গিয়েই বাবার প্রকৃতি-প্রেম কিছুটা স্থিতি পেল, মন শান্তি পেল হয়ত বা। তারপর ১৯৪৮ সাল থেকে প্রত্যেক

বছরই আমরা পুরো পুজোর ছুটি রিখিয়ায় কাটিয়েছি। তখনকার দিনের পুরো ফার্স্ট ক্লাশ বুক করে যাওয়া হত, লুচি ও শুকনো মাংস খেতে খেতে, সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে—সে আমাদের কাছে ছিল স্বর্গসুখের মতন। বাবার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতাই লেখা হয়েছে রিখিয়ার নিসর্গশোভা দেখে—ত্রিকূটে 'ভোরের আগুন' থেকে দিগ্‌রিয়ার সূর্যাস্তশোভা নিরীক্ষণ করে। আমার মনে পড়ে, রিখিয়ায় বাবার সঙ্গে হাত ধরে চাঁদের আলোয় নীরুকাকাদের বাড়ির সামনে বেড়াচ্ছিলাম—আমাদের ঘরে বেটোফেনের নাইন্থ সিম্‌ফনি বাজছিল খুব জোরে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় সেই ঐশ্বরিক সঙ্গীত শুনতে শুনতে বাবাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "বাবা, স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর ?" বাবা তখন কী সুন্দর হেসেছিলেন। নীরুকাকাকে উৎসর্গ করে বাবা রিখিয়ার কবিতা লিখেছিলেন—

"হিরণার টিলা লালে লাল হল
মেঘডম্বরুনীলে
সবুজে ও লালে লাল।
বাবুডির আঁকাবাঁকা লালপথ মেঘে পলাশে ও শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।"...

নীরুকাকা, গোপালকাকা ও শানুপিসীর রিখিয়ার ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাবা কতবার উজ্জ্বল রঙে মনের খুশীতে ক্যানভাস ভরিয়েছেন, সে ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় বর্ণময় কবির মনের কী খেলা!

শুধু শিল্পীরাই নয়, কবি সমর সেন, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের বাড়ির নিত্য অতিথি। সমর সেন সুলেখাদি তো ছিলেন আমাদের নিকট প্রতিবেশী। অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এঁরা ছিলেন চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আর আমাদের সবার আপনজন। দেবব্রত বিশ্বাস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন বাবা মায়ের এম. এ. ক্লাশের সহপাঠী—ফলে ওঁরা আমাদের দু'বোনকে ছোট্টবেলা থেকে গান তো শেখাতেনই, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসে যেত—তারই আনন্দধ্বনিতে রণরণিত হত আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। আমাদের স্কুলে নাচগানেও বটুককাকা বা জর্জবাবু নির্দেশনা দিতেন, আমরা বুলগানিন ক্রুশ্চেভ ও জওহরলাল নেহরু, চৌএনলাই, হাইলে সেলাসী ও এমন আরো অনেক বিদেশী বিখ্যাত লোকজনের মনোরঞ্জনের জন্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি।

বাবা নিজেই আমাকে একটি অটোগ্রাফ খাতা কিনে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষ বসুর হস্তলিপি লাগিয়ে আবার নিজেও একটি ছড়া লিখে উপহার দেন যাতে আমি গানের পরে

ঐসব মহারথীদের অটোগ্রাফ নিতে পারি। বাবাই আমাকে অটোগ্রাফ নিতে বলেছেন স্টিফেন স্পেণ্ডার, লুই ম্যাকনীস, পাবলো নেরুদা, অডেন ইত্যাদি বিখ্যাত বিদেশী কবিদের কাছ থেকে, যখন বাবার সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে এসেছেন—আমাদের ছোট্ট বাড়িটায়। পরে বহু শিল্পীর বাড়িতে (এমনকি নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর) আমাকে বাবা নিয়ে গেছেন ছোট্ট একটি স্কেচ সংগ্রহ করার জন্য ঐ অটোগ্রাফ খাতাটিতে। ফলে ঐ খাতাটি এখন মহামূল্যবান!

আমরা যখন খুব ছোট্ট তখন বাবা আই. পি.টি. এ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা প্রায়ই স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ি "নবান্নর" রিহার্সাল দেখতে যেতাম। এখনও মনে পড়ে বিজন ভট্টাচার্যের সেই অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান—"ঘুরঘুটি আন্ধার রাতেরে ভাই, ঘুরঘুটি আন্ধার রাতে, পাও সরেনা ডরে, মন সরেনা ভয়ে" —আমি তো ঐ গান শুনে রীতিমত ভয় পেতাম। ডোডোবাবু ও বিজনবাবু আমার মোটাসোটা ছোট্ট ভাইটিকে কত অদ্ভুত সব বীরত্বের কাহিনী শোনাতেন—তাই শুনে আমরা সবাই হেসে লুটোপুটি খেতাম। বাবা-মা, গোপাল ঘোষ ও অশোক মিত্রের, হেমন্ত ও বেলা মুখার্জির বিবাহউৎসবেও সাহায্য করেছিলেন। তখন আমরা কতবার ঘরোয়া আসরে হেমন্তবাবুর কত গান শুনেছি। সুচিত্রাদি ছিলেন আমাদের আরো আপনজন, ওঁর দিদি সুজাতাদির সঙ্গে কতবার ইরা ও আমি ছবি এঁকেছি, গান করেছি, সারাদিন কাটিয়েছি। এমনকি রবিশঙ্কর একদিন আমাদের বসবার ঘরে পা মুড়ে বসে ঝন্‌ঝন করে সেতার বাজিয়েছিলেন—আমার মনে ছবির মত ভাসছে। বিলায়েত খাঁর তখনও অত নাম হয়নি, আমাদের স্কুলের বড ঘরে বাবার বন্ধুবান্ধবদের বাজনা শোনাচ্ছেন এমন দাপটের সঙ্গে যে তাঁর চুলের রাশি এসে মুখ ঢেকে দিচ্ছে—আমি অবাক চোখে দেখেছিলাম। পরে যখন আমাদের পাড়াতে বাড়ির কাছেই আলি আকবর মিউজিক কলেজ হয়—পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের গোড়ায়—কতবার আমরা বাবার সুবাদে একদম সামনের সারিতে বসে কত সুন্দর সেতার ও সরোদের অনুষ্ঠান শুনেছি—তেমন সঙ্গীত কোনো বড় মিউজিক কনফারেন্সেও শোনা যায়না আজকাল।

আমার খুব মনে পড়ে কালিকা সিনেমা হলে আই পি.টি এ'এর নৌবিদ্রোহ বিষয়ক ছায়ানৃত্য হচ্ছে, বাবা আমাকে হাত ধরে সামনের সারিতে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। যেই "বম্বের নীলসমুদ্র রক্তে লাল হয়ে গেল" বলেই সাদা পর্দায় রক্তাভা ফুটে উঠতে লাগল —আমি ভীষণ বিচলিতভাবে একছুটে বাবার কাছে চলে গেলাম। তখন প্রায়ই 'উদয়ের পথের" পরিচালক জ্যোতির্ময় রায় ও বিনতা রায় আমাদের বাড়ি আসতেন—আমরাও সকলে ওদের বাড়ি যেতাম। আমার ভাই পপা তো বিনতাদির এমন ভক্ত ছিল যে

সবসময়ে ওর কোলে চড়ে বসত। আমাদের ছোট্ট বসবার ঘরে জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে বাবার বিশিষ্ট বন্ধু নবযুগকিশোর আচার্যচৌধুরীর এমন হাস্যকর তর্ক শুরু হয়ে যেত—জল দিয়ে গাড়ী চলে কিনা কিংবা আজব কোনো খাদ্যবিষয়ে—যে আমরা সবাই তাজ্জব বনে যেতাম। কখনো কখনো রতনলাল সরকার বা ধৃতিকান্ত চৌধুরী আমাকে ও দিদিকে মধ্যরাতের কলকাতা দেখানোর জন্য রাত ১১টায় গাড়ী করে পাগলের মত ঘুরিয়েছেন। একবার তো আমাকে অভিভূত করার জন্য রতনবাবু ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রামে ধাক্কা মেরে বসলেন—তারপর পুলিশকে কীসব বোঝালেন—ফলে আমাদের কিচ্ছু হল না; বাবা কিন্তু এসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনে হেসেছেন শুধু।

বাবা ছিলেন আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁকে ঘিরেই ছিল আমাদের সত্তা। ভোরবেলা উঠে বারান্দা বা ছাদ থেকে সূর্যোদয় দেখতেন, নিজে হাতে কফি বানিয়ে নিয়ে। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বাবা নিজের শুভ্র ধুতিপাঞ্জাবী এমনকি রুমালটি পর্যন্ত গুছিয়ে রাখতেন কলেজ যাবার জন্য। বাবা সাধারণত নিজেই কলেজের টাইমটেব্‌ল্‌ বানাতেন ও সকাল ১০টার ক্লাশে চলে যেতেন ট্রামে করে। প্রথমে রিপন কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সী ও সবশেষে বহুবছর মৌলানা আজাদ কলেজে ইংরাজি সাহিত্য অধ্যাপনা করেছেন বাবা। আমি ছোটবেলায় প্রায়ই অসুস্থ থাকতাম! ১৯৫২, ৫৩ ও ৫৪ সালে তো আমি অসুস্থতার জন্য তিনচার মাস স্কুলেই যেতে পারিনি। আমার অসুস্থতার সময়ে সারাদুপুর বিকেল কখনো সন্ধ্যেবেলাও বাবার সঙ্গ পেতাম—মা তো স্কুলে খুব ব্যস্ত থাকতেন। রোজ কলেজ থেকে ফিরে বাবা মোটামোটা বই পড়তেন, আমি বাবার পাশে শুয়ে জিজ্ঞাসা করতাম—"বাবা তুমি অত কী পড়ো!" বাবা হেসে বলতেন—"সত্যি সত্যি পড়ছি কি আর, এই একটু পাতা উল্টে দেখছি।" অথচ সন্ধ্যেবেলা সেই বই নিয়ে সুধীন দত্ত, সমর সেন বা শম্ভু মিত্রর সঙ্গে কী গুরুগম্ভীর আলোচনা করতেন—আমি বাবার গা ঘেঁষে বসে অবাক হয়ে শুনতাম। আমি বাবাকে প্রায়ই বলতাম "বাবা তুমি এই অত বই এত মন দিয়ে পড়ো!" আমার বিস্ময়ের সীমা থাকত না। ছুটির দিনে বাবার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ ঝাড়বার জন্য বা গোছানোর জন্য ডাক দিলে আমাদের কী আনন্দ। পরম উৎসাহে কবিতা, দর্শন, নাটক বা ইতিহাসের বই ঘাঁটাঘাঁটি করতাম তিনভাইবোনে। কখনো কখনো বাবা আমাদের নিয়ে যামিনী রায় ও ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলির কাচ পরিষ্কার করতেন—সেও আমাদের কাছে আনন্দোৎসব।

বাবা রোজই আমাদের তিন ভাইবোনকে দুপুর থেকে সন্ধ্যেবেলা অবধি সঙ্গ দিতেন। কত কবিতা পড়ে শোনাতেন শেলী, কীটস, ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথের লিপিকা

ও ক্ষণিকা থেকে। সন্ধ্যেবেলা বাবা রেকর্ড বাজাতেন বাখ, বেটোফেন, মৎসার্ট, শুবার্ট কিংবা ভাগনার। আমার বাবার মতো ভাল রেকর্ডের সংগ্রহ তখনকার কলকাতায় বোধ হয় চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারো ছিল না। কতবার বাবার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের লেক টেম্পল রোডের বাড়ি গেছি নতুন রেকর্ড আনতে বা শুনে ফেরত দিতে। বাবা রোজ সন্ধ্যেবেলা একবার রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হয় গড়িয়াহাট পর্যন্ত বা সাদার্ন এভিনিউ ধরে লেক পর্যন্ত হাঁটতে যেতেন। কতবার বাবার হাত ধরে আমিও হেঁটেছি—গল্প করতে করতে। বাবার সঙ্গে দ্রুতগতিতে পা মিলিয়ে চলা—তা ছিল আমার কাছে এক পরীক্ষার মতই কঠিন। এমনিভাবে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে কতবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও রাজশেখর বসুর বাড়ীও গেছি। এঁরা দুজনেই আমার পিসেমশাই হন। বাবার সঙ্গে সুধীন দত্ত'র বন্ধুত্ব তো কিংবদন্তিপ্রায়। আমি বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছি কি দারুণ চোস্ত ইংরাজিতে দুজনে সাহিত্য আলোচনা করেছেন। রাজেশ্বরী কখনো-বা অসাধারণ ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন বাবাকে ও বাবা তাই নিয়ে লিখেছেন অপূর্ব কবিতা! রাজশেখর ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু, কিন্তু ওঁর বিদ্রূপগুলি ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত, বোঝাই যেত না যে উনিই আমাদের প্রিয় লেখক পরশু-রাম। উনি বাবা-মাকে বিশেষ ভালবাসতেন, কয়দিন দেখা না হলে বাবাকে চিঠি দিতেন। দোতলায় বসে থাকতেন—শিল্পী যতীন সেনের মুখোমুখি, কিন্তু একটিও কথা বলতেন না দুইবৃদ্ধ নিজেদের মধ্যে। অথচ দুজনেই বাবার সঙ্গে গল্পে নিমগ্ন হয়ে যেতেন, আমি চুপচাপ মজা করে ব্যাপারটি লক্ষ্য করতাম। খুব মনে পড়ে রাজশেখর বসুর রোগশয্যায় যখন বাবার সঙ্গে যাই, উনি কিরকম খুঁটিয়ে মায়ের ও আমার ভাইবোনের খবর নিয়েছেন, আশ্চর্য হয়েছি আমি ওঁর চেতনা দেখে। কতবার উনি ওঁর বানানো যন্ত্রপাতি দেখিয়েছেন আমাকে, বাবা খুব গর্বভরে বলতেন "সবাই তো জানে না ন' জামাইবাবু কত বড় বৈজ্ঞানিক।" ওঁর বসবার আসনের পাশের দেয়ালে উৎকীর্ণ করা ওঁর একমাত্র কন্যা ও জামাতার মর্মরমূর্তি—যাঁরা একই দিনে মারা যান।

আমরা সারাক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতাম কবে আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি হবে। তখন বাবা আমাদের সারাদিন কবিতা পড়ে শোনাতেন, আমাদের সঙ্গে ব্রীজ বা দাবা খেলতেন। তাছাডা শিল্পপ্রদর্শনী বা গানের আসর বা পশ্চিমী মার্গসঙ্গীতের কনসার্টে যেতাম তো সারা বছর ধরে। গ্রীষ্মে বাবাকে বেশী কাছে পেতাম বলে আমার মনে হত আমরা যেন আনন্দের স্রোতে ভাসছি। কখনো প্রদোষ দাশগুপ্তর বাড়ী ভাস্কর্য দেখতে যাওয়া কখনোবা গোপাল ঘোষ বা নীরদ মজুমদারের বাড়ি

চিত্রকলা দেখতে যাওয়া ছিল আমাদের দৈনন্দিন ঘটনা। পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়ের বা ঋত্বিক ঘটকের শুটিং দেখতে যাওয়া ছিল আমাদের এক আনন্দময় ঘটনা। কত ভাল বাংলা সিনেমার প্রিমিয়ার শো-তে যে আমরা যেতে পেরেছি সে তো বাবারই সুবাদে। শানুপিসী আমাদের স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন আর নিজেও আর্ট কলেজে শিখতেন। আমাদের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে রিখিয়া যেতেন ও আমি পাশে বসে কত স্কেচ করা দেখেছি। কমলকুমার মজুমদারও ছিলেন আমাদের সবার প্রিয়—উনি ললিতকলা আকাদেমীর জন্য বাবাকে লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করে দিতেন। যখন কমলকাকা নীচে থেকে "বড়বাবু" বলে হাঁক পাড়তেন, আমরা ছুটে যেতাম ওঁকে স্বাগত জানাতে, উনি অভিনয় করে আমাদের দারুণ ভূতের গল্প বলতেন। বাবাকে অনেকবার পাতিপুকুরের বাড়িতে দয়াময়ী কাকীমার শতেক রান্না এমন সাড়ম্বরে খাইয়েছেন কমলকাকা—তেমন করে' বোধহয় কোনো রাজাও খাওয়াতে পারত না।

প্রতি সন্ধ্যেবেলাই বাবা হেঁটে ফেরার পর জমে উঠত বিরাট আড্ডা—তাতে বাবার কবিবন্ধুরা ছাড়াও যোগ দিতেন নবযুগ আচার্য, অশোক সেন, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, আশিস্ বর্মন, অসীম রায়, সমীর দাশগুপ্ত, সত্যকাম সেন, ধৃতিকান্ত লাহিড়ী ও সত্যেশ চক্রবর্তী যিনি পরে ১৯৫৭ সালে আমার জামাইবাবু হন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের পুরো পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রিখিয়ার সূত্রে। সৌমিত্র চ্যাটার্জি, আলোক সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, শান্তিকুমার ঘোষ, প্রণব মুখোপাধ্যায়ও প্রায়ই বাবার কাছে আসতেন সাহিত্য আলোচনা সূত্রে। প্রায় প্রতি রবিবার সকালে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তিদি আসতেন—বাবার সঙ্গে ব্রেখট ও অন্য নাটক নিয়ে তুমুল আলোচনা চলত আর আমি তখন শাঁওলীর সঙ্গে গল্প করতাম, খেলতামও। একবার তৃপ্তিদি-রা যখন ঢাকা যান তখন শাঁওলী সাতদিন আমাদের বাড়িতেই ছিল। বহুরূপীর সমস্ত নাটক আমরা যে কতোবার করে' দেখতাম! আর কী যে ভাল লাগত শম্ভু মিত্র'র বিভাব নাটক ও অসাধারণ সুন্দর কবিতাপাঠের আসরগুলি।

সবচেয়ে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল অরুণ মিত্রদের সঙ্গে। টুসি ও গোগোল ছিল আমার নিজের ভাইবোনের মতো। যখন ১৯৫৯ সালে এলাহাবাদ চলে যান অরুণ মিত্র কর্মসূত্রে তখন আমাদের কী ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল। পরে আমরা এলাহাবাদে ওঁদের বাড়ী বেড়াতে যাই।

হীরেন মুখার্জির পরিবারের সঙ্গেও আমাদের ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠতা, তেমনি ছিল অন্নদাশঙ্কর রায় ও ক্ষিতীশ রায়ের পরিবারের সঙ্গে। তাঁদের পুত্রকন্যারা আমাদের প্রিয় বন্ধু বা বান্ধবী। খুব ছোট্টবেলায় অন্নদাশঙ্কর রায় যখন বাঁকুড়ায় পোস্টেড ছিলেন তখন

বাবার সঙ্গে ট্রেনে যেতে গিয়ে আমরা দু-এক স্টেশন বেশী চলে যাই। তাই আমাদের দু'বোনকে নিয়ে ঠাট্টা করে উনি ছড়া লিখেছিলেন "ইরা ইরা ইরাণী" আর "তারা তারা তাতার"। সে-ছড়া খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ায় আমাদের খুব লজ্জা হয়। তখন আমাদের অনুরোধে বাবাও একটা মজার ছড়া লিখে পাঠালেন অন্নদাশঙ্কর রায়কে।

বাবার সূত্রে আমরা কত বড় বড় কবি শিল্পী চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গ পেয়েছি। তার মধ্যে সত্যেন বসুকে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের "জেঠু" বলে। বাবা সর্বদা জেঠুর কাছে সব ব্যাপারে পরামর্শ করতে যেতেন আর আমরা কে কোন বিষয় পড়ব, তাও জেঠুই ঠিক করে দিতেন। ১৯৫৭ সালে আমার মা ১৭ বছর পর স্কুল ছেড়ে বিশ্বভারতীতে পড়াতে গেলেন, তখন আমিও শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনমাস জেঠুর কাছে রইলাম—পরে আবার পুজোর ছুটিতে ও ক্রীসমাসের ছুটিতে ওঁর কাছে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সত্যেন বসু তখন উপাচার্য—ওঁর বাড়ি থেকে রোজ বিকালে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাবাও ভেবেছিলেন চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকবেন, রবীন্দ্রচিত্রকলা নিয়ে গবেষণা করবেন। কিন্তু বাবাকে দেখতে এত জনসমাগম হল পুজোর ছুটিতে যে, বাবা ভয় পেয়ে শান্তিনিকেতন ছেড়ে রিখিয়ার বাবুডিতেই বাড়ি ভাড়া করলেন সারা বছরের জন্য। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে দিদির বিয়ে হয়ে গেল বিশাল ঘটা করে—বাবার মত কবিমানুষের পক্ষে ঐ বিপুল আয়োজন করা কী যে দুরূহ হয়েছিল এখনও তাই ভাবি।

বাবার সঙ্গে আমার এমন একটা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে যেই সঞ্জিত আমার নতুন বন্ধু হল, অমনি তাকে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। বাবা পরে একান্তে ডেকে বল্লেন "সঞ্জিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাল, কিন্তু কখনো বিয়ে করার কথা ভাবিস না, তুই কষ্ট পাবি।" আর বলেছিলেন আমি চাই না তুই রাস্তায় রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিস্। সবসময় বন্ধুদের ডেকে এনে বাড়িতেই গল্প করবি।" বাবার কথাগুলি আমি সবসময়েই মনে রাখতাম। যদিও প্রায়ই সঞ্জিতের সঙ্গে অন্য জায়গায় দেখা করতে হতো, আর শেষ অবধি তাকেই বিয়ে করলাম ১৯৬৩ সালে।

আমাদের বাড়ীতে সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব ছিল ২রা শ্রাবণ বাবার জন্মদিনের দিন। সারাবাড়ি গোলাপে, রজনীগন্ধায় ভরে যেত—কত রকম সন্দেশ, কত বন্ধুবান্ধব আসতেন। অর্ঘ্য সেন বা সুচিত্রা মিত্র কখনো বা গীতা ঘটক সন্ধ্যেবেলা ঘরোয়া আসরে গান শোনাতেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে বাবার মুখটা আরো সুন্দর হয়ে উঠত। মনে পড়ে ১৯৫৯ সালে বাবার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন মনীন্দ্র রায় ও অন্যান্য কবিরা—বালিগঞ্জ

ফাঁড়িতে মুখার্জিদের বাড়িতে। দেবব্রত বিশ্বাস সেদিন অসাধারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, শম্ভু মিত্র'র গলায় বাবার কবিতাপাঠ এখনও আমার কানে লেগে আছে, আর নিখিল ব্যানার্জি বাজিয়েছিলেন সেতার—ঠিক যেন পূজার মতো ক'রে। তারপর আরো অনেক সংবর্ধনা সভায় বাবাকে সম্মান জানানো হয়েছে কিন্তু ঐদিনটি আমার মনে চিরজাজ্জল্যমান।

১৯৬২ সালে যখন আমি এমএ পাশ করে অশ্রুসাগরে ভাসতে ভাসতে আসানসোলের কলেজে চাকরী নিয়ে চলে যাই নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে, বাবা খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। শিল্পী হবার সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলী দিয়ে আমি অধ্যাপনার জীবন বেছে নিলাম বলে বাবা হতাশই হয়েছিলেন। কিন্তু বাধা দেননি। ১৯৭২ সালে পূজোর ছুটিতে আসানসোলে মাঝরাতের মিথিলা এক্সপ্রেসে কিছুতেই বাবার কামরা খুঁজে পেলাম না রেলওয়ে কর্মীদের গাফিলতির দরুণ। ভোর পাঁচটায় জসিদি স্টেশনে নেমে বাবার সেই অসাধারণ সুন্দর চেহারাটা দেখেই ছুটে জড়িয়ে ধরলাম। বাবা আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন "কাল সারারাত তোর জন্য জেগে বসে ছিলাম।" শুনেই আমার দুচোখে নামল জলের ধারা। তারপর রিখিয়ার অপূর্ব নিসর্গ সৌন্দর্য দেখেই মন জুড়ালো আমাদের।

১৯৬৩ সালে যখন সজিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, বাবা সযত্নে নিমন্ত্রিতের তালিকা করেছেন, গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে ডেকে বৈদিক বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমার বিয়ের রেজিষ্ট্রি হবার সময় সাক্ষী দিয়েছেন তিনজন বিরাট ব্যক্তি—যামিনী রায়, সত্যেন বসু ও আমার শ্বশুরমশায় অতুল বসু—আর বাবা নিজে তো ছিলেনই। বাবার মতো বড় কবিকে এত সাংসারিক কাজ করতে হয়েছে আমার জন্যে—আমার খুব লজ্জা হয়। বাবা এত গোছানো মানুষ ছিলেন অথচ খুব ভুলো মনও ছিল তাঁর। প্রায় রোজই ব্যাঙ্কের চেক্ লিখতে ভুল হত, হয় তারিখ নেই নয়ত টাকার অঙ্ক লিখতেই ভুল হ'য়ে গেছে। তাই নিয়ে আমরা বাবাকে খুব হাসিঠাট্টা করতাম। বাবার সঙ্গে আমার এমন একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ছবি আঁকা নিয়ে, কবিতা পড়া নিয়ে—তার উপর বাবা কবিতা লিখলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে কপি করে দিতাম। অনুবাদ করতে বসলে বাবাকে অভিধান খুলে শব্দ বেছে নিতে সাহায্য করতাম। বাবার সঙ্গে গাছপাতার একটা বৈজ্ঞানিক ও বাংলা নামের তালিকা করেছিলাম—সেটা এখনও আমার কাছে আছে। মনে পড়ে কাঞ্চনফুলের নাম বোহিনিয়া বলতেই বাবা উদ্বুদ্ধভাবে লিখে ফেলেন সেই প্রিয় কবিতাটি—"আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া।" আমাকে নিয়ে বাবার চিন্তার কথা প্রকাশ পায় একাদশী বলে' কবিতায়—

"তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
ছেয়েনা ফেলে রে তোর আনন্দ তন্ময়
অঙ্গের লাবণি আর বিহঙ্গম মন।"

বাবা আমাকে নিয়ে লিখেছিলেন আরেকটি গভীর মমতাময় কবিতা "বামী"—যার প্রতি ছত্রে আমার জন্য বাবার দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে—

…"সেই ভীতু মেয়ে বামী
কি করে যে তারাভরা আকাশের
অসহায় আকুল বিস্ময়ে
অন্ধকার ছাতে
জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন…
যেখানে নির্মাতা স্রষ্টা শিল্পী কবি
প্রেমী অবজ্ঞেয়
ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বামী কি করে যে বড় হবে
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে
আঁচল-আড়ালে দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কি করে যে ভাবি
কি করে সে অন্ধকার দীপান্বিত করে দেবে
আরেক বৈভবে॥"

আমার এই প্রিয় কবিতা দুটি যা সর্বদা আমার সঙ্গে রাখি বাবার আশীর্বাণী ব'লে—সে দুটিকে অরুণ সেন রিথিয়া বিষয়ক কবিতা বলে আলোচনা করেছিলেন—তাতে দুঃখ পেয়েছি, তবে প্রতিবাদ করিনি কারণ প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

যখন আমি ১৯৬৫ সালে বস্টন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাই আর সজ্জিত যায় কাছাকাছি এম. আই. টিতে অর্থনীতিতে ডক্টরেট করতে, তখন বাবা অমিয় চক্রবর্তীকে এমনভাবে লিখে দেন যে—বস্টনে প্রথম থেকে শেষদিন পর্য্যন্ত উনি ও হৈমন্তী মাসীমা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেন। ওরা সত্যি যেন আমাদের "বাবা মা" হয়ে

গেছিলেন ঐ চার বছরের জন্য। ওঁদের বাড়ীতে কিছু ভাল রান্না হলে আমাদের দিয়ে যেতেন আর নিমন্ত্রণ যে কত খাইয়েছেন তার শেষ নেই। সমীর দাশগুপ্তও সেই সময় বাবার চিঠি পেয়ে আমাকে ডলার দিয়ে সাহায্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—অথচ আমিও তেমনি স্বাধীন চেতা—সমানে বেবী সিটিং করে পড়াশোনা ও সংসার চালিয়ে দিলাম ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। তারপর আমি ফেলোশিপ পাবার পর সঞ্জিতও ১৯৬৬ সালে পি এইচ. ডি. শেষ করে গাড়ী কিনে ফেলল তখন বাবা চিঠিতে খালি লিখতেন টি. এস. এলিয়টের প্রিয় জায়গা নিউহ্যাম্পশায়ার দেখে আসতে, রবার্ট ফ্রস্টের রকপোর্ট প্রিয় জায়গা দেখে আসতে। আমেরিকান বন্ধুরা অবাক হয়ে যেত ওদের দেশের কবিদের বাসস্থান সম্পর্কে বাবার এত গভীর জ্ঞান দেখে। বাবার বন্ধু স্টিফেন ও এলইস হে আমাদের কনকর্ডে নিয়ে গেলেন, সেখানেই তো আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। আমার দিদি জামাইবাবুও সপুত্র ১৯৬৭ সালে নর্থ ক্যারোলাইনা ও ক্যানাডায় গিয়েছিলেন। আমার ভাই জিষ্ণু স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে সস্ত্রীক ১৯৬৬ সালে চলে গেছে সাসেক্সে পি. এইচ. ডি. করতে। সেই সময় তিন-চার বছর বাবা মা একলাই ছিলেন কলকাতায়, কখনো বা রিখিয়ায়।

১৯৬৬ সালে বাবা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান ও তারপরেই পান নেহরু পুরস্কার। বহু সংবর্ধনা সভা বাবাকে খুব ক্লান্ত করে কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক স্বভাবের মানুষ। বাবা রাশিয়াও যাননি ঐ কারণেই। এমন কি ই. এম. ফরস্টার বারবার বাবাকে কেম্ব্রিজ যাবার নিমন্ত্রণ জানান—তাও বাবার যাওয়া হল না পাশপোর্ট ও ভিসা করার ঝামেলার ভয়ে। ১৯৬৯ সালে যখন আমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলাম—বাবাকে মনে হল কী বিষন্ন ও নিঃসঙ্গ। বাবার বন্ধুরা একে একে সবাই চলে গেলেন বা তাঁরা অসুস্থ বলে আর দেখা হয় না। বিশ্বরাজনীতির অবস্থাও ঘোরালো। ১৯৬৯ সালেই বাবা চাকরীজীবন থেকে অবসর নিলেন ও রিখিয়ায় গিয়ে অনেকদিন রইলেন। ১৯৭১ সালে আমি ও সঞ্জিত দিল্লীতে থাকতাম—বাবা-মা সেখানেও এলেন—আমার ছেলে সায়ন্তন বাবার তৃতীয় নাতি তখন মাত্র দু' বছরের শিশু। বাবা ভীষণ শিশু ভালবাসতেন—জমে উঠল দুজনের ভাব। বাবা ওকে ডাকতেন "গাব্‌লু" বলে, ফোলাফোলা গালের জন্য। সঞ্জিত বাবাকে গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে বাবা বললেন তুগলকাবাদ নিয়ে যেতে। সেখানে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখার শেষে বাবার উদাসী দুটি চোখের দৃষ্টি আজও আমার চোখে ভাসে। বটুককাকার (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হওয়ায় বাবা কী খুশী—বটুককাকা যথারীতি গানে গল্পে আমাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে আমরা হঠাৎ দিল্লী ছেড়ে কলকাতা চলে আসি চিরকালের মত। পাপ্পা ও নবনীতা একদিন গল্পচ্ছলে আমাকে বলল "তোমার বাবা এবার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবেন।" আমি তখনি বাবাকে গিয়ে বলতেই বাবা আমাকে তিরস্কার করে বললেন "তোর কোনোদিনও আক্কেল হবে না। আমি কাউকে জানি না, চিনি না, আমাকে জ্ঞানপীঠ কেন দেবে? কিন্তু তার অল্প দিন পরেই যখন সত্যিই বাবা জ্ঞান-পীঠ পুরস্কার পেলেন তখন বাবার কী করুণ অবস্থা। সর্বত্র সংবর্ধনার ধুম্ পড়ে গেল, সব কাগজে ছবি বেরোতে লাগলো। বাবার খুব অস্বস্তি ও লজ্জা। আমরা কিন্তু ভাই বোনেরা খুব ফুর্তি করতে করতে বাবার সঙ্গে দিল্লী গেলাম ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। স্টেশনে নেমেই ফুলের মালায় মালায় বাবার মতন দীর্ঘকায় মানুষই চাপা পড়ে যাচ্ছিলেন সত্যি—ফুলের মধ্য দিয়ে বাবার করুণ দুটি চোখ জেগে আছে—আমার ভারি কষ্ট হচ্ছিল। তবে বটুককাকা বিজ্ঞান ভবনে "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ" সুর দিয়ে ও কবিতাপাঠ দিয়ে এত অসাধারণ সুন্দর একটি ট্যাব্‌লো করলেন—বাবার মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। করণ সিং যখন বাবার পুরস্কারটি দিয়ে গড়গড় করে বাবার কবিতা মুখস্থ বলতে লাগলেন, বাবার মুখটি স্মিত হয়ে উঠলো।

১৯৭২এ অক্টোবরে বাবার হার্নিয়া অপারেশন হয় ও তারপর ক্রমশঃ স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে।

মা বাধ্য হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে রিখিয়ায় যে বাড়িটি কেনা ইতিমধ্যে হয়েছিল সেখানে বাবাকে নিয়ে চলে গেলেন ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে। তখন থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বাবা মা রিখিয়াতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন—আমরা ছুটিতে দুবার কিংবা তিনবার বাবা মায়ের কাছে বেড়াতে যেতাম। ১৯৭৯ সালে দুই পুত্রকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে আমি রিখিয়া গিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি বাবার পায়ে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। বাবা স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে বললেন, "গন্ধরাজ ফুল তুলতে গিয়ে পড়ে গেছিলাম।" পরে ডাক্তারদের কথায় জেনেছি সেই পতনই ছিল সম্ভবতঃ বাবার প্রথম সেরিব্র্যাল অ্যাটাক। এর আগেই ১৯৭৫ সালে পড়ে গিয়ে বাবার ডান হাত ভেঙে যায়। ১৯৭৯ সালের শেষে আমার ভাই জিষ্ণু বাবাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে এল। তবুও এল সেই ভয়াবহ দিন ১৯৮০ সালে অক্টোবরে—যখন আমরা সবাই বাবাকে নিয়ে রিখিয়া যাব ভেবেছিলাম। ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাকের ফলে বাবাকে বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল। সেখানে শারীরিক উন্নতির পর বাবা বাড়িতেই ছিলেন আমার মা ও নার্সদের পরিচর্যায়। ১৯৭৭ সালে বটুককাকা মারা যাওয়ায় বাবা যেমন বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন, তেমনি

১৯৮২ সালে নীরুকাকা হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাবা নির্বাক যন্ত্রণায় একেবারে মূক হয়ে গেলেন। অথচ তার কয়েকদিন আগে নীরুকাকা বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন বাবা, নীরুকাকার হাত চেপে ধরেছিলেন, জোরে হেসেছিলেন, দুজনেই!

৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় (১৯৮২) আমি ও মা উমা সেহানবিশের বাড়ি দেখা করতে গেছিলাম সন্ধ্যেবেলা! বাড়ি ফিরতেই বাবার হঠাৎ রক্তবমি হল। তারপর দুদিন সমানে রক্তক্ষরণ চললো, ডাক্তাররা নাকে নল লাগিয়ে রক্ত নিষ্কাশন করে দিচ্ছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় বাবার মুখ হয়ে উঠেছিল করুণ—মাঝেমাঝে আমাদের হাত চেপে ধরছিলেন অসহায়ভাবে। ডাক্তাররা বললেন পেটে কোথাও তন্তু ছিঁড়ে গেছে হয়তো বা কিন্তু আর কিছুই করার ছিল না। ৩রা ডিসেম্বর বিকেলবেলা নিজের খাটটিতে শুয়ে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখতে দেখতেই যেন বাবা চলে গেলেন কী শান্তভাবে—গোধূলি লগনই তো ছিল তাঁর প্রিয় সময়। আমাদের বাড়ী লোকজনে ভরে গেল। আমি পাগলের মত কাঁদছি দেখে অন্নদাশঙ্কর রায় ও সমীর দাশগুপ্ত আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে গেলেন, "তুমি শুধু মনে রেখো তুমি কত বড় মানুষকে বাবা হিসাবে পেয়েছিলে।" আমার মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানতে চায়নি যতক্ষণ না সেই শ্রাদ্ধের মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে পারলাম "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা"। অরুণ সেন, দিব্যেন্দু পালিত ও আরো অনেকে আমাদের অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলেছেন কেন আমরা বাবার মৃতদেহ পরদিন সকাল অবধি ধরে রাখিনি সবাই দেখবেন বলে', কেন বাবার শবযাত্রা করিনি সারা কলকাতাময় ইত্যাদি। সত্যিই আমার বা দিদির বা মায়ের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় এতদূর পেঁাছেছিল হঠাৎ বাবাকে হারিয়ে, সারা পৃথিবী মনে হয়েছিল অন্ধকার,—আমাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না শবযাত্রার বন্দোবস্ত করা। আমার ভাই জিষ্ণু তখন আমেরিকায় বসে শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছিল। ডাক্তাররা বারবার বলছিলেন যে সম্পূর্ণ রক্ত নিষ্কাশন না করলে বাবার দেহ একদিনও রক্ষা করা যাবে না। আমাদের তখন সত্যিই মনে হয়েছিল হ্যামলেটের মতন—How weary stale flat and unprofitable seem to be all the uses of this world. এখন তাই একমাত্র জীবনের সান্ত্বনা খুঁজি বাবার জন্মদিন পালনের আনন্দোৎসবের মধ্যে—আমার মনে তো এখনও বাবা তাঁর সেই সদাহাস্যময় মুখে অসাধারণ সুন্দর চোখের চাউনিতে জ্বলজ্বল্ করছেন—তাঁর কাব্যপাঠ ও তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে যাই—আমার বাবার আনন্দময় সান্নিধ্যে।

বিষ্ণু দে

আমাদের বাড়িতে গান শোনা

আমাদের একটি দম দেওয়া গ্রামোফোন ছিল। আর বেশ কিছু রেকর্ড। আমার সাত-আট বছর বয়স থেকে এই রেকর্ড গুলোর দেখাশোনা আমিই করতে শুরু করি। হিসেব রাখা কিন্তু বেশ শক্ত কাজ ছিল। কারণ: প্রথমতঃ রেকর্ডগুলোর পরম্পরা একটা বড় জিনিষ ছিল। ৭৮ স্পীডের রেকর্ড। একটা করে ক্লাসিকাল সোনাটা, সিম্‌ফনি, বা কোয়ার্টেট (১) শেষ হতে চার, পাঁচ, ছয় কখনো কখনো আরো বেশি সংখ্যক রেকর্ড লাগতো। আমাদের একটি অপেরা ছিল—ডন গোভান্নি, মৎসার্ট এর। সেটি আজও মনে আছে—তেত্রিশটি রেকর্ড ছিল। বাবার হাত থেকে রেকর্ড পড়ে গিয়ে কখনো ভেঙ্গে গেছে সেই কারণে কিনা মনে নেই তবে রেকর্ড চালানোর দায়িত্ব ছিল অনেকসময় আমার, অনেকসময় মায়ের ওপর। আরেকটা হিসাব প্রায় আমিই রাখতাম। সেসময়ে দুরকম পিন্ চালু ছিল—স্টীল ও ফাইবার। আমাদের অধিকাংশ রেকর্ড স্টীল নিড্‌লে চালানো নিষেধ ছিল। ফাইবার নিড্‌ল্ আসতো বিদেশী বন্ধুদের দাক্ষিণ্যে—জন আরউইনই প্রধানত এর যোগান দিতেন। জন তখন ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিঅমের ভারতীয় অংশের কীপার। সমস্ত মিলে হিসেব রাখাটা বেশ একটা শক্ত ব্যাপার ছিল।

এরপর শুরু হল গ্রামোফোন মেরামতের পালা। গ্রামোফোনের স্প্রীং কেটে গেলে দোকানে বহু দেরী হয় বলে এইসময় আমাদের দ্বিতীয় গ্রামোফোন কেনা হয়। জোগাড় করে দেন চঞ্চলবাবু (চট্টোপাধ্যায়)। আমরা বড়ো চোঙওয়ালা গ্রামোফোনটা নীচে রাখতাম—বসার ঘরে। ছোটটা থাকতো বাক্সে—বড়োটা সারাতে গেলে বা রিথিয়া

গেলে বেরোতো। রিখিয়া আমাদের পরিবারের এক অযৌক্তিক নেশা—দেওঘরের কাছে এই গণ্ডগ্রামে কিছুই নেই। না হিমালয়, না নদী, না সমুদ্র বা মন্দির। লোক-জনও সুবিধের নয়—এক সাঁওতালরা ছাড়া। সাঁওতালদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আমাদের বা অন্যান্য "বাবুদের" নেই। এহেন জায়গার প্রতি আমাদের একটা রক্তের টান দেখছি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। যাই হোক- এই রিখিয়ায় একমাস গেলেও ছোটো গ্রামোফোন যেত ও বহু রেকর্ড। সাধারণতঃ একশো। বাছতাম আমিই—ওজন কম হতো না। গ্রামোফোনটা যেতো একটা কাঠের বাক্সে।

আমার প্রথম গ্রামোফোন মেরামত—আমার মনে আছে মুঙ্গেরে আমার ছোট পিসিমার বাড়িতে। একমাস গান না শুনে আমরা (বাবা ও আমি) হাঁপিয়ে উঠে গ্রামোফোনটা সারাই। তারপর লং প্লেয়িং রেকর্ড হবার পর ইলেক্‌ট্রিক গ্রামোফোন সারানো—বিশেষত: stylvo ঠিক করা বহু করেছি। এই ব্যাপারে বাবার উৎসাহ ছিল খুবই বেশী। বলাই বাহুল্য বাবাই আমার গ্রামোফোন সারানোর "ক্ষমতা"-টা তাঁর বিশেষ বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে জানান (আমরা তাঁকে জেঠু বলতাম)। তার ফলস্বরূপ আমার অনেক রকম লাভ হয়েছিল। তার মধ্যে একটা হল যাদবপুরে জেঠুর ছাত্রতুল্য শ্যামাদাস বাবুর (চট্টোপাধ্যায়) কাছে পড়তে যাওয়া। তারপর শেষ অবধি অবশ্য আমি ইলেক্‌ট্রনিক্স না পড়ে তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যাতেই ঢুকে পড়ি। তাতে এইটুকু লাভ নিশ্চয়ই হয়েছে যে, বুঝতে পারি ভারতবর্ষে জেঠুর মতো কোনো বিজ্ঞানী আর জন্মান নি। আরেকটা জিনিষও খুব ভালো করে বুঝেছি—সেটা হল উনি কি ধরণের মানুষ ছিলেন যাতে করে একই সঙ্গে খুব সহজেই দিক্‌পাল বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন দত্ত—বিষ্ণু দের মতো সাহিত্যিকদের সঙ্গেও সমানে কথা বলতে পারতেন। এ যেন রূপকথার জগতে জি. পি টমসনের সঙ্গে টি এস এলিয়ট বা রিচার্ড ফাইনমানের সঙ্গে ওয়ালেস স্টিভেনের বন্ধুত্ব।[২]

জেঠু অবশ্যই খুবই সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। ফলে জেঠুর কাছ থেকে অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। শব্দতত্ত্ব ও সঙ্গীতের থিওরী নিয়ে অনেক গল্প :

তার মধ্যে একটা Alain Danielou-র "শ্রুতি-হারমোনিয়ম"। সে এক বিরাট যন্ত্র—তাই জন্যেই বোধ হয় চলেনি। জেঠু এস্রাজ বাজাতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিছুটা খুশীমতো - কিছুটা demonstration. সেই সময় শান্তিনিকেতনে তৃণাদি ও তাঁর এক জার্মান বান্ধবী Schoenberger অনেক বাজনা শুনিয়েছেন। Schoen-berger রবীন্দ্রনাথের piano-তে keyboard practice করতেন রোজ সকালে। তিনি বেটোফেনের প্রথম দশটা পিয়ানো সোনাটা শোনান—যা তখনকার দিনে রেকর্ডিং ছিল

না। বাখ্ এর Well Tempered Clavier এর প্রথম আটটি প্রেল্যুড ও ফিউগও তাঁর কাছেই প্রথম শুনি।

ঘটনাচক্রে গ্রামোফোন সারানো থেকে ফিজিক্সে এসেছি বলেই হয়তো আমার কাছে শ্রোতা হিসাবে সঙ্গীতচর্চা ও পেশাহিসাবে বিজ্ঞানচর্চা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমার ধারণা আমার বাবার কাছে কবিতা লেখা ও "গান শোনা" একই রকম ছিল। "গান শোনা" বলতে অবশ্য সবরকম সঙ্গীতের কথাই আমরা বুঝি।

উদাহরণ হিসাবে ১৯৮০ সালের পর বাবা যখন খুবই অসুস্থ (এমনকি লোককে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ, কথা তো বলতে পারতেন না "হ্যাঁ, না" ছাড়া) তখনও গান শুনলে তালে তালে আঙুল ঠোকা বা চুপচাপ থাকা থেকে বোঝা যেত গান তাঁর চৈতন্যের খুব গভীরের বস্তু।

সঙ্গীতে বিষ্ণু দের পছন্দ-অপছন্দ ও কবিতায় তার প্রভাব

বাবা কি কি শুনতেন এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সঙ্গীত তাঁর কবিতাকে কিভাবে স্পর্শ করেছে।

আমার মনে হয় বাবার সবচেয়ে পছন্দ ছিল বেটোফেনের শেষ কোয়ার্টেটগুলি। এই কোয়ার্টেটগুলি তাঁকে স্পর্শ করেছে অত্যন্ত গভীরে—যেভাবে এলিয়ট স্পর্শ করেছে। কারণটাও একই—শিল্পের সবচেয়ে উঁচু ধাপে তা নৈর্ব্যক্তিক, কিছুটা শুষ্ক ও কঠিন। একটি কবিতায় এই পর্যায়ের একটি কোয়ার্টেটের নাম পাওয়া যায়, 'পাঁচ প্রহর' কবিতার শেষাংশে

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, রাত্রি কোজাগর বিনিদ্রের,
স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
কোয়ার্টেট যেন কোন অতন্দ্রিত
অপরাজেয় গ্রোসে ফুগের গান।
রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও, মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত।
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান—
পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত।

এখানে দেখা যায় একটা ব্যক্তিগত থেকে নৈর্ব্যক্তিক উত্তরণ—প্রকৃতি ও চণ্ডালিকার মতো মা ও মেয়ে ঃ

"বাছারে বুঝি না তোর ভাষা।"

কিংবা

"ওগো মা, আমাকে বলো দেখি তাকে ঘরে
আনব কি বলো থাকব প্রহর জেগে"

যেন প্রায় সাঁওতাল কবিতা বা ছত্তিশগড়ী কবিতার সহজ সঙ্গীতময়তা থেকে আসে হঠাৎ এই বেটোফেনের শেষ পর্যায়ের ভিন্নতর কাঠিন্য।

প্রসঙ্গতঃ ফিউগ জিনিষটা কি? বাবাকে কৈশোরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাব ছিল ছোট্ট—প্রেল্যুড হল একটা জানালার ফ্রেম ও ফিউগ তার বাইরের দৃশ্য। দৃশ্য স্তরে স্তরে অবাধ বিস্তীর্ণ! এই ব্যাখ্যা বাবার নিজস্ব কিনা জানিনা। তবে খুব জুৎসই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ্রোস ফিউগ বেটোফেনের B Flat major quartet op. 130 এর শেষ অংশ ছিল। পরে তিনি এটিকে আলাদা করে op. 133 করে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য op. 130 ও op. 133 আমাদের রেকর্ড ছিল Busch String Quartet এর। পরে লং প্লেয়িং রেকর্ড বেরোলে অন্য দলের বাজানো অনেক ভালো ভালো রেকর্ড আমরা শুনেছি। বাবার পছন্দ হয়নি। জিজ্ঞাসা করতে বাবা বলেছে Busch-দের বাজানোর মধ্যে একটা আর্তি ছিল। সেটা পরের কারো নেই—টেক্‌নিকাল যোগ্যতার দিকে তাঁদের মন অনেকটা চলে গেছে। পরে Busch-দের বাজানো রেকর্ড লং প্লেয়িং-এ রূপান্তরিত হয়েছে। আর একটি গ্রুপের কিছু রেকর্ড এরকম খোঁজ করে বাবা পরে কিনেছিল—লং প্লেয়িং এ রূপান্তর। কোর্তো, থিবো ও কাসাল্‌স্। এঁদের Archduke Trio ছিল—সেটির রূপান্তর আমরা পাইনি। Archduke Trio বাবার মতে Late Beethoven এর শুরু। তারপর নাইন্থ সিমফনি, Missa Solemnis পিয়ানো সনাটা op. 106 (Hommerklavier) op. 110, op. 111 ও শেষ কোয়ার্টেটগুলি বাবার খুব প্রিয় ছিল।[৩] Op. 109 পিয়ানো সনাটা আমাদের ছিল না—থাকলে নিশ্চয়ই খুবই ভালো লাগতো। আমার বিশেষ দুঃখ থেকে গেলো ডিজিটাল বা কমপ্যাক্ট ডিস্ক বাবা কখনো শুনতে পাননি। শুনলে কি খুশীই না হতেন।

বিষ্ণু দের কবিতায় সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আমি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করতে বসিনি। তবে প্রভাব যে খুবই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কি কারণে এই প্রভাব? তার

জবাব এই কটা কবিতার লাইনে তোলা আছে (অক্টোবর দিনগুলি : নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)—

পৃথিবীর গান শত মুখে মুখে উন্মুখর
মাটির শিকড়ে গন্ধের শত মূর্ছনা
ঘ্রাণে ঘ্রাণে একা অর্কেস্টায় বুক ভরে দেয় দিনরাত !
কখনো তীক্ষ্ণ ভিয়োলা সবুজ ধানে
কখনো বেয়ালা পাকা ধানে বাজে তীব্র মুক্ত ছন্দে
ঘাসের চেলোয় মেলায় দোটান মন্দ্রে

ফুলের তেরোটি মুরজ মুরলী থেকে থেকে পশে মর্মে
তারি মাঝে মাঝে এক পশলার মৃদঙ্গ বাজে হাতপায়,
আমাদেরও সব ডাক দিয়ে যায় পৃথিবী ঐক্যতানো।

বিষ্ণু দের কবিতায় সঙ্গীতের স্বরূপ ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বিশ্ববিদ্যাবৈদ্যকৃতি[৪] অর্থাৎ ডক্টরেট জাতীয় থিসিসে আলোচনা করা চলে কোন্ কবিতা সাঙ্গীতিক বিচারে প্রাচ্য, কে বা প্রতীচ্য। কিন্তু কেতাবে কেতাবে ধুলো জমে, প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে রাধা ভোলে আপন কাহ্নুরে।

বাবার ও আমাদের সকলের ভাগ্য বলতে হবে—একজন প্রকৃত সঙ্গীতকার ডক্টরেট না করে সুর দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিষ্ণু দের কবিতায় সঙ্গীতের স্বরূপটি কি। এই মানুষটির সঙ্গে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত জড়িয়ে দিল আমাদের মনে—তারই প্রকাশ বারেবারে বাবার কবিতায় দেখা যায়। কবিতায়ই মানুষটির সঙ্গে আলাপ করুন :

আলেখ্য

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

যে চঞ্চল, যে সুদূর তাকে চির করেছে পিয়াসী,
যে বুভুক্ষু খুঁজে ফেরে তীব্র নবজীবনের গান,
যে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় চিত্ত তার অশান্ত প্রয়াসী
যার সুর মর্মরিত অহর্নিশি তন্নিষ্ঠ হৃদয়ে তার ;
কারণ শুনেছে সে যে গান আকাশে পাতিয়া তার কান

গম্ভীর পৃথিবী যার মৃদঙ্গে নিয়ত বলে : ধ্যান ভাঙো ধ্যান
একটি আকাশ ভেঙে হাজার আকাশ, হাজারের এক নীলাকাশ ;

সেই স্বপ্নে সে ভরেছে উদগীথউত্থিত তার ধ্যান।
তার মনে পদ্মার প্রবল ঢেউ, শুভ্র চরের প্রসার,
খরপ্রাণ কলকাতার দুরন্ত বিস্তার,
আড্ডা সভা ধর্মঘট মিছিল উৎসব গণনাট্য গান
মন্বন্তর দেশভঙ্গ অনাচার জীবিকার ক্লান্তি আর কাজের উল্লাস
ঢেউ তোলে কবিতায় গানে যৌথ শিল্পের বিন্যাসে।
আজও তার শান্তি নেই দিল্লী মফস্বলে পাহাড়ে জঙ্গলে
হরিণের নৃত্যভঙ্গে, পাখির বিস্ময় আর বিচিত্র সম্ভার
আনে না মনের তৃপ্তি, নানা চর্চা, মানবিক নানা কৌতূহলে
আজও তার মনের পরিধি ভাঙে জীবনের দ্বিধান্বিত ব্যাসে
নানান বেসুরে, বেতালের কূট ভেদাভেদে, অসম্পূর্ণতায়।
তাই সে কবিতা লেখে খাতায় বা ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো পাতায়
তারপরে ভুলে যায় মমতায় লিখেছে যা এবং হারায়।

সম্পূর্ণের ঘোরে তাই খেয়ালী সে কবি সে উদাস
আত্মভোলা মজার মানুষ সে আর্টিস্ট যাকে বলে,
আশেপাশে মানুষের চিত্ত কিংবা বিত্তশূন্যতায়
সে ভাবে মনের আর জীবিকার জীবনের
স্বর্ণযুগ এল বুঝি সকলের ঘরে সচ্ছলতা অবকাশ
উষার আলোয় পাহাড়ে শিখরে নদীতে সন্ধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীতে পূর্ণ আনন্দনির্ঝরে।
তাই নিজেই কবিতাকার সুরস্রষ্টা আর
প্রেরণায় ইতিহাস খুঁজে পায় নিজ কণ্ঠস্বরে
রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণমূর্তিদানে।
কারণ সারাটা দেশ গান করে তার মনে

কবিত্বের বিভোর-ভুবনে
ধ্রুপদে টপ্‌পায় কীর্তনে বাউলে ভাটিয়ালী কাওয়ালীতে
জারীগানে সারিগানে যাত্রায় গাজনে তুলসী দোঁহায়
সবেতে সে আগমনী শোনে আর গায়।
তাকে আমি বহুকাল জানি।

দেখেছি কেমন তার মন খোঁজে গানে দেশের মানুষে
পাখিতে হরিণে জলে বা পাহাড়ে পদ্মার গঙ্গার পাড়ে
কারণ প্রকৃতি এই নিসর্গসুন্দরী আর বীণাপাণি
তার মনে একটি প্রতিমা—সতীই পার্বতী
একটি পৃথিবী একটি আকাশ
তাই ধ্যানের মানুষ হয় হাজার মানুষ, ভিড়;
নবজীবনের গান হ'য়ে ওঠে সঙ্ঘের আরতি,
কারণ না হ'লে তার সুদূরপিয়াসী মন
কোটি কোটি মানুষের প্রত্যহের মর্মভেদী কান্নায় কান্নায়
প্রতিবাদে কিংবা প্রতিবাদের অভাবে সারাক্ষণ
কেবলই ব্যাহত হয় নিঃসঙ্গ-নিবিড়;
সে চায় সবাই একটি চঞ্চল সুদূরপিয়াসে
প্রত্যহ করুক গান
জীবনেরা ডানা পাক্ জীবিকার বন্দী পায়ে পায়ে।
তাই সে চঞ্চল তাই বিধুর উদাস কবি সুরস্রষ্টা গীতকার,
তাই তার গায়কিতে আধুনিক চৈতন্যের আতত সম্ভার।
আমাদেরই প্রতীক সে প্রিয়জন, অসহায়, আত্মভোলা,
সকলেই তাকে ভালোবাসে॥

গান তো অনেক দিন শুনছি। এই গানের এক ক্ষুদ্র অংশ মানুষের গলায়। তারো এক ক্ষুদ্র অংশ কবিতায় সুর দেওয়া। তবু অনেক কবিতার সুর দেওয়া শুনেছি। তিনটে খুব অসাধারণ মনে হয়েছে: ১। শুবার্টের Erlkonig (গোয়টের কবিতা; বড় রাজা) ২। ব্রেজিলের ভিলা লোবোসের আট নম্বর বাখিয়ানা। সেখানে আটটি চেলোর সঙ্গে একটি মেয়ের গলায় ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার একটি কবিতার অপূর্ব

সমন্বয় আছে। ৩। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর দেওয়া বাবার কবিতার সুর, বিশেষতঃ "স্বর্ণলতার ঝোপে জ্বলে যায় জোনাকী পোকা / রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে থাকুক কয়েক খোকা।" কবিতাটা একটু ঝাপসা, আধা আলো আধা অন্ধকারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সুরটি ঠিক যেন তারই হাত ধরে চলেছে। এই গানগুলি লেখার সময় আমরা সামনে ছিলাম। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এখানে তারই বর্ণনা করতে বসেছি।

১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে জ্ঞানপীঠ অনুষ্ঠানে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের হিন্দী অনুবাদে সুর দেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আমাদের বটুকাকা। তার বছর খানেক আগে থেকে চলে তার প্রস্তুতি। সাধারণত এই সব অনুষ্ঠানে নাচ বা ঐরকম কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে। জ্ঞানপীঠ ব্যবস্থাপকরা ঠিক করলেন অমলাশঙ্করকে বলবেন একটি অনুষ্ঠান করতে। বাবাকে জানাতে বাবা তাদের লেখেন—দিল্লীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র থাকেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখুন না কিছু একটা করা যায় কিনা। এর আগে বটুকাকা রামলীলায় সুর দিয়েছেন—শবরীর গান আমাদের কানে বাজছে। টেলিভিশনে রামায়ণের গান শুনে আর ঐ রামলীলার কথা ভাবলে প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে—কি মূর্খ আমরা! এদেশে হীরেমুক্তো ছড়িয়ে আছে—তা ফেলে গোবর কুড়োই আমরা। সে কথা থাক। কবে ভারতবাসীর ভাগ্য হবে—কে ঐ রামলীলার সুর উদ্ধার করে কবে গাইবে ভগবান জানেন।

আমাদের রোমাঞ্চিত করে শুরু হল স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত। একটি মঞ্চে কয়েকটি চৌকো কাঠের ব্লক। তারি ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে মেয়ে। তারা এক একজন কয়েকটি করে লাইন পড়ছে—ঐ চৌকো কাঠের ব্লকে দাঁড়িয়ে প্রায় নাচের ভঙ্গীতে। আর তাদের গলাগুলি নানা সুরে মেলানো—পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার মতো। বাখের মত কাউণ্টার পয়েন্ট—সাযুজ্য সঙ্গীত ধ্বনি।

তারপর আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম এবং বাবা, মা ঐ জ্ঞানপীঠের টাকায় রিথিয়ায় বাড়ীতে অনেক সংস্কার করে সেখানে থাকতে চলে গেলেন। বটুকাকা এলেন কলকাতায়। আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন—গল্প করতেন ঝাড়গ্রামের কাছে "ফার্ম" এ ধান কেমন বাড়ছে। গান শোনাতেন আমাদের প্রাচীন হারমোনিয়মে। বটুকাকার নিজস্ব হারমোনিয়ম ছিল না। এরই মধ্যে একদিন গাইতে গাইতে ঐ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত সুরগুলি বাংলায় গাইলেন। তারপর উৎসাহিত হয়ে আরো কিছু সুর দিলেন। এইসময় অর্ঘদা (সেন) আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। একদিন অর্ঘদা এই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে কিছু তুললেন। অর্ঘদার একটা কথা আমার ভুলোমনেও গেঁথে আছে। বটুকাকা সুর দিয়েছিলেন "সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাশয়"। অর্ঘদা বলে-

ছিলেন মহাশয় টহাশয় যে গানের কথা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে জানা ছিল না। শেষে ১৯৭৫ সালে ১৮ই জুলাই বাবার জন্মদিনে আমরা অর্ঘদা ও বটুকাকাকে নিমন্ত্রণ করি। ঐদিন দুজনে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত টেপ করেন। বটুকাকা কবিতা পড়েন ও দুজনে গানের অংশগুলি করেন। ঐ টেপটি তোলে আমাদের বন্ধু মনু ভাটিয়া—যে এখনও হায়দ্রাবাদে ডিফেন্স ল্যাবে চাকরি করে। তার সেই টেপ-এর কপি ধরে ধরে প্রসূন দাশগুপ্তর সুনির্দেশনায় ও সুভাষ চৌধুরীর উৎসাহে ইন্দিরা গোষ্ঠী এই গান রেকর্ড করেছেন। বটুকাকার পড়া ঐ কবিতা ধরে ধরে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, সুধীর মিত্র কবিতা পড়েছেন। বটুকাকার নবজীবনের গান, ঝঞ্চার গান, রামলীলা, লম্বকর্ণপালা, পাহাড়-নদী-মানুষের গান—কোনো কিছুরই রেকর্ড নেই। কয়েকটির স্বরলিপি আছে শ্রীজ্ঞান ঘোষ ও প্রসূন দাশগুপ্তের কল্যাণে—সুভাষ চৌধুরী মহাশয় তা 'ইন্দিরা' থেকে প্রকাশ করে সারা বাংলা দেশের কাছে ধন্যবাদার্হ। বাকীগুলি আছে শুধু আমাদের স্মৃতিতে।

কি লেখা যায় সঙ্গীতের বিষয়ে যাতে কাগজে কলমে তাকে বোঝা যায়? কিছুই না। তেমনিই কবিতায় সঙ্গীত কিভাবে আসে তাও লেখা যায় না—একমাত্র গান করে শোনানো যায়। তার জন্য দরকার অনেক কিছু—একজন গায়কই যথেষ্ট নয়। একজন সুরকারই যথেষ্ট নয়। চাই একজন যে নিজে কবি ও কবিতার অংশীদার। এই জন্যই বোধ হয় বটুকাকার সুর বিষ্ণু দের কবিতার অন্তর স্পর্শ করেছে। অন্যান্য সুর, অন্যান্য রেকর্ড (যেমন জর্জবাবুর অসাধারণ গলায় গাওয়া "কোথায় যাবে তুমি" বা অজিত পাণ্ডের জোরালো গানগুলি) শুনে ভালো লাগতে পারে, মজা লাগতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ আমার মতে তা কখনোই বটুকাকার সুরের স্তরে পৌঁছতে পারে নি।

"এ নরকে / মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই / যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়, প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়। দুঃস্বপ্ন কেবল" এ সুরের কোনো জুড়ি নেই।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিষ্ণু দে—দুই কবি, দুই বন্ধু শুধু নয়। দুজনে দুজনের কাছে দারুণ এক উদ্দীপনা। 'মেঘে ঢাকা তারার' সুর শুনতে বাবাকে বারবার একই সিনেমা দেখতে ছুটে যেতে দেখেছি। কতবার দেখেছি একই দিনে বটুকাকা একাধিকবার গেয়েছেন "আমি চঞ্চল হে"। বটুকাকার সব সুর যদি হারিয়ে যায় তাহলে বিষ্ণুদের কবিতার এক ভাষ্য হারিয়ে যাবে। এই কথাটি আমি রক্তের ভেতর থেকে বুঝতে পারি। বাবার কাছে শেখা আমার সঙ্গীত চেতনার একটি মূল কথা এটা। এই বলে আমার বক্তব্য আজ শেষ।

টীকা

(১) সোনাটা মানে ছোট গান। এর আসল মানে সঙ্গীতের একটি রূপায়ণ যেখানে দ্রুত ও বিলম্বিত অংশ একটি অপরটির পরে আসে। এই সোনাটা ফর্মের উল্টো ইটালীয়ান ফর্ম যেখানে বিলম্বিত প্রথম, দ্রুত পরে। সোনাটায় সাধারণতঃ চারটি মুভমেণ্ট থাকে—সাধারণত একটি বা দুটি যন্ত্রের জন্য লিখিত। ব্যতিক্রম আছে। টীকা-৩ দ্রষ্টব্য। কোয়ার্টেট চারটি যন্ত্রের জন্য লেখা। সাধারণতঃ এই চারটির দুটি বেহালা একটি ভিয়োলা ও একটি চেলো। সিমফনি পুরো অর্কেস্ট্রার জন্য—১০ থেকে ১০০টি যন্ত্রের। কোয়ার্টেট ও সিমফনির প্রথম স্রষ্টা জোসেফ হাইডেন।

(২) জি. পি. টমসন ও রিচার্ড ফাইনমান—উভয়েই নোবেল পুরস্কার জয়ী পদার্থ-বিদ্। ওয়ালেস স্টীভেন্স এর নাম করলেই একটা কবিতার কথা মনে হয় যার সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একটি বিশেষ ঢঙের খুব মিল আছে—Variations. দুটি বিখ্যাত Variation বাবার খুবই প্রিয় ছিল: Variations on a theme by Goldberg —সঙ্গীতকার যোহান সিবাস্টিয়ান বাখ ও Variation on a theme by Diabelli —সঙ্গীতকার লুডউইগ ভন বেটোফেন। এছাড়া দুটি Variation এর কথা মনে এলেও তারা আসলে ফিউগ পরম্পরা: বাখের Musical offering ও Art of the Fugue. বলাই বাহুল্য এই দুটিও বাবার খুবই প্রিয় ছিল। স্টীভেন্সের কবিতাটা বাবার অনুবাদে:

শ্যামা পাখী দেখার তেরোটি ধরন

বিশটি তুষার-পাহাড়ের মাঝে
সচল বস্তু শুধু
শ্যামা পাখীটির চোখ।

আমি তো ছিলুম তে-মনা,
যেন বা একটি গাছ
যে গাছে তিনটি শ্যামা।

এক ঝাঁক শ্যামা শরতের হাওয়া ঝাপ্‌টে চলে।
এ যেন বা এক গাজনের ছোটো পালা।

একটি পুরুষ ও একটি নারী
তারা একই।
একটি পুরুষ ও একটি নারী এবং একটি শ্যামা
একই।
কে জানে কোন্‌টি বেশি পছন্দ করি—
শব্দরূপের বাহার অথবা
বক্রোক্তির বাহার,
শ্যামার শিসের মুহূর্তটুকু,
না কি ঠিক তার পরে।

হিমকণা ঢাকে বিস্তৃত বাতায়ন
বর্বর কাচে মোড়া,
শ্যামার ছায়াটি তাই কেটে কেটে ওড়ে
এদিক থেকে ওদিক।
মেজাজটা যেন রাগরূপমালা
ছায়ায় ছায়ায় এঁকে যায়
অজ্ঞাত স্বরলিপি।

হে হ্যাডাম্‌-বাসী কৃশকায় পুরুষেরা
সোনালি পাখীর স্বপ্ন দেখছ কেন?
কেন যে তোমরা দেখ না কেমন শ্যামা
তোমাদের আশেপাশে ঐ মেয়েদের
পায়ে পায়ে ঘেঁষে ঘোরে?

আমি জানি বটে মহৎ স্বরের মাত্রা
এবং স্বচ্ছ অমোঘ ছন্দবৃত্ত;
কিন্তু এও তো জানি
ঐ শ্যামা পাখী জড়িত আমার জানায়।

শ্যামা পাখী যবে চোখের বাইরে উড়্‌ল
বহু বৃত্তের একটিতে যেন
টেনে গেল সীমারেখা।

সবুজ আলোয় উড়ন্ত এক ঝাঁক
শ্যামা দেখে বুঝি চীৎকার ক'রে ওঠে
স্বরমাধুরীর যত হীরামালিনীরা।

কাচের গাড়িতে চেপে সে বেড়াল
কনেক্‌টিকট্ ঘুরে।
একদা, বিদ্ধ হ'ল সে একটা ভয়ে
যখন সে ভুলে সাজপোশাকের ছায়াটাই
একঝাঁক শ্যামা ভাবল।

নদীটা এবার সচল।
শ্যামা এইবার উড়বে।

সারাটা বিকেলই সন্ধ্যা।
ঝ'রে যাচ্ছিল তুষার কেবলই
ঝরবেও আরো তুষার।
শ্যামা বসেছিল
দেওদারটির বাহুতে॥

(৩) বেটোফেনের শেষ পিয়ানো সোনাটা op. 111 তে দুটি মাত্র মুভমেণ্ট। সাধারণতঃ চারটি মুভমেণ্ট থাকে সোনাটায়। দুটি মুভমেণ্টে শেষ সোনাটা, কেন—তার একটি অপূর্ব জবাব আছে টমাস মানের ডক্টর ফাউস্টাস বই-এ। বাবার এটি খুব পছন্দ ছিল। আমাদের বাড়ীর বইটিতে পাতার উপরে লেখা ও পাতার পাশে right চিহ্ন ✓ দেওয়া আছে বাবার নিজের হাতের লেখায়। বাবার কথায় আমি খানিকটা এই

অংশের জন্যই বইটি পড়ি। পাশ্চাত্য সংগীতের অনুশীলনে এরকম কাব্যময় ও মনোগ্রাহী লেখা আর কোথাও নেই। এখানে Variation এর কথাও আছে (দুই নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য) ও কবিতার কথাও যথেষ্ট আছে। পাঠক ধৈর্য ধরে মানের ডক্টর ফাউস্টাস পড়বেন মজা পাবেন।

(৪) নান্নুরে আমরা একবার গিয়ে দেখি সেখানে একটা আফ্রিকান বাওবাব গাছ! বাবা কবিতা লেখেন এবং সেই কবিতাতে 'বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য' কথাটির উদ্ভব।

নান্নুরে

জাদুঘরে পরিষদে তর্ক চলে ছাতনা বা নান্নুরে
কোথায় চণ্ডীর পীঠ বা কোন চণ্ডীদাস!
বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে খেতাবে—
আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে,
পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কানুরে,
প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ।

দেখেছি গড়খাই-পারে দীঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী তাকিয়ে ভাস্বর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর।
এদিকে কাঁপন লাগে পাপড়ির আঙুলে সুরে সুরে,
প্রেমের ফাঁসিতে খু'লে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ বিষ্ণু দে

[চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় তিরিশের কবি। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের একটিও বই বাজারে সুলভ নয়। বাংলা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম এক সংগ্রামী পত্রিকা 'সাহিত্যপত্রের' প্রথম সম্পাদক তিনি। বিষ্ণু দে. সমর সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কমল কুমার মজুমদারের আবিষ্কারক। গ্রীক ও লাতিন জানা বাঙালীদের মধ্যে তাঁর নাম আলোচনায় আসে। দান্তের মৌলিক কাব্য তিনি পড়েছেন। সাম্যবাদী কবিদের শিবিরে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। 'পরিচয়', 'অরণি', 'অগ্রণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। বয়োবৃদ্ধ এই কবি এখনও নিয়মিত অধ্যয়ননিমগ্ন। তবে লেখালেখি এখন ছেড়ে দিয়েছেন। বিষ্ণু দে সম্বন্ধে লিখতে তাঁর প্রবল অনীহা। হয়তো স্মৃতি প্রতারণা করতে পারে। তাই এই সাক্ষাৎকার।]

প্রশ্ন : বাংলা সাময়িক পত্রিকা জগতে, 'পরিচয়', 'অরণি', 'অগ্রণী'র মত পত্রিকা থাকতে আপনারা আবার 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ করতে গেলেন কেন ?

উত্তর : সেই সময়ে যে সব মার্কসবাদী কাগজ ছিল সে সব কাগজ ঠিক সাহিত্য মানদণ্ডে উৎকর্ষ বাড়াতে পারছিল না, সেই কারণে বিষ্ণু দে কেবলমাত্র সাহিত্য বিষয়ক একটা কাগজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

প্রশ্ন : এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনায় বিষ্ণু দের সঙ্গে আর কে কে ছিলেন ?

বিষ্ণু দের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী। তিনি বললেন, 'পরিচয়' থাক রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে, সেই সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক আর একটি পত্রিকা হোক। এই সময় বিষ্ণুবাবুর অনুরোধে স্নেহাংশু আচার্য 'লোকায়ত' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত

নিলেন। বেন্টিক স্ট্রীটে পত্রিকা কার্যালয়ের জন্য ঘরের ব্যবস্থা হল। আমরা পত্রিকার নামে প্যাড ছাপিয়ে ফেললাম। নিয়মিত কাজকর্ম স্বরু করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। কিন্তু হঠাৎই স্নেহাংশু আচার্য পশ্চাদ-পসরণ করলেন। 'লোকায়তের' আত্মপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুবাবু, আমি, আরও চার পাঁচজন মিলে 'সাহিত্যপত্র' বার করে ফেললাম।

প্রশ্ন : পত্রিকা তো বার করলেন, টাকা পয়সা আর্থিক দায় দায়িত্বের ব্যাপারটা কেমন করে মেটালেন ?

উত্তর : আমরা কয়েকজন মিলে চাঁদা দিয়ে কিছু টাকা তুললাম। কিছু বিজ্ঞাপন বাবদ সংগ্রহ হত। তবে কাগজ চালাতে গিয়ে আর্থিক দায়িত্বের অনেকটাই আমাকে বহন করতে হত।

প্রশ্ন : 'সাহিত্যপত্র' কেমন কাগজ ছিল ?

উত্তর : 'সাহিত্যপত্র' আদৌ ভালো কাগজ ছিল না। তবে কিছু কিছু লেখা কখনও সখনও উন্নতমানের হত। যেমন বিষ্ণু দে, শান্তি বসু, পরে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির লেখাগুলি। এ'দের লেখা সব সময় উঁচু মানের হত।

প্রশ্ন : কবিতা লেখালেখিতে আপনাদের সময়ের কবিরা কি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন ? এ ব্যাপারে আপনার মত·········

উত্তর : আমি তো মনে করি নজরুলের মতো আমরা একটাও কবিতা লিখতে পারি নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের কবিতা অনেকের মনে একটা স্পন্দন এনে দিয়েছিল। আমরা যাঁরা নিজেদের মার্কসীয় মনে করি, মনে হয় সে রকম কোনো কবিতা আমরা লিখে উঠতে পারি নি। সুকান্ত খানিকটা, সুভাষ সামান্য লিখেছে। তবে সত্তর-একাত্তরে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রেরণা সঞ্চারী, বাংলায়, ভালো কবিতা লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন : কবি বিষ্ণু দে-র রাজনৈতিক মতাদর্শের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছিল ?

উত্তর : বিষ্ণু দে কোনাদিনই পার্টি সদস্য ছিলেন না। তবে নিজেকে তিনি কম্যুনিস্ট—স্ট্যালিনপন্থী মনে করতেন।

প্রশ্ন : বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র যোগ তো বিরাট ও ব্যাপক ছিল। আপনি তো এ অভিমত সমর্থন করেন ?

উত্তর : বিষ্ণু দে-র আগে আমদের মধ্যে কারুরই ইউরোপের বা সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলির আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। বিষ্ণু দে-ই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। বিষ্ণু দে ইউরোপীয় সব ভাষা জানতেন না, কিন্তু সাহিত্যবোধ ছিল অসাধারণ। সেই বোধ থেকেই তিনি ইউ-রোপীয় সাহিত্য অনুধাবন করতেন।

প্রশ্ন : ছবি ও গান ছিল বিষ্ণু দে-র অন্যতম প্রিয় বিষয়। তাঁর কবিতায় ছবি ও গানের কি কোনো স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল ?

উত্তর : ওঁর কবিতায় ছবির প্রভাব পড়েছিল কি না বলতে পারব না, তবে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য গানের প্রভাব তাঁর কবিতায় তো পড়েছেই। তবে এলিয়ট যেমন বেঠোফেন আত্মসাৎ করেই 'ফোর কোয়ার্টেট রচনা করেছিলেন, বিষ্ণু দে ঐ রকম প্রভাবিত লেখার চেষ্টা করেছিলেন এবং আংশিক সফল-তাও পেয়েছিলেন বলেই আমার মনে হয়।

প্রশ্ন : এ কালের জনৈক সমালোচক বলেন অনেকের মতে কবি বিষ্ণু দে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা বিরোধী। আপনার এ ব্যাপারে অভিমত কি ?

উত্তর : সেই লেখকের লেখাটি পড়লে হয়তো একটা মতামত দেওয়া যেতে পারত। কি কারণে বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছেন হয়তো ধরতে পারতাম। যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সোভিয়েত বিপ্লবের পর সাহিত্যে শিল্পে প্রবর্তিত হয় এবং অনেকাংশে সাফল্য লাভ করে। সে সময় তার প্রভাব অন্য দেশেও হয়েছে। আমাদের দেশে তীব্র কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সময় চল্লিশ দশকে গণনাট্য সংঘ মারফৎ কয়েক বছরের জন্য অন্ততঃ এর সাফল্য লক্ষণীয়। লেখাটি পড়ে আবার ভাবা যেতে পারে। আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কী তা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। য'ারা ছিলেন এবং সার্থক লেখক শিল্পী হয়েছেন তাঁরা আলোচনা করলে এই বাক্যাংশটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে। এ বিষয়ে সুধী প্রধানের লেখা অনেক আলোকপাত করবে।

বিষ্ণুবাবুর কবিতা পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ওপরই ভিত্তি যদিচ তাঁর কবিতা পড়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বোধ আসে না। কথাটা স্ববিরোধী হলেও সত্য, যেহেতু বিপ্লবের চেয়ে বিপ্লবের মননই তাঁর কাব্যে প্রকাশিত, সেই সূত্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিচার বিশ্লেষণ তথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কাব্যমণ্ডিত হয়ে আসে—

ম্লান সজ্জা বাহু, আর কদলী দলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে (জন্মাষ্টমী)

কিংবা সংকুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে চক্রধর মেঘ
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।

প্রশ্ন : বিনয় ঘোষ তাঁর 'সাম্প্রতিক বাংলা কাবিতা' প্রবন্ধে বলেছিলেন—এঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে দেশের বাকি সব মানুষকে এঁরা অপগণ্ড ও মূর্খ ভাবেন, সুতরাং এঁরা যা কিছু রচনা করেন তা শুধু গোষ্ঠীর সভ্যদের জন্য।—এমন মন্তব্য সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছে করে—

উত্তর : আমার মনে হয় বিনয় ঘোষের এই উক্তি নিয়ে কোনো তর্কবিতর্কের সৃষ্টি কেবলমাত্র সময় নষ্ট।

প্রশ্ন : সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতার' সমালোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে বলেছেন—সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে একথা কি খাটে ?

উত্তর : সমর সেন সম্বন্ধে বিষ্ণু দে-র এই উক্তি আমি পড়ি নি। সমর সেনের কবিতা যখন প্রথম বেরোয় তখন বিষ্ণু দে সেগুলিকে inane and jejune বলতেন। পরে 'কয়েকটি কবিতায়' রিভিউ প্রবন্ধে বলেন যদিও তাঁর গদ্যছন্দ বাংলা ভাষায় এনেছে নতুন রূপ কিন্তু তাঁর কাব্য রবীন্দ্রানুগ রোমান্টিক। অর্থাৎ রোমান্টিসিজম্ এড়াতে না পারার জন্য তাঁর কবিতা অংশত ব্যর্থ, অথচ গদ্যফর্ম দৃঢ়। মনে হয় একটু ভুল বুঝেছিলেন। সমর সেন সৌখীন ছিলেন না—

মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন
নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা।

অবশ্য পরে তিনি একটি ভালো রিভিউ করেন। সমর সেনও সেই রিভিউ পছন্দ করেছিলেন।

প্রশ্ন : কম্যুনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণু দে-র এলিয়ট প্রীতি যে কোনো মানুষকে সন্দিগ্ধ করে তোলে। আপনার ধারনায় এটাকে কি বলা যায় ?

উত্তর : এলিয়টের মীমাংসা হল নতুন ধর্ম বোধে—at the still point of the turning world—অডেনের নতুন নীতিবোধ এলিয়ট প্রভাবমুক্ত—'Oh love, the interest itself in thought-less heaven. বিষ্ণু দে-র সময়ে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার গ্লানি আর কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে আসা এবং তারই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষায় বর্ধিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের নবজাগরণ এবং নবজাগরণের জন্যই যা কিছু মনন। নবজাগরণ শব্দটি enlightenment হিসেবে ব্যবহৃত। একটা নতুন শিক্ষা মধ্যবিত্তরা পেলেন ইংরেজদের কাছ থেকে, তারই ফল রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিষ্ণু দে। এ বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন, আমার নতুন করে কিছু বলবার নেই। আমার মতে এলিয়টের ভক্ত হলেও বিষ্ণু দে-র আত্মসচেতনতা এলিয়টমুখী নয়, অডেনমুখীও নয়। স্বভাবতই যে দেশে তাঁরা বর্ধিত সেখানে আত্মসচেতনতার রূপ আলাদা হতে বাধ্য। তাঁদের কাব্যনীতি, কাব্য পরিকল্পনাও আলাদা। বিষ্ণু দে দেখেছেন :

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ় ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার (অন্বিষ্ট)

তাঁকে তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই কাব্যনীতি, কাব্য পরিকল্পনা করতে হয়েছে। এই নীতি ও পরিকল্পনা কতটা সার্থক হয়েছে তা পাঠকই বিচার করবেন।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের বিষ্ণু দে-র কবিতাকে 'দুর্ভেদ্য কেল্লা' বলাটা উত্তরকালের পাঠকদের প্রতি অবিচার হল না কি ?

উত্তর : প্রধানত বিষ্ণু দে কাব্যে একটা নতুন ফর্ম নিঃসন্দেহে আনতে চেষ্টা করেছিলেন, পেরেও ছিলেন, যদিও তা জীবনভিত্তিক না ও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত এই ফর্ম ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেন নি।

প্রশ্ন : মার্কসবাদ মূল্যায়নের নানা ব্যাপারে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে অনেকেরই বিরোধ হয়েছিল। আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো মতান্তর হয়েছিল ?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কম্যুনিস্ট পার্টিতে জনযুদ্ধের ব্যাপারে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটেছিল। আমিই এর একমাত্র বিরোধিতা করেছিলাম।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—পত্রিকা সম্পাদক, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃষিকেশ ঘোষ

বাল্যসাথীর চোখে ঃ

প্রঃ আপনি তো বিষ্ণু দে-র নিকট আত্মীয়। থাকতেন কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে। বিষ্ণু-বাবুর ছেলেবেলার কথা কিছু বলুন।

উঃ বিষ্ণু দে আমার সম্পর্কে কাকা। ওঁরা থাকতেন ১৩নং কলেজ স্কোয়ার, ঠাকুমার বাড়ীতে। তবে আমাদের বাড়ীতে খুবই যাওয়া আসা ছিল। কিশোর বয়স থেকেই খুবই humourous ছিলেন। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম, গল্পগুজব করতাম। একটু বড় হয়ে যখন সব কলেজে পড়াশোনা করছি, তখন বেশিরভাগ সময় কলেজ স্কোয়ারে বাড়ীর সামনে বসে বেশ আড্ডা জমতো। সাহিত্য, রাজনীতি, গান এই সব ছিল আড্ডার বিষয়। ধীরেন বসু, নরেন বসুর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তো ওঁর ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। বিষ্ণু কাকার 'ছড়ানো সে জীবনে' তো ওঁর কথা আছে। স্কুল থেকে ফিরে আমরা ফুটবল খেলতাম। বিষ্ণু কাকা খেলতেন মোটামুটি ভালোই। তবে কলেজে পড়ার সময় আর খেলাধুলা করেন নি। পায়ের দোষ ছিল সম্ভবত।

প্রঃ গড়ের মাঠে খেলা দেখতে যেতেন কি? কল্লোল যুগের অনেক কবি সাহিত্যিক তো মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতেন।

উঃ না, আমরা তাঁকে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতে দেখিনি বা শুনিনি।

প্রঃ বিষ্ণুবাবুর ছাত্রজীবন কেমন ছিল?

উঃ পরীক্ষা দেব ফাস্ট হব এসব সংকল্প নিয়ে তিনি কখনো চলতেন না। যা হবার তাই হবে, এ রকম একটা ভাব ছিল। পরীক্ষা-হলে জানালা দিয়ে রোদ্দুর এসে গায়ে পড়ছে, অতএব রোদ্দুরে বসে পরীক্ষা দেব কী করে—পরীক্ষাই আর সেদিন দেওয়া হলো না। এইরকমই একটা mood ছিল তাঁর।

প্রঃ কলেজ জীবনে রাজনীতি করতেন কি ?

উ- রাজনীতির সংস্পর্শে সরাসরি কিভাবে এসেছিলেন বলতে পারবো না। তবে শরৎ বসু বিষ্ণু কাকার জামাইবাবু ছিলেন। তা ছাড়া কলেজে বিষ্ণু কাকার চেয়ে দু-ক্লাশে নিচে পড়তাম আমি। আমি পড়তাম প্রেসিডেন্সী কলেজে, বিষ্ণু কাকা সেণ্ট পলসে। ঠিক ছাত্র রাজনীতি করতেন কি না জানা ছিল না।

প্রঃ সাহিত্য চর্চার ঝোঁক, লেখালেখি এসব ব্যাপারে বিষ্ণুবাবুর উৎসাহ কিভাবে হোল ?

উঃ বিষ্ণু কাকা যে লেখালেখি করবেন তাঁর একটা tendency দাদামশাই মানে বিষ্ণু কাকার বাবা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, যখন যে বই দরকার দাদামশাই ওঁকে সে সব বই কিনে দিতেন। এখন যেখানে মনীষা গ্রন্থালয়, সেখানে ছিল গিরীন মিত্রের দোকান 'বুক কোম্পানী'। ঐ দোকান থেকে বিষ্ণু কাকার জন্য নানান বই আসত। তাছাড়া বাড়ীতে সাহিত্যের আবহাওয়া আসতেই পারে। রাজশেখর বসু ছিলেন বিষ্ণু কাকার জামাইবাবু। রাজশেখর বসু 'কচি সংসদে' বিষ্ণু কাকাকে নিয়ে একটা চরিত্র এঁকেছেন। পেলব রায়ই হচ্ছে বিষ্ণু কাকা।

প্রঃ কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে বিষ্ণু দে'র যাতায়াত ছিল নিশ্চয় ?

উঃ হ্যাঁ, কফি হাউজে বিষ্ণু দে বন্ধুবান্ধব নিয়ে যেতেন বৈকি ? বিষ্ণু দে'র সঙ্গে থাকতেন কবি সুধীন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, আরও অনেকে।

প্রঃ হোটেল রেস্টুরেন্ট এই সব জায়গায় আড্ডা ছিল নিশ্চয় ?

উঃ না, সে রকম আড্ডা খুব একটা দিতে দেখিনি। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই বেশি খেতেন না। সন্দেশের প্রতি বিশেষ লোভ ছিল। পেট খারাপের ভয়ে অনেক কিছুই খেতেন না।

প্রঃ সিনেমা থিয়েটারের প্রতি কেমন টান ছিল।

উঃ নাটক দেখতেন, বিশেষ করে বহুরূপীর, শম্ভু মিত্রের নাটক। সিনেমা দেখার খুব একটা আগ্রহ ছিল না।

প্রঃ গানের প্রতি দেখি বিষ্ণু দে'র ভীষণ আগ্রহ। যৌবনে নিশ্চয় গানের চর্চা করতেন ?

উঃ না। বিষ্ণুকাকাদের ১৩নং বাড়ীতে তেমন কোনো গানের চর্চা ছিল না। বিষ্ণুকা' classical music শুনতে যেতেন।

প্রঃ ছবির আগ্রহ জন্মালো কিভাবে ? ছবি আঁকার চর্চা কি বাড়ীতে ছিল ?

উঃ না, তেমন কোনো চর্চাতো ছিল না। তবে যামিনী রায়ের সংস্পর্শে এসে ছবির

ওপর অনুরাগ জন্মেছিল বলে শুনেছি। যামিনী রায়ের মত আর একজন বড়-মাপের মানুষের সঙ্গে বিষ্ণুকাকার বন্ধুত্ব ছিল, তিনি হলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বসু। বিষ্ণুবাবুর মাধ্যমেই আমার সত্যেন বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়।

প্রঃ বিষ্ণুবাবু তো ছাত্র জীবনেই শ্রীমতী প্রণতি দে'র সঙ্গে মেলামেশা মানে প্রেম করতেন? আপনারা সব জানতেন?

উঃ আমিই তো ফার্স্ট ম্যান জানতে পারি। আর জেনেই বাড়ীতে এসে বলে দিয়েছিলাম—বিষ্ণু কাকা একটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে, দেখলাম। কিন্তু বিষ্ণু কাকা ভারী মজার মানুষ ছিলেন। খুব হিউমারাস। নানারকম মজা করতেন। একবার কলকাতায় ভূমিকম্প হয়। আমাদের কেমিষ্ট্রি অধ্যাপক ভীষণ মোটাসোটা মানুষ। ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেঁচাতে লাগলেন—সরে যাও, সরে যাও। বিষ্ণু কাকা সেই দৃশ্য অবিকল নকল করে দেখাতেন, হাসাহাসি করতুম।

শুধু তাই নয়, আরো আছে। তখন বিষ্ণুকাকারা গোলাম মহম্মদ রোডে উঠে এসেছেন। একদিন পথে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম বাবা কেমন আছে? বিষ্ণু কাকা দুই আঙুল তুলে জবাব দিলেন—দুটি যমজ মেয়ে, বলেই হন্‌হন করে চলে গেলেন।

প্রঃ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী আর্টেমিস' যখন বের হয়, আপনাকে দিয়েছিলেন?

উঃ হ্যাঁ, আমি এক কপি পেয়েছিলাম। এই কবিতা বই প্রকাশের সমস্ত খরচা ছোট দাদামশাই মানে বিষ্ণু কাকার বাবাই দিয়েছিলেন।

দাদামশাই এর উৎসাহ না থাকলে বিষ্ণু কাকা দাঁড়াতেই পারতেন না। দাদামশাই ছিলেন ধীর, স্থির, নম্র, আস্তে আস্তে কথা বলতেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—পত্রিকা সম্পাদক, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধন সেনগুপ্ত

স্মৃতি ও সত্তার আলোয় বিষ্ণু দে

সত্যিই আমার সৌভাগ্য যে, আমিও কবি বিষ্ণু দে'র সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলুম। জীবনের শেষ পনেরো বছর যা আসলে কবির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময় সে সময়টাতেই তিনি আমায় তাঁর সান্নিধ্য দান করে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে ষাটের দশকের মধ্য ভাগে সুস্মিত অর্থাৎ কমরেড রেণু চক্রবর্তী এম পি'র ছেলে আমায় প্রথম নিয়ে যায় তাঁর কাছে। তাঁর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতেই মনে আছে ঝোড়ো বর্ষার এক সন্ধ্যায় প্রথম তাঁকে দেখেছিলুম। তিনি সাধারণত চুপচাপই থাকতেন। কিন্তু কিছু মনের মত শ্রোতা বা আলোচনার বিষয় পেলে সেই বিষ্ণু দে'ই রীতি মতো ক্লান্তিহীন। স্মৃতি থেকে মজার মজার গল্প বার করে এনে ততোধিক মজা করে সেগুলো তিনি অত্যন্ত নম্র ও মৃদু স্বরে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতেন। ঘরোয়া আড্ডার ক্ষেত্রে সহজেই সব্বাইকে আকর্ষণ করতে পারতেন তিনি। যে কারণে তাঁর বাড়িতেই চিরকাল, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রকর বা বুদ্ধিজীবীরা এসে জড়ো হতেন। আতিথেয়তায়ও বিষ্ণু দে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অভাবের সময়েও তাঁর বাড়িতে গেলে আপ্যায়নের ত্রুটি কেউ লক্ষ্য করেন নি। তাঁর বৈঠকখানায় আসতেন যামিনী রায়, সত্যেন বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন সহ বাংলার তথা বিশ্বের বহু জ্ঞানীগুনী ও বিদ্বৎজনেরা। পাশাপাশি নবীন কবি, লেখক, গায়ক বা রাজনীতিতে উৎসাহী মানুষের দলও কবির কাছে আসতেন। বহু বিষয়েই মত বিনিময় করতেন তাঁরা। ব্যবহার বা আতিথেয়তায় তিনি সমানভাবে প্রত্যেকের দিকে নজর দিতেন। বই পড়া আর গান শোনাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো নেশা। রেকর্ডে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সঙ্গীত সংগ্রহ ও তা শোনা বা মতামতের ব্যাপারে একদা বিষ্ণু দে'র মতামত ছিল

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পুস্তক ও রেকর্ড সংগ্রহশালাটিও অনেকের ঈর্ষার কারণ হতে বাধ্য। জীবনের মধ্য পর্বে এসেই সাম্যবাদী ধ্যানধারণার মধ্যে নিজের বিশ্বাসকে কবি মেশাতে পেরেছিলেন। ইয়োরোপের ধ্রুপদী সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত বা লোক-গাথা সম্পর্কেও তিনি ব্যাপকভাবে অনুধাবন করে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, ভারতীয় তথা বাঙালীর জীবনধারা ও ঐতিহ্য এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও লোকগাথা বিষয়েও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকি-বহাল।

অথচ তিনি কখনো বিদেশ যাত্রা করেননি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুবারই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে। সোবিয়েত ল্যাণ্ডস পুরস্কারের সুবাদে সোবিয়েত দেশ ভ্রমণের যে আমন্ত্রণ তাতেও তিনি সাড়া দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সুহৃদ্ এবং ভক্ত ছিলেন সারা বিশ্ব জুড়ে। বিশ্বের অন্যতম সেই সব ব্যক্তিত্বের আমন্ত্রণেও তিনি বিদেশ ভ্রমণে কদাপি উৎসাহী হননি। হয়তো স্বভাবের দিক থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ঘরকুনো। তবু সেই চল্লিশের দশকে বোম্বাইতে আই. পি. টি. এ'র মহা সম্মেলনে যোগ দিতে সদলবলে বেরিয়ে পড়েছিলেন কবি। আপাতদৃষ্টিতে লাজুক, কন্দর্প কান্তি চেহারার সুউচ্চ মানুষটির দেখা মিলত বাংলা নাট্যমঞ্চের সভাপতি হিসেবে উৎসবের শেষে কিংবদন্তী পুরুষ শম্ভু মিত্রের সহযোগী হিসেবে। আবার বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের পর্বে সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রকাশ্য প্রাঙ্গণে এই বিষ্ণু দে'ই উপস্থিত থেকেছেন বন্ধু দেবব্রত বিশ্বাস ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। আবার কখনো দেখেছি নব নির্মিত গোর্কি সদনে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সহ সোবিয়েত বিপ্লবের বর্ষপূর্তির ভি. আই. পি. পরিপুষ্ট উৎসবে—যেখানে তিনিই ছিলেন মধ্যমণি।

কবির অন্যতম ঘনিষ্ঠ ছিলেন অনেকেই। তবু বটুক দা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সমর সেন দীর্ঘকাল অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। সমর সেন তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত'তে বিষ্ণু দে বিষয়ে কিছু কটূক্তি পরবর্তীকালে করলেও বহুকাল তিনি কবির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও রাসবিহারীর মোড়ে কবির এক আত্মীয়ের বাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের প্রভাতী সমাবেশেও এসেছিলেন সমর সেন। এখানে বিষ্ণু দে'র দীর্ঘকালের অনুরাগী বন্ধু জন আরউইন দীর্ঘসময় বন্ধু কবি বিষ্ণু দে বিষয়ে স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। সমর সেনের সেই সভায় সারাক্ষণের সশ্রদ্ধ উপস্থিতি বিষ্ণু দে বিষয়ে পুনরায় তাঁর গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধারই পরিচয়। যদিও কবি বন্ধু অশোক মিত্র, আই. সি. এস, বা কবি পত্নী প্রণতি দের অনুরোধেও সমর সেন কিছুতেই সে সভায় মুখ খুলতে বা

কিছু আলোচনা করতে সম্মত হলেন না। অথচ বিষ্ণু দে'র কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে কবি সমর সেন চিরকাল শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। মনে আছে, বিষ্ণু দে'র স্মৃতির সংগ্রহটিও ছিল বিশাল। আর সে সব কাহিনীর সকৌতুক পরিবেশন প্রায় সকলকেই আকর্ষণ করত। প্রায়ই রাঙা দাদা অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়ে অনেক গল্প করতেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর আত্মীয়। যেমন বিষ্ণু দে'র আত্মীয়তা ছিল কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথমা স্ত্রী ছবি অথবা রাজশেখর বসুর সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এঁরা ছিলেন বিষ্ণু দে'র দীর্ঘকালের বন্ধু। প্রায়ই তিনি এই সব বন্ধুদের বিষয়ে অনেক পুরনো কথা বলতেন। আবার মুজ্‌ফ্‌ফর আহ্‌মদ, ফিলিপ্‌স স্প্রাট্‌, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য বা যামিনী রায়কে নিয়ে তাঁর মনের ঝোলায় মনে রাখা ঘটনাও ছিল অন্তবিহীন। কবি জীবনানন্দ দাশ, সমরেশ বসু, চিত্রশিল্পী নীরোদ মজুমদার, অনুজ সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও তাঁকে অনেক গল্প করতে শুনেছি। এছাড়া পি. সি. যোশী, চিত্তপ্রসাদ, রবিশংকর বা পুরনো কলকাতা এ সব তো ছিলই।

একটানা বেশ কয়েক বছর বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় আমি তাঁর সঙ্গী হবার সুযোগ পেয়েছিলুম। ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী ও ধুতি পরে তিনি সন্তর্পনে রাস্তায় হাঁটতেন। পরনে চকচকে পাম্প শু, হাতে ছাতা। গপ্পো করতে করতে লেক মার্কেটের পাশ দিয়ে এগিয়ে লেক প্লেস ছুঁয়ে আবার শরৎ ব্যানার্জী রোড। অবশেষে দেশপ্রিয় পার্কের কোনাকুনি পার হয়ে তিনি সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরতেন। মাঝে মধ্যে উঁকি মারতেন ৪৯ নং লেক প্লেসের একতলায়। সেখানে থাকতেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তাঁর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় হয়েছিল তিরিশের দশকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মুখোমুখি একটা রেস্তোরাঁয় কোনো এক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে। সঙ্গী ছিলেন স্প্রাট, যিনি এ দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিগঠনের কাজে অন্যতম উদ্যোগী। পরবর্তীকালে তিনি গান্ধিবাদী হিসেবেই পরিচিত হন। কখনো বেড়াতে বেড়াতে কবি চলে যেতেন রবীন্দ্র সরোবরের সাহিত্য একাডেমির অফিসে বন্ধু ক্ষিতীশ রায়ের খোঁজে। ক্ষিতীশ রায় তখন সাহিত্য একাডেমির পূর্বাঞ্চল অফিসের কর্ণধার। আবার কখনো গিয়ে হাজির হতেন দেবব্রত বিশ্বাসের রাসবিহারী এভিনিউর ছোট্ট অথচ আন্তরিক আস্তানায় অথবা ডিহি শ্রীরামপুর রোডের যামিনী রায়ের নতুন বাড়িতে। যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর ছিল একটানা প্রায় চল্লিশ বছরের যোগাযোগ। বাঁকুড়ার বেলেতোড় বাড়িতেও কয়েকবার অতিথি হয়ে বন্ধুবান্ধব সহ বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে এসেছিলেন বিষ্ণু দে। একদিন বিকেলে ক্ষিতীশ রায়কে নিয়ে বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের খবরাখবর নিয়ে গেলেন।

আমায় পত্র লিখে আসতে বলায় আমিও কবির সঙ্গে গিয়েছিলুম। ক্ষিতীশদার মেয়ের সন্তান হয়েছে বিলেতে। তাই মেয়ে জামাইকে উপহার দেবার জন্যে যামিনীদার একটা ছবি বাছাই করে দিয়েছিলেন। কবির সুবাদে ছবিটি মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দিয়েছিলেন যামিনী রায়। আমাকেও বিষ্ণু দে একবার যামিনীদার ছেলে পটলকে বলে যামিনী রায়ের একটা ছবি জলের দামে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শুনেছি, জ্ঞানপীঠ পাবার খবর রেডিওতে শুনে ছুটতে ছুটতে এসে প্রথম জানিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পুরস্কার পাবার কিছুদিন পরে সেবার পুজোয় বিষ্ণু দে আমায় নিয়ে রিখিয়া গিয়েছিলেন। মিথিলা এক্সপ্রেসে প্রথম শ্রেণীর একটা ক্যুপে ছিলাম কবির সঙ্গে সারাটা রাত। প্রণতি দে'ও ছিলেন সেদিন। সেই প্রথম আমার রিখিয়ায় যাওয়া। উঠেছিলাম বাবুডির ভাড়া বাড়ি পুবমুখো বিরিঞ্চি ধামে। ছেলে-মেয়েরাও এসে পরে হাজির হোলো। বাবুডির বাড়িটা হয়ে উঠল জমজমাট। বিষ্ণু দে অশোককৃষ্ণ দত্তদের বাড়ির পাশে একটা বড়ো বাড়ি কিনেছিলেন বিঘে পাঁচেক জমিসহ। প্রতিবেশী ছিলেন লীলা বাবু যিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের মুখিয়া। একরাশ শাদা চুল উড়িয়ে তিনি সবসময় এখান সেখান সাইকেলে চষে বেড়াতেন। সেবার রোজ সকালে আর বিকেলে কবির সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। কখনো লীলাবাবুর বাড়ি হয়ে আগাইয়া পার হয়ে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের বাড়ি। দারুণ আড্ডা জমত সেখানে নীরুবাবুর প্রগলভতার গুণে। বাগানে বসে তিনি তখন হিন্দু বৌদ্ধ-খৃষ্ট ইত্যাদি ধর্মীয় ধারণার সমন্বয়ে একটা নতুন ধরনের ভাস্কর্য গড়ে তুলছিলেন। চেয়ারের পাশে একটা বেঞ্চিতে সাজিয়ে রাখতেন বহুবিধ পানীয়। বড়ো হাসিখুশী আর প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন বিষ্ণু দে'র ভক্ত এই মানুষটি। বিষ্ণু দে সেবার আমায় চিনিয়েছিলেন দিগরিয়া পাহাড় কিংবা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গম্ভীর ত্রিকুট পর্বত। আর চিনিয়েছিলেন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তিরতির করে বয়ে যাওয়া শীর্ণ নদী। চল্লিশের দশকে সেখানে বনভোজন করতে যেতেন কবি তার পুরনো বন্ধুদের নিয়ে। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে কবি চিনিয়েছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তদের বাড়ি। সেখানে রিখিয়ার তখনকার সর্বজ্যেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ অলোকরঞ্জনের ঠাকুরদাদা দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন। রিখিয়ার সেই লাল মাটির দেশে সেটাই একমাত্র পুজো। বিষ্ণু দে'র সঙ্গে একদিন বিকেলে দেখা গেল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ি, যার বাগানে তখনও ছিল অসংখ্য আমের গাছ। ওই বাড়িরই গা এলিয়ে শুয়ে আছে দিগরিয়া। কবি ত্রিকুট ও দিগারিয়া পাহাড় দুটিকে মিলিয়ে বলতেন 'হর-গৌরী'। আরেক মজার ছোট্ট পর্বতমালা হচ্ছে—সিরিয়া—রিখিয়ার ছোট্ট "হিমালয়" সংস্করণ।

মনে আছে বিষ্ণু দে'র সঙ্গে পরিচয়ের আগে অনেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অনেকেই বলতেন বিষ্ণু দে'র কবিতার দুর্বোধ্যতার কথা। কেউ কেউ বলতেন, তিনি বড্ডো নাকউঁচু মানুষ। পাণ্ডিত্য আর বৈদগ্ধ্যমিশ্রিত চাপা অহংকার নাকি তাঁর ব্যবহারের মধ্যে চাপা থাকে না। অথচ আমার সৌভাগ্য, আমার অভিজ্ঞতায় সে সব কখনোই ধরা পড়ে নি। রিখিয়ায় মোট তিনবার গিয়েছিলাম। কাটিয়েছিলাম প্রায় মাস তিনেকের কাছাকাছি। সে সময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। অজস্র গান শুনেছি রেকর্ডে প্রতি-দিন। বাখ্, মোৎসার্ট, স্যুবার্ট, বিটোভেন থেকে শুরু করে দেবব্রত বিশ্বাস সুচিত্রা মিত্র সহ শৈলেন দাস বা অর্ঘ্য সেনের রেকর্ড। বহু বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। অথচ কখনো তাঁকে দাম্ভিক বা অন্যরকম বলে মনে হয়নি। অনেক সময় তাঁকে নীরবতা পছন্দ করতেও দেখেছি। কিন্তু তাই বলে অসহজ মনে হয়নি তাঁকে কখনোই।

রিখিয়াতে থাকার সময় নিজের শোবার ঘরে শুয়ে শুয়ে প্রায়ই বিষ্ণু দে'র কবিতা পড়তুম। দক্ষিণের একটা ঘরে কবি পছন্দ করে আমায় থাকতে দিয়েছিলেন। সারা-দিন কবির সঙ্গ লাভ, আর কাজ বলতে শুধু গান শোনা আর বেড়ানো। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। সে সময় রাত্রে একলা ঘরে শুয়ে বিষ্ণু দে'র কবিতা পড়ে অনেক কিছু মেলাবার চেষ্টা করতুম। জানিনা এভাবে কবিতা পাঠের রোমাঞ্চ আর কিছুতে পাওয়া সম্ভব কি না! কিন্তু কবিতা যে তখন অনেক সহজ হয়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই। আমার অনুভবে কবি তখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতেন। যেমন একটি কবিতা 'নীরদ মজুমদারের জন্য'। এই কবিতাটি 'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়ে ১৯৪৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কবিতার প্রথম চারটি চরণ রিখিয়ায় যখন পুনরায় পড়লুম তখন আনন্দে আর উত্তেজনায় তেতে উঠেছিলুম। প্রায় তিন দশক আগে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন—

> হিরনার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
> সবুজ ও লালে লাল।
> বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
> একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।
> চিৎকাটে আজ উট্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
> শরৎ মেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেঁষা অক্রূর নীল,
> থরো থরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল

সহৃদয় নীলসঘনঘটায় দিঘারিয়া দূর, দূর
ত্রিকূটে জড়ায় দোঁহায় পূবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

এই কবিতার মধ্যে টের পাওয়া গেল চুরাশি মৌজার কথা সেখানে মানুষের হৃদয়ে আছে অসীম ধৈর্য্য। তাদের অমর বাহুতে আমনের আশা, থাকে দেহাতি হিম্মতওয়ালা প্রাণ। কবির সামনে ধরা পড়েছিস আশ্চর্য এক স্থিরচিত্র যেখানে সাঁওতাল ফেরে শালবন ঘেরা সান্ধ্য ঘরের দিকে। কিংবা, 'ত্বারিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে, শাল বনের কিনারে, দুরন্ত টানে ছুটে চলে অনিমিখে বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।' এই চিত্ররূপ যা একান্তভাবেই এ মর্ত্ত পৃথিবীর তাই হল বিষ্ণু দে'র অধিকাংশ কবিতার বিশ্বস্ত পটভূমি। অতি সহজেই কবি দেখতে পান 'স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল / আকাশ পৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে / ভেড়োয়াটাড়ের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা স্বরে / রক্তিম পটে পিকাসোর পেশী সচ্ছল সাঁওতাল'॥

কবির অনেক কবিতায়ই সাঁওতাল পরগনার এই দিগন্ত জোড়া প্রকৃতির মনোভূমি অতি সহজেই বিষ্ণু দে তাই লেখেন, 'ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগ্‌ল / সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা? / নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগ্‌ল। জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্ণা'। (প্রতীক্ষা)

ওই 'অনিষ্ট' কাব্যগ্রন্থেরই মূল কবিতা অনিষ্ট' যা একদিক থেকে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে বিবেচিত সেখানেও 'মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে / পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়'। সেখানেও 'আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে / পাকা-ধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে'।

এসব পড়তে গিয়ে তখন তাই মনে হত বিষ্ণু দে'র কবিতায় এ অসংখ্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা। তুলনা বা প্রতিতুলনার এই যে গভীর এবং ব্যপ্ত আয়োজন তার মূলে মিশে রয়েছে অন্তহীন অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সবকিছুকে কাছে থেকে দেখার মত মরমী চোখ এবং হৃদয় যা তাঁর মজ্জাগত নাগরিকসুলভ মনন ও বৈদগ্ধ্যকে ছাড়িয়ে গেছে প্রায়শঃই। বিষ্ণু দে'র কবিতা অসংখ্য ঐশ্বর্যের এক প্রতিফলনও বটে। ইতিহাস ও পুরাণ থেকে দেশ ও দেশান্তর এবং কাল থেকে কালোত্তরে তাঁর বিচরণ। আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা তাঁর ব্যক্তির স্পর্শে গোড়ায় এসে তাই হোঁচট খায় বটে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রখর করে তুলে তাঁর কবিতা পরিণতিতে দান করে' 'খর স্রোত নব আনন্দের'। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের গভীরে প্রবেশ ও পাঠে পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্যও বটে। কিন্তু গোড়ায় যা কঠিন বলে ভ্রম হয় কিছুদিনের মধ্যে চর্চার ভেতর দিয়ে তা সহজে বোধগম্য

হয়ে ওঠে। পাঠক এইভাবেই এক সময় পুলকিত হয় 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর অমোঘ সেই শেষ চরণ কটি পাঠ করে যেখানে কবি উচ্চারণ করেছিলেন—

আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে,
তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
প্রাণ মন চায় বরাভয়, তারাই যে বয়কনে॥

তার কবিতার মধ্যেও মিশে আছে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা যা একটু চেষ্টা করলেই অনুভব করা যায়। আমি তাঁর স্নেহের ছায়ায় অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়েছিলুম বলেই তার অন্তরঙ্গতা এই কবিতার ভেতরেও স্পর্শ করতে চেয়েছি। কখনো কখনো এই বিশাল সৃষ্টি বা কাব্যসম্ভারকেই সেই আন্তরিকতার ফসল বলেই মেনে নিতে মন প্রস্তুত হয়েছে। এই আন্তরিকতার পুরস্কার সব সময় যে বিষ্ণু দে পেয়েছেন তা নয়। তার প্রচার বিমুখতার ফলেই লেনিন পুরস্কার শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। সোভিয়েত ল্যাণ্ডস নেহেরু পুরস্কার পেয়েও কবি রাশিয়া যান নি সশরীরে। আবার যেবার নোবেল পুরস্কার প্রদান কর্তৃপক্ষের লোকেরা তাঁর রাজনৈতিক মতামত বাজিয়ে দেখতে কলকাতার তাঁর বাসায় এলেন সেবারও বিষ্ণু দে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়ে দিলেন তিনি অডেন ও স্পেণ্ডারকে খুবই পছন্দ করেন। ফলে সুইডেনের দূতেরা হতাশ হয়ে ফিরে যান।

এইসব কারণে প্রায়ই তাঁকে আমার এই সময়ের একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলেই মনে হত। চেহারায়, রূপে, আভিজাত্যে তাঁর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ধরা দিয়েছিল। তাই পৃথিবীর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষার সংস্পর্শে বা যোগাযোগ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। প্রতিষ্ঠা বা সম্মান তাঁকে নিরন্তর স্পর্শ করে গেছে বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বকে আহত করে কখনো প্রতিষ্ঠার পেছনে দৌড় ঝাঁপ করতে যায়নি। ফলে একমাত্র বোধহয় বিষ্ণু দে'ই তাঁর সময়ের পুরোধা কবি হয়েও কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে একটানা চল্লিশ বছর কাটিয়ে যান অবলীলায়। কলকাতায় তাঁর একটা ছ্যাকড়া গাড়িও ছিল না কোনদিন। এই বিষ্ণু দে'কে আমার চিনে নিতে বেগ পেতে হয়নি।

শতাধিক চিঠি তিনি আমায় লিখেছিলেন। সবাইকেই পত্রের উত্তর দিতেন কবি নিজের হাতে লিখে। কবির অধিকাংশ গ্রন্থই উপহার হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন

আমায়। বন্ধু ছিল অনেক। অনুজ ভক্তরা যেমন অশোক সেন, অসীম রায়, বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সেন এঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। খবর নিতেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মত আরও বহু বিদ্বৎজনেরা। অসম্ভব ক্ষুরধার স্মৃতি ছিল বিষ্ণু দে'র। লেখা হাতে থাকলে কাউকেই নিরাশ করতেন না। ছোট বড়ো পত্রিকার কোনো ভেদাভেদ ছিল না কবির কাছে। ঋত্বিক ঘটক বলতেন—লোকটা সব গুলে খেয়ে ফেলেছে। 'পরিচয়' পত্রিকার আড্ডা ছাড়া আর কোথাও তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ছিল না। 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ করে তিনি একদা হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। 'শ্যামল রায়' ছদ্মনামে ছোটগল্প লিখতেন যৌবনের গোড়ায়। অথচ পরবর্তীকালে বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন পৃথক মর্যাদার প্রতীক। কবি হিসেবে ক্রমশ তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রত্যয়ের রূপকার। প্রত্যয় আর সিদ্ধির সম্মেলন ছিল তাঁর সমগ্র কাব্যজীবন যেখানে ব্যক্তি পরিণতিতে হয়ে উঠেছিল সমগ্রের প্রতিনিধি। কবির ব্যক্তিজীবনও যেন তাঁর কবিতার মতই ঋজু। আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাই তাঁর জয়যাত্রা তাঁর কবিতার মতই বীরত্বের ব্যঞ্জনা মিশ্রিত। আমার চোখে বিষ্ণু দে'র কবিতা আসলে যেন তাঁর জীবনেরই ব্যক্তিত্বময় প্রতিচ্ছবি—, যা কখনোই মলিন হবার নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে ঃ কৃতজ্ঞতার স্মৃতি

আমরা যখন কবিতা লেখালেখি শুরু করি, তখন বাংলা কবিতায় মোটামুটি দুটি শিবির ছিল, তাদের বলা হত বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব। তখন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিও পূর্ণ সৃষ্টিশীল, কিন্তু তাঁদের কোনো গোষ্ঠী ছিল না। আমরা কৃত্তিবাসের তরুণের দল কোনো গোষ্ঠীতেই যোগ দিইনি, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতাই ছিল আমাদের মূল আদর্শ। এবং বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে, এই দু'জনেরই লেখা আমরা পড়তাম খুব মন দিয়ে। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছি, কখনো কখনো ঐ প্রবীন কবিদ্বয়ের কাছে গিয়েও আমাদের অনুযোগ ও শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

কলেজ জীবনে আমি বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের বেশি ভক্ত ছিলাম এবং বিষ্ণু দের কবিতার। বুদ্ধদেব বসুর পুত্র-কন্যা-জামাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বলে বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে এবং তাঁর সান্নিধ্যে দু'চারবার যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু বিষ্ণুদে'র সঙ্গে ছিল বেশ খানিকটা সসম্ভ্রম দূরত্ব। ছাত্র বয়সে আমি বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও খানিকটা যুক্ত ছিলাম, সেইজন্য বিষ্ণু দে-র কবিতা আমাদের বেশি কাছের মনে হতো, তবু আমি বৈষ্ণব হতে চাইনি।

আমার প্রথম কবিতার বইটি প্রকাশিত হবার পর আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল প্রিয় কবি বিষ্ণু দে-র হাতে একটি বই তুলে দেওয়ার। সঙ্কোচ কাটাতে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন অন্যান্য বন্ধুদের না জানিয়ে আমি চলে গেলাম সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে (এখন বোধহয় সেই কলেজটির নাম মৌলানা আজাদ কলেজ), সেখানে বিষ্ণু দে ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন। সেদিন আমি এমনই একটা বোকার মতন কাণ্ড করেছিলাম, যে-জন্য আজও লজ্জা বোধ হয়। বিষ্ণু দে তখন একটা ক্লাশ

নিচ্ছেন, আমার উচিত ছিল আড়ালে অপেক্ষা করা, কিন্তু আমি তাঁর ক্লাসরুমের দরজার কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়ে। তিনি দু'চারবার আমার দিকে তাকালেন, একবার ভেতরে এসে বসবার জন্যও ইঙ্গিত করলেন, তবু আমি নট নড়ন চড়ন। হঠাৎ তিনি পড়া থামিয়ে বাইরে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন।

এর আগে বিষ্ণু দে-কে দু'একটি কবি সম্মেলনে দেখেছি দূর থেকে, কিন্তু কখনো তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি। সেই দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষটির সামনে দাঁড়িয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো, মুখ দিয়ে কথাই বেরোতে চাইলো না। নিজের কবিতার বই দেওয়ার ব্যাপারে একটা অসম্ভব লজ্জা বোধও পেয়ে বসেছিল। আমার অতিশয় দুর্বল ও কাঁচা কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ভাষার এক প্রখ্যাত কবি-ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর সময় নষ্ট করাও বোধহয় অন্যায়।

আমার হাতের বইটি দেখেই তিনি বোধহয় ঘটনাটি অনুমান করেছিলেন। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, নতুন কবিতার বই?

সেদিন আমাকে তিনি যদি বকুনি দিতেন, তাতেও অন্যায় কিছু হতোনা। কিন্তু একজন নবীন কবির মনোভাব তিনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন, সেইজন্য তিনি বইটির কয়েকটি পাতা উল্টে সস্নেহে বললেন, আচ্ছা পড়বো। তারপরই দ্রুত ফিরে গেলেন ক্লাসরুমে।

তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। সেদিনের সেই ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করে।

এরপর বিষ্ণুদের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তাঁর আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে।

তখন এত সব সম্বর্ধনা দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। আমরা কৃত্তিবাসের পক্ষ থেকে ঠিক করেছিলাম, বিষ্ণু দে-কে আমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করবো একটি সভায়। হল ভাড়া করার পয়সা ছিলনা, তাই সভার ব্যবস্থা হয়েছিল শংকর চট্টোপাধ্যায়ের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। বিষ্ণু দে র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে সেবারই আমি প্রথম যাই। তাঁকে অনুরোধ জানাতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সেদিন বিকেলবেলা তুমুল বৃষ্টি নামলো। আমরা কৃত্তিবাসের দলবল শংকরের বাড়িতে আগেই উপস্থিত হয়ে গেছি। ফুলটুল কেনা হয়ে গেছে, কিন্তু এদিকে রাস্তায় জল জমছে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে সেদিনের সভাটি আর হবে না, তখন দেখি ছাতা মাথায় দিয়ে বিষ্ণু দে সেই ঝড়-জলের মধ্য দিয়েও হেঁটে আসছেন একা।

সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাঁকে আমাদের খুব কাছাকাছি পেয়েছিলাম। আমাদের

সামান্ত সম্বর্ধনায় বিষ্ণুদে-র কিছু যায় আসেনা, কিন্তু সেদিন তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে, তাঁর কবিতাপাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা শুনে আমরা যথেষ্ট উপকৃত ও অনুপ্রাণিত বোধ করেছি।

আমাদের কৃত্তিবাস পত্রিকায় কবিতা চাইলেও তিনি দিয়েছেন। বেশ পরিণত বয়সে তিনি যখন রিখিয়ায় গিয়ে থাকতেন, সেখান থেকেও একবার কৃত্তিবাসের জন্য একগুচ্ছ কবিতা পাঠিয়েছিলেন।

আমি বিষ্ণু দে'র খুব বার্ধক্যের চেহারা দেখিনি। তাঁর মৃদু হাস্যময় সুন্দর সুঠাম চেহারাটাই মনে ছাপ ফেলে আছে। এখনও তাঁর কবিতা পড়তে গেলেই তাঁর সেই যৌবনবন্ত রূপটিই মনে পড়ে।

খুঁজে ফিরি সত্তা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

খর স্রোত নব আনন্দের

—ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে দেবতারা মৃত্যুভয়ে ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইলেন এবং ইহা হইতেই ছন্দ শব্দের সৃষ্টি। ছন্দ বলিতে বিশেষ করিয়া বেদ না বুঝিয়া যদি একালে কথাটির এক সামান্য অর্থ ধরি তাহা হইলে উপনিষদের এই উক্তিটি কাব্যতত্ত্বে প্রথম সূত্র হিসাবে গ্রহণীয়। 'কাব্য-রস ব্রহ্ম-রসের' সমতুল কথাটির তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে নাও বুঝিতে পার। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে রস-তত্ত্বের কূট আলোচনা করিতে হয়। আর যদি বল কাব্য তোমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে যেন কাব্য সম্বন্ধে সার কথাটি বলা হইল। উপনিষদকার বলিলেন, দেবগণ মৃত্যুভয়ে তাড়িত হইয়া ছন্দের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। একালে ইহার অর্থ এই যে কাব্য-সাধনা অমৃতের সন্ধান।

মধ্যযুগে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কাব্যে এই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য এই অমৃতের উৎস। কিন্তু আধুনিক যুগ বিচিত্র পথগামী হইয়া যেন বড় দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় যেন আমরা এক নতুন যুগে আসিয়া পৌছিয়াছি। সে যুগে বৈষ্ণব কাব্যের রস ফুরাইয়া যায় নাই, সে যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। তবু যেন কোন নতুন কথা শুনিবার ইচ্ছা হয়, কোন নতুন সুরের জন্য উৎকর্ণ হই। সে নতুন কথা একজনের কথা নয়, সে নতুন সুরও একজনের সুর নয়। জীবনানন্দ দাশের কথায়—'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ।...এই নতুন কবিসাধারণসঙ্ঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান'। ('উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' ১৩৫২, কবিতার কথা, ২য় সং ১৩৭০, পৃঃ ৩৮) এই কাবসাধারণসঙ্ঘের দুই অসাধারণ কবি জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে যখন একটি সর্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করিলেন, তখন গৌড়জন তাঁহাকে লইয়া কতখানি মাতিয়াছিলেন, তারে বেতারে পত্রে পত্রিকায় সভায় সমিতিতে তিনি কতখানি অভিনন্দিত হইয়াছেন জানি না। তবে অনুমান করিতে পারি বড় বেশী মাতামাতি হয় নাই। প্রথম কথা, বিষ্ণুবাবু বিনয়ী সদালাপী মানুষ হইয়াও যেন নির্জনতা-মুখী। বঙ্গদেশের সাহিত্য-শতদলের কোন কোন একটি দলেরও ধার ধারেন নাই। **The soul was like a star, and dwelt apart.** কথাটির মধ্যে কবির আত্মস্থতার প্রশংসা থাকিলেও বলিতে হয় এমন apart থাকিয়া ইংরাজ কবি বড় লাভবান হন নাই। 'বিষ্ণুবাবু মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক' এই ভাবটি বোধ হয় আজও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে লইয়া আমরা মাতিব কেন।

দ্বিতীয়ত, বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয় হইলেও একালের বাঙ্গালী পাঠক প্রধানত উপন্যাস-রসিক। পৃথিবীর সব দেশেই কাব্যের চাইতে উপন্যাসের চাহিদা বেশী। তবে বঙ্গদেশে আজ উপন্যাসের বড় ছড়াছড়ি। আমাদের সকল মহৎ কথাই এখন বৃহৎ কথা। যদি গুণাঢ্য বলিয়া পরিচিত হইতে চাও আগে একটি গল্প বল। বহুকাল যদি নিছক কবি হইয়াও থাক অন্তত আজ একটি কাহিনী লেখ। ওই দেখ বাঙালী পাঠক আজ কথা-সরিৎ-সাগরে ভাসিতেছে। বিষ্ণুবাবু কেবলি কবি।

তৃতীয়ত আধুনিক বঙ্গীয় সমালোচক আধুনিক বঙ্গীয় কবিকে প্রায় এড়াইয়া চলেন। আর বিষ্ণু দে'র কোন কাব্য-গ্রন্থ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে এখনও স্থান না পাইয়া থাকে, তবে শীঘ্র তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে আশা করি না। আমাদের কাহারও হাতে ডি-ফিলের পাচনবাড়ি, কাহারও হাতে ডি লিট্-এর পাঞ্চজন্য, আবার কাহারও এক হাতে পাচনবাড়ি আর হাতে পাঞ্চজন্য, কিন্তু গোষ্ঠে বা রণক্ষেত্রে আমাদের কোন সমসাময়িক কবির নাম বড় উচ্চারণ করিতে হয় না।

তবে এই প্রসঙ্গে আসল কথা বোধ হয় এই যে বিষ্ণুবাবুর কথা কান পাতিয়া শুনিয়া মর্মে উপলব্ধি করিবার সময় আমাদের নাই। গত পঁচিশ বছর ধরিয়া আমরা যে হট্টগোলের মধ্যে জীবন কাটাইয়া আসিতেছি তাহাতে বিষ্ণুবাবুর ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার রেশ আমাদের কানে পৌঁছাইতে পারে না। বঙ্কিমের যুগে বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর, বাঙালী শুনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বাঙালী শুনিয়াছে। একালে এক বিষম কলরবের মধ্যে যেন কোন একটি কণ্ঠস্বর আমরা স্পষ্ট শুনিতেছি না। অর্থাৎ আমাদের দেশে ডেমোক্রেসি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি কোথাও আমরা কোন একজনের কথা শুনিতে বা মানিতে চাই না। এদের কণ্ঠে যে বহুর কথা

শোনা যাইতে পারে সে বিশ্বাস আমরা হারাইয়াছি। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ হইতে আমাদের বড় আপত্তি। দেবগণ মৃত্যুভয়ে ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমাদের হয় মৃত্যুভয় নাই, অথবা আমরা নিজ নিজ ছন্দে নিজ নিজ মুক্তি খুঁজিতেছি। বিষ্ণুবাবু আমাদের সকলের জীবনের মৌল ছন্দটির স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন: তাঁহার কাব্য সেই অনুভূতির প্রকাশ। তাঁহার কথা:

সামুদ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকর্ষে
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,
শুধু পাবে কৌটিল্যেরা
ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার।

তবে বিষ্ণুবাবুর অন্ধকারে ভয় নাই। তাঁহার আধুনিকতার শাশ্বত সত্যটিকে এই নির্ভীকতার মধ্যেই খুঁজিয়া লইতে হইবে।

গোধূলি বিবর্ণ হল।
অন্ধকার অদৃশ্য প্রতীক্ষা,
নিদ্রায় ও বিনিদ্র প্রয়াসে, প্রহরে প্রহরে
অনাগত সম্পূর্ণদিনের।

যে নিরাশার ভাব লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি বিষ্ণুবাবুর কাব্যে তাহার প্রশ্রয় নাই। যে আশার কথা উপনিষদে, বৈষ্ণব কাব্যে, শাক্ত গানে, রবীন্দ্রনাথে সেই আশার কথা বিষ্ণুবাবুর কবিতায়। তবে উপনিষদ, বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত গান রবীন্দ্রনাথের পরেও যে বিষ্ণুবাবুর কাব্য পড়ি তার কারণ এই যে, তিনি একালের বড় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। আধুনিক কবির বড় দায়িত্বও এইখানে। বিষ্ণুবাবু অঙ্গারে বিভূতি দেখিয়াছেন:

উত্তরে পশ্চিমে গ্রীষ্ম, পোড়া বালি,
বৈশাখে বা জ্যৈষ্ঠে
গ্রাম্য কাফি পুড়ে ছাই,
ঝরেছে সবুজ আম।
তবু আশা। আশা বাঁচে খাণ্ডবেরও পরে
মরুভারতাতে নামে শ্যাম, দেশী,
অঝোর আষাঢ়।

বিশিষ্ট কবির কোন কোন লাইন যেন মনের মত কানে বাজিতে থাকে, আর উহার অর্থেরও যেন শেষ নাই। যতবার উচ্চারণ করি ততবার যেন নিবিড় হইতে নিবিড়তর

ভাবের সঞ্চার করে। চরণটির একটি শব্দ যেন কত যুগের সাধনার অর্থ বহন করিয়া আনে। Empson সাহেবের Seven Types of ambigecity গ্রন্থের তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে না মানিয়াও বলিতে পারি এই "ভারতী" শব্দটির এখানে বিচিত্র দ্যোতনা। ভারতী কি না বাক্যধ্বনি অর্থাৎ ভাষা। আবার ভারতী হইলেই ভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী যিনি সরসিজাসনা! ঋগ্বেদে বহু স্থানে সরস্বতী সিন্ধুনদ অর্থে ব্যবহৃত। আবার কোন স্থানে সরস্বতী দেবনদী। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে সরস্বতী বাক্‌ রূপে বর্ণিত এবং পরে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪১ সূক্তের ষোড়শ ঋকে সরস্বতী শ্রেষ্ঠ নদী। এমন সজল সরস্বতী বা ভারতীকে মরু-ভারতী বলা হইল। অন্তত ভারতী শব্দের সঙ্গে মরু শব্দের সংযোগে একটি অভিনব ভাবের সৃষ্টি হইল। এই ভাবের উৎস বিষ্ণুবাবুর ইতিহাস বোধে। 'এ বড় অদ্ভুত রাজ্য, ছাব্বিশে বৈশাখে মরুভূমি'। প্রাচীন কবির ভগবতী ভারতীকে বা ভারতচন্দ্রের ভরসা ভারতীকে আধুনিক কবি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতে পারেন না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর ইতিহাসের খাণ্ডবদাহে সব পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। কিন্তু তারপর আবার 'নামে শ্যাম' কথাটির মধ্যে কত ভাব ঘন নিবদ্ধ হইয়া আছে। শ্যাম অর্থে মেঘ, নবদূর্বাদল, আবার ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের ইষ্ট দেবতা, চাই কি শাক্তের শ্যামা বা মাইকেলের 'শ্যামা জন্মদে'। দেশী দীপক রাগের ভার্যা এক রাগিণী। আর অঝোর আষাঢ় কথাটির অর্থ কোন বাঙ্গালী-পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। মুকুন্দরামের 'আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল' যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা বিষ্ণুবাবুর এই লাইনটির তাৎপর্য ধরিতে পারিবেন। এই আষাঢ়ের ধারায় নতুন আশার সঞ্চার, নতুন প্রাণের উদ্গম। সে প্রাণের আধার কোথায়?

কবির উত্তর:

ছিন্ন জীর্ণ সব আয়ু। তবু আশা। আশাই ত মাতৃভাষা। কথাটি অবশ্য 'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলাভাষা,' কলিটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কবির বক্তব্য আরও গভীর। ভাষার মৃত্যু আত্মার বিনাশ। মানুষের অভ্যুদয় ভাষার অভ্যুদয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনককে বলিলেন: 'বাগ্বৈ, সম্রাট পরম: ব্রহ্ম'। কথাটির তাৎপর্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুঝাইতে পারেন। তবে সাধারণভাবে বুঝিতে পারি সমস্ত সত্য, সমস্ত উপলব্ধির আধার হইল ভাষা। সার্থক ভাবের সাধনা সার্থক ভাষার সাধন। যেখানে মনন সুন্দর, সেখানে উচ্চারণ সুন্দর। এই ভাষার সূত্রে আমাদের অন্তর্জগত বহির্জগতের সঙ্গে গ্রথিত। সেই গ্রন্থনকে সার্থক করিতে হইলে—বিষ্ণু-বাবুর কথায়—'মমতায় ব্যপ্ত কর মন', 'প্রাত্যহিকে মগ্ন কর মন', 'সততায় স্থির কর মন'।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিল ও সে ক'জন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে
ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ,
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।

বিষ্ণুবাবুর কবিতার মর্মস্থলে পেঁছাইতে হইলে তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আগে বুঝিয়া লইতে হইবে। এ কথা অবশ্য যে কোন কবি সম্বন্ধেই বলিতে পারি। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর ক্ষেত্রে কথাটির বিশেষ মূল্য এই জন্য যে তাঁহার স্টাইল আমরা প্রায়ই আধুনিক বাংলা কাব্যের স্টাইলের সঙ্গে গুলাইয়া ফেলি। আবার কথনও বা তাঁহার স্টাইল এলিয়টের অনুসৃতি এই স্থির বিশ্বাসে বিশ্লেষণের লেঠা চুকাইয়া দেই। আর বিষ্ণুবাবু এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হইবে। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিত, কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট কলেজে তিনি উক্ত সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন দীর্ঘকাল, তিনি আধুনিক ইংরাজী কাব্যের বিশেষ করিয়া এলিয়টের কাব্যের অনুরাগী, তিনি এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫৩), এলিয়ট সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্য-সমাজে আদৃত। কিন্তু তবু বলি ভাবে ও ভাষায় বিষ্ণুবাবুর কবিতা কোন অর্থে এলিয়টের কাব্যের প্রতিধ্বনি নয়। এলিয়ট নিজের একটি লাইনের সঙ্গে অপর কোন কবির একটি লাইন জুড়িয়া দেন এবং বিষ্ণুবাবুও ওইরূপ করিয়া থাকেন। অতএব বঙ্গীয় কবি ইংরাজ কবির মন্ত্রশিষ্য এমন যুক্তি সাহিত্য সমালোচনায় মারাত্মক। এই যুক্তির বড় বিপদ এই যে, ইহাতে মনে হইবে বিষ্ণুবাবু শব্দের কারুকার্য লইয়া ব্যস্ত, নিজস্ব ভাবনার এক সার্থক স্বতন্ত্র প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। আচার্য সুকুমার সেন বলেন: 'জীবনানন্দের কবি প্রকৃতিতে হৃদয়াবেগের উত্তেজনা ও অনুভবের তীক্ষ্ণতা স্বভাবতই প্রবল। বিষ্ণুবাবুর কবি প্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিয়টের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুসৃত।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪ খণ্ড, ৩য় সং ১৯৭১ পৃঃ ৩৭৬) একথার অর্থ বোধ হয় দাঁড়াইতেছে এই যে বিষ্ণুবাবু ভাবের ঘাটতি বিদ্যা দিয়া পূরণ করিয়াছেন এবং এই বিদ্যা নির্ভরতার ফল স্বরূপ এলিয়টের রচনা-ভঙ্গির অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইংরাজী কাব্য পাঠ করিয়া আমরা কতখানি আনন্দলাভ করিয়াছি জানি না, কিন্তু উক্ত কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা বহুলাংশে বিপর্যস্ত। গত শতাব্দীতে আমরা বলিতাম মুকুন্দরাম বাংলার চসার, বঙ্কিম বাংলার স্কট্, মাইকেল বাংলার মিল্টন বা বায়রন। এই শতাব্দীতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শেলীর সঙ্গে তুলনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বিষ্ণুবাবুকে এলিয়টের সঙ্গে জড়াইয়া লইবার পক্ষে 'প্রমাণ'ও বড় কম নাই।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে সমালোচনার একটি বিশিষ্ট কাঠামো নির্মিত হইয়া আছে। আমরা যখন আমাদের আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় অগ্রসর হই তখন ওই কাঠামোটি যেন বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করি। আমাদের আধুনিকতা যে বিশেষভাবে আমাদের নিজস্ব আধুনিকতা হইতে পারে এই বিশ্বাস যেন আমাদের এখনও হয় নাই। আমাদের প্রাচীন যুগ প্লেটো বা ইস্কিলাসের যুগ হইতে ভিন্ন; আমাদের মধ্য যুগ একোয়াইনাস্ বা দান্তের যুগের সঙ্গে সম্পর্কহীন; অতএব আমাদের আধুনিকতা দেশের আধুনিকতা অবশ্যই হইতে পারে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এই কথা যেমন আমরা ইউরোপীয় হিউম্যানিজম্ হইতে আমদানি করি নাই তেমন একালে আমাদের কোন আধুনিক বোধের জন্য ইউরোপীয় মডানিটির খোঁজ লইতে হয় না। বিষ্ণুবাবুর আধুনিকতা একান্তভাবে বাঙ্গালী কবির আধুনিকতা। তিনি ইংরাজী বই পড়িয়া আধুনিক হইতে শেখেন নাই।

তবে মুশকিল এই যে গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী কাব্যে এমন সব কাণ্ড হইয়াছে যে, তাহা লইয়া একটু আলোচনা না করিলে মনে হয় আমরা আধুনিকতা হইতে বড় দূরে সরিয়া আছি। আর ইংরাজী কাব্যে ও কাব্যচিন্তায় আধুনিকতার দুই প্রবক্তা এলিয়ট এবং হিউম-এর প্রবচনগুলি যেন আমাদের কাছে এক নতুন কাব্যতন্ত্রের সন্ধান দিল। ১৯১৩ সালে হিউম আধুনিক কাব্যের প্রফেট্ হইয়া লিখিলেন 'I prophesy that a period of dry, hard classical verse is coming'. ১৯২২ সালে এলিয়টের The waste Land যখন বাহির হইল, তখন মনে হইল হিউমকথিত সেই classical verse-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তখন হিউম অবশ্য বাঁচিয়া নাই। নতুন classical verse এর রচয়িতা যে ভাবে ধ্যানে রোমান্টিক তাহা তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই। আসলে হিউমের 'Romanticism and classicism' প্রবন্ধটি ত্রিশ বছর বয়সে লেখা হইলেও এটিকে বি-এ ক্লাসের ছাত্রের রচনা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার ওই anti-romantic কথাগুলি আমাদের শৌখীন আধুনিকতার রসদ জুটাইল। কাব্য না করিয়া কবিতা লেখার এক নতুন আদর্শের কথা উঠিল। হিউমের

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ছয় বছর পরে এলিয়ট্ তাঁহার Tradition and individual Talent' প্রবন্ধে লিখিলেন যে, কাব্যে emotion বলিয়া কোন বস্তু নাই। এখানে এলিয়ট্ যেন হিউমের কথাই অন্য ভাষায় বলিলেন। এই হিউম-এলিয়ট্ প্রোক্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি নিরপেক্ষ 'dry hard classical verse, আধুনিকজনের নতুন কাব্যাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে ইহার দণ্ডীর অভাব হইল না। যে কবি রবীন্দ্রনাথের মত করিয়া না লিখিবেন তিনিই এই নব্য কাব্যতন্ত্রের গোসাঁই হইবেন।

বিষ্ণুবাবুর স্বচ্ছ খরধার ভাষা, বুদ্ধি-দীপ্ত শিক্ষিত মন ও পরিমার্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া আমরা স্থির করিলাম ওনার কাব্য হিউম-এলিয়ট্ বৃক্ষের অমৃতময় বঙ্গীয় ফল। আর বিষ্ণুবাবু নানা প্রবন্ধে কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন তাহা হিউম-এলিয়টের কথার সঙ্গে মিলাইয়া পড়া সম্ভব। বিশেষভাবে শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মালার্মে: প্রগতি' কবিতাটির বক্তব্যও যেন এই নব্যতন্ত্রেরই কথা বলিয়া মনে হইতে পারে।

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট্ বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্প কর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রাজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে, স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ, অপ্রাকৃত মধুর-কথায় ;

(শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৩য় সং ১৯৬৮ পৃঃ ১৪৬)

তবে এই চৌদ্দ লাইনের কবিতাটিতে যে কাব্য-ভাষার কথা বলা হইয়াছে তাহার সঙ্গে হিউমের রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে জেহাদের কোন সম্পর্ক নাই। হিউম সাহেব চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতির মধ্যে রোমান্টিকতার গন্ধ পাইতেন। 'শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ' গন্ধের আরতির মধ্যে তিনি নিশ্চয় 'dry hardness' খুঁজিয়া পাইতেন না। বরং 'সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে' কথাটি এক নশ্বর রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্য ও প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে উক্তিটি স্মরণ করাইয়া দেয়। আসলে

ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক, প্রাচীন মধ্যযুগীয় আধুনিক প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাশি রাশি মাস্টারি বুলি আমাদের সহজ সাহিত্য-বোধকে বড় আবিল করিয়া তুলিয়াছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ী সমালোচনার ঘোর কাটাইয়া আমরা সেই সহজ সাহিত্যবোধের আশ্রয়ে বিষ্ণুবাবুর কাব্য পড়ি তাহা হইলে দেখিব সে কাব্য হিউম-এলিয়টরূপ বট-অশ্বত্থের ছায়ায় আধুনিকতার চারা হইয়া বাড়ে নাই, চর্যাপদ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যই তার পূর্ব-ইতিহাস। বিষ্ণুবাবু একান্তভাবে বাঙালী-জীবনের আধুনিকতার কবি। তিনি কবি বলিয়াই আধুনিক, আধুনিক বলিয়া কবি নন।

বিষ্ণুবাবুর আধুনিকতার মহত্ত্ব এই যে ইহা বিশ্বজীবনের শাশ্বত সত্যে দৃঢ় মূল। এ আধুনিকতাকে কোন নতুন আধুনিকতা আসিয়া উন্মূল করিতে পারিবে না। 'ক্ষয়ে প্রগতিতে এক সচ্ছল একতান'। এই একতান বিষ্ণুবাবুর কাব্যে বিচিত্রভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার কাব্যের ধ্রুব-পদটি যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি তাঁহার আধুনিকতার মর্ম বুঝিয়াছেন। যাঁহারা সার্থক আধুনিক কাব্যকে সাম্প্রতিক নৈরাশ্য ও অন্ধকারের কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা বিষ্ণুবাবুর অন্ধকারবোধের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। যাঁহারা তাহার জীবন-দৃষ্টি বা সমাজ-দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই অভিনবত্ব দেখিয়াও বোধ হয় স্বীকার করিবেন না। আর যাঁহারা তাঁহাকে এলিয়টীয় ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের কবি বলিয়া গণ্য করিতে চান তাঁহারাও এদিকে সহজে দৃষ্টি দিবেন না। অথচ তাঁহার জীবন-দৃষ্টির মূল কথাটি ধরিতে না পারিলে আমরা এই মার্ক্সবাদী এলিয়ট-ভক্ত কবিকে লইয়া বিষম গোলে পড়িব। 'পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিয়ট' এই প্রশ্ন যিনি করিয়াছিলেন তিনি কার্লমার্ক্সকে দিয়া কি ভাবে বিংশ শতাব্দীর পোড়ো জমি চাষ করাইয়া লইবার কথা ভাবিয়াছিলেন তাহা কবে কোন 'বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য' তাঁহার 'থীসিসের কেতাবে' দেখাইয়া দিবেন জানি না। মার্ক্সীয় মতবাদ ও এলিয়টের কাব্য যে বিষ্ণুবাবুর মনোজীবনে প্রবেশ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অর্থে দান্তে একোয়াইনাসের দর্শন গ্রহণ করিয়াছেন সেই অর্থে বিষ্ণুবাবুর মার্ক্সীয় দর্শনকে অন্ততপক্ষে কবি হিসেবে গ্রহণ করেন নাই। অন্যদিকে দান্তের ভার্জিল-প্রীতি সত্ত্বেও যেমন ডিভাইন কমেডি ইনিডের প্রতিধ্বনির, বিষ্ণুবাবুর এলিয়ট-প্রীতি সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য ওয়েস্টল্যাণ্ডের প্রতিধ্বনি নয়। বিষ্ণুবাবুর 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৬) কাব্য-গ্রন্থে যে অন্ধকারের অনুভূতি তাহা মার্ক্স বা এলিয়টের জগতে খুঁজিয়া পাই না:

অন্য অন্ধকার আছে ? তা-ও চেনা,
থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল
স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে
মহা ভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।
থেকেছি সে অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই
শরীরে, হৃদয়ে,
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়,
মধুর দয়াল ;
মৃত্যু নয় দীন হীন, আপতিক, নয়
সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক
শোষণে ভয়াল।

এমন হিরণ্যগর্ভ অন্ধকারের কথা এলিয়টের কাব্যে কোথাও নাই, ওয়েস্টল্যাণ্ডে নাই, ফোর কোয়ার্টেট্‌সেও নাই। ওয়েস্টল্যাণ্ডের শেষ কথা শান্তির প্রসঙ্গমাত্র, শান্তির উপলব্ধি নয়। আর ফোর কোয়ার্টেট্‌সের শেষ কথা এংলিক্যান স্যালভেশনের কথা :

And all shall be well and
All manner of things shall be well.

কথাটি চতুর্দশ শতকের ইংরাজ মিস্টিক জুলিয়ানার এক উক্তির প্রতিধ্বনি : Sin is behovabil [inevitable], but all shall be well and all shall be well and all manner of things shall be well.'

এ তত্ত্ব sin and redemption-এর তত্ত্ব। ইহার মধ্যে 'হিংস্রতাও স্বাভাবিক, দৃষ্টিময়, মধুর দয়াল' এই ভাবের লেশ মাত্র নাই। আর ফিকেতম লাল মার্ক্সবাদীও এই স্বাভাবিক সৃষ্টিময় মধুর দয়াল হিংস্রতার তত্ত্বকে অমার্জনীয় মিস্টিক প্রলাপ বলিয়া তুচ্ছ করিবেন। আর যদি বল বিষ্ণুবাবুর 'মার্ক্সীয় চিদম্বরে, মননের সম্পূর্ণ স্বভাবে, সশরীতায়', 'প্রত্যক্ষের সত্যময়তা'র মধ্যেই স্বাভাবিক সৃষ্টিময় মধুর দয়াল হিংস্রতার অনুভূতি সম্ভব তাহা হইলে বুঝিব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, সুফী মিস্টিসিজমের মত এক

ধরনের মার্ক্সীয় মিস্টিসিজ্‌ম্‌ বাংলা কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। অন্ততপক্ষে কোন মার্ক্স-বাদী বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন না।

বিষ্ণুবাবুর এই হিরণ্য-গর্ভ অন্ধকারবোধের মূলে তাঁহার প্রসন্ন স্থির নির্মল আস্তিক্য-বোধ। ইহার মধ্যে মধ্যযুগীয় তুকা বা তুলসীর বা আমাদের কালের রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রেম নাই। তবু বলিতে হয় ইহাই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা। আর আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সেরা তত্ত্ব শংকর অদ্বৈতেও বা ঈশ্বর-প্রেম কোথায়? ঈশ্বর-প্রেমিক চিনি খাইতে ভালবাসে: ঘোর অদ্বৈতবাদীর পুরুষার্থ চিনি হওয়া। অতএব অদ্বৈতবাদীর আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বর-পাগল বৈষ্ণব বা শাক্ত বা শৈবের আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরভক্ত মানুষ ঈশ্বরের অসীমতা মানিয়াও তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুজগতে অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে লইয়া আসিতে চায়। তাহার ঈশ্বর প্রতিমায় মূর্ত, মন্দিরে অধিষ্ঠিত, ইতিহাসে সক্রিয়। আধুনিকের আধ্যাত্মিকতা ব্রাত্যের আধ্যাত্মিকতা। ইহাতে বিগ্রহ নাই, মন্দির নাই, মন্ত্র নাই, পুজা নাই। ইহার ব্রহ্ম ইতিহাসের সত্য হইতে অভিন্ন, ইহার ধর্ম মানব-প্রকৃতি-শিল্প-কর্ম-প্রেম। ইহাতে ব্রহ্ম নাম অনুচ্চারিত, ঈশ্বর সশরীরে অনুপস্থিত। কিন্তু ইহা সত্য ও আনন্দের সন্ধানী বলিয়া আধ্যাত্মিক। বিষ্ণু-বাবু এই সত্য ও আনন্দের সন্ধানী, আধ্যাত্মিক কবি। মাইকেল ব্রজাঙ্গনাকাব্য লিখিয়াও বৈষ্ণব কবি হন নাই। বিষ্ণুবাবু বুঝিয়াছেন 'পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে'। তাই তিনি আর একখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লেখেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন 'রবিশস্য দগ্ধস্তূপ'। তাই তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের রেশ টানিবার কথা ভাবেন নাই। অথচ বৈষ্ণব-কবি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের ধন।

দেখেছি গড়খাই-পারে দীঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী তাকিয়ে ভাস্বর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর।

এই মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর নবীন কবির হৃদয়ে কোথাও বাজিতেছে, তাঁহার নতুন সঙ্গীতের আরোহণ-অবরোহণের মধ্যে কোথাও মিশিয়া আছে।

চোখের জীবন ফেরে, দেখি নগ্ন যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন, শুধু কষ্টি পাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতি শৃঙ্গারের পাথরে স্তম্ভিত কোথায় সৌরভ?

সেকালের স্বাদ-গন্ধ একালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একালের স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে একত্র হইয়াছে। 'একাল আর সেকাল মেলে কালের বিষহরণে।'

রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের এই ডায়ালেকটিক-বিধানে নবীন কাব্যে উপস্থিত। বিষ্ণুবাবু বিপরীত এক অভিন্নতার তত্ত্বটি বুঝাইয়াছেন তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় (রচনা ৯ মে ১৯৬১)।

স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে তীক্ষ্মতা,
সে তীব্র বিষয় হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মান ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবীই ইমনকল্যাণ ।

এই 'পূরবীই ইমনকল্যাণ' কথাটির মধ্যে বিষ্ণুবাবুর রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে মনোভাব সূত্রাকারে উপস্থিত। পূরবী সন্ধ্যার পূর্বে বা দিনের চতুর্থ প্রহরে গেয়। ইমনকল্যাণ রাত্রির প্রথম প্রহরের গান। কিন্তু কান পাতিয়া শোন জীবনের মহাসঙ্গীতে যেন কত রাগ কত রাগিণী এক ঐকতানে মিলিত হইয়াছে।

একটি অখণ্ড সত্য অভিজ্ঞতা, স্নায়ুতে বিকশি
বাঁধে, তাই এক হয় ইছামতী অথবা তিতাস—
এমনি হাজার নদী—গঙ্গা পদ্মা শোণ বা কিউল।
সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে কোথা, সংলগ্নেরই স্মৃতিতে অধরা
বাঁধা যায় নিজেকে—ও শুদ্ধ কাব্যে নব্য পরম্পরা ।

কাব্য-জগতের এই অখণ্ডতার কথা এলিয়ট্ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার Tradition and Individual Talent প্রবন্ধে 'the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones. but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. এই তত্ত্বটি বিষ্ণুবাবু 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পের আধুনিকতার সমস্যা' গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব ভাবে বুঝাইয়াছেন। তবে আধুনিক কাব্যের কালজয়িতার কথা বিষ্ণুবাবু যেমন বুঝাইয়াছেন তেমন এলিয়ট্ বুঝাইতে পারেন নাই। তাঁহার আধুনিকতার উত্তরসূরি পূর্বসূরির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক সূত্রে যুক্ত। আধুনিকের নেতিচেতনার মধ্যেও এক আনন্দ এবং সেই আনন্দের উপলব্ধিতে আধুনিক কবি সর্বকালের কবি।

অতএব চোখ খুলে ধূসর নেতিতে বিশ্ববীক্ষা
চর্চা করি, ধৈর্যভরে, যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
বর্ণাঢ্য আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে গ্রাম গ্রামান্তরে মানবঋণের,
দৈনন্দিন আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে, ঐতিহাসিক বিষাদে
ট্রাজিক উল্লাসে, তীব্র, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয় সঙ্গীতের মতো।

এ কালের সঙ্গে সে কালের এই অন্বয়বোধ বিষ্ণুবাবুর অন্বয়-মুখী চেতনার একটি দিক মাত্র। কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান মূলত অন্বয়ের অন্বেষণ। সাংখ্যে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্য বা ব্যাপকের অবিনাভাব বা সতত সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বিধৃত তাহার আশ্রয়ে এই অন্বয়ের তাৎপর্য শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ বুঝাইবেন। সাধারণ-ভাবে বুঝিতে পারি যাহা অনন্বিত তাহা অর্থহীন। যাহা অন্বিত তাহা অর্থপূর্ণ। যেমন শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয়ে কথা তেমন চিত্তের সঙ্গে বস্তুর অন্বয়ে ভাব। বেদান্তের শেষ কথা 'তৎ ত্বম্ অসি' কথাটিও এক অন্বয়ের কথা। যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে। মুক্ত কর হে বন্ধ, ইহাও সার্থকভাবে অন্বিত হইবার জন্য প্রার্থনা। আধুনিক মানুষের পক্ষে এই অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সে যেন এক বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জগতের মানুষ। সেখানে কিছুই যেন কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এমন ছিন্ন ভিন্ন জগতের অর্থহীনতাকে সেই আধুনিকেরা alienation বলেন। এই alienation-এ অন্বয়ের অভাব। বিষ্ণুবাবু alienation-এর কবি নন। তিনি অন্বয়ের কবি। একালে alienation-এর বড় ধুম। সেই ধুমে বিষ্ণুবাবু অনুপস্থিত। তাহার অন্বয় বোধের প্রকাশ তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে।

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে-স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝরনা
সহাস জীবনে এনে দিক্
সহজ আনন্দ দিক্ মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সকল ব্যথা বাঁচার সংরাগ

কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সত্ত্ব ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে-চিলে-শালিকে-টিয়ায়
ট্রামে-বাসে পায়ে-পায়ে গ্রামান্ত-শহরে-কলে-মিলে।
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে-বাষ্পে ছাপে রঙে-রঙে আমাদেরও চিদম্বরম।

এই অন্বয়মুখিতা বিষ্ণুবাবুর কাব্যকে উপনিষদের কাছাকাছি লইয়া আসিয়াছে।

স্নায়ুর ঘাঁটিতে

অম্লান পিপাসা আজো হিরন্ময় সত্যের বাটিতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতল জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।
কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালী জলের স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিংবা ফানুস—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে।
অস্তিমের অমর পাথরে খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।

বিষ্ণুবাবুর ভাষার বা স্টাইলের আধুনিকতা তাঁহার ভাবের আধুনিকতার অনুসারী। তাঁহার নতুন ভাব যেমন বাংলা কাব্যের শাশ্বতভাবের সঙ্গে যুক্ত তাঁহার ভাষাও

তেমন বাংলা কাব্য-ভাষার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার স্টাইলের অনন্যতার মধ্যে স্বেচ্ছাচারের চিহ্ন মাত্র নাই। ভাষার শৌখীন নব্যতা তিনি সযত্নে এড়াইয়াছেন। 'নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন'।

সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা ॥

মাইকেল বলিতেন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্য বারবার পড়িতে হইবে। My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is. বিষ্ণুবাবুর স্টাইলের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে এক একটি কবিতা বহুবার পড়া চাই। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চালটা ধরিতে যেমন সেকালের বাঙালীর কিছু সময় লাগিয়াছে বিষ্ণুবাবুর ভঙ্গীভনিতির চালটাও ধরিতে একটু মনোযোগের প্রয়োজন। তিনি বাংলাভাষার স্বধর্ম বুঝিয়ে তাহাকে নিজের স্বধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। এই মিলনের ফলে যে স্টাইলের সৃষ্টি তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই স্টাইলে পল ভ্যালেরি-কথিত ভাষার অন্তর্নিহিত ভাষা দিয়া কবি তাঁহার কথা বলিতেছেন। শব্দের এই ব্যঙ্গার্থ যে কোন সার্থক কাব্যের প্রাণবস্তু। কিন্তু আধুনিক কবির পক্ষে ভাষার সাধনা এক কঠিন সাধনা। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা কত বিচিত্র কথা কত বিচিত্র ভাবে বলিয়াছে। এই ভাষাকে দিয়া নতুন কথা নতুন ভঙ্গিতে শুনাইতে হইলে শব্দের মধ্যে এক নতুন সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিতে হয়। শব্দের রাজ্যে তখন এক নতুন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। চিত্রশিল্পী দেগা একদিন মালার্মেকে বলিয়াছিলেন: 'তোমাদের এই কবিতা-রচনা এক নারকীয় ব্যাপার। কত সব চিন্তা মনে আসে তবু কিছুতেই যেন তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।' মালার্মে উত্তর করিলেন, 'কাব্যের উপজীব্য চিন্তা নয়, শব্দ'। আধুনিক সাহিত্যে 'শবদে শবদে বিয়া'র নিত্য নতুন ঘটকালি, শব্দের সঙ্গে শব্দের নিত্য নবপরিণয়, ভাষার দেহে নব নব যৌবনের উদ্গম।

উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেয়ে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং

সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে, হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব-আনন্দের।

এই খরস্রোত নব-আনন্দের হাজার ছন্দ, ইহার বিচিত্র বীচিভঙ্গ, ইহার হাস্য, লাস্য, ইহার দুকূলপ্লাবী প্রবাহ আবার ইহার মন্থর কুটিল গতি, ইহার অপ্রত্যাশিত আবর্ত আবার ইহার ধীর শান্ত ধারা, ইহার মুখরতা, নীরবতা, ইহার গাম্ভীর্য, ইহার চপলতা বাংলা কাব্যে এক বিশিষ্ট স্টাইলের সৃষ্টি করিয়াছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তগান, বাউলগান, মাইকেলের কাব্য, রবীন্দ্র কাব্যের পরই এমন এক পরিশীলিত পরিমার্জিত স্টাইলের আবির্ভাব সম্ভব। আধুনিকতার বনিয়াদ এক সমৃদ্ধ অতীতে। বিষ্ণুবাবুর স্টাইলের অভিনবত্ব বাংলা কাব্যের এই সমৃদ্ধির ফল।

যে কোন যুগের যে কোন কবির প্রধান কর্ম তাঁহার ভাষার অতীতে লইয়া যাওয়া। প্রাচীন ভারতের অলংকারতত্ত্ব, রস, ধ্বনি, বক্রোক্তি লইয়া সকল আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপের প্রাগ্ স্কুলীয় মতবাদ ওই একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলিতেছেন। কাব্যের ভাষা আমাদের পরিচিত ভাষা হইয়াও ঠিক সেই ভাষা নয়। কাব্যে ভাষা সঙ্গীতে পরিণত। প্রত্যহের ভাষার প্রয়োজন তাহার অর্থময়তার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কাব্যের ভাষা অভিধার্থকে ছাড়াইয়া একটি নতুন অর্থের সন্ধান দেয়। কাজ-কর্মের ভাষা কাজকর্মের সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। কাব্যের ভাষা এক অবিনশ্বর শব্দলোকের সৃষ্টি করে। কবি কি পদ্ধতিতে একটি লৌকিকভাষার আশ্রয়ে একটি অলৌকিক ভাষার সৃষ্টি করেন সে বিষয়ে আলোচনা সম্ভব, সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবে এই ভাষা হইতে ভাষার উর্দ্ধে উঠিবার কাজটি আধুনিক কবির পক্ষে বড় কঠিন কাজ। প্রাচীনতম কবি একটি ভাষার উর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহার স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলিলেন। তাঁহার পরের কবি দেখিলেন প্রাত্যহিক ভাষা ও কাব্যের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহু বিচিত্র বাক্যরীতির সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বিতীয় কবি ভাষার এই নতুন ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করিলেন। ভাষার প্রাচুর্যে তাঁহার কাজ বাড়িল। এই ভাবে বিবর্তনশীল প্রাত্যহিক ভাষা এবং বহুযুগের বহু কবির বিচিত্র ভাষা আধুনিক কবিকে যেন এক ভাষা-জালের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সে জাল মণিজাল হইলেও কবি এই প্রতুলের মধ্যে দিশাহারা বোধ করেন। ভাষার এই প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁহাকে এক নতুন নিজস্ব ভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর বর্তমান যুগে, বিশেষভাবে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া কাব্যের ভাষা লইয়া যে এক তর্ক বিতর্ক তাহার প্রধান কারণ ভাষা ও সাহিত্যের এই বিচিত্র সমৃদ্ধি। গত একশত বছর ধরিয়া আবার যে ভাষা লইয়া

একস্‌পেরিমেণ্ট-এর কথা হইতেছে তাহাও ভাষার এই পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের পরিণাম। কবিকে এখন ভাবিতে হয় তিনি কোন পথে কিভাবে তাঁহার নিজস্ব ভাষাটি খুঁজিয়া পাইবেন।

বিষ্ণুবাবু এই স্টাইলের সাধনায় সিদ্ধ। এই সিদ্ধি আধুনিক বাংলা কাব্যের এক বিশিষ্ট কীর্তি। দেশী বিদেশী সাহিত্যের বহু বিচিত্র কাব্য-রীতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কলা ভাষার জিনিয়াস্ বুঝিয়া এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত বাংলা ও ইংরেজী কাব্যের মিউজিকে অভ্যস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী কাব্য-পাঠকের কানের রুচি মনে রাখিয়া বিষ্ণুবাবু তাঁহার নিজস্ব স্টাইলে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই স্টাইলের লক্ষণ এক কথায় নির্দিষ্ট করা শক্ত। গণিতশাস্ত্রবিদ্ যেমন গণিতের মূল প্রকরণে অধিকারের ফলে বিভিন্ন অঙ্ক বিভিন্ন প্রণালীতে কষিতে পারেন বিষ্ণুবাবু সেইরূপ ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার মূল রীতি রক্ষা করিয়া বিষয় অনুসারে তাঁহার স্টাইলকে চালিত করেন। স্টাইল সম্বন্ধে কোন মতবাদের অনুশাসন মানিয়া তিনি একটি লাইনও লেখেন নাই। বস্তুত তাঁর স্টাইলের একটি বিশেষ লক্ষণ ভাষার ও ঢংএর সারপ্রাইজ বা চমক। উনি যে কখন কি কথা কোন ভাবে বলিবেন তাহা কে বলিবে। এ চমক প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের চমক নয়, এমন কি মেটাফিজিকাল কবিকুলের উইটও নয়। এ যদি শুধু কথার চমক হইত তবে একে চটকও বলা যাইত। এই চমক আমাদের যে বিস্ময় তাহা কবির অনুভূতির বিস্ময় হইতে অভিন্ন।

যাই বল তুমি, পরগাছা নই বটে
পিপুলে না হোক শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎস
তবুও সবুজে মাথায় সরস পল্লবে!
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

প্রথম কথা একটা অন্ত্যমিলের প্রত্যাশা জাগাইয়া ভিন্ন চালে স্তবকটি শেষ করিলেন। অথচ অন্ত্যমিলের অভাবে আমাদের আশাভঙ্গ হইল না। এক অদৃশ্য অশ্রুত অন্ত্যানুপ্রাস যেন এই পাঁচটি লাইনকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে। শেষে মনে হয় মিত্রাক্ষরে এমন অখণ্ডতা সম্ভব হইত না। দ্বিতীয়ত, 'যাই বল তুমি, পরগাছা নই' পদটি একটু হাল্কা ধরণের কথার আরম্ভ বলিয়া মনে হয়। 'পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা' কথাটিও যেন একটু চটুল। কিন্তু তারপর 'পাথুরে মাটির লাল নীরসতা যেন বড় অতর্কিতে একটি গভীর প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিল। আবার 'উৎস'-এর মত তরল শব্দটি লাল নীরসতাকে এক নতুন অর্থ দিল। তৃতীয় স্তরে দেখি ওই 'উৎস' শব্দটির হাত ধরিয়া

সহসা সরস পল্লব কোথা হইতে যেন উঠিয়া আসিল। সর্বশেষে ঋজু কঠিন জীবনের অপ্রত্যাশিত পূর্ণতা পাঁচটি লাইনের অর্থটিকে ফুটাইয়া তুলিল। ভাষার এই প্যারাডক্স ভাবের প্যারাডক্স-এর জন্য অপরিহার্য।

কিন্তু এই সারপ্রাইজ আবার কখনো কখনো বড় সহজে বুঝি না।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ।
এ কূলে ও-কূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে।

আমরা পৃথিবীর মানুষ বেশ একটি সরল কবিত্বময় কথা। আর এ কথার মধ্যে কোন চমকও নাই। অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ কথাটিতে কবিত্বের মাত্রা একটু চড়িল; কিন্তু এও প্রায় ক্লিশে। কিন্তু তবু লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম যে 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত' ইত্যাদির রেটোরিক ইহাতে নাই। কিন্তু যে কবি-সুলভ কথা দুইটি প্রথম দুই চরণে পাইলাম তাহা যেন এক নতুন অর্থ পাইল স্তবকটির তৃতীয় চরণে। স্রোতের এপারে ওপারে যে দুই কলি তা আমাদেরই বর্তমান। টাইম ও স্পেসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জরিপের হিসাবের প্রশ্ন উঠিল। শেষ চরণের প্রথম কথাটি যেন এক হিসাবের খাতা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—'কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও'। এই সারপ্রাইজ গোটা স্তবকটির মধ্যে যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করিল। আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কিছু একটা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরিশেষে আসিল 'বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে'। স্রোত বা এ-কূল ও কূলের সঙ্গে বৃষ্টি কথাটির এক সম্পর্ক ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু আর্তেসীয় জল কি বস্তু? ফ্রান্সের আর্টরিস নামক অঞ্চলে এক ধরনের কূপ খনন করা হয় যাহা হইতে জলের চাপে জল আপনা হইতেই ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উৎসারিত হইতে থাকে। এই কূপ এখন আর্টেসিয়ান ওয়েল নামে পরিচিত। বাংলায় আর্তেসীয় জল কথাটি বেশ তরল, মধুর। তাছাড়া আর্তেসীয় কথাটির মধ্যে আর্ত শব্দটির দ্যোতনাও একটু আসিয়া পড়ে। 'বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে' কথাটি 'কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও' কথাটির আটপৌরে ভাবটি একেবারে মুছিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, এই রকম একটি অপরিচিত বিদেশী শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার পক্ষে যুক্তি কি? একথার উত্তরে প্রথমে বলিতে হয়, দেশী শব্দ অর্থাৎ আমাদের বাংলা শব্দও, বিশেষ করিয়া তদ্ভব শব্দও কখনো কখনো অনুরূপ দুর্বোধ্য হইতে পারে।

মাইকেলের 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে মহামহোপাধ্যায় হইতে হয়। কিন্তু কথাটি কানে এমন সুন্দর বাজিয়া ওঠে যে অর্থটি জানিয়া লইবার ইচ্ছা হয়। অথচ সমুদ্রতীরও ঢেউ শব্দের স্থলে যাদঃপতি, রোধঃ এবং চলোর্মি শব্দের ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলায়ও পাইব না। এই রকম শক্ত শক্ত, অন্ততপক্ষে অপ্রচলিত শব্দ বিষ্ণুবাবু বড় কম ব্যবহার করেন নাই। নেআণ্ডরতাল (বর্বর-ইংরাজী Neander thal), সোৎপ্রাস (সপরিহাস), বুভুৎসা (জিজ্ঞাসা), এই রকম বহু শব্দের প্রয়োগ বিষ্ণুবাবুর কবিতায়। ইহা পেডান্টি্রও নয়, এলিয়টের অনুকরণও নয়। ভাষার চমৎকারিত্বের জন্য কবি অচলিত, বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, প্রয়োজন হইলে এক-আধটি শব্দ সৃষ্টি করিয়াও লইতে পারেন। বিভিন্ন যুগের আলংকারিকেরা কবিকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিতেছেন। এরিস্টটল তাঁহার পোয়েটিক্স গ্রন্থে বলেন : 'Out-of-the-way usages give dignity and transform the common speech ; by out-of-the-way I mean loan words metaphors, extended words and all departures from the standard.' (অনুবাদ, L. J. Potls, ১৯৫৩, পৃ. ৪৯) এরিস্টটল তাহার রেটোরিক নামক গ্রন্থে আরও বলিলেন :—

'A foreign air must be given to the language ; for people are admirers of what is far-off, remote, and all that is wonderful is agreeable' (অনুবাদ : E. M. Cope, ১৮৭৭, ৩য় খঃ পৃ: ১৪-১৫)। ডেমেট্রিয়াস ত বলিয়া বসিলেন 'the usual and familiar diction excites contempt. (on style, অনুবাদ : T. A. Maxon, ১৯৪৯, পৃ ২২০)। হো রেস বলেন :

'It has been, and even will be allowable to coin a word with the stamp in present request. (Art of Poetry, অনুবাদ : C. Smant, পৃ: ৪৬)। জর্জ চ্যাপম্যান লক্ষ্য করিলেন :

'Chaucer had more new words for his time than any man needs to devise now. ('A Defence of Homer,' G. G. Smith সম্পাদিত Elizabethan Critical Essays, ১৯০৪, ২য় খঃ পৃ: ৩০৫)) ড্রাইডেন তাঁহার 'Discourse of Epic Poetry' প্রবন্ধে লিখেছেন :

'When I want at home I must seek abroad. বায়রনের দুটি লাইন এখন স্মরণ করা যাইতে পারে :

Then fear not, tis needful to produce.

Some term unknown, or obsolete in use.

বিষ্ণুবাবু 'বিস্তার ধুন্ধুর পথ' বাছিয়া লইয়া নেআগুরতাল বা আর্তেসীয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। এই শব্দগুলি তাঁহায় কণ্ঠে সুন্দর শুনাইয়াছে, তাঁহার স্বাভাবিক ভাষার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। বাংলা কাব্যের সব পদ যদি 'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে / আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে' প্রকৃতির মত সরল হইত তাহা হইলে সে কাব্যে মাইকেলের স্থান হইত না। বিষ্ণুবাবুর স্টাইল বাংলা ভাষার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, হাজার বছরের বাংলা কাব্য-রীতির এক সার্থক পরিণতি।

আমি বাংলার লোক, ছিন্ন-ভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আম জাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠবিস্তার।

বিষ্ণুবাবুর কাব্যের বাংলা ভাষার এই বলিষ্ঠ বিস্তার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ কীর্তি।

(পুনর্মুদ্রণ)

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যুগের দর্পণে তিরিশের কবি বিষ্ণু দে

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হলেও ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা থেকে থাকলেও, ব্রিটিশ সরকারের তখনকার ভারতসচিব মন্টেগু'র ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়ে ভারতে নামমাত্র স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত ছিলেন। ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাবু সমাজ নরমপন্থীদের নীতি মেনে ইংরেজের সঙ্গে আপোষরক্ষার নিরাপদ আশ্রয়ে চাকরি-বাকরি কিংবা অন্যান্য পেশায় উচ্চপদে আসীন হয়ে দিন অতিবাহিত করছিলেন। বিশশতকের দ্বিতীয় দশকেও তাই ব্রিটিশের দমনমূলক অত্যাচার, দেশের দিকে দিকে সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থান ও তার ব্যর্থতায়ও তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠার উচ্চচূড়া থেকে নেমে আসতে পারেননি যদিও ক্ষীণ আত্ম-জিজ্ঞাসা হয়তো তাঁদের বিব্রত করেছিল।

একদিকে ব্রিটিশের দমননীতি ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ভগ্নোদ্যম হতাশায় বিষিয়ে-ওঠা দেশের জল-মাটি-মানুষের আশা-নিরাশা উচ্চমধ্যবিত্তদের স্পর্শ করেনি-যাঁরা establishment এর নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন জীবনধারণের জন্যে।

সময়ের এই প্রেক্ষাপটেই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়। উচ্চবিত্ত সামাজিক পরিবেশে জন্মেও "অসার আত্মপ্রকাশের গরজে" যাঁরা কলম ধরেন নি তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবী এই দুই কবির কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।

চৈতন্যের এই উন্মেষ উভয় কবির ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে, বিষ্ণু দে-র ভাষাতেই বলি— "টি, এস্, এলিয়টের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়।' বিষ্ণু দে তাঁর অনূদিত এলিয়টের কবিতার

মুখবন্ধে লিখেছেন "এই য়ুরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হলো দেরীতে, বলা যায় প্রায় টি, এস্, এলিয়টের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতায় প্রথম আলোচনা বোধ হয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে, যা পরে ছাপা হলো 'কাব্যের মুক্তি' নামে। সেই এলিয়টের প্রবেশ বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায়, মুখ্যত ১৯২৫ এর কবিতাবলী এবং 'দি সেকরেড উড্' ও 'ক্রাইটোরিয়ান্' পত্রিকা সমেত। বিশ শতকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই, স্নায়ু তখন এক পাহাড়ের চূড়ায়, বেটোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয়, নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনো তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখনো প্রায় সেই তিমিরেই, আজ যে তিমিরে। নেতির সংযমে শিক্ষা সুরু হলো, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হলো কর্মিষ্ঠ, সচল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। জ্ঞানে হলুম আমরা 'গেরোনশন' থেকে 'ওয়েষ্টল্যাণ্ডে'-এ উপনীত।"

এলিয়টের 'Potrait of a Lady', Love Song of Alfred Prufrock' ইত্যাদি কবিতা কাব্যজগতে রূপান্তর আনলো। সমসাময়িক কবি ইয়েটসের মতো এলিয়ট 'গজদন্ত মিনার' খুঁজলেন না বাঁচার তাগিদে, দাঁড়ালেন বাস্তবের মুখোমুখি। তাঁর কবিতায় রূঢ় বাস্তবকে তিনি রূপায়িত করলেন. রূপায়িত করলেন যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডের বিবর্ণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশকে। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই প্রেক্ষাপটই এলিয়টের 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড'। এলিয়টের Prufrock কবিতাবলীতে চিত্রিত হলো শহুরে প্রেম—যাতে ফুলের পেলবতা নেই, আছে পাণ্ডুর সন্ধ্যার রুগ্নতা। এলিয়টের বর্ণনায় এই সন্ধ্যা

'Spread out against the sky
Like a patient etherised on a table'.

ওয়েষ্টল্যাণ্ডে একটি শহুরে মেয়ের যে আলেখ্য এলিয়ট এঁকেছেন তাতে দেখা যায় এই বিবর্ণ পরিবেশে তাও কত অর্থহীন—

'When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smoothers her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramaphone.

আমাদের দেশে একদিকে ব্রিটিশের দমননীতি ও রাজনৈতিক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ভগ্নোদ্যম হতাশায় বিষিয়ে-ওঠা দেশের জল মাটি মানুষের আশা-নিরাশা সমাজের

উচ্চমধ্যবিত্তদের স্পর্শ করেনি—যাঁরা establishment-এর নিরাপদ আশ্রয়ে স্বস্তি খুঁজেছিলেন জীবনধারণের জন্য।

সময়ের এই প্রেক্ষাপটেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মনে অন্তর্দাহ কিন্তু সুরু হয়েছিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতই এই সব বুদ্ধিজীবীরা অন্তর্দাহ ও আত্মবিশ্লেষণে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছিলেন এবং আত্মানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন পরবর্তী উত্তর সাধকদের। কবি বিষ্ণু দে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে বন্ধ্যাযুগের এই সামাজিক বদ্ধজলায় মানসমুক্তি সম্ভব নয়—যার উপমা তিনি খুঁজে পেয়েছেন 'চোরাবালি'-তে।

উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের যে পারিপার্শ্বিক কবিকে অবসাদগ্রস্ত (boredom) করে তোলে তার প্রতি তিক্তজ্বালা ও শ্লেষ নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ। শিকড়হীন ছন্নছাড়া ব্যক্তিত্বের প্রেমও অর্থহীন। অবক্ষয়ী সমাজের প্রেমের অসারতা ফুটে উঠেছে ১৯২৮-এ লেখা 'মন দেওয়া নেওয়া' কবিতাটিতে।

"ভুল যদি আজ ন্যাকামি করে প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।

* * *

ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে।

নতুন তো নেই কিছুই। এখন করবো কী যে?
বেজায় ক্লান্ত শ্রান্ত লাগে!"

উচ্চবিত্ত সমাজের সান্ধ্য পার্টিতে অলকা সুরেশ, লিলি ও তার টেনিসের জুড়ি খসরু বেগের নাগরালি-কে কটাক্ষ করে তিক্ত শ্লেষের সুরে কবি বলে ওঠেন—

"ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াও ডন জুয়ানের বেশে
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে।

ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ড্রইংরুমে—হে অতনু! বীরতনুতে সাজো।

কিংবা

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ ?
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে ওঠে প্রশ্বাসি
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ।"

যৌবনের উদ্দীপনাকে ধরে রাখার জন্যে সুরেশের এই যে আকুতি এর সঙ্গে কোথায় যেন প্রুফ্রক-এর বিষাদের মিল আছে।

এলিয়টের কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের হতাশা ও অবক্ষয় কবি বিষ্ণু দে-কে আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এলিয়টের 'Hollow men' কবিতাটি পাঠ করলে একথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। কবিতাটি অনুবাদ করেছেন কবি স্বয়ং।

"আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস দিয়ে ঢলে পড়েছি এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে! হায়রে!
যখন ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ করি
আমাদের শুকনো গলা শোনায়
শান্তি অর্থহীন
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিম্বা যেন আমাদের সরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাঁচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা

রূপহীন কিমাকার, বর্ণবিহীন ছায়া,
পক্ষাঘাতগ্রস্থ বেগ, অঙ্গভঙ্গী নিশ্চল;

যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে—যদি রাখে
মনে রাখে শুধু
ফাঁপা মানুষ
ফাঁকা মানুষ বলে।

বাসনা আর তৃপ্তির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে
তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালো ছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
প্রভু তোমারই
এ জীবন
প্রভু তোমারই তো সব
এই চালে ভাই দুনিয়া শেষ
এই চালে ভাই দুনিয়া শেষ
দীপ্ত বজ্র নির্ঘোষে নয় কাৎরানিতেই।

একথা এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে সামাজিক অসারতা ও তার প্রতি শ্লেষই বিষ্ণু দে-র কবিতার উপজীব্য নয়। তাই 'চোরাবালি' ও 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পূর্বপ্রতিশ্রুতি আছে, আছে অমোঘ ঈঙ্গিত।

তাই 'ওফেলিয়া' কবিতায় হ্যামলেটের পাগলামির অন্তরালে নতুন মূল্যবোধগুলিকে তার আঁকড়ে ধরার যে আকুতি, প্রেমের প্রতি তার যে নিষ্ঠা এই কবিতায় হ্যামলেটের স্বগতভাষণেই তা প্রকাশিত।—

"তবুও এ দুঃসাহস! বসন্তের সঞ্চিত সংগীত
যদি তুমি ছিঁড়ে দাও, ভেঙে দাও জিয়ানো কুসুম,
স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, দুর্বাদল ঘুম
যদিই জ্বালিয়ে দাও দীপ্ত লঘু কৈলাসের শীতে,
তবুও এ দুঃসাহস, তবু আজ করে যাবো গান।

তুমি যেন এক পর্দায় ঢাকা বাড়ি,
আমি অঘ্রাণ-শিশিরে-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরে।
উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা,

কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা
হৃদয় তোমার দ্যুলোকে বেঁধেছে বাসা ?

ঝোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনো মেঘ
চৈত্রী পূর্ণিমাকে।
আমি যে তোমায় ভালবাসি সেকি তাই শুধু ওফেলিয়া"।

'মহাশ্বেতা' কবিতাটিতেও প্রেমের শাশ্বত মূল্যের প্রতি আস্থা ও সমর্পনের মনোভাব প্রতিবিম্বিত।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ এদেশের সমাজজীবনেও বিপর্যয় এনেছিল। যার অবশ্যম্ভাবী ফল যুব সমাজের বেকারত্ব। তারও উপরে বাঙালী যুবক মাত্রই সন্ত্রাসবাদ কিংবা ভারতের মুক্তিকামী কোনো না কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত—চাকুরির বাজারে ব্রিটিশরাজের মুরুব্বিদের এই সন্দেহ প্রবণতায় বাঙালী যুবসমাজের অবস্থা আরও করুণ ও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। 'বেকার বিহঙ্গ' কবিতায় সেই চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
এ মরা শহরে নীড় সন্ধানী মন
হারালো চতুর উভচর দিশা তার।

জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে থেই—
তবু হায় নেই হাতের নাগালে ডাঁটা
নীলোৎপলের—অনঙ্গ অধরার।
কৈশোরে ছিল ধর্মঘটের শখ,
যৌবনে নয়, মাষ্টার, কেরানীও
বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংস সার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য সে উমেদার।

*　　*　　*　　*

অতএব মেসে কাটাও তক্তাপোষে,
দৈনিক দেখ কাজ খালি কোথা কষে,
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চষে,
আর দেখ বসে সিনেমার পোষ্টার
এলবর্ট হলে তারপরে শোনো বসে
খোলা ইতিহাসে নানা ঘাটে উদ্ধার।

এই কবিতার শেষেই কবি অস্তিবাদে আশ্বাস রাখার জন্যে আবেদন রেখেছেন—

'তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা
রেডিও-সচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নব-আশা—
তবু হে কুমার, খেলোনা শকুনি-পাশা।
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক-না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরোনা অন্ধ বন্ধ জটায়ু পাখা॥

হতাশায় খিন্ন যুব সমাজের প্রতি কবি বিষ্ণু দে হতাশার সঙ্গে জটায়ুর রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছেন। কিন্তু এই সংগ্রাম একক হলে হতাশার চোরাবালি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। নদীর একক স্রোতকে মিশতে হবে সহস্রের সমুদ্র-সঙ্গমে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠার যে আশ্বাস নীহারিকার স্তরে ছিল অথচ আমাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে ভিতরে ভিতরে গড়ে-ওঠার প্রচ্ছন্ন আবেগ ক্রিয়াশীল, 'ঘোড়সওয়ার' শীর্ষক কবিতাটিতে তা একটি তীক্ষ্ণ রূপ নিয়েছে।

'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে, ডাকি-
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

*　　*　　*　　*

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর ?
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

* * *

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার।

ঘোড় সওয়ার-কে উদ্দেশ করে কবির বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছিল—

'হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো ॥
সাতসমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতার ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড় সওয়ার।'

'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থেও এই আত্মজিজ্ঞাসা ও সামাজিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠার গূঢ় ইঙ্গিত আছে। 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটির বক্তব্য অনুধাবন করলে তার যাথার্থ আমাদের উপলব্ধি হবে।

"ফিটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বইনাকো,
বাজার সরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরাণী,

জজকোর্টে উকিলই হয়তো-বা
তেল নেই নিজেরই চরকার।"

* * * *

'কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্ন মুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ অঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীর সম্পূরণে
বেঁধে দিক হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরন্ময় জালে।'

'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে আরো একটি লক্ষণ পরিস্ফুট। পৌরাণিক ঘটনার আলোকে বর্তমানের সামাজিক অবস্থাকে উপস্থাপিত করা—যার ফলে আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গে আরো এক মাত্রা যুক্ত হয়ে তা' অধিকতর ব্যাপ্তি পায়—

'পিতা তার ছিন্নভিন্ন শকুনি ও শিবার আহার
যাযাবর দস্যুদল দমনের পণ্ডশ্রমে হত।

* * *

মাতা তার পথচারী অন্নের আদিম অন্বেষায়

* * *

দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভ-বাহনে
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এলো শ্রাবণ প্লাবনে
গলিত বল্লভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে,
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে।

নিজবাসভূমে পরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল থেকে ক্রমশ জটিলতর পরিস্থিতিতে সমাজ জীবনের পতিত জমিকে বিষ্ণু দে-র মনে হয়েছিল 'চোরাবালি'-র সামিল। সেখানে জীবনের প্রকৃত সাধ, আশা ও আকাঙ্খার সমাধি হয়।

'হে মৈত্রেয় আত্মসহোদর
এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে সাযুজ্য সঙ্গীতে,
অনিমা সঞ্চারী তীব্র তড়িৎ সংবিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী-জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই।"

একদিকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মানসিক মুক্তির আকুতি যেমন চিত্রিত হয়েছে 'চোরাবালি' ও 'পূর্বলেখ' দুই কাব্যগ্রন্থেই তেমনি পাশাপাশি রয়েছে উত্তরণের প্রস্তুতি।

এরপরে চল্লিশের দশকে এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত। এসেছে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্নান। দেশের সেই দারুণ দুর্দিনে মাৎস্যন্যায়ের অসহায় শিকার জনসাধারণের মর্মন্তুদ পরিণতিতে বিষ্ণু দে স্থির থাকেন নি। **Waste land**-এ যে বেদনাবোধ ও হাহাকার এলিয়টকে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের দুর্গে অবশেষে বন্দী করেছে, দিয়েছে রাজতন্ত্রে আস্থা, still centre-এর শান্তি এনেছে তাঁর মনে, বিষ্ণু দে সেই স্থিরকেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মার্কসবাদে প্রকৃত মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। বুঝেছেন এই সামাজিক পরিবর্তন আসলে বিপ্লবেরই সূচনা।

"আলগা মাটির হালকা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানস লোকের বাসিন্দা যত তন্দ্রহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতির পাল,
অর্ধগৃধ্নু অস্ত্রমাতাল ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।
ভেঙেছে আসর কুঞ্জ শূন্য আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙ্গলে, হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল।

কবি সত্যই "Cinna the poet, not Cinna the conspirator." 'সাতভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থে তাই ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগদানকারী 'বেণুর জন্য' তাঁর কবিতা।

উৎসারিত হয়—যার চোখ থেকে এখনো কৈশোরের ঘোর কাটেনি, আগামী ভবিষ্যতের সেই নায়ক—

'ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে নূতন চৈতনাচৈত্য' তারই দুহাতে রচিত হবে। আগামী দিনে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে, বাংলা দেশের অগণিত ছেলে যুদ্ধে যোগ দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ কে আনতে ছুটেছে—

'শ্যাম কম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থেও প্রতীয়মান হয় যে কবি বিশ্বাস করেন যে বৃষ্টিতেই এই দগ্ধদিনের অসহনীয় গুমোট কেটে যাবে, ধুয়ে যাবে সমস্ত পাপের গ্লানি। বৃষ্টি এখানে হয়ে উঠেছে বিপ্লবের প্রতীক।

'পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটের মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধ দিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশান হাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শাস্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোত হানা ও ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে"

বিষ্ণু দে অবহিত ছিলেন যে ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে দেশের জনমানসের সংযোগ নেই। মার্কসবাদকে তিনি সম্পূর্ণ সত্তার অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন—খণ্ডিত চৈতন্যকে স্বীকার করেন নি। 'সাহিত্যের ভবিষ্যতে' তিনি লিখেছেন—'আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্যসাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজজীবনের মরিয়া তাগিদ আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জন সমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতু-বন্ধনের কথা।"

বিষ্ণু দে-র কাব্যে তাই ঘুরে ঘুরে আসে রূপকথার উপকথার জগত থেকে লালকমল, নীলকমল, কঙ্কালী পাহাড় বা সাত ভাই চম্পার রূপকল্প। 'যৌভোগ' কবিতাটি এমন প্রয়াসের সুন্দর উদাহরণ।

"চোর-ডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়
মরীয়া যত রাণীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।
ওদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামার শালে মজুর ধরে গান।"

এই সেতুবন্ধনের প্রয়াসেই বিষ্ণু দে চলে যান শোষিত ও বঞ্চিত সরল সাঁওতাল-উরাঁও লোকগাথার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে উইলিয়ম আর্চরের মতই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। তাঁর কবিতার জগত সরল অকপট সাঁওতাল বা উরাঁও কবিতার অবলম্বন অনুবাদে আরো প্রসারিত হয়ে ওঠে।

"ঘাটে-ঘাটে আজ পল্টন মাঠে-মাঠে
সাহেব বাবুতে দু'হাতে চালায় কোড়া,
পাহাড়ের বুকে বন্দুক বুঝি হাঁটে,
কোন ঘাটে বলো, নামাবো আমার ঘড়া ?"

কিংবা "সিদো কেন তুমি রক্তে করছ চান ?
কাহ্নু বলো তো কেন 'হুল্ হুল্' গান,

* * * * * * *

বেনে ডাকাতেরা আমাদেরই দেশ করে দিন খান্‌খান্।

ছত্তিশগড়ী কবিতার অনুবাদের সেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গও ভোলা যায় না—

"দারোগা সায়েব, এ কী সুখবর
বদলি হলেন !
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম,
দারোগা সায়েব ছাড়া আর কে বা
এক পয়সায় বাজারে কিনতো কাপড় ?"

'পূর্বলেখ' 'সাত ভাই চম্পা' ও 'সন্দ্বীপের চরে' যে মার্ক্সবাদকে বিষ্ণু দে মনন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন 'অম্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে তা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে ব্যক্তিসত্তার অঙ্গীভূত। বলা বাহুল্য মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতীতি ও উপলব্ধি তাঁর মননে এবং কবিতার প্রকরণেও রূপান্তর এনেছে। 'অম্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে বলা যায় তাঁর কাব্য নতুন মোড় নিয়েছে। এর পূর্বপ্রস্তুতি স্থরু হয়েছিল সেই ফ্যাসীবাদ বিরোধী দিনগুলিতে। প্রতি-রোধের ঢেউ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য দেশের কবি শিল্পীরাও সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অত্যাচারী ফ্যাসিস্তদের প্রতি দেশে দেশে প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বাংলায়ও গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু পশ্চিমী লেখক ও শিল্পী কলকাতায় এসেছিলেন এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক আড্ডায় ভাবনার আদান প্রদাত হতো। এই বিদেশী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে তৎকালীন কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের ধ্যান-ধারনার ক্ষেত্রে একটা আন্তর্জাতিক লেন-দেন গড়ে ওঠে। ফরাসী দেশের লুই আরাগঁ, পল এলুয়ারের মত কবির ফ্যাসিষ্ট বিরোধী মনোভাব এবং স্বদেশ ও জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক দরদ কবি- সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নতুন নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থবোধ ঘোষের গল্পগুলি বিষ্ণু দে, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি ছাড়াও বহু সাহিত্যিক ও কবির কাছ থেকে সে সময়ে উজ্জ্বল সৃষ্টিশীল রচনা পাওয়া গিয়েছিল। 'অম্বিষ্টে' বিষ্ণু দে লুই আরাগঁ-র মতই সোচ্চার হয়ে স্বদেশ ও স্বদেশের নিপীড়িত জনসাধারণের কথা বলেছেন—

"স্থতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরনী
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসিকাঠ
নয়নে ঘনায় ছায়া—স্বদেশের জনগণ
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের।"

মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা-কে বিষ্ণু দে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে সমাজনৈতিক বা রাজনৈতিক চেতনা স্বদেশের মাটি ও জনসাধারণের প্রতি মমতায় নিষিক্ত হয়ে ভালোবাসার অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে :—

"আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবন আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।"

এই ভালোবাসার অভিজ্ঞানেই বিষ্ণু দে-র কাব্যে আরাগঁ ও এলুয়ারের মত প্রিয়া ও স্বদেশ এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছে। যে প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে বাসা বেঁধেছিল, স্বদেশপ্রেমেও তার অমোঘ উপস্থিতির ছায়া এসে পড়েছে—ব্যক্তিজীবন মিলেমিশে গেছে বৃহত্তর জীবন স্রোতে ; ভালোবাসার আধার হয়ে উঠেছে নিখিল বিশ্বের অঙ্গীভূত :

"আমি দূরে কখনও-বা পালে-পালে কখনো-বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি, ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জিয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে
তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে ॥"

স্বদেশ ও প্রিয়ার অভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে, 'জল দাও' ছাড়াও 'সেই তো তোমাকেই' কবিতায়।

"কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাও সেই
একই মাটি জল একই নীলাকাশ—
জন্মভূমি যেন, দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, এই গ্রামের থেকে যেই
ও-গ্রামে যাও, তবু কোনোই ভুল নেই
বাতাস এক বয় একই নীলাকাশ।
কোথায় যাবে তুমি ? দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, যেন জন্মভূমি তুমি।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন ছ' মাত্রার ছন্দের মত রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকে বিষ্ণু দে নিজের মত করে বাজিয়েছেন। বস্তুত মাত্রাবৃত্তও পয়ারের মত বাংলা ছন্দে বিষ্ণু দে-র কাব্যে চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হলেও তিনি বাংলা ছন্দ রীতিতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। 'ত্রিওলেত', 'র'দেল', 'ভিলানেল' প্রভৃতি ফরাসী ধ্রুপদী ছন্দেও বহু সার্থক কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। ভিলানেল ছন্দে লেখা কবিতাটি তো অবিস্মরণীয় :—

'সে তরু এ-হৃদয়, তুমি যে তরুমূলে
বসেছ ফুল সাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙাফুলে,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।"

বিষ্ণু দে সারাজীবন কাব্যের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বিষ্ণু দে 'একালের কবিতা' সংকলনটি সম্পাদনার সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে বাংলা কাব্যে মা এবং জন্মভূমি ব্যতীত গরীয়ান বিষয় আর নেই। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত স্বদেশকে যিনি এক আঁচড়ে এঁকেছেন 'চোখে তুমি নন্দা দেবী, কানে তুমি কন্যা কুমারিকা', সেই কবি সারাজীবনই যেন এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করে গেছেন :—

"আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই
অথচ ডালে ডালে শুকনো হাহাকার
অথচ মাঠে মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্লান্তি নেই।

জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষা, না এক মিত্রস্থর!
আকাঙ্খার নীলে রেঙেছে অঙ্গার
চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়
শরীরে মন মেলে মুঠিতে দূর।

*   *   *   *   *

তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই
জীবনে তার, আর সেই হীরার।"

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

বিষ্ণু দে : দ্বিতীয় চিন্তা

একালের বাংলা কবিতায় কবি বিষ্ণু দে-র অবদান যেমন যৎসামান্য নয় তেমনি একথাও সুবিদিত যে তাঁর কবিতা ঠিক সহজবোধ্য কখনো মনে হয়নি। বরং বলতে গেলে তাঁর জীবদ্দশায় যদিও আগ্রহী পাঠকের অভাব ছিল না তবু মেধা ও মননে এই কবি এতোই স্বতন্ত্র ছিলেন যে ব্যাপকভাবে পাঠিত হবার সুযোগ তেমন ছিল কিনা সন্দেহ। কলেজে আমরা যখন ছাত্র, বিষ্ণু দে সেই সময়ে রিপন কলেজের অধ্যাপক। ১৯৩৭-এ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' ভারতীভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিশাল ভূমিকা সম্বলিত হয়ে। আমরা তখন সবে কবিতা লেখা শুরু করেছি এবং আধুনিক বাংলা কবিতার রূপটি কী রকম হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে সচেতন হবার চেষ্টা করছি। 'চোরাবালি'র ভূমিকাটি পড়ে বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে যতোটা অবহিত হয়েছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী অবহিত হয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসমালোচনার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে। কিন্তু ওই ভূমিকায় বিষ্ণু দে-র কবিতার বিষয়ে যেটুকু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল তা তখনকার দিনে আমাদের মতো উঠতি তরুণ কবিদের এই কবিকে, বৈশিষ্ট্যের জন্যে কোনো কোনো দিক থেকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল।

'চোরাবালির' ভূমিকায় 'ওফেলিয়া ও 'ক্রেসিডা' কবিতা দুটি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এই: "যে পাঠকের পড়াশোনা আমার চেয়ে বেশী, তিনি কবিতা-দুটির মধ্যে আরো অনেক কিছু খুঁজে পাবেন।'[১] কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এই মন্তব্যকে অত্যন্ত অতিশয়োক্তি মনে করেছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকায় 'চোরাবালি'র পত্রাকার সমালোচনায় তিনি কবি বিষ্ণু দে কে জানিয়েছিলেন যে সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে যতো বড়ো কবি বলে এই মন্তব্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন আশা করি তিনি অর্থাৎ

বিষ্ণু দে ঠিক ততো বড়ো কবি নন।[২] বস্তুত তিরিশ দশকের শেষ পর্যন্ত কবিতার জগতে বিষ্ণু দে-র অবস্থান সম্পর্কে অনেকেই কৃতনিশ্চয় হতে পারেননি। এই সময়ে তাঁর কবিতাবলী পাঠে তরুণ কাব্যপাঠক আকর্ষণ অনুভব করলেও তখনকার অধ্যাপক সমাজের বেশ একটি বড়ো অংশই ছিলেন উদাসীন। কবি মোহিতলাল মজুমদার এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বাংলা পড়াতেন এবং বিষ্ণু দে-র নাম তাঁর কাছে উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক ছিল। এমনিতেই তিনি তখনকার আধুনিক কবিতাকে 'অতি আধুনিক' সংজ্ঞা আরোপ করে মুণ্ডুপাত করতেন তার ওপর বিষ্ণু দে-র কবিতাবলীকে তিনি এক প্রকারের হটকারিতা ছাড়া কিছু মনে করতেন না। সমকালীনদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত বা বুদ্ধদেব বসুরও বিষ্ণু দে-র কবিতার উপযোগিতা ও স্থায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছুটা সংশয় ছিল 'চোরাবালির' ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিস্তারিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যালোচনা ও বিশ্লেষণ সত্ত্বেও। বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিদেশী বা ভিনদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ প্রায়ই যখন তখন যেভাবে এসেছে তা জটিলতার সৃষ্টি ক'রে কাব্য উপভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করা হ'তো। আমরাও ছাত্রাবস্থায় যখন বিষ্ণু দে-র কবিতাবলী পড়েছি তখন সেসব কবিতার সবটাই আদ্যন্ত বুঝেছি এরকম নয়, মাঝে মাঝেই উপভোগ্যতার পথে বেশ হোঁচট খেতে হ'তো। বলা বাহুল্য অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের জটিলতা এর কারণ নয়, নিছক বঙ্গীয় পরিবেশ অতিক্রম ক'রে বাইরের পৃথিবীর অতীত সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের উদ্যোগের পর্বে পাঠকমন সর্বদা অনুগমন করতে পেরেছে কিনা এই প্রশ্নটাই তখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন 'বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন'[৩] তখন আরো একবার বিষ্ণু দে-র অনেক কবিতাই মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, সুধীন্দ্রনাথকৃত 'চোরাবালির' ভূমিকা পাঠেই একালের কাব্যরসিক বিষ্ণু দে-র কবিতার বহুমুখী বিচার-বিশ্লেষণের কয়েকটি মূলসূত্র হাতে পেয়েছিলেন যার ফলে এই প্রতিশ্রুতিবান কবিকে এড়িয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা রইলো না।

একথা বলা যেতে পারে সুধীন্দ্রনাথই ছিলেন বিষ্ণু দে-র কবিতার সর্বাগ্রগণ্য আধুনিক পাঠক এবং তাঁর মতো পণ্ডিত ও বহুশাস্ত্র পারঙ্গম ব্যক্তি যখন বন্ধুর কবিতার বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে কলম ধরেন তখন তার গুরুত্ব পাঠকের কাছে অনেক বেশী, পাঠক এই মননশীল সমালোচকের কাছে কৃতজ্ঞতা না প্রকাশ ক'রে পারেন না। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় একজন তরুণ কবি অপর একজন বন্ধু কবিকে কাব্যজগতে পরিচিত করার

উদ্দেশ্যে এমন সব ভুয়া তথ্য ও যুক্তির অবতারণায় নিজের বক্তব্যকে কণ্টকিত করেন যা ব্যাজস্তুতির নামান্তর এবং পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কবিতাই যদি তেমন উল্লেখ্য না হয় তাহ'লে নিছক বন্ধুকৃত্য কোনো কবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সে-উদ্যোগ অনতিবিলম্বে ব্যর্থতার চোরাবালিতে তলিয়ে যায়। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে পরস্পরের বন্ধু এবং এই বন্ধুত্বও সুদীর্ঘ কালের। উভয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ধ্যানধারণা এরূপ স্তরে ছিল যার পরিণাম একালের বাংলা কবিতাকে শুধু নয় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের ক্ষেত্রে যেমন মিল ছিল তেমন অমিলও ছিল অনেকটাই বিশেষত বিষয়টি যখন হ'তো সমকালীন রাজনীতির কোনো কোনো প্রসঙ্গ। কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের হানি হয়নি এবং চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক এক সময় অনেক বিতর্কিত প্রসঙ্গ এলেও তিন দশকের অধিক কাল নিছক ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরস্পরের আকর্ষণ অটুট ছিল বলা যায়। অনুমান করা যায় এই অটুট সুহৃদ সম্পর্কের ফলে বিষ্ণু দে-ই অধিক লাভবান হয়েছিলেন যেহেতু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়ো এবং অধীত বিদ্যাও ছিল অনেক বেশী ব্যাপক। পক্ষান্তরে বয়সে কনিষ্ঠ হলেও বিষ্ণু দে-র যুক্তিসমূহকে সুধীন্দ্রনাথও মূল্য দিতেন এবং মুখোমুখী আলোচনায়ই শুধু নয় বিষ্ণু দে-র প্রায় প্রতিটি রচনাই তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েই পড়তেন। অন্য বাঙালী কবিদের সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথকে খুব বেশী উৎসাহিত হতে দেখিনি, এমনকি জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কেও নয়। জীবনানন্দ সম্পর্কে তার মৌনতা বিস্ময়কর, এমন কি উত্তরকালের তরুণ কবি ও পাঠকসমাজের কাছে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত এই কবির দুর্ঘটনাজনিত অকাল মৃত্যুর পরেও সুধীন্দ্রনাথ প্রায় ভাবলেশহীন ছিলেন। জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত মূল্যায়ন থেকে তাই পাঠক বঞ্চিত হয়ে রইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কবি বিষ্ণু দে-র দীর্ঘকালব্যাপ্ত কাব্যচর্চাকে সুধীন্দ্রনাথ যেরকম বরাবর নজরের বাইরে যেতে দেননি সেরকমভাবে সমকালীন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির কবিকর্ম সম্পর্কে তেমন উৎসাহিত হওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ কোনো কাব্যপুস্তক উপহার পেলে সেই কবিকে চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার ও উৎসাহদান সুধীন্দ্রনাথের ভব্যতা, রুচি ও শিক্ষার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাব্যপুস্তক প্রেরণ ক'রে তাঁর কাছ থেকে উত্তাপঘন প্রশংসাসূচক উত্তর পাননি এমন কবি অন্তত আমাদের কালে বিরল যদিও তৎকালীন সাময়িক পত্রসমূহে তিনি তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা কখনো করেছিলেন কিনা জানা যায় না।

কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যপ্রসঙ্গে অনেক সমালোচক এলিয়টকে আলোচনার পরিসরে

নিয়ে আসেন এবং তুলনামূলক আলোচনা করতে পারলে খুসী হন। মনে রাখা দরকার কাব্যজীবনের সূচনায় এলিয়ট বিষ্ণু দে র অতি প্রিয় কবি হলেও 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকালের সময় থেকেই তাঁর কবিতাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পর্যটক। এলিয়ট প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে একবার বলেছিলেন: 'বাংলা সাহিত্যে এলিয়ট তাই বলাই বাহুল্য মার্কস্‌বাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদিনী রাত বটে।'[4] এই চাঁদিনী রাতকে সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ-করা অনেক তরুণ বাঙালী কবি স্বাগত জানিয়েছিল। কখন কীভাবে বিষ্ণু দে এলিয়ট সম্পর্কে সম্যক উৎসাহিত হয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর 'কী করে লেখক হলুম'[5] নিবন্ধে—এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বিষ্ণু দে বলেছিলেন এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠ্‌ল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন।' এবং 'সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে বোধও এলিয়টের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্য অর্থাৎ এক প্রকার কর্মের দীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্দ্ধন দুইই করেন।' এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে দুজন কবি রবীন্দ্রনাথকে এলিয়টের কবিতা তথা আধুনিক কাব্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। এ বিষয়ে দুই কবিবন্ধু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলে নিয়েছিলেন এরকম অনুমান করা যায়। কলকাতা থেকে এলিয়ট সহ অন্যান্য কিছু আধুনিক কবিতার বই সুধীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং সেইসঙ্গে অনুরোধ ছিল আধুনিক কবিতা সম্পর্কে কিছু লিখতে। পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' নিবন্ধটি তারই ফলশ্রুতি যেটি পরবর্তী সময়ে 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। ওই সময়ে বিষ্ণু দে অনুবাদ করলেন এলিয়টের 'জার্নি অব দি মেজাই' এবং সুধীন্দ্রনাথকে দিলেন পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। সুধীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়লেন এবং প্রস্তাব দিলেন অনুবাদটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে একবার দেখিয়ে আনা যাক। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু দে এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। বিষ্ণু দে কৃত ওই অনুবাদটি যখন রবীন্দ্রনাথ মেজে ঘষে ও কাটাকুটি ক'রে ফেরৎ পাঠালেন তখন দেখা গেল সেটি একটি স্বতন্ত্র রচনা হয়ে উঠেছে, বিষ্ণু দে কৃত অনুবাদ হিসেবে কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না। সুতরাং অনুবাদটি পরিচয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ হিসেবেই ছাপা হয়েছিল। এই বিষয়টি আমি জেনেছিলাম অনেক বছর বাদে কবি বিষ্ণু দে-র কাছেই, কথা প্রসঙ্গে। বিষ্ণু দে কিন্তু তাঁর 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর অনুবাদ (তিনি যেরকম অনুবাদ করেছিলেন) অনেক পরে ছেপেছিলেন পঞ্চাশ দশকের কোনো এক সময় 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায়। ফলে রবীন্দ্রনাথ

ও বিষ্ণু দে-র একই কবিতার অনুবাদের তুলনামূলক বিচারের একটি সুযোগ থেকে গেল।

কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকেই আমার মনে হয়েছে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে একাল পর্যন্ত জীবনানন্দের পরেই বিষ্ণু দে নানা কারণে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তার পুনরাবৃত্তি এখানে অনাবশ্যক মনে করি। অবশ্যই বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি অমিয় চক্রবর্তীর অবদানও কম নয় কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় সময়ের পটভূমিকায় মাঝে-মাঝে যে প্রচণ্ড বাঁক ও আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে সেরকম খুব কমই চোখে পড়বে। এ বিষয়ে যাঁরা আমার চেয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রসর তারা তুলনামূলক ভাবে আলোচনা ক'রে দেখাতে পারেন, আমি উল্লেখ করলাম মাত্র। বিষ্ণু দে দীর্ঘকাল কবিতা লিখেছেন এবং অজস্র কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতাকে অন্তত তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব কবিতা রচনার শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তীকাল, দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন কবিতাবলী এবং তৃতীয় পর্বে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকাল থেকে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের এমনকি কিছু কিছু সত্তর দশকের লেখাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একালে কেউ যদি বলেন ভবিষ্যতের কাব্যপাঠকের স্মৃতিতে কবি বিষ্ণু দে কেন বেঁচে থাকবেন তাহ'লে তার একটিই উত্তর : ফর্মের জন্যে। একথা সকলেরই জানা যে বিষ্ণু দে কবিতার ফর্ম নিয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষা করেছিলেন সেরকম তিরিশের অন্য কোনো কবি করেছেন কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে বিষ্ণু দে-র সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস অবশ্যই উল্লেখ্য। কবিতার ফর্ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় বিচ্যুতি ছিল না একথা অবশ্য বলা যায় না। যে সুধীন্দ্রনাথ 'চোরাবালি'র ভূমিকায় বিষ্ণু দে-র কবিকৃতির সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন তিনিই উত্তরকালে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থে (কলকাতার সিগনেট প্রেস কর্তৃক পঞ্চাশ দশকে প্রকাশিত) ছন্দের ও শব্দ-ব্যবহারের নানা অসঙ্গতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রকাশিত 'সাত ভাই চম্পা' সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসু ও অরুণ মিত্রের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাংলা ছন্দের মিশ্র ব্যবহারও মাত্রাযোগের ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র গঠন শৈলীকে কোনো কোনো সময় উদ্বেগজনক মনে হয়েছিল তাঁদের কাছে। বিষ্ণু দে এই ধরণের অভিযোগ সম্পর্কে কখনো কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। আর কারুকে না হোক সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সেরকম কোনো পত্রাদি তিনি লিখেছিলেন কিনা জানা যায় নি।

অথচ বিষ্ণু দে-র কবিতাবলী সমগ্রভাবে ঐতিহ্যরহিত নয়। বরং বলা যায় দেশজ

ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যবাহিত দিকটি সম্পর্কে বেশ কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে ওই তিন কবির স্বাতন্ত্র্যকে তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর কবিতার ভাষা কখনো ঊর্মিমুখর কখনো আশ্চর্য সরল। একদিকে তাঁর রচনায় যেমন বিষয়ের নানা বৈচিত্র্য তেমনি বিষয় অনুযায়ী তিনি ছন্দপ্রকরণেও বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টিতে অবিচলিত থেকেছেন। একই কবিতায় এমন কি একটিমাত্র স্তবকেও মিশ্র ছন্দের প্রয়োগ অনভ্যস্ত পাঠককে হতবাক করেছে। সমালোচনাও হয়েছে কিন্তু বিষ্ণু দে পরোয়া না ক'রে তাঁর অন্বিষ্টের সন্ধানে এগিয়ে যেতে ইতস্তত করেননি। আত্মসমর্থনে বাদানুবাদে যাওয়া ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ, তিনি সম্ভবত এই ধারণাই পোষণ করতেন যে, কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে যদি বিষয় বা আঙ্গিককে ধরা না যায় তাহলে নিছক ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার প্রয়োজন থেকে যায় সামান্য। বিষ্ণু দে যে ইদানীং তেমন পঠিত নন এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে অশোক মিত্র যে কথা বলেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি :

'যাঁরা উদ্ধত সাহস নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে বাংলা কবিতায় নতুন স্বাদের প্রবাহ আনতে চেয়েছিলেন, সফল হয়েছিলেন ভীষণভাবে, পেশাদার সাহিত্য-বিশ্লেষকদের বাইরে, ক'জন আর হালে তাঁদের কবিতা পড়েন ? বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তী-সমর সেন, এই নামগুলি সকলেরই জানা, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যবসায় বা উচ্ছ্বসিত প্রেম নিয়ে তাঁদের কবিতা ক'জন আর পড়েন এখন ? কবিতার সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে কবির সংখ্যা। কিন্তু সম্ভবত সে কারণেই, চিত সাঁতার কেটে কেউই আর তেমন রাজি নন চল্লিশ বছরের পুরোনো ঘাটে ফিরে যেতে। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে যে-যে কবিতা লেখা হয়েছিল সেই সব কবিতা দীর্ণ করেই সাম্প্রতিক কবিতার জন্ম ; এটা শুধু ঐতিহ্যের ব্যাপার নয়, জরায়ু তথা ঔরসের সম্পর্কেও। কিন্তু এই মুহূর্তে ক'জন আর মানতে রাজি হবেন তা ?'[৩]

কিন্তু বিষ্ণু দে সম্পর্কে তরুণতর কবি গবেষকদের মধ্যে এখন পর্যন্ত যে অনুসন্ধিৎসা বর্তমান তার নিদর্শন মাঝে-মাঝে পাওয়া সম্ভব। প্রয়াত হবার পর বিষ্ণু দে-র বিষয়ে যেক'টি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে একাধিক তরুণ সমালোচক যে তাঁর কাব্য-আলোচনার গভীরে যেতে পেরেছেন এরূপ উক্তি অবশ্যই করতে পারা যায়। আশির দশকে গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় দেব, শুভ বসু এবং আরো কয়েকজন তরুণ সমালোচকের আলোচনায় সমগ্রভাবে এই আভাসই মেলে। এবং এই আভাসও মেলে যে একালে তিরিশের কবি

গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে—তাঁদের রচনার ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীর কথা মনে হতে পারে বটে কিন্তু শেষোক্ত কবিদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন কারণে যার বিচার-বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

সমসাময়িক কালের কবিদের মধ্যে অন্তত দু'জন কবির প্রসঙ্গ মনে আসে যাঁরা কবি বিষ্ণু দে-র মতোই মার্জিত রুচি ও কবিতার শোভন বিন্যাসের জন্যে এক সময়ে শিক্ষিত পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দু'জনেই, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র, একালের পাঠকসমাজে তেমন সুপরিচিত না হলেও কালচেতনার দিক থেকে বিষ্ণু দে-র সমগোত্রীয় ছিলেন বলতে পারা যায়। এঁরা দু'জনেই তিরিশ দশকে বিষ্ণু দে-র ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং কবিতার নির্মাণকার্যে বিষ্ণু দে-র তিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবিতার সমীপবর্তী হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় চঞ্চলকুমার সমর সেনের মতোই বহু বছর আগেই লেখার জগতে লেখনী সংবরণ করেছেন যদিও অন্য সব দিক থেকেই ভাবনাচিন্তায় সমকালীন ও সক্রিয় হয়ে আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ তিরিশের দশকে এবং অপর একটি ছোট কবিতার বই (প্রেমের কবিতা) প্রকাশিত হয়েছিল ষাটের দশকের শুরুতে। একালে তাঁর একটি মাত্র কবিতা ('রাজকুমার') খুঁজে পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' কাব্য সংকলনে। জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র অবশ্য তুলনায় অনেক বেশী সুপরিচিত এবং লিখেছেনও বেশী। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মধুবংশীর গলি' যখন চল্লিশ দশকে প্রকাশিত হয় তখনই ভারতের কোকিলকণ্ঠি কবি ও রাজনীতিবিদ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। দুঃখের বিষয় চল্লিশ দশকে সদা সক্রিয় থাকলেও জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র পঞ্চাশ দশকে দিল্লী চলে যান এবং ক্রমে তাঁর কাব্যরচনা স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি এখন প্রয়াত।

মেলামেশার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে কবি বিষ্ণু দে-র শান্তস্বভাব, মার্জিত রুচি ও সাহিত্যবিচার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। বিতর্কিত প্রসঙ্গে যাওয়া কিংবা তাই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না বলেই তাঁকে কোনো প্রসঙ্গে উত্তেজিত করা সহজ ছিল না। নিজের ধ্যানধারণাকে তিনি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন এবং কোনো বিতর্কিত বিষয়ে প্রভাবিত বা প্ররোচিত হওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বিতর্কিত বিষয়ে তিনি সহসা মতামত দিতে চাইতেন না। কিন্তু অনেক সময় দু'চারটে মন্তব্য যদিও বা করতেন তাতে মিশ্রিত থাকতো কিছুটা রহস্য, কিছুটা কৌতুক। দিল্লীতে জাতীয় কবিসম্মেলনে কবিতাপাঠ বা রবীন্দ্রনাথের মোটর গাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্রমনের বর্ণনায়ও এই রহস্যপ্রিয়তা ও কৌতুকের অভাব

ছিল না। যতোদূর দেখেছি বিষ্ণু দে সভাসমিতিতে বিশেষ যেতে চাইতেন না, নিজের প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ীতে বসে আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় তাঁর সহজ অভ্যাসের ভেতর ছিল। 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' পুরস্কারপ্রাপ্তির সময়ে দু' সপ্তাহের জন্যে সোভিয়েট দেশ ঘুরে আসার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু তিনি যান নি। বস্তুত কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে আসা কঠিন ব্যাপার ছিল। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে কয়েক বছর কবিতামেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় অগ্রজ জীবিত জ্যেষ্ঠ কবিদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এই উপলক্ষে একটি ক'রে স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। যেবার বিষ্ণু দে র সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ছিল সেবার চেষ্টা ক'রেও তাঁকে সভার মঞ্চে হাজির করা যায়নি। আমরা বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনাপত্র ও অন্যান্য উপহারগুলি (মালা, গ্রন্থ ইত্যাদি) সমর্পণ ক'রে সুখী হয়েছিলাম।

সুতরাং সুখী হয়েছিলাম যখন বিষ্ণু দে সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত এমন একটি ছোট সভায় আসতে সম্মত হলেন যেখানে টি, এস, এলিয়টের মৃত্যু উপলক্ষে একমাত্র আমাকেই প্রবন্ধ পাঠের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাঁর উদার উপস্থিতিকে আমার প্রতি প্রীতির চিহ্ন হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৬৫-র লেক স্টেডিয়ামের সেই সভায় এলিয়ট সম্পর্কে নানা ধরণের টুকরো টুকরো কৌতুক কথা সেদিন তিনি শ্রোতাদের শুনিয়ে ছিলেন।

সূত্রনির্দেশ

(১) স্বগত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩৪৫ প্রথম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ২১২

(২) কবিতা। চৈত্র ১৩৪৪ পৃষ্ঠা ৫৭

(৩) এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য। 'টমাস স্ট্যর্নস্ এলিয়ট' নিবন্ধ। পৃষ্ঠা ৮০

(৪) এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য।

(৫) সাহিত্যচিন্তা পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত। সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৬৯-৭৩

(৬) সাহিত্যচিন্তা। বিষ্ণু দে স্মরণ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯০

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণু দের কবিতায় প্রেম ঃ প্রতীক্ষা

'জীবন উদগ্রীব প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষা না এক মিশ্র স্বর !'

কন্‌ভেন্‌শন্‌সের চর্চার মধ্যে থেকেও মধ্যযুগীয় রোমান্টিক বৈষ্ণবকাব্য বিরহের রিক্ত-শাখায় প্রতীক্ষার ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছিল রাধার প্রেমের চলিষ্ণুতার জন্য। তার আগে প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ অনুভূতি ভারতীয় কাব্যে তীব্রতা পায়নি এমন কথা বলা আমাদের অবশ্যই অভিপ্রায় নয়। কিন্তু আদিরসকে অনন্তরসে পরিণত করতে গেলে সমুদায় আলঙ্কারিক উক্‌টামের জের থেকে ব্যক্তিসত্তাকে যে মুক্ত করে নিতে হয়, পদাবলীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আনুকূল্যেই বৈষ্ণব কবিরা তা বুঝে নিয়েছিলেন। কেবল বিরহ একটা অভাবাত্মক অনুভূতি মাত্র। প্রতীক্ষা পৃথক অনুভূতি। বিরহে সুনিশ্চয় শুধু প্রেম। প্রতীক্ষায় প্রেমাসম্পদও সুনিশ্চিত। প্রতীক্ষায় বেদনা আছে, দুঃসহ অস্তিত্ব যাপন আছে—কিন্তু শূন্যতা নেই। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার প্রতীক্ষার দুই মুখকেই ফুটিয়ে তোলে। যে অপেক্ষামান আর যে ধাবমান দুজনেই প্রতীক্ষাপ্রাণিত। বিরহ নিশ্চল। কিন্তু প্রতীক্ষা অনেক বেশি দ্বান্দ্বিক। 'অবশ্য' এবং 'অথচ'-এর মধ্যে তার দ্বন্দ্ব। তথাপি বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রতীক্ষা শেষ পর্যন্ত কন্‌ভেন্‌শন্‌স-চর্চার অভ্যস্ত ছকে বাঁধা পড়ে গেছে।

প্রেমের কবিতায় প্রতীক্ষার উপলব্ধি অবশ্যই সম্পূর্ণ নতুন হ'ল রবীন্দ্রনাথে। সেখানে সেই সম্পূর্ণতার কারণ মূলত প্রতীক্ষকের আধুনিক ব্যক্তিত্ব। প্রতীক্ষিত নয়, প্রতীক্ষকের স্বতন্ত্র উপলব্ধিই সেখানে প্রতীক্ষাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। প্রতীক্ষকের অনুভূতি সেখানে অভাবাত্মক নয়। সে অনুভূতির মূলকথা প্রতীক্ষকের জীবন সমালোচনা, সে অনুভূতির

মূলকথা প্রতীক্ষকের অন্তর্গূঢ় গতিশীলতা। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' গানটির কথা ধরা যায়। এখানে বিরহটা মোটেই কোন কথা নয়। মিলনের আভাসটিই আসল কথা। সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ এই প্রতীক্ষার অনুভূতি সুদৃঢ় রয়েছে একটা বিশ্বাসের উপর। সে বিশ্বাসটাই আনন্দস্বরূপ—তাই একথা পরম প্রত্যয়ে উচ্চারিত—আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। প্রতীক্ষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই প্রেমকে করে তোলে চরিত্রবান। প্রতীক্ষক প্রতীক্ষার ভিতর দিয়ে বুঝতে পারে সব কিছুই রচনা, সব কিছুই অর্জন। যার জন্য প্রতীক্ষা, সকল কিছুই যেন বলে, তিনি আসুন বা না আসুন, এই প্রতীক্ষাই আসলে তিনি। বাধা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে বেড়ে ওঠে। গতি তার পূর্ণতার দিকে। যার জন্য প্রতীক্ষা সেও পূর্ণ হতে থাকে প্রতীক্ষকের চেতনায়। প্রতীক্ষা অপরার্থে প্রস্তুতি। 'যেন সময় এসেছে আজ / ফুরালো মোর যা ছিল কাজ'—এখানে 'কাজ' মানে আয়োজন। আয়োজন সারা। প্রায় তিনি এসে পড়েছেন—'বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে'। প্রতীক্ষা কোনো সংশয়ের ছায়ায় ধূসর নয়। উদ্বেগ আর সংশয় তো এক কথা নয়। সংশয়ে আছে কিছুটা অবিশ্বাস। উদ্বেগ প্রতীক্ষার তীব্রতার সূচক।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথ আর বিষ্ণু দে দুজনেই তাঁদের প্রেমের কবিতায় প্রেমকে ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিমানসের বন্ধনমুক্তির আকুলতা হিসাবে। যে বিবিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সচেতন মানুষের অভিজ্ঞান, প্রেমের আকুলতায় উৎকণ্ঠায় সেই অনন্বয়কে অতিক্রমণের আকুলতা। মধ্যযুগীয় কবি চণ্ডীদাস সেই আকুলতার স্বরূপ অনুধাবন করেই বলেছিলেন প্রেম সুখস্বরূপ নয়, দুঃখস্বরূপও নয়। 'চির অস্থির উদাত্ত এক শান্তি'—এই কথায় আধুনিকোত্তম কবি বিষ্ণু দে যখন প্রেমের চরিত্র নির্দেশ করেন, তখন চণ্ডীদাস-সংক্রান্ত উপলব্ধি আরেক মাত্রা পায়। কীভাবে বৈষ্ণব কবিতার উপাদান, বৈষ্ণব কবিতার পরিস্থিতি প্রসঙ্গ এবং কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে আধুনিক আলোয় নতুন করে তুলেছেন তা দেখার জন্য আমরা চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র তিনটি কবিতার এখানে তুলনা-বিচার করব। মূল কবিতাটি হল চণ্ডীদাসের 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা'। প্রতীক্ষকের জন্য আকুলতাও একটা প্রতীক্ষা। প্রেম ও প্রতীক্ষার সেই উৎকণ্ঠায় নায়িকা বেপরোয়া কঠিন হয়ে উঠতে চায়—সামাজিক পিছুটানকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। সে বলে—'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে'। রবীন্দ্রনাথের 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি' গানটির ভাববীজ বৈষ্ণব কবিতাটির মধ্যেই নিহিত।

এমন কি চণ্ডীদাসের নায়িকা যেখানে ঘরে তথা সংসারে আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ার ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নায়িকা সেখানে বলে—

রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে—
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে।
কঠিন বাধা লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি।
(১৯২১ / ২৯শে আগস্ট)

কিন্তু রবীন্দ্রপদে 'আমি'-র উপর স্বরপ্রাধান্যটা লক্ষণীয়। বৈষ্ণব নায়িকা বলেছিল 'মোর মনে হেন করে'। সে বস্তুত আগুন লাগিয়ে দেবে কিনা আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা কিন্তু 'মনে হয়' বলেনি। সে সটান তার দৃঢ় সংকল্পকে ব্যক্ত করেছে। তিলেকের জন্যও সে নিজের সংকল্পকে শিথিল হতে দেবে না। কবিতাটি বর্ষার কবিতা, বর্ষামঙ্গলের গান। কিন্তু একুশ সালের পটভূমিকায় কবিতাটি রচিত একথা ভুলে যাবার নয়। দুর্যোগঘন রাত্রে অস্তিত্বের কাছে নূতনের বার্তা বহন করে যে এনেছে, সে তো মুক্তিরই বার্তাবহ। 'আগমন'

কবিতার শেষ স্তবকে যে-কথা বলা হয়েছে এই গানটিও সেই কথাই বলে প্রেম-প্রতীক্ষার রূপকে। বৃহত্তর ও মহত্তর প্রেমকবিতা বস্তুত জীবনপ্রেমের কবিতা। প্রেমাস্পদ সেখানে প্রতীক। সংকল্পবাক্যটি তাই এত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানটিতে তিমিররাত্রির পথিক আগন্তুক অপরিচিত। যে যুগ আমাদের জীবনের আঙ্গিনায় হাজির তার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য চিত্ত তখন ব্যাকুল।

বিষ্ণু দে-র 'সপ্তপদী' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে পূর্বোক্ত দুটি কবিতার পরিকাঠামোয় পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই নায়িকার উক্তির আধারে যা বলার কথা তা বলেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় পরিস্থিতিটি একই থাকলেও নায়কই এখানে বাঙ্ময়। সে বলে :—

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।

'পান্থপ্রেমের এই গুরুভার'—নায়কের গতিবেগ ও দায়িত্বঘনতাকে ব্যঞ্জিত করছে। বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রকবিতার প্রাকৃতিক পটভূমি এখানে নদী ও মেঘের 'বজ্রআবেগের উল্লেখে আরো বেশি ঘটনাসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। 'আকাশ ছড়ানো বিজন বাট' যেন পথিকের নিঃসঙ্গতার উপযুক্ত পশ্চাদ্‌পট। কিন্তু প্রেমই পাথেয়—কারণ আবারো অন্য

একটি বৈষ্ণব পদের আংশিক পরিগ্রহণের প্রয়োজন হল—'এই দুর্যোগে ঘরকে বাহির, তুমি ছাড়া বলো, বাহির ঘর কেই বা করবে?' এ কবিতাতেও অহং-এর মুক্তির মূলকথা আত্মদান। 'আত্মদানের সে নীল আকাশে বিরাট শূন্য বাঁধবে কে তুমি ছাড়া বলো?' দেখতে দেখতে বিষ্ণু দে-র কবিতায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে এক 'তুমি'। প্রেমিকার আধারে যা কিছু ধৃত হয়েছে, নারীমহিমা, স্বদেশপ্রকৃতি, তত্ত্ববিশ্ব—যা কিছুর জন্য সম্বিতের সজাগ সাধনা, যা কিছুর জন্য সত্তার স্মৃতিদীপিত প্রতীক্ষা, সব কিছুই এই 'তুমি'।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রেম তাই শুধুই প্রেম নয়। বিষ্ণু দে-র হ্যামলেট এ যুগের যন্ত্রণা জটিল জিজীবিষায় ওফেলিয়াকে বলেছিল—

> ঝোড়ো-হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনো মেঘ
> চৈত্রী পূর্ণিমাকে।
> আমি যে তোমায় ভালবাসি সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া?

এই তিনটি পংক্তি তিরিশের দশকের স্বপ্নহর সমস্ত রূঢ়তাকে স্বীকার করেও জীবনের বিশালত্বের বন্দনা। প্রশ্নে প্রোথিত রয়েছে অমোঘ সত্য—প্রেম মানে মহাজীবনের অঙ্গীকার। বিশ বৎসর বাদে 'এলসিনোরে' কবিতার নায়কের ওফেলিয়া সম্ভাষণ ভিন্নতর পটভূমিকায় ভিন্নতর পুরুষার্থের অভিপ্রায়ে প্রগাঢ়। কিন্তু তা হলেও সে সম্ভাষণ যেন পূর্বোক্ত নিবেদনেরই সম্পূরক:—

> এখানে যখন প্রাসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
> ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এলসিনোর তো কারা
> দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুন
> হাওয়ায় কলুষ লুব্ধ পাপের খুন।
> তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস!

এই আহ্বান তো সংগ্রামী নায়কেরই প্রাণময় প্রতীক্ষা।

॥ তিন ॥

কবি নিজেও মনে করতেন অন্বিষ্ট থেকে তাঁর নতুন পর্যায়ের আরম্ভ। 'অন্বিষ্ট'-এ বিষ্ণু দে পৌঁছে গেলেন যেখানে তিনি প্রথম থেকে পৌঁছতে চাইছিলেন। 'অন্বিষ্ট' থেকে তিনি এবার ব্যাপ্ত হবেন। প্রেম প্রকৃতি ও তত্ত্বপ্রত্যয়ের মিলিত বিন্দুতে সম্বিতের মুক্তি প্রতীক্ষা 'অন্বিষ্ট'-এ আরো বেশী আলোকসম্পাতী। রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের অন্ধকার চেতনা যেমন দুই কবির নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধীয় দ্বান্দ্বিক জ্ঞানের দান, বিষ্ণু দে-র অন্ধকার-চেতনাও তেমন তাঁর দেশকালপাত্রবোধের ফল। প্রতীক্ষা—যার অপর নাম প্রেম—তা ঐ অন্ধকারের পটে আলোকের বিভাসরাগের জন্য। প্রতীক্ষা পূর্ণ হয়

কিনা এটা বড়ো কথা নয়। আসল কথা হল প্রতীক্ষায় স্পন্দিত থাকা। 'তুমি'-র মাত্রা অর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'-র ও অহংমুক্তি অম্বিষ্ট-পর্যায়ের কবিতাগুলির বাদী সুর। ধ্রুপদী স্ট্রাক্‌চারে পাশ্চাত্য সিম্‌ফনির আদলে সম্বাদী সুরের সহযোগে প্রেমিকের কণ্ঠে জিজীবিষাই হয়ে ওঠে প্রেমিকা-সম্ভাষণ। সে-ই হয়ে ওঠে কখনো 'মালিনী', কখনো 'উষসী' অথবা 'আনন্দভৈরবী'। 'অম্বিষ্ট'-এর 'প্রতীক্ষা' কবিতায় 'উষসী' নামে যাকে ডাকা, যার উদ্দেশে বলা :

> উষসী ! সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ উধা হৃদয় ?
> কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি ?
> তিন পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়
> খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
> আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ ?
> আভাস ! পেয়েছি হে অনামিকা।

সে যদি আপাত পরিগ্রহণে প্রকৃতিই হয়, তা হলেও গভীরার্থে সে-ই জীবন। গভীরতর অর্থে সে-ই প্রেম। রিখিয়ার প্রকৃতিচিত্রের উপাদান এখানে বাস্তবের রূপক। এ রূপকের ব্যবহার 'অম্বিষ্ট' পর্যায় থেকেই সম্পন্ন হয়েছে। অন্য কবিতায় যখন এ ছবি ফুটে ওঠে 'পাথুরে মাটির লাল নীরসতা ধ্বংসে / তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।/এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য', তখন শালগাছের প্রতীকে জীবনের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বই মূর্ত হয়েছিল। 'প্রতীক্ষা' কবিতায় প্রকৃতিই প্রেমের রূপক। প্রেমই জীবনের রূপক। 'অম্বিষ্ট'—নাম-কবিতাটিতে তখনকার জীবনের বাদবিসম্বাদ-কুৎসা-রক্ত ইত্যাদির পটে প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাসের অব্যর্থতায় বিশ্বাস—প্রেমিকের প্রত্যয়ের সঙ্গে সে ইতিহাস-বিশ্বাস একীভূত। তাই বলা হয় :

> তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
> দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
> তোমার আসা ইতিহাসের কাল।…
> বিজ্ঞ বলে এ বুর্জোয়া চাল।

এই ইতিহাস-চেতনার দীপ্তিতে বিষ্ণু দে-র প্রেমিকসত্তা ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দেয় বেশি। আর সত্যই তো সে কেমন প্রেম, যার স্মৃতি সত্তাকে ভবিষ্যতের দিকে চলিষ্ণু করে তোলে না ? প্রতীক্ষা এক হিসাবেই সেই চলিষ্ণুতার অপর নাম। নদীর যেমন বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলা মোহনার উদ্দেশে এও তেমনি, কেননা স্থির দাঁড়িয়ে তো প্রতীক্ষা নিষ্প্রাণ হয়ে যায় বাইরের দিকে স্তব্ধ হলেও ভিতরে ভিতরে সে সদাই সমুদ্যত।

অন্তর্মুখী জননীর মতো সে প্রতীক্ষা গম্ভীর বটে, কিন্তু সমাসন্নের ধারক। ভবিষ্যমুখী তার দৃষ্টি, তার চলা। প্রতীক্ষকের উচ্চারণের প্রগাঢ়তায় তাই আবারও ছায়া ফেলে বৈষ্ণব পদাবলী :—

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক
বেহাগে বাজাবে বীণ ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিম্বা সূর্যাস্তের মেঘে
পূব পশ্চিম রাঙা
আকাশ শিকলভাঙা
ঘুম ভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে।
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন।

প্রতীক্ষা প্রেমিকের প্রত্যয়ের আরেক দিক। দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি, অথবা এখন তখন করি দিবস গমায়নু, দিবস দিবস করি মাস—দুটোই প্রতীক্ষকের উচ্চারণ—কিন্তু প্রথমটিতে প্রতীক্ষকের কোন অনিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়টিতে সে কথা বলা যাবে না। শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়, এ কথায় আছে প্রতীক্ষাকে সাধনায় রূপান্তরিত করার সংকল্প। বিষ্ণু দে প্রতীক্ষাকেই যখন বলেন 'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা' তখন কিন্তু ব্যাপারটাই অন্য মাত্রা পায়। বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতায় চোখের জল নেই, ধূসর বিষণ্ণতা নেই। সে কবিতার দুই ধারে বীর্যবান প্রেম আর বীর্যবতী প্রতীক্ষার যুগল মিলন। এই অর্থে তাঁর কবিতায় চির অস্থির উদাত্ত এক শান্তির স্বীকৃতি। —যেমন জেনেছিলেন দান্তে এক দিক থেকে। চণ্ডীদাস আর এক দিকে। 'জল দাও' কবিতায় বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সংগ্রাম প্রতীক্ষাকে করে তুলেছে জীবনের নিরন্তর 'হয়ে ওঠা'-র রূপক। তাই প্রতীক্ষা জীবনব্যাপ্ত নানা রূপেরই আলেখ্য :

তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গ আতত
বালা সরস্বতী কিম্বা রুক্মিনী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিম্বা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত

লক্ষণীয় শিল্পীর প্রতীক্ষা, মানবীর পর্যাপ্ত হবার প্রতীক্ষা, আর, বীরের প্রতীক্ষা—শেষপর্যন্ত সবই প্রেমিকের প্রতীক্ষায় চূড়ায়িত। প্রেমিকের অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞতা কেমন করে মহাজীবনের অঙ্গীকারে রূপান্তরিত হয় তার দেখা পাই 'এলসিনোরে' কবিতার এই স্তবকে :

> তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
> ভাস্বরতনু তুমি আগামীর সতী।
> তুমি নির্মাণ ধ্রুতারার গান
> আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
> তুমি সখী বধ্ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

॥ চার ॥

তারপরে ধীরে ধীরে যখন অভিজ্ঞতা সংহত হয়ে এল মৌক্তিক দৃঢ়তায় তখন রচিত হয়েছে 'ক্লান্তি নেই'। প্রেম-বিরহের প্রচলিত চতুঃসীমাকে ছাড়িয়ে জীবনার্থসন্ধান এ কবিতায় মুখ্য। স্বপ্ন আর প্রতীক্ষা এখানে সেই জীবনার্থের দিকেই অঙ্গুলী সঙ্কেত করছে। মিশ্রসুর এখানে অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় প্রবহমানতার অন্যনাম। এই রচনার সঙ্গে প্রদত্ত শ্রীমতী প্রণতি দে-র পত্রটি এখানে পাঠককে দেখতে অনুরোধ করি। অঙ্গার আর হীরকের সম্বন্ধটি তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কবিতাটির বীজবক্তব্য আমার কাছে অন্তত এইটি—'তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই জীবনে তার আর'। এ উক্তি প্রেমিকের, কর্মীর, শহীদের, সাধকের, সন্ন্যাসীরও বটে। 'শান্তি নেই' কোনো নেতির অনুভূতি নয়। তা এক সতত যন্ত্রণার সাক্ষ্য। সে যন্ত্রণায় অঙ্গার সময়ের দীর্ঘ দহনে হীরকে পরিণতি পায়।

যন্ত্রণা আর প্রেম একই অনুভূতির পাপড়ি আর সৌরভ। ফুলের ফুটে ওঠার প্রতীক্ষায় যে পূর্ণতার সাধনা সেটাকেই কবি বলেছেন 'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা'। সে যন্ত্রণায় 'আমি' আর মুখ্য থাকে না। প্রধান থাকে না প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির আশানিরাশা। সে এক আত্মস্থতা, সে এক আশ্চর্য মানসিক অবস্থা। আমি এখানে এমন একটি গোটা কবিতার উদ্ধৃতি দেব, যাতে মোটে ২৯-টি শব্দ, যাতে মোটে ৫টি পংক্তি। কবিতাটিতে একবারও 'আমি' শব্দটি নেই। এমন কোন ক্রিয়াপদ নেই যার কর্তা হতে পারে একবচনাত্মক উত্তমপুরুষ। কবিতাটি মিলন মুখ্য নয়, বিরহমুখ্যও নয়। মিলন বিরহ নিরপেক্ষ এক অনাসক্ত অথচ প্রশান্ত প্রতীক্ষা কবিতাটির প্রাণ :

রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে।
রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে।
দিন কোথা? দিন নেই, প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষায়।
রাত্রি যায় আসে।

প্রতীক্ষা কতখানি অসহনীয় সে কথা আর বলার দরকার নেই। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার আততি বা টেনশনের কথাও আর নেই। পরিণত প্রজ্ঞা, অভিনিবিষ্ট ইতিহাস চেতনা যেন বলে ছিল প্রতীক্ষাই ভবিতব্য। এই অতি মিতবাক কবিতাটির পিছনে রয়েছে একটি দীর্ঘ কবিতার নান্দনিক অভিজ্ঞতা। কবিতাটি 'পাঁচ প্রহর'। সেখানেও মুখ্য হয়ে উঠেছে এক প্রতীক্ষ্যমান প্রশ্ন:

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায়?
তাই তো তন্ময় রাত্রি দিন, সে তো রাত্রি দিন
প্রাত্যহিক পালে সে দিন রাত
ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ—
মথুরা ভেঙে যায় এ নিষ্ঠায়?

পুনরায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ প্রয়োগে তীক্ষ্ণতা দেওয়া হল দীর্ঘ প্রতীক্ষার অনুভূতিকে। 'রাত্রে সে আসেনা' কবিতায় কবি এই সীমাকেও অতিক্রম করলেন। প্রতীক্ষার চিরন্তন মূর্তিতে প্রেমের বিশাল বৈভবের স্বীকৃতি। 'পাঁচ প্রহর' কবিতার শেষতম স্তবকে দিন রাত্রির যে যুগল বন্ধন, যে দ্বৈত বিহারের কল্পনা তারও আর দরকার নেই। 'রাত্রি যায় আসে' কবিতায় রাত্রিই আসল কথা। দিন কেটে যায় রাত্রির পথ চেয়ে, রাত্রেও তো যার আসার কথা সে আসে না। শুধু শিশির হাওয়ায় গন্ধটুকু ভাসে। মনে পড়ে সেই অক্ষয় পংক্তিটি আবার—'বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে'। তাৎক্ষণিকতার উপরে কালান্তরের ছায়া পড়ে। এই প্রতীক্ষার মৃত্যু নেই। এ প্রতীক্ষা আনন্দস্বরূপ। সূর্যোদয়ে যার শুরু, জাগরী রাত্রির অতন্দ্র নিমেষ-হীনতাতে তাকেই লালন। তখন যে আনন্দ যন্ত্রণার মুক্তি একমাত্র শিল্পে। অপরাজেয় সঙ্গীতে, অথবা চিত্রের বর্ণোৎসবে তা তখন 'প্রখর মুক্তিতে নন্দিত'।

প্রেমকে বিষ্ণু দে দেখেছেন বিশ্ব যোগে। 'উত্তরে থাকো মৌন' কাব্যগ্রন্থে নাম

কবিতায় বলা কথাটি এখানে স্মরি :

এই প্রেম অবিভক্ত।
বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয়—
মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায়।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
নামকীর্তনে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, চিরায়ুষ্মতী তন্বী!
তাই আদিকাল থেকে বাঁচি অনুরক্ত।

তুমিই বাহুতে হিম হৃদয়ের বহ্নি।
তুমিই প্রাণের সত্তা, স্ব... সত্য॥

প্রেম বিশালতার ঠিকানা এনে দেয় বলেই সে বিস্ময়কর। সে বিস্ময় জীবনের বিস্ময়! বিরাটের সম্বন্ধে যে চেতনা বিষ্ণু দে-র প্রধান নিজস্ব অভিজ্ঞান, তাঁর প্রেমও সেই অভিজ্ঞানেই মুদ্রাঙ্কিত।

কার্তিক লাহিড়ী

পদ্যে তাঁর স্মৃতিচারণ গল্প হয়ে ওঠে

স্মৃতি ও প্রগতির সম্বন্ধ ব্যস্ত অনুপাতের, নাকি উভয়ে অসম্পর্কীয় প্রশ্নটি কূট সন্দেহ নেই। এর উত্তর কোন্ বিশেষজ্ঞের এক্তিয়ারে পড়ে তা নিয়ে জটলা হতে পারে বেশ। তবু মনে হয় প্রগতির মধ্যে স্মৃতি কাজ করে যায় সংগোপনে খুব। অনেকের মতে স্মৃতি জারিত করেই প্রগতির চলন সঠিক দিশা পায়, অথচ স্মৃতির মধ্যে প্রগতি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে রোমন্থনের অবিরলতায় যখন তখন। এটা কি ঘটে কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলে বা শূন্যের কোঠায় গড়ালে বার্ধক্যে জীর্ণতার অতিরিক্ত চাপে কিংবা বাস্তবের অসহ ভারে কাঁচের স্বর্গে বা অন্য কোথাও আশ্রয় নিলে পর?

অথচ স্মৃতি শান্ত হয়ে এলে তার ভিতর থেকে উঠে আসতে পারে শিল্প-সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিসব, তাতে প্রগতির ছোঁয়া থাকে কিনা ঐ বিষয়ে পারদর্শী খুব না হলে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি লোকের পক্ষে বলা মুস্কিল, তবে সময় সময় স্মৃতি চারণা নতুন ধরণের সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে, পদ্যে তা এনে দিতে পারে ভিন্ন স্বাদের হয়ত বা সম্ভাবনাময় অন্য এক গড়ন।

"আমার হৃদয়ে বাঁচো" কাব্যে বিষ্ণুদের তেমন কয়েকটি স্মৃতিচারণ অনুলিখিত হয়ে ঠাঁই পেয়েছে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে, বিষ্ণু দে তখন রোগশয্যায়, নিজের হাতে লিখতে অশক্ত হয়েছেন কিছুটা হয়ত। এই অংশের ছ-টি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি 'বাঁকুড়ার দুইজন' অনুলিখিত নয়, তাতে স্মৃতির বদলে বরং প্রশংসাই জুড়ে থাকে অনেকখানি যামিনী রায়কে ছুঁয়ে বাঁকুড়ার স্থির এক মনীষী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির। বিদ্যানিধি 'বিজ্ঞানে বা বেদজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে পরম' ছিলেন এবং 'আত্মপ্রচার নয় ... / এই জীবনে তাঁর সাধনা চরম' ছিল, সেই জ্ঞান তপস্বীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোই

কবিতাটির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে লেখাটি এই অংশে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যদি প্রথম অংশে থাকতো, স্বস্তি মিলতো হয়তো বেশি। কিন্তু লেখার ধরণটি যেমন তাতে প্রশস্তিতে যেন কোথাও মিশে থাকে স্মৃতি, 'শুধুই বিদ্যানিধির স্বরে' এরকম বাক্‌ভঙ্গি সেই রেশটি ধরিয়ে দেয় মনে, তাই ঐ বিভাগের অন্তর্গত হয়ে গেলে দোষের হয় না কিছু তেমন।

অল্প বয়সে বিষ্ণু দে গুটিকয় গল্প লিখেছিলেন স্বনামে ও বেনামে। গল্প লেখা সম্বন্ধে হয় তাঁর মনোভঙ্গি যথেষ্ট উৎসাহ মূলক ছিল না মোটে, নয় নিজের গল্প সম্বন্ধে পুরোপুরি প্রত্যয়ী ছিলেন না তিনি। ফলে তাঁকে নিতে হয় কোনো কোনো গল্পে ছদ্মনাম, অথচ কবিতায় পুরাণের প্রয়োগ তিনি অবলীলায় করেন যথোপযুক্ত ভাবে, সেই পুরাণের আলতো ছোঁয়ায় আনুষঙ্গিক গল্পটি কবিতার মধ্যে তবু গল্পের আদরা এনে দেয় না। তখন মনে হয়, বিষ্ণু দে গল্প-কে বুঝি তেমন আমল দেন না সৃজনশীলতার বৃত্তে। তবু কি আমরা কোনো ঋজু সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি এ বিষয়ে, যখন গল্প লেখা, কয়েকটি লিখে আর না লেখা-র কৈফিয়ৎ ও কারণ আদৌ পাই না খোদ লেখকের কাছ থেকে কোনো ?

অনেকে বলেন, যেমন দিন আসে রাত্রি আসে ঘুরে ফিরে ঠিক ঠিক, কিংবা বৎসর বৎসর এক একটি ঋতু আবার, মানুষের আবেগ ইচ্ছা অভীপ্সার তেমন আবর্তন ঘুরে ঘুরে আসে জীবনের এক এক পর্যায়ে, যেমন শৈশব নাকি ফিরে আসে বার্ধক্যে, তবে শিশুর সারল্য তখন বার্ধক্যের মননে ঋদ্ধ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই কি প্রথম বয়সে তাঁর থেমে-যাওয়া গল্প লেখার ইচ্ছা ফিরে পাই জীবনের শেষ প্রান্তে লেখা গুটিকয় স্মৃতিচারণার পদ্যে স্পষ্ট ভাবে ?

'আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ ও গান', 'জ্যোতি ঠাকুর', 'স্মরণীয় সেই দিনটি' এবং 'মোহিনী চ্যাটার্জি' চারটি কবিতার প্রাথমিক পাঠই সেই কথা মনে করিয়ে দেয় অন্তত। একেবারেই স্মৃতিচারণা, মনে হয় শ্রোতা কেউ বসে আছেন সামনে কিংবা নিজের মনেই বলা নিজেকে শোনানো যেন-এমন, আর সেই স্মৃতিচারণায় সুতো পদ্যে গল্পের আদল তৈরী করে দিতে থাকে অকপটে, গল্প তৈরীর জন্য সেই রোমন্থন নয়; যেন স্মৃতি আপনা থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে বুনে দিচ্ছে গল্পের পরিলেখ, তারপর একসময় গল্প হয়ে ওঠে বেশ।

ধরণ তার তবু রাবীন্দ্রিক নয়, পুনশ্চ'-র পথ-ও অনুসৃত হয় না তখন, কারণ 'পুনশ্চ' ছিল এক সচেতন চেষ্টা পদ্যের বেড়ি ভাঙার, আবার 'লিপিকা'-কে রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন "গানে গাওয়া যায় না ভাবছ ?" (সংগীত-চিন্তা ১৯৬৬ পৃ ২০৫) তাঁর ইচ্ছাও ছিল

গদ্যে সুরসংযোগের। বিষ্ণু দের গদ্যের চলনে সাংগীতিক রেশ কোথাও অটুট থেকে যায় যেন, তাঁর প্রবন্ধ পড়লে তা টের পাই অনেক সময়, কারণ তিনি কথ্যভাষার ছন্দ স্পর্শ নিয়ে এসেছিলেন গদ্যের গভীরে, আর এই সব কবিতায় মুখের কথাই কেবল নয়, মনের কথাও কথ্য-র মতো উপচে পড়ে অনায়াসে তখন—

১. বিরাট পুরুষ বিচিত্র সুন্দর তাঁর দৃষ্টি !
তিনি নাম শুনে বললেন ; ও তুমি এসেছ ?
—প্রণাম করলুম ! (আমাদের পরিবারের পুরুষদের মধ্যে
সচরাচর নিয়ম ছিল না।)
সেই চোখ মুখ আশ্চর্য সুন্দর !

২. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—
ও তোমার ছেলে ?
ওকে আমার গুহাটা দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।
গুহাটা ওঁর গর্ব ছিলো
—পাহাড়ের উপরের দিকে—
আরো উপরে ওঁর লেখাপড়া শোবার ঘর—
সুন্দর বিস্তারিত দৃশ্য দূর প্রান্তরে মেলে দিতো।

আরো পদ্যাংশ বা গোটা কবিতা উদ্ধৃত করে দেখানো যায় তা। যেন তিনি খাঁটি সাংবাদিকের মতো বিবরণ দিয়ে চলেছেন বিনা মন্তব্যে নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে, কিন্তু তাঁর কাছে সংবাদ মূলত কাব্য, তাই ঐ নীরেস নিরেট বিবরণ আচমকা ভরে যাচ্ছে তন্ময় ছোঁয়ায়, তবু তা খবর ও মন্তব্যের সরল কিংবা যৌগিক মিশ্রণ নয়, যা আজকাল পত্র-পত্রিকায় আকছার পরিবেশন করা হয় খবরের নামে। বিষ্ণু দে নিছক বিবরণ দিতে দিতেই এক মোচড়ে অনন্য করে তুলছেন আবেগে মমতায় স্মৃতির মোড়কে সেই সব বিবরণ, তুলে আনছেন অন্য এক মাত্রায়—

অমিতা, খুকু, সরল উত্তর দিলে, সহজ স্বরে :
তা তো বলবেই ; লেখক বলবে—চাঁদের পাশে কলঙ্ক !
পরেই, সেই মেয়ের আবেগ ভরা কণ্ঠে শুনলুম—
ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে ? —দেবে কে ?
কবে সে চলে গেছে, অলক্ষ্যে রেখে গেছে আনন্দ,
দখিন হাওয়ায় পথিক হাওয়ার পথে ;

অন্যান্য কবিতাতেও এ ধরণের উত্তরণ ঘটে কবির তন্ময়-মন্ময় কারুকৃতির স্বাভাবিক

দক্ষতায়। কবিতাগুলি আবার মোক্ষম মোচড় খায় একেবারে শেষের মুখে, সেই মোচড়ে স্মৃতিচারণ রোমন্থন ছাড়িয়ে গল্প হয়ে ওঠে লহমায় চমক দিয়ে খুব—

১. সেদিন বইটি ফেরত দেবার কথা—
ঠিক একমাস পরে, সকালের খবরের কাগজে চমকপ্রদ খবর
পরম শক্তিশালী ব্রিটিশ রাজ্যের দিনরাত্রির পাহারা এড়িয়ে
সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের এলগিন রোডের পৈতৃক ভবন হতে অন্তর্ধান

২. রিকশায় বসেও লিখতেন
—এই ছিলো তাঁর বেড়ানো—
সময়ের একান্ত সদ্ব্যবহার?
রাঁচীতে গেলেন, স্বাস্থ্যের কারণে,
কলকাতায় আর ফেরেন নি॥

৩. মোহিনীবাবু খুব খুশী হলেন—
শেষ কথা ক'টি এখনও মনে গেঁথে আছে—
বললেন আমায়—
"দাও তো বইটি
আমার ছেলেকে দেবো—খুশী হবে সে।"
নিউ রিপাব্লিক ম্যাগাজিনটি
হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন"

আমরা জানি স্মৃতিচারণা গল্পগাছার মতো হয়ে ওঠে সাধারণ ভাবে, এবং তা শুনতেও ভালো লাগে। হয়ত আমাদের মধ্যে অন্যকে জানবার একটা কৌতূহল আছে কিংবা অন্যের কিছু মন্দ কথা জানতেও হয়ত ভালো লাগে বা অন্য আরো কিছুর জন্য স্মৃতিচারণা আমাদের টানে। অবশ্য স্মৃতিচারণার এক ঘেয়েমি বিরক্তিও জন্ম দিতে পারে মধ্যে মধ্যে, শোনা যায় বয়েস বাড়লে অতীতের কথা বলতে শোনাতে ইচ্ছে করে খুব। তখন তেমন আশঙ্কা জাগতে পারে মনে স্বাভাবিক ভাবে। এ-রকম সম্ভাবনা অবশ্য বিষ্ণুদের কবিতায় আদৌ লক্ষ্য করা যায় না, কারণ তিনি স্মৃতির মধ্যে রোমন্থনকারীর বর্তমান ভাবনা-চিন্তা অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লাগান না যেমন, তেমনি অতীত ছিল স্বর্ণময় এমন প্রগলভতাও প্রশ্রয় দেন না। খুব নিরাসক্ত ভাবে ভাবাবেগে প্লাবিত না হয়ে আবেগ অনুভবগুলোকে ঠিক ঠিক সংযত রেখে তিনি পরিবেশন করেছেন সেই সব বিষাদ মধুর বিষণ্ণ স্মৃতি সব।

বিবরণে এভাবে বাড়তি আবেগ না থাকায় অতীত অ-রঞ্জিত থাকা পরবর্তী

অভিজ্ঞতার ছোঁয়া না লেগে—একেই হয়ত অন্যকথায় বলা চলে শিল্পীর নিরাসক্তি। তবু কেমন করে এই বিবরণ নিছক কবিতার মধ্য দিয়ে পদ্য হয়ে ওঠে সহজ সরল অবাধ গতিতে, আর সেই পদ্য স্তবকে স্তবকে ধাপে ধাপে উঠে গল্প তৈরী করে ফেলে পাঠককে চমকে দিয়ে খুব কিন্তু লেখার স্বাভাবিক রীতিতে—এসব মনোযোগী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে এক সময়।

আর আমরা কৃতার্থ হই এই ভেবে যে দারুণ অসুস্থ হয়েও তিনি যতদিন পেরেছেন নিজের সৃষ্টিশীলতা থামতে দেন নি। নিজের হাতে লিখতে না পারলেও দারুণ কষ্টের মধ্যেও চিন্তা-ভাবনাকে বাক্ রহিত করেন নি চেতনার শেষ সীমায় পৌঁছুনো অব্দি। আর তার ফলেই পদ্যে তাঁর স্মৃতিচারণ গল্প হয়ে ওঠে খুব আধুনিক মেজাজের বিষাদে হাহাকারে আশার কথনো বা।

অনন্ত কুমার চক্রবর্তী

তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস

আমাদের সেই কৈশোর-ভাঙা প্রথম যৌবনে, সংপমাত্র যখন বৃহত্তর জীবনের প্রশস্ত অঙ্গনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, তখনই চোখের সামনে দেখতে হলো দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ মহামারী খুন দাঙ্গা আর অবিশ্বাসের এক ভয়াবহ একটানা মিছিল। তখন মহাকবির প্রায় অন্তিম কাব্যেই যেন আমরা পেয়েছিলুম আমাদের সেই আতঙ্কিত অস্তিত্বের এবং সংহত স্ফটিকাকার রূপ : 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি / মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।' ঐ মহাকবির কণ্ঠেই আবার পর মুহূর্তে যখন শুনলুম তাঁর শেষ অবিস্মরণীয় বাণী : 'অনায়াসে সে পেরেছে, ছলনা সহিতে / সে পায় তোমার হাতে / শান্তির অক্ষয় অধিকার', তখন সেই শান্তির তাৎপর্য সেদিন তেমন করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি যদিও মাঝে মাঝে হৃদয় দুলে উঠতো এই মহামন্ত্রোচ্চারণে যে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' কিন্তু সেই বিশ্বাস চিরকাল রক্ষা করবো এমন ভরসা তখন কোথায়!

তারপর দেশ স্বাধীন হলো, একটা মুক্তির হাওয়াও বইলো, কিন্তু স্বাধীনতার সেই মুক্ত বাতাস যেন বুক ভরে গ্রহণ করতে পারলুম না, কেন-না ঐ যে আপোসে-পাওয়া স্বাধীনতা ওর সঙ্গে সঙ্গেই এলো দেশবিভাগ, আর দেশবিভাগ হতে না হতেই দেখলুম আরও এক বিভ্রান্তিকর চিত্র, যা কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায়,

> '…কতো ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
> পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
> কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
> কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি বা ঢাকায় …।'

ছিন্নমূল জীবনের এই মর্মান্তিক কাব্যরূপ তখন-তখনই অবশ্য নজরে আসে নি,

এসেছিল বেশ কিছু পরে। কিন্তু, বিষ্ণু দে র কবিতায় যেমন দেখেছি আমাদের অবস্থাও ছিল অনেকটা, সেই রকম: 'নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে।'—সত্যিই সে এক অদ্ভুত দিশেহারা অবস্থা! অচিরেই দেখলুম, 'হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন' এবং আমাদের প্রার্থনাও তখন: 'তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস'।

১৯৫১ সালের কাছাকাছি সময়ে সেদিনকার এক অপরিণত যুবক, কিছুটা প্রাণের টানে, কিছুটা মার্কসীয় লেনিনীয় জীবনবীক্ষার উল্লাসে, কিছুটা-বা জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভের আগ্রহে, জড়িয়ে পড়লো রাজনীতির জটিল আবর্তে। কিন্তু সে-ও এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, ভ্রান্ত কিছু ঝোঁকের দায়ভাগ তখন দলের রাজনীতির সর্বাঙ্গে প্রকট, চোখের সামনে—'সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ।' তার পরে এলো প্রায়শ্চিত্তের পালা। অসহিষ্ণুতার কিছুটা আভাস এর আগেও কিছু কিছু পেয়েছিলুম। এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও শুনতে হলো, বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে, যে ১৯৩০ সালে রুশভ্রমণের আগে তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল আর রুশভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি হয়ে উঠেছেন প্রগতিশীল। রাজপথে মজুর-চাষী-ছাত্রছাত্রী হত্যার ওপর জনৈক কবিয়ালের কবিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রশ্ন করা হলো, পারেন কি বিষ্ণু দে এমন কবিতা লিখতে? কেন যে বিষ্ণু দে এমন কবিতা লিখতে যাবেন তার কোন জবাব ছিল না। অথচ আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলুম সেই বিষ্ণু দে-ই লিখতে পারলেন কলকাতার রাজপথে সেদিনকার সেই স্বদেশী হত্যালীলার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি:

> 'আর তুমি – তুমিই কি মরণের কূট ভ্রূকুটিতে
> পথের ধুলোয় পড়ে'? বরণীয় তনু হিম প্রাণ
> হীন প্রাণহীন পড়ে' পথের ধুলায় পড়ে' রক্তময় বসন্তের প্রাণ?
> এ কি বা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে?
> ওড়াও ঊর্মিল বীজকল্প হাহাকার, স্মৃতি পাতো মর্মে মর্মে ভিতে
> ঘনিষ্ঠ সম্বিতে
> তোমার নিথর দেহে প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী!
> সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।'

রাজনৈতিক বিভ্রান্তির পর যখন প্রায়শ্চিত্তের পালা আসে তখন যেটা স্বাভাবিক সেটাই দেখা দিয়েছিল সেদিন: নানা রকম হতাশা সন্দেহ অবিশ্বাস, এমন কি বেশ কিছু কুৎসাও। সেদিন বিষ্ণু দে-র কবিতাতেই আমরা আশ্বাস পেলুম:

> 'কুৎসা শুধু কুয়াসা, হবে ভোর
> উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।'

আমরাও সেদিন বিষ্ণু দে-র ভাষায় বুঝে নিয়েছিলুম বিজ্ঞজন 'মূঢ় রাগে' যা-ই বলুন, অন্ধকারেও উষার ভৈরবী শোনা যাবে। নতুনের সম্ভাবনায় যে কাঁপছে তাকে বোঝাতেই বোধ হয় বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় বারবার ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজের-তৈরি-করা এক বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় শব্দ: 'বীজকম্প্র'। 'বামে বিচ্ছেদে দক্ষিণে ভিক্ষায়' জীবন যখন দুঃসহ মনে হয়েছে তখন তিনিই আমাদের শোনালেন:

'কি বা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডুকভায়ের
তত্ত্ব কথা কিম্বা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।'

তিনিই আমাদের জানালেন উৎসর্গিত-প্রাণ 'তরুণ কুমারে'র সেই দুরন্ত আক্রোশের ভাষা, তার রূপ:

'তাই তো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।'

এ ছিল আমাদের তখনকার তরুণ আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে মহৎ আর সবচেয়ে তীব্র কাব্যরূপ। আমরাও সেদিন যেন আমাদের সামনে 'সেতুর ফাটলে' প্রত্যক্ষ করেছিলাম —'অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান'। আমাদের প্রতীক্ষার হৃদ্‌স্পন্দনও সেদিন ছিল ঐ রকমই আবেগতীব্র:

'...প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গ আতত
বালা সরস্বতী কিম্বা রুক্মিনী দেবীর মতো
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—'

আশ্চর্য ভাষা, আশ্চর্য উপমা-নাচের ও তালের প্রাণস্পন্দে ছন্দিত:

'জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর', অথবা—
'আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাৎ মন্দ সঙ্গতে তাল দেয় নি।'

মাঝে মাঝে এদেশের অন্তঃসারহীন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের প্রতি কিছু তীব্র বিদ্বেষও ঝল্‌সে উঠেছে, যেমন 'উধাও ইংরেজি ঘোড়া রেখে গেছে হাজার সহিস', কিম্বা 'আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ', কিম্বা 'দেশমাতৃকার পায়ে চাকুরে আরতি" অথবা এদেশের ব্যবসাদারী স্বার্থের খর্বতার প্রতি তীক্ষ্ণশ্লেষ : 'থালের পুঁটি কি দেখে কমলে কামিনী / দাস পায় প্রভুর মহিমা', কখনও-বা ঘৃণা :

'প্রাদেশিক, গ্রাম্য, তুমি নেহাৎ মাঝারি
তুমি তো কিছুই নও ধনী নও এমন কি নও তার ছবি
নও তুমি ভিখারি পথিকও।'

কখনও-বা পেয়েছি এদেশীয় উচ্চতলবাসীদের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা : 'এ হাতে দালালি আর ও হাতে হালালি'। এঁদের স্বভাবের কদর্যতা কবি খুলে ধরেন সুতীব্র ঘৃণায় : 'এর কানে দেয় ওর বিরুদ্ধে শলা / ওকে গিয়ে বলে এরা কেটে দেবে গলা', কিম্বা 'নিজবাসভূমে পরবাসী সদা চাল / আকাশের ছাদে ভেঙেছে তার কপাল', ইত্যাদি। কিন্তু এককালে আমাদের মহাকবি যেমন বলেছিলেন বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্যে : 'তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার', তেমনি একালের কবিও জানালেন প্রচণ্ড প্রত্যয়ে—

'সমুদ্রে আর ওদের তো ঠাঁই নেই
সে নীল এদেশ এই নীলকণ্ঠেই।'

কিছু পরে এই কবিই আবার বললেন,

'আমার মুক্তির স্বাদ জানে না কো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অস্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।'

তাঁর কাব্যেই বারবার আসে সাধারণ জীবনের সঙ্গে গভীর একাত্মতা—

'আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান···
আমরা সবাই মিলে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগত
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে···'

কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তখন কণ্ঠ মেলাই,

'আমারও অস্মিষ্ট তাই
অণুর সংহতি'

মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করি :

'হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।'

কবি দেখেন 'মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কী বিস্বাদ,' তবু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন : 'তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ', বরং তিনি চান আমরা

'…সবাই যেন ভাসি
তুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিম্বা
আলোর ঝর্ণায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।'

আমাদের অনেক সাময়িক বিভ্রান্তির মুখে আমরা তাঁর কাছেই পেয়েছিলুম তাঁর আশ্চর্য পৌরাণিক পরোক্ষোক্তি :

'…নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে।'

আজকের মতো সেদিনকার তরুণরাও তাঁদের প্রবল জিজ্ঞাসায় এক রকম করে বুঝে নিয়েছিল যে সমাজের মৌল রূপান্তরের আকাঙ্খা কেবল আকস্মিকের খেলা নয়, তার জন্যে প্রথমে নিশ্চয়ই দরকার নিজের শক্ত পায়ে দাঁড়ানো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও চাই বিশ্বাসের একটা দৃঢ় নির্ভরযোগ্য পাদপীঠ, যেখানে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে থাকে একান্ত মানবিক প্রেম, সভ্যতার দেশে-কালে-ধৃত ব্যাপ্ত ইতিহাসের বোধ, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর জীবনের নানামুখী প্রত্যক্ষতা, জীবন ও প্রকৃতির বৈপরীত্য অথচ সংলগ্নতা, সেই সঙ্গে শিল্পেরও ঘনিষ্ঠ সংরাগ—সব কিছুই জীবন-লগ্ন, সব কিছুই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এ থেকেই আসে আমাদের চলার ইচ্ছা, চলার সামর্থ্য, দাঁড়াবার ধৈর্য, গতির সৌষম্য। বিষ্ণু দে-র কাছে তরুণদের একটা মহৎ ঋণ এইখানে যে তিনি তাদের এই আকাঙ্ক্ষিত সৌষম্যে স্থিত হতে সাহায্য করেছিলেন। বোধ হয় সব বড়ো কবির কাছেই তরুণরা এটা আশা করে থাকে—আশা করে এই চলিষ্ণু অভিজ্ঞতার নির্যাস—যা শুধু সস্তা 'প্রেরণা' নয়, এবং যে আশা পূরণ হলে কবির কাছে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হয়। কী করে বিষ্ণু দে এটা করেছিলেন তা হয়তো দু চার কথায় বলাও যায় যদিও তা হবে শেষ পর্যন্ত সেই সূর্যালোকে সূর্যদেখার মতোই।

নরনারীর প্রেম শুধু জৈব আকর্ষণের স্নায়বিক উন্মাদনা নয়, ব্যক্তির প্রেমও নতুন মাত্রা পায় ব্যাপ্ত জীবনের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে : 'বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে'। প্রেম তাঁর কাছে 'দ্বৈতের বিস্তার'। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন শুনেছিলুম' 'তাঁর আঁখির

তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত', তেমনি বিষ্ণু দে-র কবিতায় পেলুম, 'আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।' হ্যামলেটের ওফেলিয়া যেন কবির কাছে এক 'তন্বী সংহতি' : 'মেলাও অতনু-রতিকে'। কখনও-বা প্রেমিকা হয়ে ওঠেন ইতিহাসের এক সত্তা :

'আমার যে দিনগুলি তুলে তুলে ভরেছো আঁচলে…
দেখি সেই দিনগুলি তোমার আমার সেই দীর্ঘ-ইতিহাস।'

আর এই ইতিহাসই হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবিকৃতির এক বিস্তীর্ণ আকাশ, ঠিক যেমন তাঁর স্বদেশ আর জনগণ হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যের অপরিহার্য জল আর মাটি। সমাজের রূপান্তরে যাঁরা সংকল্প নিয়েছেন তাঁদেরও তো ঐ একই উৎস থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয়, তাঁদের কাছেও বর্তমানের এই ক্ষণ 'স্থানে ও কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে / অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক'। তাই বিষ্ণু দে-ই হয়ে ওঠেন তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী কবি, কেননা সাম্যবাদেই সভ্যতা পায় তার চরম পরিণতি, তার চরম ইতিহাস : 'মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা'। এই ইতিহাসের পটেই জেগে উঠছে 'বর্তমান মানুষের বেঁচে থাকার মরীয়া সংগ্রাম, তার প্রতিটি রক্তাক্ত মুহূর্ত—আর বর্তমান দিনরাত্রি জ্বেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ'। মাঝখানে অনেক ধ্বংস অনেক গ্লানি বিদ্বেষ হলাহল—আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা', আর 'তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষার আততি'। কবিই জানালেন :

'আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও – বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।'

কবির সাম্যবাদী প্রজ্ঞা এইভাবেই আজ ও কালকে মেলাতে চান 'দৈনন্দিন কাজের সূচীতে', আর সঙ্গে মেশে মানুষের চূড়ান্ত সামর্থ্য বিষয়ে পরম বিশ্বাস :

'নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা।
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়॥'

এই মুক্তিরই টানে তাঁর কাব্যে আসে স্বদেশ—এবং নানা দেশ। 'মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ, / সাত ভাই জাগে নন্দিত দেশ দেশ।' সাত ভাই চম্পার সেই অবিস্মরণীয় ছড়ায় দেখেছিলুম,

'বিরাট বাংলাদেশের কতো না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।'

এই চম্পারই প্রেমে চীন জলতে থাকে, সিংহল নড়ে ওঠে, শ্যাম-কম্বোজে বলী-যবদ্বীপে সাড়া জাগে। আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষ, এ যেন এক বুড়ি ঠাকুমা, 'পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক', তবু শুভ্রকেশের সে এক আলাদা সৌন্দর্য : 'সত্যের অক্ষয় প্রজ্ঞা নেভে নি বৃদ্ধার জরায়নে', সবাই তাকে ছেড়ে গেছে, 'শুধু একজনার গৌরবে তল্লাসীরা হানা দেয় আজও', আর তারই মুখ দেখে 'যমও নেয় না ঠাকুমাকে।' অসামান্য এই কবিতার সংরাগে দেশ ও তার সন্তানদের প্রতি মমতা নিবিড় হয়ে আসে, তখন আর কর্মের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আলাপ-আহ্বানের দরকারই হয় না।

আর এই যে স্বদেশ ও বিশ্ব, সভ্যতা আর ইতিহাস, সংগ্রাম আর উৎক্রান্তি—সবই একটা প্রতীকী মূল্য, একটা ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডল খুঁজে পায় আমাদের আশপাশের ও দূরের নিসর্গ প্রকৃতিতে। মানুষের কাজ আর অবকাশ, যন্ত্রণা আর আনন্দ, যুদ্ধ আর শান্তি—সব কিছুই একটা পূর্ণতা খোঁজে ও পূর্ণতা পায় প্রকৃতির সজীব বিস্তারে, আবার এই প্রকৃতির বৈপরীত্যেই নতুন করে আলোড়িত আন্দোলিত হয়ে কোনও এক গভীর ভার-সাম্যে আত্মস্থ হয়। বিষ্ণু দে-র কবিকর্মে আমরা এই জিনিসই বারংবার প্রত্যক্ষ করি, তাই তাঁর কাব্য আমাদের অনেক যন্ত্রণা অনেক বিড়ম্বনার নিশ্চিত এক আশ্রয়স্থল। কখনও দেখি 'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক', কখনো 'দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ / কিম্বা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত-সুনীলে' 'কখনো 'বটে পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা' কখনো-বা 'পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত'। বিপরীত পক্ষে—

'আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোন ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন পড়েছিলুম, 'বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে', তেমনি যেন তার কিছুটা বিপরীত ক্রম হিসেবেই পেলুম বিষ্ণু দে-র কবিতায়—

'প্রকৃতির গায়ে তোলো মানুষের বোধ,
কোটি মানুষের পল্লবে বরাভয়'।

প্রকৃতির উদ্দেশেই উৎসারিত হয় তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের মতো সুগম্ভীর প্রার্থনা :

'হে আষাঢ়, ধৈর্য দাও, বজ্রে বজ্রে সহিষ্ণু বিদ্যুতে
শ্রাবণে মুষলধারে ধুয়ে দাও পতিত হৃদয়,
বীজকম্প্র মেঘে দাও রৌদ্রে দাও জীবনের গানে
আশ্বিনের স্বচ্ছ জয় ছড়াও ছড়াও এই পোড়ো জমি
লাখো লাখো প্রাণে।'

এই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর স্বচ্ছ জয়ের প্রত্যয় এককালে আমাদের বড়ো দরকার ছিল, আজও আছে।

বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আমাদের আগে থাকতেই শোনা ছিল—দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। কিন্তু 'সন্দ্বীপের চর', বিশেষ করে 'অন্বিষ্ট' ও তার পরের দু তিনটি কাব্যগ্রন্থে যা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে নিছক বাক্-ভঙ্গির দুরূহতা নয়, বরং তাঁর কাব্য ভুবনের সঙ্গে কাব্যপাঠকের অপরিচয়ই নানা অসুবিধে সৃষ্টির কারণ। গোটা ভৌগোলিক বিশ্ব এবং মানবসভ্যতা যাঁর বিচরণভূমি তাঁকে স্বভাবতই উপাদান খুঁজতে হয় ভারতীয় থেকে গ্রীক পুরাণ পর্যন্ত, যেতে হয় দান্তে শেক্সপিয়র মিল্টন থেকে পাউণ্ড এলিয়ট এলুয়ার আরাগঁ পর্যন্ত, দেখতেই হয় 'মাতিস আকাশ' আর 'পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর', শুনতে হয় 'অপরাজেয় গ্রোস যুগের গান' থেকে বাংলার মেঠো সুর পর্যন্ত, অথবা 'বেহাগে বাজাবে বীণ' কিম্বা 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে মীড় বাঁধা মিয়াঁ কি মল্লার' কিম্বা, 'আজকে সুর ওড়ে ষড়্‌জে রেখাবে' অথবা 'সমুদ্রের কোমল গান্ধার'। এ সবই তাঁর নিবিষ্ট কাব্যভাষার রূপ, প্রকরণের চাতুর্যমাত্র নয়। সত্যিকার সাম্যবাদী কবির কাছে যা কাম্য তিনি ছিলেন তা-ই, অর্থাৎ বিশ্বনাগরিক। তবু যেহেতু তিনি আবার এদেশেরই কবি তাই তাঁকে বারবার যেতে হয়েছে এদেশের বিশেষ করে সেই মহাশিল্পীর কাছে যাঁর আবির্ভাব আমাদের বাংলার 'ছোটো ঐতিহ্যের ধারায়' একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতো, যাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এদেশের মার্জিত শিল্পীমানসে অনেকটা মাটি জল হাওয়ার মতোই সহজ। তাই বিষ্ণু দে-র কবিতার বুননে বা অলঙ্করণে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত নানা শব্দ ও পদগুচ্ছ বারবার উঁকি দেয়, বারবার রবীন্দ্র-সৃষ্টি নানা প্রসঙ্গে নানা অনুষঙ্গ রচনা করে। কখনো তাঁর সেই পূরবী থেকে বিভাস, কখনো 'এ পরবাসে রবে কে', কখনো-বা ছোট্ট বামীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার অসহায়তা, কখনো 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা।' রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা তাঁকে

অভিভূত করেছিল এ প্রশ্ন তাঁর কাছে 'এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের / কোন ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে ...'। রবীন্দ্রনাথের সেই অতুলনীয় 'রাজার দুলালে'র অনুষঙ্গে আসে তাঁর মর্মান্তিক কবিতা :

'ওগো মা, দেখেছি সে যে হলো মেঘে মেঘে
শূন্য খেয়ায় পার হয়ে নদী অ'াধারে
বিদ্যুতে জেলে আমার হৃদয় আঙিনা।'

নানা বিষাদ যন্ত্রণা আর সংক্ষোভের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে অনির্বাণ আলোর উৎস, তাই তাঁর কাছে পচিশে বৈশাখের প্রার্থনা :

'তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের,
আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,... ।'

কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথও আজ যখন ব্যবসার সামগ্রী তখন কবি ঘোষণা করেন—

'রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি,...'

কিন্তু, 'সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দ-ভৈরবী'।' রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে কবি এইভাবেই নতুন তাৎপর্য এনে দিয়েছেন, আমাদের উপলব্ধিকেও গভীরতর করেছেন।

মানুষের বিস্তীর্ণ দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস আর তার 'পরমাগতি'কে, উদার এই দ্বন্দ্বময় বিশ্বপ্রকৃতিকে, আর প্রায় প্রকৃতির মতোই উদার আমাদের সেই মহত্তম কবিকে বারবার উপলব্ধিতে এনে দিয়ে যিনি আমাদের সঞ্জীবিত করেছেন, আমাদের আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছেন, সেই ধন্য কবি আমাদের কাছে বেঁচে থাকারই এক মহৎ আশ্রয়—যেন, তাঁরই ভাষায়, এক 'পল্লবিত ন্যগ্রোধ'! তাঁর কাছে আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত

নির্জনসজনের নিত্যসংগ্রামে

মৃত্যুর ঈষৎ আগে পাউল সেলানের কবিতা বিষ্ণু দে-র নজরে এসেছিল। লাঞ্ছিত ইহুদিসম্প্রদায়ের বিধুর প্রতিভূ ঐ কবি প্যারিসে ১৯৭০-এর বিশে এপ্রিলে আত্মহত্যা করেন। আজ তাঁর পাঠকদের মধ্যে কোথাও কোনো সংশয় নেই, তাঁর কবিতার আত্মা ব্যাপক সাধারণ্যে নন্দিত হয়নি বলে পাউল সেলানের মানসে যে-ক্ষোভ দীর্ঘায়ত ছিল, আত্মহননের মাধ্যমে তারই সংক্ষিপ্ত সমাধানের ট্র্যাজিক প্রয়াস প্রকাশিত।

সারা জগৎ জুড়ে ধিকৃত বিশেষত নাৎসি নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত যে-জাতিপুঞ্জের হয়ে পাউল সেলান কলম ধরেছিলেন, আজ শুধু তার কাছেই নয়, এই মুহূর্তের বিশ্বকবিতায় তিনি সম্ভবত সবচেয়ে আদৃত পুরুষ। জীবদ্দশায় কবি তার এই প্রতিপত্তির এক তিলাংশও দেখে যাননি। 'প্রতিপত্তি' শব্দটির বদলে 'স্বীকৃতি' বললেই হয়তো ভালো হত। কেননা কোনো যথার্থ কবিই নিতান্ত জনসংখ্যা নির্ভর প্রতিষ্ঠা দাবি করেন না। পাউল সেলানও সে-অর্থে পৃথুল, স্থাবর কোনো নিরাপত্তা কুক্ষিগত করে নিতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এষণা সবার কাছে পৌঁছে যাক। একদিকে তাঁর মানবিক অথবা মানুষের সপক্ষে সংগ্রামরত জীবনশৈলী অন্যদিকে তাঁর কবিতার সংবৃত্ত সত্তা—এ দুয়ের সঙ্গে মানুষজনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটুক, এইটেই ছিল অহরহ তাঁর কামনা।

বলা বাহুল্য, এরকম অভিপ্রায় বৈধ। কিন্তু সেলান প্রথম থেকেই তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্বকে করে তুলেছিলেন অনর্পিত আপসহীন। এই সূত্রে তিনি জানিয়েছিলেন কবিতা হলো নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ এবং (তা সত্ত্বেও) পথে নেমে পড়েছে সে। কবিতা চায় আরেকজনকে, সেই আরেকজনকে তার চাই-ই চাই, তার পরে বড়োই জরুরী ঐ অন্যোন্যতা। সে 'ঐ আরেকের কাছে গিয়ে হাজির হয়, তার সঙ্গে কথা বলে…তার

মধ্য থেকে একরকম সংলাপ প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্ত সংলাপ জন্ম নেয়।' অর্থাৎ নিজের কাছে সৎ থেকে ঐ কথোপকথনের শামিল হওয়া কবির কাজ। ১৯৬০-এ সেলানের ব্যুশ্‌নার পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে সারি-লুইসে কাশানিৎস এই কথাটাই সুন্দর ব্যক্ত করেছেন—তাঁর নির্জনতা সাধারণীকরণের প্রত্যাশায় স্বকীয়, তিনি তাঁর নিজের হয়েই নয়, অন্যদের হয়েও কথা বলে চলেছেন।' প্রায়ই দেখা যায়, সেলানের কবিতায় ঈপ্সা-শব্দ হয়ে 'আমরা', বহুবচনের প্রয়োগ। এভাবেই উঠে আসে কখন এক 'তুমি', যে হুবহু প্রেমিক বা পাঠক নয়, কিংবা দুয়েরই মিশ্রমূর্তি ('আমরা শুয়েছিলাম / সমুদ্রবর্তী জঙ্গলের গহনে, তখন তুমি / গুঁড়ি মেরে চলে এলে।') প্রকৃত প্রস্তাবে 'আমি' শব্দের আধিপত্য নেই বললেই চলে। বরং বলা যায় নিজেকে কবিতার ভিতরে নিলীন রেখে ঐ 'আমরা' ও তুমির দিকে কবির অগ্রস্থতি। এর ফলে রোমান্টিকতার দাপট থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। অথবা এভাবেও বলা চলে, আমরা ও তুমির ভিতরে সেতুর মতো উপলক্ষ্য হয়ে আমিত্বের সুবিনীত সক্রিয়তা ছাড়া কবির কোনো অন্যতর লক্ষ্যমাত্রা নেই।

২

এই পূর্বভাষটুকু বিষ্ণু দে-র কবিতার পটে ব্যবহার্য বলে মনে হয়। বিশেষত 'সন্দীপের চর' থেকে তাঁর কবিতায় নিজেকে আপেক্ষিকতায় আক্রান্ত করে বিষ্ণু দে 'আমরা' ও 'তুমি'র সমীকরণ চেয়েছেন :

> ···উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের শিমুল
> ডোবায় আপন-পর
> বিশ্বরূপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
> ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে
> আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
> বারেবারে বাইরে ও ঘরে তোমার সুষমা
> ছড়ায় উপমা।

এই অন্তিম স্তোত্রের আগেই দেখি এক জায়গায় 'আমরা মানুষ' (তু. 'আমরা নশ্বর') এই যৌথ উচ্চারণ আছে। সেলানের কবিতার চেয়েও বিষ্ণু দে-র রচনায় তুমিত্বের পরাক্রম আরো অনেক দ্যোতক, কেননা সমবেত মানুষের চেতন-অবচেতন শক্তিকে রূপান্তরিত করেই সেখানে জেগে ওঠে উত্তরমুখী 'তুমি'। সেদিক থেকে দেখলে সেলান ও তাঁর তফাতের গ্রাফিক নকশাটা শেষ পর্যন্ত এ রকম :

১. আমরা→ ←আমি→ ←তুমি

২. তুমি

↑ ↑

আমরা আমি

সেলান যেখানে বিদ্যুতের মতো মুহূর্তসম্পাতে সমন্বয়ের কাজটি সম্পাদন করেছেন, ভারতীয় কবি সেক্ষেত্রে সময় নিয়েছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ক্রমশই কবিতার ভিতরে পথ নিতে নিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি এ জন্যই চোখে পড়ে যে আমরা আঁচ করে নিতে পারি, পাঠককে তাঁর সন্ধিৎসা তিনি বুঝিয়ে দিতে চান। অর্থাৎ যতোক্ষণ না পাঠক তাঁর দিকে ঘুরে না দাঁড়াচ্ছেন, কবি একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন যেন। উদ্ধৃত সাত পংক্তির তৃতীয় ও চতুর্থে আমরা তাঁর সেই প্রবণতা প্রুফ দেখার ধরণে বুঝতে পারি :

বিশ্বরূপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে।

দু'জায়গাতেই চোখে পড়ে দুই সিলেবলের মতো শ্বাসযতির ঘাটতি। প্রথায়ত ছন্দের প্রেক্ষিতে উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তকের ঔদার্যে, একাধিক পঙক্তি রচনা করা যেতে পারত। কিন্তু কবি-ভাবুক সেটা করেন নি। তার কারণ তিনি একটি পংক্তির ভিতরে যতোখানি চিন্তন জুড়ে দেওয়া যায়, সেই মনস্কতা তাকে মগ্ন রেখেছে। এমন কি উপান্ত্য পংক্তিতেও (বারে বারে বাইরে ও ঘরে তোমার সুষমা) সেই মর্জির হয়তো কিছুটা অকাব্যিক প্রয়োগ আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত পাঠকবৃত্তিকে প্রতিহত করে, আমরা ভাবতে বসি, ভাবতে শিখব, না কবিতা শুনব ? পাউল সেলানের পাঠক হিসেবে আমরা ওই দ্বৈরথের মুখোমুখি হই না, কেননা সেখানে আমরা কবিতার কোরকটির কাছে নিজেদের সমর্পণ করার জন্য এগিয়ে যাই। যখন এক-এক জায়গায় থেমে যাই, অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসি, অথবা কবি কে দায়ী করে বসি, কেন তাঁর বীজমন্ত্রকে আরো একটু সহজ করে দিলেন না তিনি ?

বীজমন্ত্রকে সহজ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় কবি। 'সন্দীপের চর'-এর কবিতাবলির প্রায় তিন দশক পর যখন 'ঈশাবাস্য দিবা নিশায়' তিনি লেখেন :

সভাসংঘে নৈঃসঙ্গ্য সে খোঁজে।
পরক্ষণে ধাওয়া করে
চেনা ও অচেনা এসঙ্গী ও সঙ্গী চেয়ে
একাকীত্বে চায় জনতার মৌল সংলগ্নতা

ততোধিক তাঁর কবিতা অভ্যস্থ পাঠকেরা, আমরা, বুঝে যাই কোথায়-কোথায় দু-মাত্রার শ্বাসযতি চিহ্নিত করে এই লাইনগুলো আমরা পড়ব, অনুমান করে নিতে পারি কেন উপান্ত্য পংক্তিতে ('নৈঃ সঙ্গ্যরে সঙ্গীত উৎসবে নির্মাণের সঙ্গী হবে, কবি')

কবি আমাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অভীপ্সিত প্রস্বরলিপি, এবং অনুধাবন করি কবি আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে রক্ষা করবার দুর্মর অঙ্গীকারে কতো অনপনেয় ভাবে সহজ হয়ে এসেছেন। হয়তো এখানে 'সহজের' বদলে সরল শব্দটি বসালেই ভালো হত। করুণ ছাত্রের মতো আমাদের প্রিয় শিক্ষকের শ্রদ্ধেয় দুর্দশা আমরা লক্ষ করে যাই, প্রাণপণে তিনি তাঁর উপপাদ্যের মর্মকথাকে সরলীকৃত করে চলেছেন। 'ঈশাবাস্য দিবা নিশায়' এরকম শুভংকরী ধাঁধার পরিব্যক্তিতে অরুন্তুদ তেরোটি জার্মান পাদটীকায় সচকিত কবিতা 'জার্মান গণতন্ত্রের জন্য।' এরও মূল বাণী 'মানুষ মহৎ হোক / আমাদের আদর্শ হয়ে উঠুক' (Edel Sider Merzsch sei uens eir Vorbild) বিষ্ণু দে-র অনবদ্য তর্জমায়, 'মানুষই সত্য মহীয়ান / স্বপ্ন যে করে নির্মাণ।' এখানেও কবির বিবক্ষা এত প্রখর যে দশমাত্রিক কবিতায় প্রথম স্তবকের শেষেই তেরো মাত্রা ('আগামীতে গড়েছে যে মূর্তি') আমাদের পক্ষে আদৌ শ্রুতিসুভগ হয়ে ওঠে না; শিক্ষণ ও শ্রবণের দোটানায় লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। কেন কবি গভীর কথাটিকে এত সাদাসিধে করতে চাইলেন, তার যুক্তিটি কবিতার শিরোদেশেই কবি স্থাপন করে দিয়েছেন ('Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি, সেটা সাদাসিধে কিন্তু বড়ই গভীর: (Ent beh ren soust du, sollst ent behren)। 'তুমি ত্যাগ করো, ত্যাগ করে যাও,' গ্যায়টের এই উক্তিটি যতোই উদ্দীপক হোক না কেন, নান্দনিকতার বর্জনে আমাদের মন কাড়তে পারে না।

বিষ্ণু দের স্নেহঘনিষ্ঠ কেউ কেউ জানেন, কবির তাত্ত্বিকতার সঙ্গে নান্দনিকতার রফা নিষ্পত্তির একটি বহির্বিভাব ছিল। তিনি যখন তাঁর স্বকীয় সার্থকতার অদ্রিচূড়ায় পৌঁছিয়ে আমাদের পারমিতাদীপ্ত পংক্তির পর পংক্তি উপহার দিচ্ছেন, মার্কসীয় সমালোচকদের একটি শিবির থেকে অকস্মাৎ হায় হায় রব উঠেছিল। 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত তাঁর নৈরাশ্যদীর্ণ একটি অপরূপ কবিতাকে ছিন্নভিন্ন করে একজন শিবিরশীর্ণ পণ্ডিত লেখেন: 'বুর্জোয়াদের ভাবের ঘর আজ দেউলে হয়ে গেছে। সুতরাং ফর্মই তাঁদের একমাত্র উপজীব্য…এই ফর্মের চটকদার নামাবলী পরে তাঁরা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। একথা বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্পর্কেও সত্য…পাছে জনসাধারণ বিষ্ণুবাবুর এ নাকি কান্না গ্রহণ না করতে পারে এই জন্যই বিষ্ণুবাবু ফর্মের দেয়াল তুলে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ফর্ম হচ্ছে জনতাকে কাব্য থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফর্ম। এই ফর্ম অ-গণতান্ত্রিক (প্রদ্যোৎ গুহ, 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও কিছু অপ্রিয় সত্য', মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনা সমস্যা, ১৯৭৫)'। বিষ্ণু দে মানুষ এবং কবি হিসেবে কী অসাধারণ সংবেদনশীল ছিলেন, সে তথ্য সবারই জানা। এখানে তাই

ওই সংযোজন অন্যায় নয় ঐ ১৯৭৫-এই 'জনসাধারণের রুচি' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি প্রত্যোৎ গুহ উত্থাপিত সমস্যাটির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কতো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এ বইয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে অভিজাত, এবং সেজন্যই জনপ্রেমী, কবি জানাচ্ছেন, 'কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে স্বষ্টির আবেগ থাকবে কি করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই তো মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন অধিনায়কদের খুঁজে পান, ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)।' এখানে বিশদীকরণের এতটুকু প্রয়োজন নেই, শুধু কবি প্রতিভার প্রতি সমাহার শোভনতায় এটুকু বলা চলে, 'জনসাধারণের রুচি'র সমস্ত প্রবন্ধই (যদিচ কিছু কিছু সন্দর্ভ মার্কসবাদী বলে চিহ্নায়িত আক্রমণশীল কোনো কোনো রচনা প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় রচিত নয় এবং তারা অনেক আগেই প্রণীত) মানুষের দিকে সাহিত্যের অবরোহনের দিকে অত্যন্ত স্পষ্ট পদরেখায় অঙ্কিত।

বলতেই হবে, কবিমাত্রেই, নিতান্ত লৌকিক অর্থে, সামাজিক সংঘটন। দেশ-বিশ্ব-দেশ-কাল তাঁকে বলয়িত করে। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদে প্রত্যয়নিষ্ঠ এই কবি কোনোদিনই জনসাধারণের রুচিকে পরিহার করে শিল্পহর্ম্যালোকে নাগরিকতা নিতে চান নি। তবু তাঁর প্রত্যয়ে দীক্ষিত অনুগামীদের দিকে নমনীয় হয়ে ওঠা ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। কবির উপর্যুদ্ধৃত উক্তি বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়ে, আঙ্গিক এবং বক্তব্যের মধ্যে একরকম সামঞ্জস্য রচনা তাঁকে করে নিতে হয়েছিল। বিষ্ণু দে-র মতো মহৎ কবি সেরকম জোড়াতালির দিকে না গেলেও পারতেন বলে মনে হয়। কেননা সাহিত্যের আঙ্গিকের মধ্যেই যে বিষয়ের পরীক্ষা, সেকথা তাঁর অবিদিত ছিল না। আমরা এখানে রোলাঁ বার্থের 'শূন্যমাত্রার লিখা, (Le Degre Zero de' L 'Ecreture / ১৯৫৩) থেকে 'লিখা ব্যাপারটা কী' নিবন্ধের দু-চারটি উচ্চারণ মনে রাখতে বাধ্য: 'সাহিত্যের ফর্ম তার মিতব্যয়িতা এবং অলঙ্কৃত সৌন্দর্য ছাড়াও একরকম দ্বিতীয় শক্তি হয়ে উঠছে, পাঠকদের তা সম্মোহিত করে, তাকে অচিন্ মায়ায় আচ্ছন্ন করে দেয়, তাকে আবিষ্ট করে এবং ফলত গুরুত্ব পায়। সাহিত্য আর সামাজিক বিকিকিনির সামাজিক সুবিধা-লালিত বিধিব্যবস্থা নয়, সাহিত্য বলতে বোঝাচ্ছে শরীরী এবং দুরবগাহ ভাষা, যার ভিতরে স্বপ্ন এবং সন্তান দুইই লুকিয়ে আছে।' আমার মনে আছে, একবার তাঁকে অনেকটা বার্থের এই উক্তির অনুষঙ্গী কিছু ভাবনা নিবেদন করেছিলাম, এবং তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাঁর স্বভাব সুলভ সপ্রতিভতায় বলে উঠেছিলেন: 'কিন্তু ওসব কথা কি বাংলা

দেশে চলবে ?' তাঁর ঐ সংবেদনের অর্থ এই নয় যে কালক্ষণের দিনপঞ্জি মেপে তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন। শুধু এখানে একথা বললে অসংগত হবে না, বিষ্ণু দে দেশ কালের প্রেক্ষণীকে এক মুহূর্তের জন্য বরবাদ করেন নি। সম্ভবত তারি গরজে একসময় শিল্পে টেকনিকের প্রাধান্যকে খারিজ না করলেও গৌণ করে দিয়েছিলেন।

৩

বিষ্ণু দে-র কবিতার বিবর্তন বিষয়ে কোনো স্পর্ধিত উচ্চারণ কিংবা মানচিত্রায়ণ এই আলেখ্যের ভরকেন্দ্র নয়। আমরা শুধু এইটুকুই বলব, যাপিত জীবনের পরিপার্শ্ব থেকে নিজের কবিতাকে বিষ্ণু দে কখনোই বিবিক্ত করে নেন নি। তাঁর উত্তরকালের কবিতায় এই সম্পৃক্তি এতদূরই এগিয়ে গিয়েছে যে তিনি তাঁর শিল্পায়নকে কখনো প্রচলিত অর্থে ছন্দোবদ্ধ কখনো বা পয়ার স্পৃষ্ট গদ্য কবিতায় একধরণের গণমুক্তি উপহার দিতে চেয়েছেন। এরকম শুভেচ্ছা খুবই মহোজ্জ্বল, কিন্তু ঐ পরম প্রাপ্তিতেই যদি মানুষ থেমে থাকত, তাহলে শিল্পের প্রয়োজন হত না। আমাদের এই কবি তখনই অপ্রতিম, যখন তিনি তাঁর কবিতায় 'নির্জন সজনের নিত্যসংগমে' এসে দাঁড়িয়েছেন, তৈরী করেছেন এক তুমি-কে, যা স্বগত-বিশ্বগতকে অন্তর্গত করেও পার হয়ে যায়। এই অতিক্রান্তিও যে সব সময় তাঁর কবিতায় শিল্প জাগর হয়ে উঠতে পেরেছে, এ কথা বললে সহজিয়া বৈষ্ণব শোনাবে। আমরা কোনো অন্ধভক্তির ক্রীড়নক হতে চাই না। আমাদের অভিলাষ, কবিকে তাঁর নন্দন তত্ত্বের সেই নিজস্বতা থেকে নির্ণয় করা, যা কোনো প্রথানুগত বর্ণীকরণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় না। সেদিক থেকে দেখলে বলা যায়, বিষ্ণু দে-র বিশেষত অন্ত্যপর্যায়ী বিপুল সংখ্যক কবিতাবলির সমাজশোধক এবং প্রেমের কবিতাগুলির মধ্য থেকে একটি সংকলন আশু কর্তব্য। এই সংকলনের মধ্য থেকেই তাঁর একান্ত গোপন কবিস্বভাবকে আমরা শনাক্ত করে নিতে পারব। হয়তো এই নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাব, বিবর্তনই সেই ধর্ম, যার সাহায্যে ওই কবি নিজস্বতার মার্কা দেওয়া গণ্ডি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। অথবা হয়তো আমরা বুঝে নিতে পারব, তাঁর 'তুমি' ধর্মী প্রেমের কবিতাবলির ভিতরে তাঁর অসীম ক্ষমতার ক্ষেত্রফল সঞ্চারিত হয়ে আছে। সেরকম উদ্ভাবন ও গর্হনীয় হবে না, কেননা প্রেমও সামাজিক সত্ত্য। প্রত্যেক কবিই সমাজের দিকে তাকিয়ে পাউল সেলানের মতো, কবিতা লেখেন, কিন্তু পাউল সেলানের মতো একাধারে কবিতায় স্বগত শিকড় এবং দায়গ্রস্ত মানব সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। সম্ভবত, সংকলন রচনায় দুরূহ পদ্ধতিতে দেখা যাবে, প্রায় অসাধ্য এই মেরুমৈত্রী সাধিত হয় নি বলেই বিষ্ণু দে এই মুহূর্তের বাংলা কবিতায় কোনো উত্তেজক ঘটনা নন। তাতে কোনো লোকসান নেই, কেননা কোনো বড়ো কবির প্রতিভার বিচার, তাঁর মৃত্যুর পরেও, তাঁর অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তায় নয়।

সমীর দাশগুপ্ত

বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ও আধনিক মুহূর্ত

সামান্য ইতিহাসবোধ যাঁর আছে তিনি অবশ্যই 'আধুনিক' বলতে বোঝেন না শুধুমাত্র এক্ষনিক, অথবা স্পেণ্ডর যাকে বলেছেন কন্‌টেম্‌পোরারি। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন "আধুনিকতার ব্যাপারটা তাঁদের কাব্যময় প্রথম যৌবনেই চুকে গেছে," তাঁরা সেই আপনাপন যৌবনের প্রান্ত থেকেই আত্মগর্বে তন্মনস্ক হয়ে আছেন, নতুবা সেই আমলের শিল্পসাহিত্যকর্মকে 'আধুনিক'-মার্কা এক সময়-নির্দিষ্ট বাক্সে পুরে রাখতে চাইছেন। যেমন রেনেসাঁস্ নামে একটা বাক্স এতদিনে তৈরী হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তিদের কিন্তু আদৌ খেয়াল থাকে না যে এমন-কি সময়-নির্দিষ্ট সেই রেনেসাঁস্ শিল্পসাহিত্য বিচারের জন্যও চিরকালের উপযোগী কোনো অপরিবর্তনীয় ফরমূলা নেই। সময়ের হাত ধরে নিরিখ ও মূল্যায়নের পদ্ধতিও বদলে যায়।

আধুনিকতা কোনো 'চুকে' যাবার পদার্থ নয়। তাই যে-কোনো মুহূর্তেই পিছনে ফিরে তাকানোর একটা দিক থেকে যায়, যে-তাকানোর মধ্য দিয়েই বর্তমানের বিশিষ্ট সমস্যাটির রূপগুণ প্রতীত হতে পারে। এখন কেউ যদি বলে বসেন যে 'আধুনিক অবস্থা' সম্পর্কে যদিও তিনি সচেতন, তথাপি তিনি মনে করেন না সে-অবস্থার দ্বারা শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সম্ভবত দেখা যাবে সেই ব্যক্তি আর্টকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধনায় প্রযোজ্য একরকম যন্ত্রমাত্র মনে করেন, যতই তাঁর এই 'দুই-সংস্কৃতি'-র আড়িতে বেদনাবোধ হোক না কেন।

এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মোটামুটি দু-রকমের 'ঐতিহ্যবাদী আধুনিকতা' উপস্থাপিত করা যায়। এক, বৈজ্ঞানিক 'অগ্রগতি'-তে বিশ্বাসহীন, এমন-কি বিরক্ত, অতীত পৃথিবীর মূল্যলোভী আধুনিকতা। দুই, বৈজ্ঞানিক জগৎকে ধর্মান্তরিত করে

এক আধুনিক নন্দনালোকে নিয়ে আসার চিন্তা, যাতে সমকালীন সভ্যতার আকৃতি প্রকৃতি বদলে গিয়ে যুগপৎ সুন্দর ও মঙ্গলময় হতে পারে।

প্রথম দলের আধুনিকতাই ধরা যাক। ইনিসফ্রী-র য়েট্‌স্‌-কে না হয় বহিষ্কৃত করা গেল নির্জিত পলায়নের অভিযোগে। কিন্তু যিনি সচেতন স্বপ্ন খোঁজেন ইংল্যাণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে, স্নিগ্ধ দুপুরের শ্যামল বনানীতে, দুঃস্বপ্নের বর্তমানকে যিনি স্থিরবুদ্ধিতে পরিহার করে জাগ্রত স্বপ্নকেই একমাত্র অ-শয়তান সত্য বলে ঘোষণা করেন, সেই ডিলা মেয়ারকে নিশ্চয়ই 'আধুনিকতা' থেকে বহিষ্কারদণ্ড দেওয়া যাবে না। কারণ, সব আধুনিকতার সমস্যাই যদি অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে পর্যবসিত, তবে তার আরেক রূপ দেখা যাবে 'সচেতন স্বপ্ন' (যার মধ্যে নিহিত পরিবর্তনের বীজ) ও বর্তমানের পোশাক-পরা দুঃস্বপ্নের মধ্যেকার বিরোধে। শিল্পসাহিত্যের সত্তা এখানে অতীত পৃথিবীর মূল্যজ্ঞান ও অতীত পৃথিবীর কণ্ঠস্বর দিয়ে গড়া—আজকের কুৎসিত পৃথিবীর মানুষ সযত্নে কান পাতলে যে-কণ্ঠস্বরকে হয়তো অত্যন্ত আপন ও প্রেয় বলে আবার চিনে নিতে পারবে।

কিন্তু এখানে অতীতকে দিয়েই বর্তমানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ; অতীতের মূল্যকে বাঁচানোর জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের আরাধনার কোনো প্রয়োজন নেই, যেমন প্রয়োজন দেখা গেছে তথাকথিত প্রথম ইংরেজ আধুনিক কবি হপ্‌কিন্‌স্‌এ। তাঁর মতে ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি যথাসাধ্য সমসাময়িক হতে হবে, কারণ আজকের মতো করে কথা না বললে আজকের মানুষ প্রাচীন ঈশ্বরের বাণী বুঝতে পারবে না। লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার 'আধুনিক' প্রবাহকে যদি অনুধাবন করি তবে এলিয়টে পৌঁছে দেখব তাঁর বিশুদ্ধ কাব্যচিন্তা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয়তাকে ছাপিয়ে, অর্থাৎ সমস্যা ও সমাধানকে গৌণ করে দিয়ে, নবতর চৈতন্য তথা নতুন দেখার ধরণকে পরিস্ফুট করে তোলে। অর্থাৎ, আধুনিক শিল্প সাহিত্যের উৎসে যে-তাগিদই থাক না কেন, আধুনিকতার মানটি নির্ধারিত হবে শিল্পসাহিত্যের নিজেরই প্রখর আত্মসচেতনতা-প্রসূত রূপের সার্থক বিকাশ দিয়ে। এখানে সম্যক রূপসৃষ্টিই যেন অনিবার্য শেষ কথা। তাই সৃষ্টির মৌল উৎসে দুজনের মিল থাকলেও হপ্‌কিন্‌স্‌-এর সঙ্গে এলিয়টের আধুনিকতা চর্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে প্রভেদ। এলিয়টের মতে "re-presentation of the shapes and forces of a new world, and also of a modern kind of sensibility"-ই সব নয়, আরো বড়ো কথা এই যে, "sensibility had itself altered as a result of the obsessive modern situation." ফলে দেখার ধরণ নিজেই দৃশ্যবিষয় হয়ে,

যা দেখা হচ্ছে তার একটি অংশ হয়ে যায়। ইম্প্রেশনিস্‌ম্‌ থেকে কিউবিস্‌ম্‌ পেরিয়ে তাবৎ অ্যাব্‌সট্রাক্‌ট্‌ ছবিতেও এর তুল্য উদাহরণ মেলে।

আধুনিকতার দ্বিতীয় অর্থে, অর্থাৎ কুৎসিত ও অমঙ্গলের জগতকে সর্বব্যাপী নান্দনিক প্রভাবের অন্তর্গত করার অর্থে, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ প্রসঙ্গিক। এবং এই আধুনিকের ভূমিকায় বিষ্ণু দে তাঁর আগ্রহী প্রতিবেশী।

তিরিশের আন্দোলনের আমলে যখন বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'পরিচয়'-কে কেন্দ্র করে বুদ্ধিজীবীরা জড়ো হয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করতে, তখন বিষ্ণু দে-কে দেখতে পাই প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিশেবেই। কিন্তু 'পরিচয়' গোষ্ঠীর বুদ্ধিবাদী নান্দনিক মতাদর্শ যেখানে আবর্তিত হল একটি নতুন পরিসরে, যার নাম এলিটিস্‌ম্‌, সেই অবস্থানে বিষ্ণু দে অনুপস্থিত। তিরিশের বুদ্ধিজীবীরা পেটি-বুর্জোয়া, ঔপনিবেশিক উদারনৈতিক মানববাদে আচ্ছন্ন। এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের নান্দনিক ও মতাদর্শগত ধারণাসকলকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করাকেই তাঁরা মনে করলেন 'আধুনিক মুহূর্ত'-কে অধিকার করা। এবং বঙ্গীয় সমাজে মতাদর্শগত যে শূন্যতা দেখা গিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে—একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুক্তিবাদী অংশের ভাঙনের ফলে এবং অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব মতবাদের গরহাজিরের ফলে যে শূন্যতার উৎপত্তি—সেখানে প্রমথ চৌধুরীর ধারায় 'কবিতা' ও 'পরিচয়' গোষ্ঠীদ্বয়ও একই সঙ্গে প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে। 'আধুনিক মুহূর্ত' সম্বন্ধে সতর্ক ও সজাগ, কিন্তু তাদের সমাধান ভাববাদী, নিদান ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ। 'কবিতা'-র ইন্দ্রিয়মুখী, অভিজ্ঞতাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রগতিশীল সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দু। 'কবিতা'-র জোর তাই অভিজ্ঞতার উপর, অভিজ্ঞতাই তার নান্দনিক প্রগতিশীলতার মাপকাঠি, অভিজ্ঞতার মধ্যেই ব্যক্তির বাঁচা। এই ইন্দ্রিয়মুখী অভিজ্ঞতাবাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে 'পরিচয়'-র গোষ্ঠী তার মতাদর্শ তৈরী করার প্রয়াস পেয়েছে বিশুদ্ধ ভাববাদে—যে ভাববাদ কিন্তু এসেছে ফের রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। অথচ এই ভাববাদ ইন্দ্রিয়মুখী অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধী নয় বলেই বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মিলন সম্ভব ছিল। এবং একই কারণে দুজনেই পাথর ছুঁড়েছেন মার্কসবাদের গায়ে। এ রকম স্ববিরোধিতার কারণ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উদারনৈতিক মানবতাবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে ধনতন্ত্রের পরিবর্ধনশীল ফর্মের সংঘাত। ফলে এহেন উদারনৈতিক-মানবিকতাকে উল্টো করে সাজাতে হয়েছে চিরন্তনের মাপে। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তনের মাপ।

বিষ্ণু দে-ও বিকল্প দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গদেশীয় ঐতিহ্যের পুনর্লিখনের প্রয়াস পেয়েছেন।

কিন্তু তিনি যাত্রা করেছেন বুর্জোয়া মতাদর্শের বিপরীতে। খোঁজার চেষ্টা করেছেন লোকসংস্কৃতি এবং মধ্য-সংস্কৃতির মধ্যে এক বৈপরীত্যময় ঐক্য। এরকম বিশিষ্ট ঝোঁকের কারণ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র বুদ্ধিবাদী সম্পর্কের প্রয়োজনবোধ। এই প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে তিনি তিরিশের অন্যান্য আধুনিকদের মতো অ্যাকাডেমিক এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাকামী, আবার মতাদর্শগত সহযোগিতার উপযুক্ত ক্ষেত্রসন্ধানী। বিচ্ছিন্নতার দরুণ তাঁর মধ্যে ভাববাদী মোহ আড়ালে আড়ালে উঁকি দেয়, আবার সহযোগিতা-প্রয়াসী বলে তিনি লোকসমাজ ও মধ্য-সমাজের মধ্যেকার প্রগতিশীল সূত্র খুঁজে চলেন, চেষ্টা করেন এই দুই সমাজকে অন্বিত করে বঙ্গীয় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ শিল্প-সাহিত্যের মৌল বাস্তবতার সংরক্ষণে তিনি নিরলস অনুধ্যায়ী। ইত্যাকার প্রবণতাগুলির যোগফল তাঁকে অনিবার্যভাবেই নিয়ে যায় বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রের এলিটিস্‌ম্-এর বিপরীতে এবং মার্কসবাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার অভিমুখে। এবং বুদ্ধদেব এবং সুধীন্দ্রনাথ যেখানে ভাববাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতা বিচার করেছেন, বিষ্ণু দে সেখানে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন চিরন্তনতা ও প্রগতিশীলতার ঐক্য। পরিণত বিষ্ণু দে-র নানা সৃষ্টিতে এমনও মনে হবার কারণ পাওয়া যায় যে বরাবরই তাঁর চেতনে ও অচেতনে কাজ করে গিয়েছিল রাবীন্দ্রিক চিরন্তনতার সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তা, পদ্ধতি ও প্রত্যয়কে সমন্বিত করার তাগিদ। বঙ্গদেশীয় সুলভ মার্কসবাদ তাঁর কাছে যতই বুদ্ধিজৈবিক অসংলগ্নতা বলে বোধ হয়েছে. ততই তিনি জোর দিয়েছেন ব্যক্তিক অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে স্বকালের পরিসরে স্থাপন করার প্রয়াসের উপর। এবং সেই প্রয়াসে মূর্ত জীবনযাপন ও জীবনযাপনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে শিল্পসাহিত্যভাবনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছেন বোধ ও বুদ্ধির সমগ্রতা দিয়ে। সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা থেকে ছেঁকে তুলতে চেয়েছেন মূল্যবোধ এবং প্রত্যয়। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে ব্যক্তিক, সমাজ তার কাছে কাঠামো! অনুভূতি ও কাঠামোর মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক মিলন বিষ্ণু দে-র সাহিত্য সাধনার উপজীব্য। সাহিত্য দিয়ে তিনি সমাজ ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছেন, রাজনীতির সমান্তরালে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এবং ব্যক্তিক অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে তাঁর মৌলিক উপাদান করেছেন বলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা দলের সহযোগিতা ছাড়াই তাঁর যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ করেছেন। বিষ্ণু দে-র শ্রমের ফসল বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাই প্রবল বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

বিষয়টিকে আরেক ভাবেও বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে-ও চেয়েছেন সংস্কৃতির স্বায়ত্তশাসন, রাজনৈতিক বাস্তবের 'সমান্তরাল' সাংস্কৃতিক বাস্তব—যেখানে

সমাজ পরিবর্তনের ও পুনর্গঠনের মালমশলা তৈরী হতে পারে। উনিশ শতকের বাংলার রোমান্টিক ধারাকে শোধন করে তিনি তার মধ্যেকার বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক মানবিকতায়। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগত অবস্থান থেকে তাদের সরিয়ে এনে আধুনিক মুহূর্তে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, বুর্জোয়া মতাদর্শগত ঐতিহ্যের প্রগতিশীল উপাদানগুলিই তাঁর চোখে বড়ো করে ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন: "বিষ্ণু দে রনদিভে পর্বের সাংস্কৃতিক থীসিসের বিরোধিতা করেছেন প্রায় যোশী-পর্বের সাংস্কৃতিক চিন্তা দিয়ে। যেক্ষেত্রে রণদিভে-পর্বের সাংস্কৃতিক থীসিসের ভিত্তি কোনো সাংস্কৃতিক কর্মীর সামগ্রিক প্রগতি-শীলতা কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বিপরীতে লোকজ সংস্কৃতির প্রগতিশীলতা সেক্ষেত্রে বিষ্ণু দে একই ব্যক্তির কাজের মধ্যেকার প্রগতিশীল অংশের ওপর জোর দিয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিপরীতে, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির প্রগতিশীল অংশকে লোকজ ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে মিলিয়েছেন ঐতিহ্যের সামগ্রিক বাতিলের বিপরীতে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে কেন বিষ্ণু দে বাম-রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতার সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজেছেন প্রগতিশীল ঐতিহ্যের, এবং তাকে মিলিয়েছেন নিজস্ব মার্কসবাদী বীক্ষণ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে।

* * * *

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র এই ব্যাপক অর্থে সাযুজ্যের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ-ভাবে লক্ষ করার বিষয়, বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন, "ব্যক্তিক অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে স্বকালের পরিসরে স্থাপন করার প্রয়াস।" প্রচলিত মার্কসবাদী আলোচনায় মনো-বিজ্ঞানের ভূমিকা প্রায়শই অপাংক্তেয় বলে বিষ্ণু দে-কৃত এই প্রয়োজনীয় মাত্রাসংযোজন এক সদিচ্ছা ও সুখকর ব্যতিক্রম। 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে বিষ্ণু দে-র প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে "শিল্পসাহিত্যের সমালোচনা মনোবিজ্ঞানও নয়, ইতিহাসবিজ্ঞানও নয়, কিন্তু দুই সতিনের সঙ্গে তার হাত বাঁধা।" অর্থাৎ, আধুনিকতার 'চিরন্তন' দিকটি 'ব্যক্তিক' দিকটির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের উল্লেখ এড়িয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করা অসঙ্গত হবে মনে করে তাই এখানে কয়েকটি জিজ্ঞাসু মন্তব্য পেশ করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৫ সালে পঠিত এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার প্রাথমিক বয়ান প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যপত্র' ত্রৈমাসিকে (এবং তারপর ১৯৬৬-তে বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় সমিতির প্রকাশনা বিভাগ থেকে পুস্তকাকারে। পরে ১৯৭৫ সালে

ঢাকার জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী বইটির প্রথম বাংলাদেশী সংস্করণ প্রকাশ করে)। সাহিত্যপত্রের ঐ সংখ্যার এক কপি বিষ্ণু দে বর্তমান লেখককে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মন্তব্যের জন্য। উত্তরে যে-সমালোচনাটি তাঁর কাছে পৌঁছয়, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৩.৪.৬৬-র চিঠিতে বিষ্ণু দে যা লিখেছিলেন এখানে উদ্ধৃত করছি :

" তোমার প্রবন্ধটি পড়ে বিব্রত বোধ করছি : উক্ত সাহিত্যপত্রস্থ বক্তৃতাবিষয়ে এত পরিশ্রম করেছ বলে। লেখাটি অবশ্যই নিখুঁত নয়, আমার ক্লান্তিও মজ্জাগত, ফলে ঐ অবস্থাতেই বই ছাপা হয়ে গেছে। তবু তোমার লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। ...বক্তৃতাটায় প্রচুর irony-র ambivalence আছে, সেটা সমেত একটা সমগ্রতা অর্জন করেছে বলে আমার ধারণা ছিল। অধিকন্তু, অন্যান্য লেখায় যা বলেছি —যেমন রবীন্দ্রচিত্রালোচনায়—সে সব slant ও নিশ্চয় মাথায় ছিল, তাই বাঁ হাতে ডান হাতে প্রশংসার বাদ্যি বাজিয়েছি। সে বাজনায় এরিকসনীয় লুথর কাজে লেগেছিল। বাজনার আদি-অন্তে কিন্তু ব্রেখ্‌ট এবং ব্রেখ্‌ট বলতে যা দাঁড়ায়।"

বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধে আধুনিকতার চিরন্তন যে-দিকটা এরিকসন্‌-ভিত্তিক বিশ্লেষণের ফলে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের আত্মপরিচয়সংকট—যার সার্থক উত্তরণ সম্ভবই নয় ব্যক্তির ইতিহাসমানসে নিমজ্জন (গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের ভাষায় immersion) না হলে। কথান্তরে, শিল্পী বা সাহিত্যিক বিশেষের অহং-কে একদিকে কীভাবে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে, এবং অন্যদিকে বিপুল নিরবধি কাল ও সহযাত্রী-আত্মীয় মানুষের মহারণ্যে তাকে কীভাবে অন্বিত করতে হবে, এই বিষয়টিই আধুনিকতার সমস্যার চিরকালীন উপাদান, এবং এর রসায়ন বা সমীকরণ প্রক্রিয়া অবশ্যতই ব্যক্তিগত ব্যাপার ও সেই কারণে প্রতিক্ষেত্রে অনন্য।

আত্মসচেতন অথচ সংবেদনশীল মনের সূক্ষ্মবিচারসাপেক্ষ পরসংলগ্নতার আবশ্যিক গরজের মধ্য দিয়েই শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় ওআর্ডস্‌ওঅর্থ হয়তো তাঁর 'আমি'-কে 'এগোটিস্টিক সব্লাইম্‌'-এ পৌঁছে দিয়ে অতঃপর সাধারণ মানুষের ছোঁয়ার বাইরে বিপুল এক নিঃসঙ্গ নৈতিকতার পর্বত হয়ে থাকেন। অথবা যেমন টেনিসন্‌ তাঁর রোমান্টিক 'আমি'-কে নিয়ে কবিত্বের অভিজাত উপরতলায় বসে থাকেন। এঁরা যে পরিপার্শ্বের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চান না তা নয় ; মৃত বান্ধবের জন্য বিষণ্নতায় টেনিসন্‌ তো পাঠকের সহৃদয় সহানুভূতিই চান। কিন্তু পূর্বনির্দেশিত অর্থে এঁদের বাস্তববোধে কোথাও ঘাটতি রয়ে গেছে মনে হয়। কবি যেন এক উন্নততর, স্বতন্ত্র প্রাণী।

অথচ রোমান্টিকদের মধ্যেও তো প্রচুর বৈষম্য। শেলি যখন কণ্টকিত জীবনের

যন্ত্রণায় বলে ওঠেন : ঢেউয়ের মতো, পড়ে-থাকা একলা পাতার মতো, ছেঁড়া মেঘের মতো-আমাকে তুলে নাও—তা না হয় বিলাসী ভাবনা মনে হল। কিন্তু কীট্‌স্-এর 'আমি' বস্তুতই আভিজাত্যের ঘোর বিরোধী—'আধুনিক' দের সবচেয়ে কাছাকাছি। যে-কোনো পাঠক যদি মনে করে সে ও এক সম্ভাব্য কীট্‌স্—কাব্যে, জীবনে, মৃত্যুতে, প্রেমে, আত্মহত্যায়—তাহলে কীট্‌স্-ই যেন খুশি। এই ধারা অন্তত ডিলান্ টমাস্ পর্যন্ত প্রবাহিত। আবার হতাশা বনস্পতির মতো ধুলায় উবুড় হয়ে পড়া ম্যাথিউ আর্নল্ড্-কেও কেমন মনে হয় অত্যন্ত আপনজন : তিমির রাত্রিতে নির্বোধ আত্মঘাতী সৈনিক আমরা প্রত্যেকে যেন হঠাৎ একবার নিজেকে করুণ সত্যের মতো দেখতে পাই। কবির ব্যথিত অহং এইখানে বিশ্বাসের প্রার্থনায় ধুলিধূসর হয়ে যায়, যদিও র‍্যাঁবো-র অপূর্ব চৈতন্য : Car JE est un autre-র সঙ্গে তার আত্মিক মিল নেই।

আত্মসচেতনতা, অহংসংকট, এবং তারপর পরমসংলগ্নতায় উত্তরণ যদি বাস্তববোধ তথা আধুনিকতার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয় তাহলে, যেমন অন্য ক্ষেত্রে তেমনি শিল্প-সাহিত্যে, আধুনিকতার সমস্যা অবশ্যই চিরন্তন। কিন্তু আধুনিকতার সম্পূর্ণ সমস্যাটি বস্তুত আরো জটিল। সে-সম্বন্ধে চিন্তার আগে এরিক্‌সনের লুথার বিষয়ক বইটিতে ফিরে আসতে চাই। লুথারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্মের সরাসরি তুলনার কোনো অর্থ নেই, একথা বিষ্ণু দে বলেই নিয়েছেন। এখানে অবশ্য বলতে ইচ্ছে করে যে লুথারের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিরুদ্ধপন্থী যে-নামটি স্বভাবতই মনে আসে, সেই রটারডামের এরাস্‌মুসের সঙ্গেই কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য অনেক মিল। দুজনের জীবন দর্শনেই শান্তির নির্বিশেষ ও সর্বগত প্রয়োজনীয়তা, বিপুল বিশ্ববোধ, যে-কোনো জাগতিক সংকটে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে আত্মজ্ঞান ও আত্মশুদ্ধিতে আস্থা, প্রথানুগ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনুরূপ সংশয়, অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিকতা তথা নিরাকার ব্রহ্মের সন্ধান, সামাজিক-রাজনীতিক সমস্যার নিরসনে যুক্তির প্রাধান্যে বিশ্বাস, গোঁড়ামি সম্বন্ধে বিরক্তি। আবার দুজনের ক্ষেত্রেই রীতি-আশ্রয়ী ধর্মের সঙ্গে স্বীয় মানসিক বিরোধিতা নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এই দুই বিশ্বমানবের চিন্তার ও আত্মার চমকপ্রদ মিল সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার স্থান এখানে নয়। শুধু এই বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে এরাসমুসের পরিকল্পিত সর্বজাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর।

আলোচ্য আধুনিকতার প্রসঙ্গে লুথারের অভিজ্ঞতার আলোতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাক। এরিক্‌সন্ ভাষার তথা অর্থের সমস্যা নিয়ে কথা তুলেছেন : What is 'The Meaning of Meaning It'? কীভাবে কোনো ব্যক্তি জানতে পারবেন তিনি যা

মনে করছেন বলে অপরকে জানাতে চাইছেন, তাই তিনি কার্যত বলছেন কিনা। তাঁর ক্রিয়ার যে-অর্থ বাহ্যত দেখা যাচ্ছে, তাই তাঁরও অভীপ্সিত ছিল কিনা। অর্থাৎ, পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদের জন্য তিনি তাঁর নিজের কথা ও কাজের অর্থ সম্বন্ধে যে-নথিপত্র রেখে যাবেন, তা সে বিশ্বাস করবে কিসের গুণে? লুথারের জীবনে অন্তত একবার দেখা গেছে যে তাঁর "historical significance is rooted exactly in his sensitivity to the evidence that he himself had prevented himself from truly meaning what he thought he meant." বিগত অর্ধশতকের লুথারবিষয়ক মূল্যবান আলোচনায় সুইডিশ পণ্ডিতেরা এই অর্থ-জানার সমস্যাটির উপর বারবার প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছেন: লুথারের ধর্মচিন্তার অভীষ্ট অর্থ যদি লোকে বুঝে থাকে, তবে তা কীভাবে বোঝা হল?

'আধুনিকতা' যদি রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাহিত্যকর্মের একটি প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তাঁর ঈপ্সিত অর্থের যথাযথ পরিবহন হয়েছে কিনা তা কী বিচারে নির্ধারিত হবে? এই গেল এক প্রশ্ন। আরেক প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবনে যে সংকট-কালের চিন্তানায়ক, তার সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষে তাঁর তৈরী ভাষা কতটা উপযোগী ও অর্থবহ ছিল? নানারকমের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ঈডিয়মে ডুব দিয়েও রবীন্দ্রনাথ যা সেঁচে এনে তাঁর আধুনিক ঘরে রাখলেন, তাকে যদি ফ্লরেন্সি দান্তে-র De Vulgari Eloquio কিংবা চৈনিক হু শী-র ভাষার সমকক্ষ, এমনকি সমধর্মী, বলা হয় তবে ভুল হবে। অথচ চাষী-মজুর-নিম্নবিত্তভারি বাঙালি সমাজের সমগ্রীকরণে ভাষার সর্বস্তরগামী পরিণতিরই কি প্রয়োজন ছিল না রবীন্দ্রনাথে?

বিষ্ণু দে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রাবীন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বে শুচিবাইয়ের বিষয়ে। ইওরোপের সর্বগ্রাসী ভোগবাদ-উপযোগিতাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত প্রতিবাদ না হয় আমাদের সশ্রদ্ধ সম্মতি দাবি করতে পারে, যদিও তাঁর সাংস্কৃতিক শুচিবাইয়ের মধ্যে সংকীর্ণমনস্কতারও ছোঁয়া ছিল। কিন্তু আমাদের দেশজ ভাষার যে প্রাকৃত ঐশ্বর্য তাঁর বিচারে প্রধানত অন্ত্যজ, নন্দনচিন্তায় ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার সুদীর্ঘ ও মহৎ ঐতিহ্যের প্রায়-absolute-স্পর্শী যে প্রবল অথচ সুপ্ত শক্তি তাঁর আশীর্বাদের অভাবে চেতনা পেল না, তার ফলে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক 'নিমজ্জন' তথা বাস্তববোধের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিনয় সন্দেহ জাগে। এই প্রশ্নের অব্যবহিত প্রাসঙ্গিকতা এর সঙ্গে আধুনিকতার পূর্ববিধৃত গভীর সম্বন্ধনির্ণয়ে। লুথারের প্রসঙ্গ এখানে প্রত্যক্ষ-ভাবে অর্থবহ। একথা সুপরিচিত, এবং এরিকসন্-ও বলেছেন, লুথারের অসামান্য ভাষা ব্যবহার ক্ষমতার কথা। তিনি যে বিশেষ ধরণের 'দৈহিক' ভাষা ব্যবহার করতেন,

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায় তা অশিষ্ট। এখানে বলার কথা অবশ্যই এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ 'খিস্তির ভাষা' ব্যবহার না-করে ভুল কাজ করেছেন। বক্তব্য এই যে লুথার ও রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রের এবং দেশকালের ভিন্নতা সত্ত্বেও দাবি করা চলে যে আধুনিক-তার এক মৌলিক অর্থে লুথারের বাস্তববোধ গভীরতর। ষোড়শ শতকের ইওরোপে অনেকেই 'অমার্জিত' ভাষা ব্যবহার করত, সুতরাং লুথারও অনায়াসে সেরকম ভাষায় জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভাব বিনিময় করতে পেরেছেন, এই সহজ যুক্তি অসার। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশেও 'অমার্জিত' ভাষার সহজ প্রাচুর্যের সুযোগ ছিল। সুতরাং শুধুমাত্র এলিয়ট-পাউণ্ড-এমি লোয়েল বনাম রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্ব-বিতর্কে (যে-প্রসঙ্গের অবতারণাতেই বিষ্ণু দে-রচিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ সীমাবদ্ধ) উল্লিখিত ছুঁৎমার্গ সমস্যাটির পরিধি নির্ধারিত হয় না। এবং উভয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইত্যাকার বহুতর প্রভেদ লক্ষ করে "মহান সমকালীন ব্যক্তি" ও "সমকালীন মহান ব্যক্তি", এই দুয়ের প্রভেদটি আবারও মনে পড়ে যায়।

এরাস্‌মুসের প্রসঙ্গ আবার ঘুরে আসে। তিনি বারেবারেই বলেছেন ভাষার দুর্গের কথা, এবং এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্তির পূর্বদ্রষ্টা—যদিও এরাস্‌মুসের সাহিত্য কর্মের পরিধি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নগণ্য। তবে এই ডাচ্ চিন্তাবিদ-ও সসীম ও অসীমের দার্শনিক সম্পর্ক নিয়ে গভীর অর্থে ভাবিত ছিলেন, এবং ভাষার সংযোগগ্রন্থি যে অসীম মানবাত্মাকে বাঁধতে পারে না সেকথাও তিনি বলেছেন। সাহিত্যিক রবীন্দ্র-নাথেরও অগত্যা ভাষার দুর্গেই ছিল বাস। কিন্তু এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে তিনি যে পরিণত বয়সে রং ও রেখার মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি পেলেন, সে-তৃপ্তির ব্যাখ্যাও, আমার ধারণা, এতাবৎ সম্যকভাবে নির্ধারিত হয় নি। অনেক কারণে (যার মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত কারণও থাকতে পারে) তিনি কথা থেকে ছবিতে আশ্রয়ান্তর খুঁজেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বে কুরূপের আরাধনায় যে ফাঁকি পড়েছে, তারই অপনোদনকল্পে যেন তিনি সর্বপ্রকার "ভেস্টেড ইন্‌ট্রেস্ট বাদ দিয়েই [চিত্ররচনায়] ঝাঁপ দিয়েছিলেন"—বিষ্ণু দে-র এই প্রকল্প হয়তো সহজগ্রাহ্য নয়। তাঁর সামাজিক milieu-র সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য ভাষার যে-প্রাচীর রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই ভাঙবার প্রয়োজন ও দায়িত্ব ছিল, চিত্রকর্মের জাতখোয়ানো নতুন ভাষায় সেই ভাঙনের স্বাক্ষর নেই। তাঁর বিস্ময়কর চিত্রকর্মে যদি-বা তিনি ভাষার দুর্গ কোথাও ভেঙে থাকেন, সেই সঙ্গে নিজেকে আরো নিঃসঙ্গ ও বিযুক্তই কিন্তু করে ফেলেছেন তাঁর অগণিত সহযাত্রীর থেকে। সেই অপূর্ব জর্মন শব্দটি ধার করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম স্বদেশবাসীর সঙ্গে তাঁর 'বেৎসুগ্' ঘটায় নি তাঁর জীবদ্দশায়। স্পষ্টতই, তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে এই

সত্য ধরা না পড়ে পারে নি, এবং খানিকটা আত্মবঞ্চনার ক্ষোভেই অবশেষে তিনি যামিনী রায়-কে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে তাঁর দেশবাসীকে 'আবৃতদৃষ্টি'-র অভিযোগে আক্রান্ত করেছেন।

'আধুনিকতা'-কে ভিক্টোরিয় প্রেক্ষিতে বিশিষ্টতা দান করার পক্ষে বাঙালি রবীন্দ্রনাথের হয়তো ভারি যুক্তি ছিল। রবীন্দ্রমানসতাও ছিল স্পষ্টতই ভিক্টোরিয় রুচিবদ্ধ—বিশ্ব-চরাচরের সার্বভৌম কোন-এক ঐকতানের নিশ্চয়নিশ্চিন্ত ছন্দে যেন বাঁধা সেই মানসতা। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই বিপুল 'ঐকতানের' বিরুদ্ধে মানুষের আগ্রাসী উন্মত্ততার প্রকট রূপটি দেখেছিলেন। কিন্তু সেই উন্মাদ ষড়যন্ত্রের উৎস সন্ধান হয়তো খানিকটা বিপথগামী হয়েছিল। প্রাচীপ্রতীচী আখ্যায়িকা, যা-নিয়ে রবীন্দ্র-নাথ আজীবন কখনো আহ্লাদিত কখনো উদ্বেজিত ছিলেন, তার মূলে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তার অন্যতম কারণ, যে-ব্যবস্থার দ্বারাই রাজনীতিক-সামাজিক স্থিতিস্থাপন সম্ভব হোক না কেন, তাকেই তাঁর ভিক্টোরিয় মন গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হত। রোমঁ্যা রোলঁ্যা-র সঙ্গে মুসোলিনি-বিষয়ে তাঁর কথোপকথনেও এই ভ্রান্তি লক্ষণীয়। অথচ মুসোলিনির প্রতি তাঁর সমর্থনের সহজ রাজনৈতিক কদর্থ রবীন্দ্রনাথে আরোপ করলে তাকে যে ভুল বোঝা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই ভিক্টোরিয়, বৈষম্যবিরোধী, সুনির্ভর নিশ্চিন্ততা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমসাময়িক ইওরোপ তো বটেই, স্বজাতীয় আধুনিকদের সঙ্গেও এক গভীর অর্থে অনাত্মীয় করে রেখেছিল। বিষ্ণু দে কল্পনা করতে চেয়েছেন বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বাংলায় বেঁচে থাকলে, অথবা সাতচল্লিশের পরেকার, অথবা পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির সরকারি স্বাধীনতার আধিজর্জর চেহারাটি চোখে দেখলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কোন্ শুভময় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য এসব স্বদেশী কীর্তি তাঁকে দেখে যেতে হয় নি। তবে অবশ্যই বিষ্ণু দে-র এ-ভাবনা আলস্য-বিলাস নয়; এবং আলস্য-বিলাসের অবকাশই বা কোথায়? কিন্তু যে-প্রক্রিয়ায় এই নবতর সংকট সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান অর্জন এই প্রকল্পিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রয়োজন হত, সেই প্রক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ বিশ্বকবির দ্বারা আদৌ সম্ভবপর হতো কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশের ছিন্নভিন্ন দশা বেয়াল্লিশের আগেও কোনো বিপুল ঐকতানের ছন্দে অদৃশ্য কিংবা প্রচ্ছন্নমাত্র ছিল না। এবং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতে সক্ষম অক্ষম অনেকানেক শিল্পীসাহিত্যিকই সেই দুঃখকর ছন্দপতনে সক্রিয়ভাবে উদ্বেজিত হওয়াকেই বাঙালি আধুনিকের আবশ্যিক বোধ, কন্‌টেম্-পোরারি সেন্‌সিবিলিটি, মনে করেছেন। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সেই high seriousness কে যে প্রায়শই তিরস্কারে ভূষিত করেছেন তারও প্রমাণ আছে। সুতরাং যে-ভাবনা আলস্য-বিলাস নয় তা কষ্টকল্পনা হয়তো।

যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-অসম্পূর্ণ (বিষ্ণু দে বলবেন অসমাপ্ত), একাধিক অথচ প্রাকৃত ঐতিহ্যাশ্রয়ী, স্বার্থলেশহীন অথচ অনুদাসীন, তির্যক ও উদ্ধত অথচ আত্ম-শ্লাঘা-ও হঠকারিতা-হীন, ভিক্টোরিয় মোহমানসতাবিরোধী, বস্তুভিত্তিক অথচ নিরাসক্ত "আধুনিক চৈতন্য" একজন ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যানের প্রয়োজনে বিষ্ণু দের প্রবন্ধটির প্রায় চতুর্থাংশ জুড়ে স্থান পেয়েছে জর্মনির বের্টোল্‌ট ব্রেশ্‌ট। প্রবন্ধকার তাঁর উপসংহারে ব্রেশ্‌ট-কে নির্দেশ করে বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসাহিত্যিক মানবধর্ম বিচিত্র বহুরূপের জটিল বৃত্তের পূর্ণতা পেল এই কবিরই আধুনিকতায়।" যে-মূলধনের ভিত্তিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্রেশ্‌টের সগোত্র-পূর্বসূরির আসনে কল্পনা করেছেন, তা হচ্ছে একধরণের 'বৈজ্ঞানিক' নিরাসক্তি, নির্বিকার তদ্‌গতভাবে বিশ্বকে দেখা। কিন্তু এই সবিনয় প্রশ্ন হয়তো অবান্তর গ্রাহ্য হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের "নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টি" মূলত মানবিক হলেও—এবং মার্কসবাদের সঙ্গে তার এক সুমহান ultimate আত্মীয়তা থাকলেও—ব্রেশ্‌টের অন্বিষ্ট ও অনুশীলনের সঙ্গে তার সম্পূরক সম্বন্ধ কোথায়? ব্রেশ্‌টের আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গুণগত প্রভেদ, যা মূলত এক বিবাদহীন বৈষম্যের অর্থে দ্যোতনামুখর।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে-র উত্তর পর্ব ঃ একটি দিক

বাংলাভাষায় কবিতা আলোচনার একটা বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কোন বিশেষ কবিকে একটা বদ্ধ ধারণায় বোঝবার চেষ্টা। যে সব কবি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, নিজেকেই পুনরাবৃত্তি করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা মূল্যায়নে খুব একটা পথভ্রষ্ট হয় না; কিন্তু যে কবি চলিষ্ণু, বারবার নিজেকে পেরিয়ে যান, বাস্তব ও শিল্পকে নানা উত্তরণে বাঁধতে চান, তাঁর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা অনবধানে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন হয়েছে বিষ্ণু দে-র সম্পর্কে। এক সময় তাঁর কবিতার প্রথম পর্যায়কে; মোটামুটি ১৯২৬ থেকে ৪১-এর পর্বকেই চূড়ান্ত ভাবা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য, মূল্যায়ন, তাঁর দুরূহতা—এলিসটীয় প্রস্থান ইত্যাদি সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাকে উপেক্ষা করেই করা হয়েছিল। অথচ ১৯৪১-৪৪-এর মধ্যে বিষ্ণু দে-র কবি জীবনে, আলথুসেরীয় অর্থে, একটি স্পষ্ট ব্রেক বা উত্তরণ আসে। ১৯৫৫ পর্যন্ত, তারপরেও এই উত্তরণ অব্যাহত। অনেকে এই পর্বের ওপর গুরুত্ব দেন বেশী; বিষ্ণু দে-র মানবিক আস্তিক্য বোধসঞ্জাত এই পর্যায়ের জীবনের, জগতের, ইতিহাসের গভীর বাঁচার-লড়াইয়ের দিকটি বড় হয়ে ওঠে। কারুর কারুর অভিযোগ শোনা যায় কবি "স্টিল সেন্টার" এ পৌঁছেছেন। ফলে ১৯৫৫ থেকে এর সঙ্গেই, পাশাপাশি আর একটি, উপদানও যে তাঁর কবিতায় আসছে, সেটি চোখ এড়িয়ে যায়। বর্তমান এ সমাজ-দেশ-জীবনের বাস্তব সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া: বাস্তবের এক তিক্ত বোধ তাঁর কবিতায় আসে, সেটা স্টিল সেন্টারের প্রশান্তি নয়। ঐতিহাসিক বোধেই এই বাস্তবের ছবি তিনি আঁকেন। কিন্তু লক্ষনীয়, যে সব কবিতায় এই বাস্তব ধরা পড়ে, বিষ্ণু দে তাদের তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করেন না, এমন কি কোন কোন মহৎ কবিতাও। কবি

পত্নীকেও লিখতে হয়েছে, "তবু কেন উনি নিজে 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত' বাদ দিয়েছিলেন জানি না।" অথচ এই কবিতাগুলি ছাড়া বিষ্ণু দের ১৯৫৫ উত্তর কবিতার জগৎ বোঝা যায় না। ১৯৪৭-এর পরের সময়ে এ দেশ-সমাজ কোন চরিত্রহীনতায় আক্রান্ত, কোন অবসন্নতায় আচ্ছন্ন, তার কথা বারবার কবি বলেন—এই সামগ্রিক ভাঙনের বিরুদ্ধেই তাঁর কবিতার লড়াই, প্রকৃতিতে-প্রেমে-মানবিকে। সে কারণেই এ লড়াই তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝিই কবি লেখেন, "আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার / আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।" মুমূর্ষু বিকার-এর চিত্রকল্পটিতে এ সময়ের বাস্তব—বিকারও খাঁটি নয়। বাস্তবের এভাবে কবি বর্ণনা করেন:

> "এ নরকে
> মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই.
> যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, সহরও তো নয়
> প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
> সেখানে মজুর নেই, চাষ নেই,
> যেখানে রয়েছি আজ মনে হয়, আশা নেই,
> বাঁচবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
> সেখানে মড়ক অবিরত
> সেখানে কান্নার সুর এক ঘেয়ে নির্জলা আকালে
> মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
> কারণ কারোই কোন আশা নেই
> অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
> চৈতন্যে মড়ক।"

কবিতাংশটিতে ভয়াবহ এক ছবি: তেরো লাইনে দুটি পূর্ণচ্ছেদ। প্রথম এগারো লাইনে এক ভয়ানক ছবি, গ্রাম নেই, শহর নেই, মজুর নেই, চাষা নেই, আশা নেই, জীবনের ভাষা নেই। এখানে কান্নাই মৃত, আশা এত কম যে নিরাশাও নেই। কান্না ও নিরাশাও একদিক থেকে সদর্থক: কান্না থেকে প্রতিবাদ আসে, নিরাশা থেকেই আশা। এখানে তারও সম্ভাবনা নেই: নির্জলা আকাশ। বারো লাইনের পূর্ণচ্ছেদের পর দুই শব্দের বাক্য: চৈতন্যে মড়ক। এটা যখন ঘটে, তখন ইতিহাস-সময় তার আকার—গতি হারায়। বাইরের মড়ককে পেরনো যায়, চৈতন্যের সংগ্রামে,

আর চৈতন্যে মড়ক ? কোন আশা নেই—তার থেকেও বড় কথা বাঁচবার ভাবা নেই। "এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র পশুও নেই, নেই আদিম মানুষ, / বণপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই।" এ বাস্তবে নরকও নেই, আছে "নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুর ও বিকার।" বিষ্ণু দে তাই প্রার্থনা করেন, "নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হেয়মজীবন"। নরকও এখানে পজিটিভ—স্বর্গে যাবার পথ। সে কারণেই তিনি জীবন মৃত্যুর এই গোধূলিকে উড়িয়ে দিতে চান কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে। বিষ্ণু দে-র ইতিহাসের এই শিল্পরূপে বাস্তবের ছবিটাই ধরা দেয়। এ কবিতার ভাষা প্রত্যক্ষ, মুখের গদ্যের। ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্—১৯৫০-এর দশকের এই চিত্র ১৯৮০-র দশকের শেষে আরও সত্য। জীবনমৃত্যুর গোধূলি মৃত্যুর বিকারে আজ আরও ব্যাপ্ত, আরও ভয়াবহ। এ পাপপুণ্য হীন দেশে দগ্ধ দিনে, বিষন্ন রাত্রিতে, আমরা যে নরকে আছি, সে জ্ঞানও নেই। এই চৈতন্য ও জ্ঞানের জাগরণ না হলে বাঁচবার আশা নেই। বিষ্ণু দে-র কাছে কবিতা এই জাগরণের একটি মাধ্যম। ৫৮-য় আবার বলেন, "রাজধানী কবন্ধ কেন ? পঙ্গু দুস্থ সমস্ত প্রদেশ।" আমরা খুঁজি নিজবাসভূমি, অথচ প্রত্যক্ষত আছি আপন দেশেই। ৫৯-এ আবার পাই :

> তারপরে ? তারপরে কর্মস্থলে ক্লান্ত যাত্রি।
> কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,
> শত অর্থ খোঁজার পরও অনর্থক।
> গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় সহরেই হোক।...
> সদাই উদ্যত, ভবিষ্যত দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
> স্মৃতি শুধু শোক।
> প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
> ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতার সেই একই রোখ।"

এর প্রতিপক্ষেই তিনি চান অন্ধকার, কারণ তবেই আসতে পরে সর্বত সবিতা।

১৯৪৭-উত্তর আমাদের বাস্তব কবির এই নরক নয়, নরকের ব্যঙ্গ আরও সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নে শূন্যতার রোখ কবি দেখেন ঘরে ঘরে—"কাতরায়" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। এ বাস্তবের এত ভয়াবহ চিত্র কোন কবিই আঁকেন নি। হত্যা-লুণ্ঠন, শোষণ-অত্যাচার, নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন অনেকেই কিন্তু "চৈতন্যে মড়ক" এই মারাত্মক চিত্রকল্পের কথা কেউ বলেন না। এমনকি অতীতের সুস্থতার স্মরণও নেই—কারণ স্মৃতি শুধু শোক। এক ভবিষ্যহীন অতীতহারা ইতিহাসের

গোধূলিকেই কবি দেখেন এ বাস্তবে। আর তাঁর এই সিদ্ধান্ত অক্ষুন্ন থাকে, ১৯৭০-এর দশকেও অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের শেষ দশকেও।

১৯৭৪-এ লেখেন,

একি এ মৃত্যুর আলো? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি।...শান্তি কি কেবলমাত্র জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি?"

"আলো প্রায় অন্ধকার, তাও শুচি অন্ধকার নয়,
যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পক্ষপাতে জীবন্মৃত,
গ্লানির ক্লান্তিতে পঙ্গু, মূঢ়, একা মূলত আত্মহা।"

বিষ্ণু দে এই জীবনমৃত গ্লানি, ক্লান্তি থেকে উত্তরণে প্রথমেই আলোর প্রার্থনা করেন না, করেন না স্বর্গের কামনা। এক দ্বন্দ্বময় ইতিহাসবোধে জানেন আগে চাই অন্ধকার, নরকের দাহ, তবেই আসে প্রলয়ের পরের সূর্যোদয়। অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মত— সেই শুচি অন্ধকারের কথা বলেন, যাতে মানুষ শুদ্ধ হয়।

"মাঝে মাঝে হাওয়া খুঁজি? হাওয়া অন্ধকূপে।
তখন কি মহাদেশে দম বন্ধ প্রায়?
অথবা ড্রেনের গর্তে কটু-গন্ধ গ্যাসে
হাবুডুবু হাওয়া আর পাঁক-পচা স্তূপে
কিংবা গোটা দেশব্যাপী নর্দমার ব্যাসে
খুন বা খারাবি নয়, দৃষ্টি অন্ধ প্রায়,
সুদীর্ঘ বেঘোরে ঘোরা আর কাজ করা—"

কিন্তু কি বা কাজ? বাঁচা? প্রাত্যহিকে মরা? অন্ধকূপ ও নর্দমার চিত্রকল্পে দেশ আসে—নর্দমার ব্যাসে দৃষ্টি অন্ধ প্রায়। খুন বা খারাবি নয়। এই দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাওয়াই কবির কাছে ভয়ানক-হত্যা-শোষণের ধাপ ভাঙা যায়, যদি থাকে চৈতন্য-দৃষ্টি। কিন্তু এরই মৃত্যু ঘটেছে: তাই সুদীর্ঘ বেঘোরে ঘোরা, বাঁচা মানে এখানে প্রাত্যহিকে মরা। "এখানে জীবনমৃত্যু যথাযথই অনেকটা নগ্ন-রূপে চলে। / বন বা বাগান দুইই মরা, মাঠ প্রান্তর উলঙ্গ।/...জল নেই, জল যদি হয়; তাহলে বন্যাই।/ লড়ায়ে যে রুখবে, তারে সদ-বুদ্ধি কোথায়? কোথা অস্ত্র?/...দুঃখের লোভের রূপ আরো সোজা আরো যে বিবস্ত্র।" বাগান মরা, প্রান্তর উলঙ্গ আর লড়ায়ের সদবুদ্ধি ও অস্ত্র দুইই নেই। এটাই কবির কাছে আরো যন্ত্রণার: সংগ্রামের বীক্ষা নেই, দৃষ্টি নেই, আবার অস্ত্রও নেই। আর সে কারণেই কবি দেখেন, "আকাশে বাতাসে মেঘে সূর্যে জ্যোৎস্নায় মন তাই সহজিয়া ব্যথায় জাগর।" ব্যথায় জাগর,

সহজিয়া ব্যথায় : সংগ্রামের প্রতিবাদে নয়। গ্লানি, অস্তিত্বের প্রতি এক প্রায় ঘৃণাই ধরা পড়ে এই কবিতাংশে :

"শহরে গোয়ালে, উপমার নয়, বাস্তবে করি বাস !
গোরু মোষ আর মানুষ জাতীয় কত যে আজব জীব !
পাড়ায় পাড়ায় ফালি জায়গায় ঘ্রাণে কানে সন্ত্রাস
আর যন্ত্রণায় হানে সারাদিন স্ত্রী পুরুষ আর ক্লীব, ··

আর সারাদিন গৃহহীন ঘোরে খেদানো কয়েক পাল
জারজ কুকুর, খুঁজে মরে কলকাত্তাই জঞ্জাল।
আর বস্তি বা রাজপথে শানে গাড়িবারান্দাবাসী
সেরে যায় প্রাতঃ নৈশকৃত্য। কি আসে কান্না ? হাসি ?"

গোয়ালকে আর উপমা ভাবেন না, বাস্তবই ভাবেন। 'জারজ কুকুরের'র চিত্র-কল্পে ধরা দেয় একেবারে বাস্তবের ছবি। এতে কান্না, হাসি কিছুই আসে না : আসে ক্লীব অস্তিত্বের বন্ধ্যা যন্ত্রণা। প্রশ্ন তোলেন কবি, "ক্ষমা নেই ? প্রাক্-নরক এই অবসাদে ?"

"কিবা দিন কিবা রাত্রি কিবা রবিবার
প্রত্যহই ছিন্নমস্ত, বস্তা বস্তা ক্লান্তি
বিলি করে, ফেরি করে, ঢাকে গুপ্তি খাদে।"

এই ক্লান্তিতে আকাশেও ভ্রান্তি। গুপ্তিখাদের এই মুমূর্ষার ক্লান্তির পাশে এক উজ্জীবনী ক্লান্তির কথাও ১৯৫০-এর দশকে কবি বলেছিলেন,

"ক্লান্তিতে কিসের ভয় ?
ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ সেরে তুরপুন র‍্যাঁদার কিংবা তাঁতের
মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি।···
মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,
ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের ক্লান্তি বড়ো ক্লান্তিকর।
জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই,
আমরা সবাই ওরে ভাই
চাই সেই ক্লান্ত অবসর।"

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসে এই সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি, জ্ঞান ও বাস্তবের বিন্যস্ত জীবনে কর্মের ক্লান্ত অবসরের সম্ভাবনা আর দেখেন না। প্রাক-নরক, নরকের ব্যঙ্গ, চৈতন্যের মড়ক আরও সর্বব্যাপী—লক্ষ্য করা যায় কবির বাক্য ক্রমশঃ প্রশ্ন-বোধক হয়ে উঠছে। জিজ্ঞাসা চিহ্ন আসছে ঘন ঘন। যে দ্বন্দ্বময় আস্তিক্যে, জীবনের উজ্জীবনে তিনি এগিয়েছিলেন শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়, নরকের অভ্যাসের জট ছাড়িয়ে নরকের নরকের রচনায়, পায়ে পায়ে মিছিলে মিছিলে, আজ তা নরকের ব্যঙ্গে, প্রাক-নরকের গোধূলিতে হেরে যেতে চায়। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রশ্ন :

> "একি ক্ষয়িষ্ণুতা? নাকি চৈতন্যেই অতিসার রোগী?
> দিনরাত্রি বিরাগ, বিতৃষ্ণতা? কদাচিৎ প্রতিবাদ?
> জানি, ব্যক্তি নয়, নয় দেশ, দুনিয়াই ভুক্তভোগী,
> প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষেই—বিবিক্তিরই মানসে বিবাদ?

ব্যক্তির এই ক্ষয়িষ্ণুতা যে দেশের বাস্তবেই, এমন কি দুনিয়া জুড়েই এ বোধে তাঁর বিষাদও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বারবার ফিরে আসে ক্লান্তির প্রসঙ্গ : গ্রাম গ্রামাঞ্চলে বাসা কিংবা মফস্বলে / অথবা শহরে যেখানেই বাসা বাঁধো, / সেই ক্লান্তি আর অসন্তোষ। …অসংখ্য ক্লান্তির ভার জমে ওঠে ন্যুব্জ মনে, / যেন বহু কুব্জার শাপে।

বিষ্ণু দে জানতেন দীর্ঘকালীন উপনিবেশ, তার পঙ্গু বিকাশ, আপসের খণ্ডিত স্বাধীনতা তাঁর দেশকে বাস্তবকে চৈতন্যময় শুদ্ধ পথে নিয়ে যায় না। কিন্তু তিনি ১৯৩০-এর দশক থেকে দেখেছেন এর বিরোধী-প্রতিবাদী বীরত্বপূর্ণ লড়াই, দ্বন্দ্বময় আকাশের রোদ-জল। তাই আশা ছিল, ধ্যানের বাস্তব তিনি পাবেন। কিন্তু ক্রমশঃ দেখলেন সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দেখলেন গ্রাম নেই, শহর নেই, মজুর নেই, চাষা নেই, বাচবার আশানেই-ভাষা নেই। অর্থাৎ সেই শ্রেণীর যথার্থ অবস্থান নেই, যা আনবে বিপ্লবের আন্দোলন। বাঁচবার ভাষা, মানে, সেই তত্ত্ব নেই আর প্রাকসিস আসবে ইতিহাসের মুক্তিকে—এ এক অদ্ভুত গোধূলিবেলা : নরকে বসবাসের চেতনা নেই অর্থাৎ প্রাক-নরক এক ধূসর জগৎ। যন্ত্রণার বোধ নেই "আছে মৃত কান্না, নির্জলা অস্তিত্বের আকাল। লক্ষণীয়, এই সব কবিতার ভাষা! একেবারে কথ্যচাল, : স্পষ্ট, সোজা। অথচ প্রাত্যহিকতার জীর্ণ ভাষা নয়। যেমন,

> "এ কি এ মৃত্যুর আলো? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি।
> ভয় পাও? মানবিক মন চায় মৌলিক সত্তার
> কলুষিত মধ্য রাত্রি? নাকি চায় প্রাগুষার শান্তি?"

কথ্য ভাষার ছন্দস্পন্দ এখানে স্পষ্ট, ভাষার স্বচ্ছতাও, অথচ দৈনন্দিন ভাষার

জীর্ণতা নেই। যে ঐশ্বর্যময় কাব্য ভাষা বিষ্ণুদে-র করায়ত্ত সেই ভাষাকে তিনি সরিয়ে দেন ; সরিয়ে দেন সন্দীপের চর-অন্বিষ্টের বেগবান ভাষার স্রোত। অন্বিষ্ট ও স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের ভাষা পরপর রাখলেই বোঝা যায় কবির নরকের পথের চেতনা ও প্রাক-নরকের চেতনায় তফাৎ কোথায়।

"হঠাৎ উঠেছে দেখ ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হতে পারে কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাসা,
জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরনোসরাস,
আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল
পেয়েছে দপ্তর গদী গমস্তা ফরাস থাশা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী,
কলকাতার কপালের গেরো (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ)

আর অন্বিষ্টের শুরুতে পাই ঐ কবিতার সর্বাপেক্ষা মৌখিক ভাষার কাছাকাছি অংশ :

"আমারও অন্বিষ্ট তাই
আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে-স্তরে
বাঁচার বিস্ময় ছড়াক রঙের ঝর্ণা
সহাস জীবন এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সকল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন্ সূর্যাস্তে রঙীন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সত্য ও সজাগ"

প্রথম কবিতার চৈতন্যেমড়ক, আর দ্বিতীয় কবিতাংশের কর্মময় চৈতন্যের বৈপরীত্য যতটা, ততটাই এদের ভাষার পার্থক্য। দ্বিতীয়টিতে দৃঢ় ঘোষণা, আমারও অনিষ্ট তাই, নিসংশয় জীবনের অনুর সংহতির লক্ষ্য। আর প্রথমটির গোড়াতেই হয়তো বস্তুত: উত্তরপর্বের কবিতায় বাস্তব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এই হয়তোবা প্রশ্নসঙ্কুলতা নিয়ে আসে। কিন্তু কবিতার কোন ঘাটতি হয় না। এই বাস্তবের ঘৃণা, অনিশ্চয়তাকে বিষ্ণু দে বেঁধে নিতে পেরেছিলেন কবিতার শিল্পে—এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী। ভাষাকে ক্রমশ: নিরাভরণ করে করে ব্যক্তি ও বহির্বাস্তবের দ্বন্দ্বকে ধরার প্রয়াসে বিষ্ণু দে-ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মতই বিষ্ণু দে-কে লড়াই করতে হল এক ভাঙনের বিরুদ্ধে। কবি হিসেবে। দ্বন্দ্বময় এক আস্তিক্যের চেতনায় তিনি বেঁধেছিলেন তাঁর কবিতাকে : এ চেতনায় আকাশে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-মেঘ, চাঁদ-নক্ষত্র সবই সমন্বিত হতে পারে, এ এক সৌর-জগত। কিন্তু ক্রমশঃ বাস্তবে এ জগৎ অবাস্তব হয়ে যায় নানা ঐতিহাসিক ব্যর্থতায়, আকস্মিক কারণেও। এই ব র্থতা ও তজ্জনিত ভাঙনের বোধ তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু কখনই তিনি সরে আসে না তাঁর ঐ আস্তিক্য বোধের কেন্দ্র থেকে। ঐ কেন্দ্রই তাঁকে বাঁচায়—বাঁচেন প্রকৃতিতে, বাঁচেন রবীন্দ্রনাথে। এই মত্ত পৃথিবীর চিত্ররূপ সেকারণেই আঁকতে পারেন লোভ, বিকার, মড়কের মধ্যেও, "তবু এই আষাঢ়ের দৃশ্যে শ্রাব্যে ভরে ওঠে। শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ।' বাঁচেন প্রেমে-শিল্পে-গানে। একোন স্থির কেন্দ্রের নিশ্চলতা নয়, এ বাঁচার লড়াই : ভয়াবহ চরিত্রহীন মৃতকান্নার বাস্তবে কবির সংগ্রাম। এই মুমূর্ষা পেরিয়ে যেতে চান তিনি ইতিহাসে।

"অতএব চোখ খুলে ধূসর নেতিতে বিবীক্ষা
চর্চা করা। ধৈর্যভরে যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
বর্ণাঢ্য আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে গ্রামগ্রামান্তের মানবঋণের
দৈনন্দিন আনন্দেই কিংবা তারই নামান্তরে, ঐতিহাসিক বিষাদে
ট্রাজিক উল্লাসে তীব্র, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয়
সংগীতের মতো।"

বেগম আকতার কামাল

আধুনিকতা ও বিষ্ণু দে

'আধুনিক' শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নির্মোহ, তবে সেটা কোন নিশ্চিত ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'একালের কবিতা' শীর্ষক কাব্যসংকলনের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, '…আধুনিক শব্দটা খুব নিশ্চিত নয়। …রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং কয়েকটি মৌল পুরুষার্থে তাঁর আস্তিক্য নিশ্চিত, যদিও প্রান্তিক থেকে শেষ লেখায় কঠোর নগ্ন প্রশ্ন তাঁর মন তুলেছে—এবং শেষ অবধি শান্তিপারাবারে তাঁকে সংকুচিত হতে হয়নি আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। সে প্রকাশ যেমন বিরাট, বিচিত্র, তেমনি স্বস্থ ও মহৎ। পরের কবিদের যে কারণেই হোক সে আত্মস্থতা হল দ্বিধান্বিত, প্রশ্নদীর্ণ, লজ্জিত, সংকুচিত।"[১] বাংলা কবিতার প্রগতি নির্দেশের সূত্রে তিনি ঐ কাব্যসংকলনকে 'আধুনিক কবিতা না বলে অভিহিত করেছেন 'একালের কবিতা' বলে এবং রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মৌল পার্থক্য সম্বন্ধেও ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। আধুনিকতা, প্রগতিশীল মানবিকতা ও শিল্পরচনা—এসবই তাঁর চেতনায় প্রায়শঃ সমার্থকরূপ নিয়েছে। ঐতিহ্যবিবেচনায়, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদঘাটনে কিংবা কাব্যরূপবিচারেও বিষ্ণু দে একটি কেন্দ্রস্থ ধারণার সূত্রে প্রগতিশীল মানবিকতার সঙ্গে আধুনিকতার সমীকরণ ঘটিয়েছেন।

কবিতারচনাকে তিনি দেখেছেন আত্মসচেতন সক্রিয় কর্ম হিসেবে, যা মননজাত, শ্রমসাপেক্ষ। তবে এক্ষেত্রে অবচেতন-প্রেরণার প্রভাবকে একেবারে বাদ দেননি, বলেছেন, "কবিতাতো লেখাই হয় শব্দের ছন্দের প্রায় অবচেতন খানিকটা ব্যক্তির বাইরে নিজস্ব তাড়নায়, ভাষার প্রকাশসত্তা প্রাণ পায় কবিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কথার এই চেতন-অবচেতন ধ্বনির দ্বন্দ্বস্রোতে। …কবিরা কখনও কখনও কবিতা আরম্ভ

করতে গিয়ে টের পেয়ে যান যে, তাঁর জ্ঞানেঅজ্ঞানে একটা কিছু ঘটছে এবং সেটার বাইরে গঠন পাবার মূর্ত হয়ে আসার চাপটাও বোধ করেন। তিনি হয়তো সম্যক জানেন না সেটা ঠিক কি ব্যাপার ঘটছে যদিচ তার প্রস্তুতি হয়েছে তাঁরই মনে।”[২] বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত ‘ঘোড়সওয়ার’, ‘মহাশ্বেতা’ কিংবা ‘জলদাও’—এর কিছু অংশ অবচেতনার ঘোরে রচিত হলেও তাঁর কাছে শেষাবধি কবিতারচনা মনেরই ‘সজ্ঞানতার স্বয়ংনির্দিষ্ট সক্রিয় বিন্যাসধৃত একটি ব্যাপার, যা আধুনিকবোধেরই সমার্থক। ঐ বিন্যাসের পশ্চাতে থাকে যে কবি-মানস তার সমগ্রসত্তাই তাতে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে এবং “শেষ অবধি যে কবিতা তিনি (অর্থাৎ কবিরা) রচনা করে বসেন তার সে কবিতাই হয়তো প্রকাশ করে সেইসব আশা আকাঙ্খা, উদ্বেগ-ভয়, সেইসব সংশয় বা আস্তিক-অনুভব যাতে তিনি সচেতন-অবচেতন ভাবেই অংশীদার বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে এবং দেশের মানুষের সঙ্গে চৈতন্যে ক্রমান্বয়ে উত্তীর্ণ।”[৩] ব্যক্তিগতের নিভৃতি থেকে চৈতন্যকে বৃহৎ মানবসমাজ-সম্বন্ধের কাছে এনে ফেলাই বিষ্ণু দে-র প্রগতি এবং এ কাজটি তিনি করতে চেয়েছেন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, ব্যক্তিত্বের নবনব উন্মেষ ও বিকাশকে অর্থবোধক ভেবে এবং একটি নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গেই তাঁর বক্তব্য, “প্রকৃত বা সৎকাব্য যার শিকড় চেতন ও অবচেতনের মাটি ও জলে, নিজের যুক্তিতে সে নির্ভর। অবশ্য সে যুক্তি কষ্ট করে জানতে হয়, কাব্যের স্বকীয় ডায়ালেকটিক খুঁজতে হয় তার নিহিত থেকে প্রকাশিতের অভিযানের মধ্যে, রূপহীন থেকে রূপায়িতের প্রক্রিয়ায়। যথার্থ কাব্যের মজ্জাগত এই আততিই যে কোনো সত্তবান কবিকে নিজের মধ্যে এবং যুধ্যমান জগতের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে এনে ফেলে। সেইজন্যে ফরাসী সাম্যসুধীর ভাষায় কাব্য আজকে সামগ্রিক অর্থাৎ প্রগতিশীল মানবিকতার দিশারী।”[৪]

বিষ্ণু দে কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বরূপের স্বভাবে কবিসত্তার বিকাশকে চিহ্নিত না করে তাকে দেখেছেন ‘সভ্যতার বা বৈদগ্ধ্যের গভীরতায় এবং নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায়।’ আবার অন্যদিকে শুধুই বহির্তথ্যের রূপায়ণ নয়, আত্মভাবকেও ঐকান্তিক না করে বরং যে-প্রকৃত ভারসাম্য কবি অর্জন করেন চৈতন্যের ইতিনেতির দ্বন্দ্বে, তা-ই শব্দেছন্দে গ্রথিত হয়ে থাকে। হতে পারে তার আরম্ভ নেতিতে, কিংবা মানসিক সংকটবোধে, তবুও তা মানস-প্রগতিরই অভিধা। কবিতায় প্রাণ পায় “কবিমানুষটির সমগ্রসত্তা অথবা সমস্ত-রকমের অভিজ্ঞতার গোটা পট, তাঁর স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য থাকছে তাঁর সমস্ত বিশ্বের পশ্চাদ্‌ভূমির, সমস্ত তত্ত্বজগতের জলহাওয়া।”[৫] কবি ও কবিতার এই অব্যবহিত সম্বন্ধসূত্রকে বিষ্ণু দে অবলোকন করেছেন আত্মসচেতনতার প্রেক্ষাপটে। এবং প্রেক্ষাপটটি বাস্তব রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্পষ্ট ও অবয়বপ্রাপ্ত।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজ-প্রবর্তিত খণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্রোড়েই যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের আলো জ্বলে উঠেছিল সে কথা পুনরাবৃত্তি হলেও বারংবারই প্রাসঙ্গিক। ক্রমান্বয়ে ঐ আলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রাজনীতির প্রত্যক্ষক্ষেত্রে ঠেলে দেয়, নানা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বে আন্দোলিত করতে থাকে, তাদের আত্মপরিচয় ও ঐতিহ্যের প্রশ্নকে সংকটাকুল করে তোলে। বিভিন্ন আবেগ ও আদর্শ যেমন মধ্যবিত্তের চিত্তজগতে ছাপ ফেলতে থাকে, তেমনি ইতিহাস ও বাস্তবের গতিপ্রকৃতিতে নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে ঐ চিত্ত সচেতন হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীরই একজন ব্যক্তি হিসেবে বিষ্ণু দে বাস্তব রূপের ভগ্ন ও খণ্ডিত অবয়বকেই অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করলেন এবং মধ্যবিত্তের আত্মসংকট যে রাজনীতি-স্পৃষ্ট-ও উদ্ভূত—এই প্রত্যয় তাঁর মানসজগতে অনুভূত হতে থাকে। তিরিশের কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-র চেতনাই রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং তা হল এই যে, বাস্তব দ্বন্দ্ব বিরোধকে, মূল্যবোধের বিনষ্টিকে এবং সর্বোপরি উত্তরাধিকারত্বের জিজ্ঞাসাকে স্বীয় অস্তিত্বের শিকড়ে চারিয়ে দেওয়া, একই সঙ্গে ব্যক্তি ও কবির ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন অবস্থার রুদ্ধচিত্র অবলোকন করা এবং সৃজনশীল বোধে ঐকান্তিক হয়ে ওঠা। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখেছেন, "ক্লান্তিহীন সংকটাবস্থায় সৃজনধর্মী বা ইতিমূলক কর্মিষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিস্বরূপ স্বভাবতই তীব্র হয়ে ওঠে উৎক্রমণের প্রকাশপথের মুক্তি চেয়ে, তীক্ষ্ণ আততিতে আত্মভুক সর্পিল সচেতনতা নির্গত হতে চায় প্রকাশের বহিরূপায়ণের মুক্তিতে।"[৬] এটাই আধুনিক লেখকের আত্মসচেতনতা, যা নিরক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে যেমন চিহ্নিত করে, তেমনি আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধেও পীড়িত হয় ও পরিণামে অভীষ্ট-সন্ধানী হয়ে ওঠে।

বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে প্রথমেই যা লক্ষ্য করা গেছে, তা হল বাস্তব সংকটবোধকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাত্রারম্ভ হয়েছিল, সেখানে ছিল নেতিবাদী ভঙ্গী, তির্যক ব্যঙ্গ, সর্বোপরি রবীন্দ্রবর্ণমালার সঙ্গে বৈপরীত্যপোষণ। এবং এসবই রূপ পেয়েছে আত্মসচেতনতার উদ্বেলতায়, নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চায় এবং একটি মানবিক দৃশ্যরচনায়। তখন থেকেই তিনি কবিতারচনাকে ভেবে এসেছেন ব্যক্তিস্বভাবের আত্মপ্রকাশরূপে নয়, বরং ব্যক্তিস্বরূপের দ্বন্দ্বারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ-পন্থার মধ্যে; হতে চেয়েছেন সৎ কিন্তু মাইনর কবি। অর্থাৎ তিনি নিজব্যক্তিত্ব ও কবিত্বময় প্রকাশের পরম্পরায় আধুনিকতাকে বুঝে নিতে চাইছিলেন। আত্ম আবিষ্কারের প্রেরণা, বিনিদ্র রাত্রিযাপন, মানসিক টেনশন—সবকিছুই একটি নৈর্ব্যক্তিক রূপের মধ্যে নির্গলিত হয়েছিল যার উদাহরণ বিধৃত রয়েছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' নামধেয় প্রথম কাব্যে। প্রেমবিষয়ক হয়েও কাব্যটি আত্মনাট্যের বিকার থেকে মুক্ত, পীড়ন থেকে দূরবর্তী একটি শক্তিময়তায়, স্বচ্ছপ্রকাশে নির্ভয়। প্রথম থেকেই

তিনি আধুনিক সংজ্ঞার্থে কবিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের পৃথক অনুশীলনকে ধরতে চাইছিলেন, 'আত্মসচেতন মনের কাব্যিক স্বাক্ষর'কে সজ্ঞানে অর্জন করতে চেয়েছিলেন—যা ছিল রবীন্দ্রোত্তর তিরিশী কবিদের স্বকীয় পথ। সেই পথটি ছিল রোমান্টিক কবিতার ব্যক্তিত্ব চিন্তাকে পরিহার করে আত্মের চরমসীমা ব্যক্তিগতের শুদ্ধতম প্রকাশকে ব্যক্তিক না করে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করে তোলা যায় কিরূপে। এই শর্তে বিষ্ণু দে রোমান্টিক প্রেমভাবনার ভঙ্গুরত্ব চিত্রিত করেছেন, পাশাপাশি একটি মানবিক সৌন্দর্যবোধের স্বচ্ছ অথচ বলিষ্ঠ সঞ্জীবনী শক্তি স্বরূপা প্রতীক তৈরী করে নিয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসময় ভাষারীতি বাদ দিয়ে তাঁকে খুঁজতে হয়েছে ব্যক্তিসমাজের নিহিত ভাষাবোধের আততিকে। এই প্রয়াসেই তিনি রবীন্দ্রবর্ণমালাকে ভেঙ্গেছেন এবং পরবর্তীকালে গড়েছেনও। তবে কলাকৌশল থেকে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে পৃথক করে দেখেন নি তিনি।

আধুনিকতার আরেকটি বড় দিক থেকে আত্মশুদ্ধির সন্ধান করা—বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে, নেতিমুখ যন্ত্রণার অবগাহনে আত্মের বিসর্জন। এই শুদ্ধতার লক্ষ্যে তিনি যেমন এ্যান্টি রোমান্টিক হয়েছেন, তেমনি ক্রমান্বয়ে মার্কসবাদে হয়েছেন সংস্থিত। প্রথাগত লিরিকের অবয়বেই প্রথাকে ভেঙ্গেছেন, আবিষ্কার করেছেন দীর্ঘকবিতার সাঙ্গীতিক প্রতিবেদন ছন্দের উচ্চাবচ ভাস্কর্যলীলা। কবিস্বভাবের প্রগতি এর মধ্যেই নিহিত। প্রথম পর্যায়ে তাঁর চেতনায় ছিল উদারনৈতিক ভাবধারা, সূক্ষ্ম রুচিবোধ, শালীন বৈদগ্ধ্য, পরবর্তীকালে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কসীয় জীবনদর্শন। উদারনীতির পোষকরূপে এলিয়ট-চর্চা, রবীন্দ্রদ্রোহ-পরিগ্রহণ ও আঙ্গিকের বিচিত্র পরীক্ষায় রত ছিলেন। সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক মতামত বিনিময়ের ঔদার্যে, পত্রপত্রিকার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপনে, আড্ডা মজলিসে মননশুদ্ধ রসচর্চা ঐ ধারাকে বিকশিত করেছে, তার আত্মপ্রতিকৃতির সঙ্গে কবিত্বশক্তির অভিন্ন সম্বন্ধ গড়েছে। এসবই আধুনিক মানসের প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁর প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, রসগ্রাহী চিত্তের সাযুজ্যসহ বাস্তব সময়ের বিপন্নবোধে আক্রান্ত হন এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে মার্কসবাদকে স্বীয় কবিপ্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ করে নেন, এটা ঘটেছিল এই কারণে যে, "আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বর নিক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত" চর্চার ফলে। এই চর্চায় তাঁর কাব্যিক বিষয় ও রূপ উভয়ের বিস্তার ঘটেছে—জীবনের বহুমিশ্রিত সমগ্রতার অন্বয়ে। উক্ত সমগ্রতার সূত্রে রয়েছে সময়চেতনা, ঐতিহ্যের মীমাংসা এবং সৃষ্টিশীল সত্তার জাগরণ প্রশ্নটিও। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় প্রতিপালিত হয়েও রবীন্দ্রোত্তর কবিরা ঐতিহ্যের প্রশ্নে, আত্ম অবস্থানের জিজ্ঞাসায় যেমন সমস্যাক্রান্ত হয়েছিলেন, তেমনি সময়চেতনার শর্তে হয়ে উঠেছিলেন বৈশ্বিক ঐতিহ্যের

মুখাপেক্ষী। বিষ্ণু দে নিছক ব্যক্তিক আবেগ-কল্পনা পরিহার করে শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, বিজ্ঞানের উন্মেষ ও বিস্তারকে অনুস্যূত করেছেন কবিতার অবয়বে, মানবসমাজের যা কিছু মহৎ, সৌন্দর্যময় ও কালোত্তীর্ণ—সেসবই তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছে পরম উত্তরাধিকার। এসবই সংঘটিত হয়েছে একটি সূত্রবদ্ধ কেন্দ্রস্থ সত্যগঠনের শর্তে। বিষ্ণু দে জ্ঞানের বিচিত্র সম্ভারকে একটি সূত্রে বাঁধবার লক্ষ্য যেমন নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি সেসব উপাদানকে বাস্তব সময়-সংকটে, দ্বন্দ্বে, বিক্ষোভে, ভাঙ্‌চুরের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বশীল করবার সদিচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ বিচিত্র বিষয় তাঁর কবিতা ও মানসরূপকে করে তুলেছে পরস্পরের জন্য অপরিহার্য ও অব্যবহিত। মনন-প্রাথর্য তাই তাঁর কবিতার একটি অনিবার্য মাত্রা ; "কারণ আধুনিক কাব্যের ঝোঁকটা হচ্ছে কবিতালিখনের প্রক্রিয়াতেই মননের নির্দিষ্ট কর্মিষ্ঠতার বিনীত সততায়।"[১]

বিষয়লগ্ন দৃষ্টিলোকই বিষ্ণু দে-র কবিব্যক্তিত্বের মূলবৈশিষ্ট্য ; এই বিষয়লগ্ন দৃষ্টি সম্ভব হয়েছে 'সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্ব স্বীকারে'—বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন চলমানতায়, মানবিক দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার ফলে। বিষ্ণু দে-র ভাষ্য, "নিজের অন্তঃস্থলে বাস্তবের যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থেকে তাই যাত্রা শুরু। তাইতো চলতে হয় ক্লান্তিহীনভাবে উদ্‌ভ্রান্তি ও শক্তিমত্তা সাধ্যানুসারে অর্জন করতে নিজেরই সত্তার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যে সত্তা ব্যক্তি মানুষেরই অহম্‌ এবং সমাজে তার জীবনযাত্রার মিলিত ফল। তত্ত্বগতভাবে আমরা সবাই বুঝি যে, এই সত্তাকে বিকশিত বা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারায় আমাদের আজন্ম মানবিক দৃশ্যের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস এবং আমরা আমাদের কৃতকর্তব্যে। যে সামাজিক দৃশ্যে আমাদের অবস্থান তার সঙ্গে যেটা আমাদের বিশ্বদৃশ্যের অজস্রতার আর মহিমার একটা বিলক্ষণ প্রতিশক্তি।" বিষ্ণু দে উপর থেকে আবছাভাবে বা পার্শ্ব দৃষ্টিতে জীবন ও জীবনলগ্ন সক্রিয়তাকে অবলোকন করেন নি ; তিনি চলমান-বিকাশের অন্বয়সূত্রে সব কিছু দেখেছেন। নটরাজের নৃত্য তাই তাঁর পরমপ্রতীক ; চিত্র ও সঙ্গীতকে ছন্দের একই গতির মধ্যে দোলায়িত করেছেন। তবে একথাই সত্য যে, বিষ্ণু দে নির্বিশেষ আকুতিকে বিশেষের আততির মধ্যেই রূপায়িত করেছেন। সেখানে শিল্প-রচনার স্বভাবকে মান্য করাই তাঁর অনিবার্য দায়িত্ব ছিল। রূপের বা কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায় অর্থাৎ, কবিতার শিল্পরূপও যে বিষয়বিষয়ীর অবিচ্ছিন্নতা—এই তথ্য থেকে তিনি বিভ্রান্ত নন। ফলে আধুনিকতা মাত্রেই আর কালগত ব্যাপার বা রবীন্দ্র-দ্রোহরূপে বিবেচ্য থাকে না, তা হয়ে ওঠে একটি মননশীল প্রবর্তনা। আত্মসচেতন মননই জীবনের নানাপর্বে নানাধরণের সংকটযন্ত্রণা অতিক্রম করে আত্মপরিচয় লাভে

উৎসুক হয়ে ওঠে। এরই প্রবল এষণা থেকে ব্যক্তিচিত্ত একটি টেনশনের মধ্য দিয়ে ছুঁতে চায় নিজের উত্তবকে। দ্বন্দ্বকে এবং অন্বিষ্টকেও। এই অর্থেই বিষ্ণু দে সংকট বোধের উত্তরণের পথে মানবমনের সঙ্গে ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় গতিকে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসকেই বলেছেন আধুনিকতার আততি। তাঁর আধুনিকবোধের বিচার আরও স্পষ্ট হয়, যখন তিনি কবিতার বিচার করতে চান দ্বন্দ্বময় অলঙ্কার প্রয়োগের কবিত্বময়তা দিয়ে। তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যে; প্রয়োজনের সঙ্গে আনন্দের যে-বিরোধের কথা রবীন্দ্র-সাহিত্য তত্ত্বে উচ্চারিত, তার মূলে বিষ্ণু দে দেখেছেন যে-যুগের জ্ঞানচর্চার বিচ্ছিন্নতাকে। আধুনিক মন সে বিচ্ছিন্নতাকে চরম বলে মনে করে না বরং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস করে। এবং যেহেতু এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক চেতনায় তুলনামূলকভাবে আত্ম-সচেতনতায় তীব্র, তির্যক, তাই আধুনিক কবিতা হয়েছে ব্যাখ্যার বদলে ব্যঞ্জনাধর্মী, রূপকের দ্বৈত পোশাক পরিত্যাগ করে হয়েছে প্রতীকী। এখানে ব্যক্তি ও বহির্বিশ্বের সম্বন্ধকে দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের প্রেক্ষাপটে সংকটাকুল ও জটিলরূপেই দেখা হয়। ফলে সুবোধ্যতা-বিচ্যুত হয়ে কবিতা হয়ে ওঠে জঙ্গম উচ্চাবচ, কখনও বা দুর্বোধ্য।

তথ্য নির্দেশ

১। বিষ্ণু দে, মুখবন্ধ, একালের কবিতা, সম্বোধি পাবলিকেশনস্, কলকাতা ১৯৬৩ পৃঃ ৫, ৯।

২। বিষ্ণু দে, জনৈক লেখকের কৈফিয়ত, সেকাল থেকে একাল, ১ম প্রকাশ নভেম্বর বিশ্ববাণী কলকাতা, পৃঃ ২১।

৩। ঐ, পৃঃ ২৫।

৪। বিষ্ণু দে, আরাগঁ, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সিগনেট প্রেস কলকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ ৬৮।

৫। বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১ম বাংলাদেশীয় সংস্করণ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃঃ ৪।

৬। ঐ, পৃঃ ২।

৭। ঐ, পৃঃ ৪।

৮। বিষ্ণু দে, জনৈক লেখকের কৈফিয়ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

মনিভূষণ ভট্টাচার্য

প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা

আধুনিক বাংলার উপরিকাঠামোর ভিত্তি তৈরী করেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-পোষিত মুৎসুদ্দি পুঁজি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদপুষ্ট জমিদারশ্রেণী ও উনিশ শতকের বেনিয়া এবং বাবুরা, কলকাতার-উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এদের মিশ্রণে ও পারস্পরিক সহযোগিতায় এই নগরবন্দরের আর্থ-সামাজিক বনিয়াদ তৈরি হয়েছিলো। সমকাল ও সংস্কৃতি তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাংলার বহুবিজ্ঞাপিত নবজাগরণ তাই পরাহত জাতির জীবনকুণ্ঠা প্রকাশে খণ্ডিত শক্তির আশ্রয়ে দিশেহারা। এই অসম্পূর্ণ, ভাঙাচোরা রূপলাবণ্যের লবনাক্ত মহাসমুদ্রে মধুসূদনই প্রথম বিশ্বনাগরিক।

ঈশ্বর গুপ্তে আমরা যে জীবনরসরসিকতাময় বানীগ্রন্থনানিপুণ স্বদেশী ব্যক্তিত্বের আভাষ পাই, আংশিক পিছুটানে তা পূর্ণতা ও তৃপ্তি লাভ করেনি। তিনি ভারতচন্দ্রের নাগরিক উত্তরসূরী। মধুসূদনই বাংলা কবিতার ভগীরথ। তাঁর বিশ্বপর্যটন অসমাপ্ত থাকে ব্যক্তিজীবনের নানা জটিলতা ও দ্বন্দ্বে; প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামে তিনি ডানা ভাঙা ঝড়ের পাখি। তাঁর 'মেঘনাদ বধ' ও 'বীরাঙ্গনায়' তাই মুক্তির সমুদ্র গর্জন, তাঁর লোকায়ত জীবনতৃষ্ণায় পরিচয় মেলে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাঁর দেশজ শিকড়ে আবদ্ধ বহুভঙ্গ অনুসন্ধানী সত্তার মৃত্তিকাভেদী আকুলতা।

মধুসূদনের আলোকিত উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে পূর্ণ বিকাশের মর্যাদা লাভ করলো। কিন্তু সমুদ্র কল্লোল নয়, গাঙ্গেয় অববাহিকা নিস্থত জলরাশিতে পরিপূর্ণ জাহ্নবীমহিমাই রবীন্দ্রকবিতার অন্তরালশায়ী স্রোত। তার সঙ্গে যুক্ত হোলো রামমোহনের বিশ্ববীক্ষা। মধ্যভিক্টোরীয় শুচিতা ও শালীনতা বোধ ও উপনিষদিক প্রশান্তি স্বদেশে পরবাসের যন্ত্রণা

থেকে তাঁকে আংশিক মুক্তি দিতে পেরেছিলো। কবিতার বহুপ্রসূ প্রান্তরে তিনি নানা জাতের ফসল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সোনার ধানে উপচে উঠেছে মহাকালের সোনারতরী। কিন্তু স্বদেশশ্মশানে যে জীর্ণ ক্ষতবিক্ষত শববাহকেরা কোমরে গামছা বেঁধে আগুনের জন্য অপেক্ষা করছে—সেই যন্ত্রণাদগ্ধ নিঃস্ব নিরুপম জীবনচর্যা তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে স্পর্শ রেখে গেলেও তা ব্যাপকতা অর্জন করেনি। তাই কালগত ভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলেন নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' হাতে নিয়ে বাংলা কবিতায় নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন বিষ্ণু দে। প্রথম থেকেই তিনি বিতর্কিত কবি। দুরূহ উচ্চারণে তিনি কবিতার পেলব শরীরে কঠিন গ্রন্থনা নিয়ে এলেন। তারপর একের পর এক কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে বিশ্বপথিকের তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ সম্পূর্ণতা লাভ করলো।

কবিতায় যে ভূমিসংলগ্ন বীজ থেকে বিকাশের পর্বে পর্বে অন্তরীক্ষ-আলাপ, তার বিচক্ষণ প্রকাশরূপ কবির বহু অনুসন্ধানের বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপনের, এক সহৃদয় সমুদ্র মন্থনের বার্তাকে বহন করে। সময়ের ব্যবধানে তাই কবিতাই হয়ে ওঠে কালের সাক্ষী। বাংলা কবিতায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যে নিরুদ্ধ আবেগের উন্মোচিত তরঙ্গ মালাকে মুক্তি দিয়েছে তার উৎস 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে। মধ্যবর্তী 'ঝুলন' কবিতাটি অন্তর্বিপ্লবের কবিতা। তারপর বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার'। এই চারটি ঐতিহাসিক লগ্নেই ঘটেছে কবিতার প্রতিবন্ধকতাদীর্ণ জাগরণ। 'মেঘনাদ বধে' অন্ধ নিয়তির বিরুদ্ধে পৌরুষ-প্রদীপ্ত প্রতিরোধ, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' নৈসর্গিক প্রস্তর কারাগারে নির্ঝরের ঘোষণা ও ঘর্ষণ এবং তার সমুদ্রাভিসারী আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গিত প্রকাশ, 'ঝুলন' কবিতায় সত্তার বহিরঙ্গ রূপকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার অন্তহীন উদ্বোধন, 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় চতুর্দিকে ভয়াবহ শব্দহীন প্রান্তরে দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ঘোড়সওয়ারের আগমন ধ্বনি ও তাকে আকুল আমন্ত্রণের অবচেতন অভীপ্সা—বাংলা কবিতার বিকাশের ইতিহাসে চারটি দিকচিহ্ন-বাহী স্মারক।

'ঘোড়সওয়ার' 'চোরাবালি'র কবিতা। এলিয়টের পোড়ো জমি আর বিষ্ণু দে'র চোরাবালি এক নয়। এ আরও ভয়াবহ, আরও মর্মান্তিক। প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯২৬ সালের দাঙ্গার প্রাকতিরিশ যুগের আর্থিক সংকট আমাদের দেশের 'অর্গানিক ইনটেলেক-চুয়াল'দের দারুণ ধাক্কা দিয়েছিলো। এলিয়টের কবিতায় প্রাক-মহাযুদ্ধ ইয়োরোপের শূন্যতা ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির সংকট যে ভাবে ধরা পড়েছে, বাংলা কবিতায় একমাত্র বিষ্ণু দে-ই তাঁর মননব্রতী মানসে অনুরূপ ভারতীয় সংকটকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাঁর সহযোগী সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর মর্মভেদী মনীষা সত্ত্বেও কিছুকাল ইতিহাস বিচ্ছিন্ন

মার্কসকে নিয়ে যাপন করার পর 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ'কে স্মরণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে 'হিটলারের সুহৃদ স্ট্যালিন'। বুদ্ধদেব বসু সামান্য ক্ষণ প্রগতিশিবিরে কাটিয়ে চলে এলেন আমরণ কমিউনিষ্ট-বিরোধিতার ভূমিকায়। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে পাস্তেরনাক সম্পর্কে লিখেছিলেন—'নীরক্ত অসম্পূর্ণ রাজনীতি বা জীবন-বিমুখ নীতিতে তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসার আরতি খণ্ডিত।' এ যেন বুদ্ধদেব বসুর সমগ্র কাব্যসমারোহ সম্পর্কে এক মর্মজ্ঞ মূল্যায়ন।

তাঁর সম সময়ে কবিতা সৃষ্টিতে যাঁরা অনলস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী রবিরশ্মির পরিধিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েও একটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল তৈরী করেছিলেন, বিশেষত তাঁর শেষ দিকের কবিতায়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কালের শুদ্ধ কবি এবং পরবর্তীকালে বিশেষ জনপ্রিয় কবি। তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় ইতিহাসের ট্রাজিক বোধের প্রেক্ষাপট ও তীব্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তাঁর আরম্ভ বিস্ময়ের কেন্দ্রেই স্থিতি লাভ করেছিল। একটু অবাক লাগে, বাংলার তরুণেরা যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে রুদ্র সংগ্রাম ঘোষণা করে আগুনের পাখির মতো ইতিহাস রচনা করছেন, তখন তিনি 'রূপসাবাংলা'র চতুর্দশপদী রচনায় নিমগ্নচিত্ত। হতে ও পারে, এও এক আত্ম-আবিষ্কারের দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে অনুসন্ধানী অভিযান। কিন্তু ভারকেন্দ্র ও অনুপাত নির্ণয়ের দায়িত্বও তো কবির থাকে।

বিষ্ণু দে-র কবিতাবলয়ে প্রবেশের আগে তাঁর 'আরাগঁ' প্রবন্ধ থেকে ত্রিসতাঁ ৎসারার একটি সংগীতময় পংক্তি, গ্রহণ করা যাক—'ফেলে দাও তোমার অহংকার, কান মেলে রাখো শ্রবণ কোঠায়। কারণ সৎ কবির শ্রেষ্ঠ পুঁজি কাব্য নয়, মানুষ।' বিষ্ণু দে-র কবিতা দেশকাল জোড়া এই মানুষেরই বিদীর্ণ অন্তর্বানী। তাঁর আস্তিক্যবোধ ও মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা তাঁকে পৃথিবীর পরিজনের পরমাত্মীয় করে তুলেছিলো। মানুষের যা কিছু মহত্তম ঐশ্বর্য—সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, কবিতা, স্থাপত্য—সবই তাঁর কবিতার ভাবরূপে স্নিগ্ধ ও আন্তরিক সমীকরণে গৃহীত। প্রাচ্যের দেবদেবীদের সঙ্গে গ্রীক পুরাণের চরিত্র ও ঘটনাকে অনায়াস সেতুবন্ধনে গ্রথিত করেছেন। কোনো কোনো বিদেশী নাম ও অনুষঙ্গ আমাদের অপরিচিত লাগে, কিন্তু তাঁর কবিতা পাঠ শ্রমের পুরস্কার।

বৈশ্বিক চৈতন্যে দীক্ষিত হলেও তাঁর স্বদেশের নির্বিচার ও নির্মম ঘটনাবলি তাঁকে দহন করেছে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পটভূমিতে দীর্ণ 'সাত ভাই চম্পা'র কবিতা-গুলিতে যে আর্তি তা পরবর্তী কালে শেষ দিকের 'চিত্ররূপমত্ত পৃথিবী' ও 'আমার হৃদয়ে বাঁচো'তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ভূমিতে তাঁর—'বিজয়ী অশ্বত্থ

এক ঊর্ধ্বমুখ মৃত্তিকামোহিত' পল্লবিত হয়ে ওঠে। তবে খণ্ডিত প্রশান্তির অবকাশে মাঝে মাঝে তাঁর দ্বিধা ও অস্বস্তি দু একটি জায়গায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন—

'প্রতিটি মুহূর্তে মোর মূর্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা অশান্ত কৌতুক।'
'প্রি-রাফায়েলাইট্' ('চোরাবালি')

আবার পাশাপাশি ঐ একই কাব্যগ্রন্থে 'কবিকিশোর' রচনায় তাঁর প্রসন্ন পরিহাস-তিক্ততাকে হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। গুরুগম্ভীর ঘননিবদ্ধ কবিতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ যুক্ত করে দিতেন। সমগ্র রচনাটি একটি অখণ্ড রসরূপ গ্রহণ করে পাঠক চিত্তকে চিন্তিত করে তোলে। তাই কবির তত্ত্ববিশ্ব কোনো স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ থাকে না। তাতে আলোছায়ার ভাঙাগড়ার খেলা প্রতিনিয়ত পাপড়ি খুলে দেয়। কবির অবলম্বনের ঘোর একসময় ভেঙে যায়, আবার তিনি নতুন রসদ সঞ্চয় করেন। ভেঙে আবার তৈরীর ইতিহাস যদি রচিত না হত তাহলে কবি একটি মাত্র কবিতা লিখেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অদ্বৈত সিদ্ধি কবিমানসের একটি চলমান প্রক্রিয়া। গ্রামশ্চির দৃষ্টিতে 'man is a process and precisely the process of his action' এই ভ্রাম্যমান পদ্ধতির কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই। সত্তার অনুসন্ধানে তাই সমগ্র চৈতন্যের নির্মানের ইতিহাসকে কবিতার রূপাবয়বে গ্রহণ করতে হয়। তাতে যুক্ত হয় নানা তথ্য, তত্ত্বের সারাৎসার, ব্যক্তিনাম, স্থান, নদনদী, ফুল, অরণ্য, বৃক্ষলতা; সমুদ্র প্লাবিত সংসারের চিত্রশালা রচিত হয় পরম নিষ্ঠায় ও আবেগে। তাই 'সংবাদ মূলত কাব্য।' তাই তাঁর সৃষ্টির বিকীর্ণ জ্যোতিতে তিনি ছিন্নভিন্ন স্বদেশের রূপ কখনো বা দেবদেউলে, চড়ক ঈস্টার রোজার পার্বণে, ঋতুতে ঋতুতে পালাবদলের ইতিহাসে, কখনো বা খণ্ডচিত্র যোজনায় অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব শুধুমাত্র বস্তুজগতের ধ্যানময় প্রতিফলনে উদ্ভাসিত নয়, প্রতিফলিত রূপের ও রূপবিন্যাস তাতে—কখনো বা ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে ইতিহাসেরই প্রাণময়তার উৎস সন্ধান।

"কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কি করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়?" বিষ্ণু দে'র এই উপলব্ধির সঙ্গে আর একজন বিশ্বপ্রাণ পথিকের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেওয়া যায়। তিনি সাত্র্ঁ। লেখার সাধনায় নিমগ্ন কিশোরকে তাঁর ঠাকুমা বলেছিলেন—'it's not just a question of having eyes, you have to learn how to use them. Do you know what Flaubert did to the young

Maupassant ? He sat him down in front of a tree and gave him two hours to describe it.' সার্ত্র ঠাকুমার কথা শুনে চিন্তিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন—'So I learned to look' ('WORDS', page 101) যে টেকনিকের বিকাশের উপর সৃষ্টির পরমায়ু নির্ভর করে, তা আসে দৃষ্টির সম্মোহন এবং ভাষাকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে। সার্ত্র যে এই আমৃত্যু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁর মনীষাদৃপ্ত রচনাবলীই তার প্রমাণ। বিষ্ণু দেও সমধর্মী স্রষ্টা। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ-প্রকরণের অভিনবত্বে প্রণোদিত। তাঁর রচনায় কখনো ম্লান-হয়ে-আসা সন্ধ্যার ছায়াপাত ঘটেনি। কবিতার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি কবিতাকে করে তুলতেন বিস্ফোরক। 'ঘোড়সওয়ার', 'জন্মাষ্টমী' এবং 'জল দাও' তিনটি কবিতার অন্তর্লোকে গঠনপ্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'ঘোড়সওয়ার' কডওয়েলের ভাষায় 'hightened language'-এ রচিত। কিন্তু 'জন্মাষ্টমী' ও 'জল দাও'তে প্রাথমিক নিরাসক্তি ক্রমশ সূক্ষ্ম অন্তর্নাট্যে এক অভিনব আবেগকে আশ্রয় করেছে। 'জন্মাষ্টমী'তে প্রথম পনেরো পংক্তিতে দুঃসহ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি প্রস্তুতির পরই রবীন্দ্র কবিতার উদ্ধৃতি শ্লেষে বিদ্ধ করে। তারপরেই কলকাতার সঙ্গ ও অনুষঙ্গ পাঠককে পরিচিত পরিধির বাইরে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করে। মাঝে মাঝে বহুদূরে চলে গিয়ে আবার কাছে ফিরে আসা—কবিতার টেনশনকে অটুট রাখে। কবিতার স্বপ্নে ও চেতনায় কবি যে মানুষের চিত্রপট আঁকেন তা আসলে অসম্পূর্ণ মানুষ। কডওয়েলের উক্তি অনুসারে 'He is only a half man; কিন্তু এই ভাঙা-চোরা আত্মীয়দের রূপ নির্মাণই তো আধুনিকতার একটি বড় লক্ষণ। এ কালে মেঘনাদের মতো সম্পূর্ণতাময় বীর দুষ্প্রাপ্য। তাই 'জন্মাষ্টমী'তে তারই খণ্ডিত রূপ। অবশ্য টানাপোড়েনের ইতিহাসে একালে ব্যক্তি মাত্রেই যোদ্ধা। কখনো বা সে মেঘনাদ কখনো বা ডনকুইকসোট। কডওয়েলই তার কারণ নির্দেশ করেছেন—'man is conscious of the necessity of outer reality but not of his own, because he is unconscious of the society that makes him what he is." তাই সম্ভবত কবিতায় বা যে কোনো শিল্পমাধ্যমেই স্রষ্টার বারবার আত্মআবিষ্কারের প্রয়াস, অসম্পূর্ণতাকে সংহারের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই খণ্ডিত মানুষের পূর্ণ যাত্রার স্বপ্নে আমৃত্যু আলোড়িত ছিলেন। তাঁর 'কলিকা' কবিতায় (মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে / রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।') তিনি মানসযাত্রার ঘনিষ্ঠ রূপাবয়ব রচনায় শেষে 'পূর্ণের পদপরশ' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষারত। কিন্তু রাবীন্দ্রিক আস্তিক্যের আশ্রয়ে যাঁরা নেই তাঁদের

জন্য রচিত হয়েছে 'জল দাও' কবিতা। কারণ, 'হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রনাই বর্তমানে ইতিহাস' আর এই সংযুক্ত ইতিহাসের যন্ত্রণাদগ্ধ অন্তর্লোক তাঁর অধিকাংশ কবিতাকে নিয়ে আসে চিন্তিত পাঠকের সামনে। পাঠকের আত্মদর্শন ঘটে। তার সামনে খুলে যায়, 'কস্তুরীযূথের পায়ে / উর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধুলায়' আকীর্ণ এক মহাবনভূমি। 'জন্মাষ্টমী'র এই দ্বন্দ্বময় চিত্রকল্পটি আধুনিক অর্ধসমাপ্ত মানুষের মর্মলিপি।

মালার্মে কথিত টেকনিকসচেতনতা ও তার রূপায়ণপদ্ধতির সংক্রমণ, রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ। বিষ্ণু দে-ই এই টেকনিকের চতুরঙ্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাংলা ছন্দের বিপুল প্রবাহের উৎস থেকে তিনি ধ্বনির মহোৎসবে উপনীত হয়েছেন জটিল প্রক্রিয়ায়! উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'কলিকা' এবং বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' ছ মাত্রার পর্বের বিন্যাসে সংহত। দুটি কবিতাতেই 'দিগন্ত' শব্দটি চারমাত্রার মূল্য শিরোধার্য করে। কিন্তু 'কলিকা'য় 'দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে' আর 'ঘোড়সওয়ার'এ 'চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি'—দুটি ক্ষেত্রে 'দিগন্ত' শব্দটিতে চারমাত্রার সংযোগে একই ধ্বনিমাহাত্ম্য অর্জিত হয়নি। 'কলিকায়' 'দিগন্তে'র পরে 'লুটে' ক্রিয়াপদের ব্যবহার দিগন্তকে সম্প্রসারণে বাধা দেয়। কিন্তু 'ঘোড়সওয়ারে' 'দিগন্তে'র পর 'ডাকি' ক্রিয়াপদ আহ্বানের প্রতিধ্বনিতে দিগন্তকে অনন্তের দিকে সম্প্রসারিত করে।

বিষ্ণু দে'র কবিতা কঠিন শব্দ ভাস্কর্য। কোনার্কের সঙ্গেই তুলনীয়। উদাহরণ হিসেবে 'কোনার্ক' কবিতাতে মনস্ক পাঠক প্রস্তরীভূত সৌন্দর্যের সন্ধান পাবেন। তিনটি পর্বে বিন্যস্ত এই মহৎ এবং উদার সংগঠনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শা-জাহান' কবিতার তুলনা চলে। 'বলাকার ৭ সংখ্যক এই কবিতায় ইতিহাসাশ্রিত ব্যক্তি আবেগ চূড়ান্ত প্রবাহিত হয়ে একটি নক্ষত্রকে স্পর্শ করেছে—'একবিন্দু নয়নের জল··· এ তাজমহল।' কবিতাটির দুরন্ত গতিময়তা জ্যোৎস্না রাতের পাখির মতো ডানা মেলে অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে উড়ে চলেছে।

রবীন্দ্রকল্পনা যেখানে আকাশস্পর্শী, বিষ্ণু দে সেখানে কোনার্কের ভূ-সংস্থিতির ও নির্মাণের লাবণ্যে ধ্যানমগ্ন। 'লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি'তে কবি অভিনিবিষ্ট হয়ে কোনার্কের পাথরের প্রাণসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন—'কত শিল্পী মজুরের মাঝিমাল্লা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুঞ্জন।' 'সহস্রের বাটালি তুরপুনে' যে মহাশিল্প সমুদ্রের সহচর হয়ে আকাশে পাখা বিস্তার করে, কবি কবিতায় তার রূপমুগ্ধ দক্ষ কারিগর। নিজেই একাত্ম হয়ে গেলেন সেই শ্রমের অভ্যুত্থানের সঙ্গে। নিষ্ঠচিত্তে যুক্ত

হলেন 'সূর্যের সমান / প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে।' 'কোনার্ক' এক বিশাল ঢেউ-থেমে-যাওয়া মহাসমুদ্রের একটি উন্মোচিত রহস্য।

গঠনস্থাপত্যে মধুসূদন এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা থাকলেও বিষ্ণু দে নির্মাণে ও বিস্তারে সুধীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর মার্কসীয় বীক্ষা তাঁকে জনজীবনের মাঝখানে এক মহাচারণের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। নিরপেক্ষ কবি বলে কিছু নেই। কবি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন সেটাই লক্ষ্যণীয়। এইপক্ষ নির্বাচনের প্রেরণায় তিনি কডওয়েল ও জর্জ টমসন নির্দেশিত কবিতার আদি উৎস সন্ধান করেছেন জীবনে ও কবিতায়। কায়িক শ্রমই সেই ঐতিহাসিক লগ্ন। তাই অনুষঙ্গে আসে—শ্রমের বাহুবিস্তার, কৃষির যন্ত্রপাতির বহুল উল্লেখ, সাঁওতাল ও উরাওঁ এবং ছত্তিশগড়ী গানের অনুবাদ বা 'মাঝিরা মাল্লারা' শীর্ষক কবিতা। কায়িক শ্রমের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠায় বাংলা কবিতায় তিনি একটি স্মরণীয় মাত্রা যোগ করেছেন। এ যেন এক শ্রমজীবী মানুষের প্রাত্যহিক অভিভূত শোভাযাত্রা। পক্ষ নির্ধারণের তাগিদেই তিনি 'মাঝিরা মাল্লারা' কবিতায় দ্বিধাহীন রচনা করেছেন—'সন্ধ্যাতারা, চেনা সে লাল তারা।'

অথচ বৈচিত্র্যের জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। মানুষের অনন্ত অপরিতৃপ্ত বাসনাবিপুল খরস্রোত জীবনের ফাটলে ফাটলে বটের চারা রোপন করে। জীবন তো একটি অসমাপ্ত কবিতা। তাই 'দামিনী' কবিতায় সেই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের মানবসত্তার চিরদিনের আর্তনাদ মিতায়তনে আমাদের টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রতীরে। সেখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গীর মতো মনে হয়—'আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন পূর্ণিমা।' দামিনীর অতৃপ্ত বাসনার প্রদীপ জ্বলে ওঠে আমাদের ঘরে ঘরে। আমরা তৃপ্তিহীন অনুসন্ধানের এবং আবিষ্কারের ধ্যানে দামিনীর মতোই নিজেকে জ্বালিয়ে নিখিল-বিশ্ব-সংসারের বন্দনা করি। আর সেখানেই প্রত্যেকের ধারাবাহিক আত্ম-উন্মোচিত রহস্যের পদযাত্রা।

এই মানস যাত্রায় কবির তত্ত্ববিশ্ব ভোরের হিমালয়ের মতোই জ্যোতির্ময়। উৎসারিত হয়েছে নানা শাখা প্রশাখাময় নদী। কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে বা স্মৃতিচারণায় তিনি অতৃপ্ত পরিব্রাজক। বাংলা কবিতার বহু ঐতিহাসিক আবর্জনাকে কথনো পাশ কাটিয়ে কথনো শল্যবিদের নিরাসক্তিতে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার। কবির কবি শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের কবি। সেই মানুষ, যার প্রতি মুহূর্তের লড়াই নিজের ভিতরে, নিজের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম এবং সন্ন্যাসই তাঁর কাব্য।

পুনশ্চ :—

দু'বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। একবার কলকাতায়, পরেরবার রিখিয়ায়। পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই পরিচয়। দু'বার গিয়ে তাঁকে পাই—তাঁর কবিতার মতোই তিনি। কিন্তু বাইরে থেকে তার অন্তর্নিহিত মানসসরোবরকে, তাঁর মহৎ সৃষ্টিক্ষমতাকে স্পর্শ করা যেত না। দুবারই তিনি ঘণ্টা দু'য়েক করে সময় বন্ধুদের বিষয়, চিত্রকলার বিষয়, যামিনী রায় এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে কথা বলেছিলেন। রিখিয়ায় নাতনীদের সঙ্গে নিয়ে ছবি তুলেছিলেন। ছাতে পায়চারি করতে করতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে গল্প করে গেলেন। কবিপত্নী শ্রীমতী প্রণতি দে দুবারই আমাদের যত্ন করে চা এবং মিষ্টি পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কবির সঙ্গে ফটো তুলতে রাজি হননি। হাসিমুখে বাগানে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছবি তোলার পর আবার চা এলো, প্রণতি দেবী তাঁর সংসারের গল্প করলেন। দেওঘরে গিয়ে বাজার করার অসুবিধে হয় না জানালেন। সঙ্গে কবিও উৎসাহে রিখিয়ার মানুষের কথা বলে চললেন। তারপর একসময় আমরা উঠে পড়লাম। নাতনীদের সঙ্গে নিয়েই তিনি বাগানের বাইরে এলেন। আমরা টাঙ্গায় চলতে চলতে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর সম্পর্কে বলার কোনো শেষ নেই। তাই একটি স্খলিত পদ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

এনেছি কিছু ফুল তোমার জন্য
বিদ্যুৎ কাঁপে চূর্ণ দেশ,
আকাশগঙ্গায় তারা নগণ্য,
খুলছি আমরণ ছদ্মবেশ।

পাথরে অকাতর স্রোতের গান,
গৌণ আখ্যানে রয়েছি মজে,
রূপে ও অরূপে নিত্য স্নান—
তীর্থযাত্রায় পদব্রজে।

ক্ষুণ্ণ দাঁড়িয়েছি শূন্য তীরে,
নৌকো পড়ে আছে, মাঝিরা নেই ;
প্রখর জল নাচে চড়াকে ঘিরে,
আত্মরক্ষা তো আত্মদানেই।

ফুলের প্রণিপাত পরাগে লীন,
স্মৃতি ও খেলা করে লুকিয়ে তাস,
প্রবাসে চিঠি আসে ঠিকানাহীন—
কালের ক্রীতদাস গুণছে লাশ।

ফাটিয়ে হিমালয় এনেছো শিলাজতু
অলকানন্দা ফসলে মেশে,
সৌর অতিথির অতিথি, তবু
সত্তা খুঁজে পাও আপন দেশে।

বিশ্বহৃদয়ের দেওয়ালি-রাতে
তোমার রূপবাণী তোমাতে শেখা,
খুলেছো দুই হাতে প্রতীত করাঘাতে—
ত্রিদিবে জ্বলে ওঠে স্বর্ণরেখা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'দুর্বোধ্যতা' প্রসঙ্গে

কবি কিসে সিদ্ধিলাভ করেন তা আমার জানা নেই, হয়তো পাঠকের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে, বা নিজেকে অভিপ্রেত মুক্তি দিতে পেরেছেন কবিতায়, তার দ্বারা; কেউ বহু-পাঠকনন্দিত হওয়াকেই পরম লাভ মনে করেন, কেউ বা নির্বাচিত মনস্ক পাঠকের অন্তর্জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারাকেই সার্থকতা, মনে করে থাকেন; এরকম নানা ইচ্ছের প্রকাশ দেখি কবিদের গদ্যে; কেউ চেয়েছেন ভীড়ের হৃদয়ের—পরিবর্তন, কেউ বা ভীড়ের দ্বারা অভিনন্দিত হওয়াকে চরম সার্থকতা বলে ঘোষণাও করেছেন, অর্থাৎ কবির দায়বদ্ধতা পাঠকের প্রতি, এর স্বীকৃতি ও অস্বীকার নিয়ে কবিদের বিতর্কের অন্ত নেই।

যে দুরূহতার জন্য পাঠকের আলস্যে তার জন্যে কবিকে অভিযুক্ত করেছেন সুধীন্দ্র-নাথ; আবার শিক্ষিত পাঠকও আধুনিকদের অভিযুক্ত করছেন বারংবার, কবিরা যে দুরূহতার কুয়াসায় মুড়ে কবিতাকে উপস্থিত করেন, তার রসগ্রহণের দায় নেই পাঠকের। প্রশ্নটা এখান থেকেই শুরু, প্রথম অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্রই সূত্র নির্দেশ না, পাঠক ও কবির সম্পর্ক আদো জরুরী কি না; কবি থাকবেন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে, পাঠকের অনুরাগকে উপেক্ষা করে, না তিনিও অন্তত সহৃদয় পাঠকের মনে অনুরণন তুলতে চান কবিতায়, নন্দিত হতে চান তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে।

'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'-মনে হয়, এর মতোন সত্য উচ্চারণ আর হয় না। একাকী সৃষ্টির কর্ম চলে, একা না হলে উপলব্ধির জগতে বিচরণ করা যায় না, কিন্তু রচনা কর্মের সমাপ্তিতে চাই অন্য কোনো সহৃদয়ের সান্নিধ্য; যে নিভৃত সাধনায় জন্ম নিল একটি বিমূর্ত রচনার, তা দেখার বা পাঠের অভিঘাত অন্যের কাছে কি

ধরনের, কতোটুকু ; তা জানা না গেলে স্রষ্টার যে তৃপ্তি নেই। গায়ক ও শ্রোতা যদিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিবটে, কিন্তু অনুভবের অনুরণনে দু'জনেই একই অবস্থায় পৌছোন, তাই এক সময় গায়ক ও শ্রোতা সমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় একই স্তরে যান পৌছে, তাতেই শিল্পের সিদ্ধি।

কবিতা অন্যান্য ভাষা শিল্পের মধ্যে চারিত্রিকতার দিক থেকেই ভিন্নধর্মী। অন্তত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভব থেকে যে লিরিকের জন্ম, তার স্বভাবের সঙ্গে ব্যক্তির রহস্য-জটিলতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। ব্যক্তির আশা আকাঙ্খা যখন সমষ্টির দ্বারা শাসিত হ'ত তখন ব্যক্তিত্বের উন্মেষ হতনা, সৃষ্টিও হোত সমষ্টির স্বার্থে সমষ্টির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ; কিন্তু রেঁনাসা আমাদের দিয়েছে ব্যক্তিত্বের বিকাশের মন্ত্র ; অতএব ব্যক্তিমানুষের মনের জগৎ জ্ঞান, নির্জ্ঞানের, অবচেতনের কুটরহস্য প্রাধান্য পেল যে ব্যক্তিতন্ময় কবিতায়, তাতে ঈষৎ জটিলতা অবশ্যম্ভাবী। 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।' নিজের মধ্যে এতো অজানিত জগৎ, এতো সম্ভাবনা যে লুকিয়ে আছে, তা তো জানা ছিলো না ; আর এই Know Thyself, নিজেকে জানো —বহু পুরানো আপ্তবাক্য হলেও এর অর্থ নিয়ে মাথা কেইবা ঘামাতো ? অন্তত শিল্পকলায় লোকশিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা রেনেসা— পূর্বযুগের সাধারণ ধর্ম, অন্তত আমাদের সাহিত্যে তো বটেই ; মধুসূদনেই ব্যক্তিতার, অস্মিতার পদক্ষেপ প্রথম ঘটলো, তাই দুরূহতার অপবাদ হয়তো তাকেও নিতে হয়েছে, এর কারণ কি এরকম নয়, পুরাতনের অনুবর্তনের সহজ অভ্যাস নতুন রীতির অনভ্যস্ত চরিত্রের সঙ্গে মেলে না, ? মনে হতেই পারে খাপছাড়া, অভ্যস্ত জনরুচির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই তো বিপ্লব, আর প্রতিভার কাজই তো চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরানো ; এই ঝুঁকি প্রতিভাবানের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব, যেমন মেঘনাদ বধ কাব্য বা বীরাঙ্গনা কাব্য ; দুটোই জাতে স্বভাবে হারুঠাকুর রাম বসু, ভোলাময়রার যুগে সামন্ততন্ত্র থেকে বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তরে পৌছানোর মতন গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ ; ঐ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, ভাষার ঐশ্বর্য ও চেতনারবহু স্তরকে মেনে নিতে না পারার উদাহরণ কি নেই ? আছে, আর তা ছুছুন্দরিবধ কাব্যই তার প্রমান। কিন্তু দ্বান্দ্বিক নিয়ম এক্ষেত্রে সমান সত্য। একসময়ের অ্যান্টিথিসিস থিসিসে পরিণত হয় মধুসূদনের রচনাকে সুধিজন গ্রহণ করেছে প্রশংসিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কি দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠেনি, কিন্তু তারও পরিণতি পরবর্তীদের দ্বারা গ্রহণের স্বীকৃতি, আর একথা হলফ করেই বলা চলে পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘে জমি বা কথা ও কাহিনীর কবিতাই তো সাধারণ বাঙালী পাঠক গ্রহণ করেছে, কজন পড়েছে শেষলেখা, সেঁজুতি, আরোগ্য, জন্মদিনে ? পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা ব্যাখ্যার

অতীত, অথচ পাঠের সময় এক 'সিরিন' অনুভূতি জাগে, কবিতার আবেদন এভাবেই হতে পারে, অন্য ভাবেও তো হয়। তিরিশের কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-র কবিতায় জটিল ও দুর্বোধ্য বলে বহুপ্রচলিত মত এখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র কবিতা বুঝিয়ে দিতে পারলে শিরোপা দেবেন, বলেছিলেন যেমন তেমনি বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র শক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়েও 'চোরাবালি'র কবিতা প্রসঙ্গে 'প্রিয় বয়েষু,' সম্বোধনে স্বয়ং কবিকেই প্রশ্ন করেছেন—'আমি অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো-কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারিনা। বিদ্বজ্জনের মুখে 'ওফেলিয়া' ও ক্রেসিডা'র নানারকম দুরূহ ব্যাখ্যা শুনে আরো বেশি বিচলিত বোধ করি—ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটা আমার কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়। তবু, ও-দুটি কবিতাই আমি পড়তে ভালোবাসি ; মাঝে-মাঝে চমকপ্রদ চিত্রকল্পের দেখা পাই ; মনের মধ্যে বিচিত্র ছবি ফোটে, আর ছন্দের কৌশল ধ্বনি মর্মরের মোহ ছড়ায়'।

প্রবন্ধের শেষাংশে সুধীন্দ্রনাথের 'ভূমিকা' প্রসঙ্গে আলোচনায় বুদ্ধদেব বলেছেন 'আপনার কবিতার দুরূহতা তিনি সমর্থন করেছেন, কিন্তু সেটা উত্তীর্ণ হতে পাঠক তাঁর কাছে সাহায্য পাবে না···। অধীত বিদ্যার উপরে নির্ভর না-ক'রেও আপনার কবিতা উপভোগ করা যে সম্ভব আমিই তার প্রমাণ কেননা, আমাকে যদি শব্দার্থ ও উল্লেখ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চয়ই ফেল করবো। তবে সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধির মুখাপেক্ষী ; এবং যে পাঠকের পড়া-শুনা আমার চেয়ে বেশি, তিনি কবিতা দুটির মধ্যে আরও অনেক কিছু খুঁজে পাবেন,' তখন তিনি আপনার উপর যে-বিরাট পাণ্ডিত্য আরোপ করেন, তা কবিতায় কি ভাবে ও কি পরিমাণে ব্যবহার্য সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

আর একটা জিজ্ঞাস্য, 'ক্রতুকৃতম', 'অবাপবিক্কমস্নাবির', 'সেৎপ্রাসপাশ' (এমন আরো আছে), এই সব শব্দ ব্যবহার ক'রে সত্যি লাভটা কোথায়। হয়তো কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয় না "সংপাঠক এবং এ-সব শব্দে প্রতিহত হবে ?"

এই লেখাটি প্রকাশের (১৯৩৮) অর্ধশতক পরেও একই অভিযোগ করেন একজন স্বদেশী-বিদেশী কবিতার নিষ্ঠ পাঠক। তিনি অধ্যাপক ও লেখার নানা কাজে নিমগ্ন থাকেন। প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি বলেন, বিষ্ণু দে আদৌ কবি নন, কারণ পাণ্ডিত্য ও কবিতা একসঙ্গে মেশানো যায় হয়তো, তবে পাণ্ডিত্য যেখানে কবিতাকে গ্রাস করে,

তখন কবিতা পণ্ডিতি কূটকচালে পরিণত হয়। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

আমি কিশোর বেলা থেকে বিষ্ণু দে-র নিকট সান্নিধ্যে এসেছি অজস্রবার। নানা চিঠি পত্র দিয়েছি যখন কবি রিখিয়ায়, তিনিও উত্তর দিয়েছেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি, কিন্তু উনিশশতকী শিক্ষা সংযম সুরুচি প্রত্যক্ষ করেছি বিষ্ণু দে-র মধ্যে; তিনি বৈঠকখানায় এলে আমি দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভ্রম জানিয়েছি, জানাতাম। সেই বুদ্ধিদীপ্ত হাসি ও গভীর চোখের ভাষা আমাকে টানতো, আজও তাঁর বিশালতা আমি অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবি, যাঁরা আধুনিক কবিতার এদেশে পুরোহিত, তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে ঐতিহ্যবাদী হয়েও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। সম্ভবত শেষ 'মেজর কবি' আমাদের ভাষায়। এতো ব্যাপ্তি ও গভীরতা যা অন্যত্র কদাচিৎ দেখেছি। তবু, আমিও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, "আর সেই জন্য যেখানেই আমার মনে হয়েছে আপনি যেন স্বেচ্ছায় আপনার কবিতার আবেদন খর্ব করেছেন, সেখানেই আমার মন প্রতিবাদ করেছে।"

বুদ্ধদেব বসুর মতন উদার কবিতা-প্রেমিক ও যোদ্ধা আর কেউ আছে কি না জানা নেই। পাণ্ডিত্য তাঁর কম নয়, তবু কবিতাকে পাণ্ডিত্য থেকে বিমুক্ত রাখার যে দাবি তিনি করেছেন, তা যৌক্তিক। আবার লক্ষ্য করতে হবে বুদ্ধদেব বিষ্ণু দে-র তাবৎ কবিতার বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলেন নি, তিনি বলেছেন, 'যেখানেই আমার মনে··· খর্ব করেছেন।' বিষ্ণু দে নানা কবিতায় দুরূহতার আবর্ত সৃষ্টি করেছেন, যেখানে পৌছনো পাঠকের পক্ষে অনেক বিদ্যায় অধীত হওয়া প্রয়োজন। অভিধানেও সব শব্দ মেলে না আর পাঠকের আলস্য তো রয়েছেই। এই সব বাধা ডিঙিয়ে তাঁর জগতে প্রবেশের চেষ্টা ও অনুরাগ অনেকেরই নেই। মনে হয়, অযথা জটিলতার আশ্রয় কবি না নিলেও পারতেন, তাতে তার কবিতার আবেদন অনেক ব্যাপ্ত হতো।

কবিতা অবসরবিনোদের জন্য রচিত হয় না চর্যাপদ হয়নি; ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের তাগিদ ছিলো তাতে; বৈষ্ণব পদাবলীতেও তাই, তবু ভাষার মধ্যে ভাষার অতীত ব্যঞ্জনা যে কবিতার শর্ত, বৈষ্ণব পদগুলোতে তা রয়েছে পংক্তিতে পংক্তিতে, স্তবকে, স্তবকে। মঙ্গলকাব্য-বর্ণনাধর্মী, কাহিনী কাব্য, যেগুলো সঠিকভাবে সাধারণ জীবনযাত্রা ঐতিহাসিকভাবে উপস্থিত, তাতে কবিতার সেই সংকেত ধর্ম, ব্যঞ্জনা কিছুই নেই; কিন্তু মধ্যযুগের শেষ কবি, নাগরিক কবি ভারতচন্দ্রের সচেতন কারুকৃতি আধুনিক সাহিত্যের সম্ভাবনার বীজ বহন করেছে। আর প্রথম আধুনিক মধুসূদন, কবিতায় ব্যক্তিগত গূঢ়তা ও নৈর্ব্যক্তিগত বস্তুনির্ভরতা, দুয়েরই আমদানি করে, কবিতায়

দিলেন বহুমাত্রিকতার চরিত্র। কবিতা যখনই হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক, তখন আর তা সাধারণ গ্রাহ্য, সহজ পাচ্য থাকে না, এখানেই গদ্য শিল্পের সঙ্গে তার চারিত্রিক পার্থক্য। যারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের নখদর্পণে, তারা ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়েছেন স্কুল কলেজের দৌলতে প্রধানত পদ্যের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে গভীর দর্শন ও উপলব্ধির সমন্বয় ঘটিয়েছেন, সেখানে অদীক্ষিত পাঠকের ভীড় জমেনা, জমতে পারেনা। যা কিছু সাধারণের বঙ্কিমের ভাষায় 'ভাত কাপড় জোটানো', তার ভার নিয়েছিলেন— রবীন্দ্র অনুজ ভক্তবৃন্দ। কালিদাস রায়, কুমুদ রঞ্জন, করুণানিদান, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কিন্তু ঐ পথ অচিরেই পরিত্যক্ত হল কারণ ইন্দ্রিয়ঘন, চিত্রকল্পসজ্জিত অনুভবের কবিতা যে রচিত হবেই; তাই মোহিতলালের, কদাচিৎ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার কাছে নতজানু হওয়া। আর যা কিছু কবিতার পক্ষে অদরকারী, আর কবিতার জন্যে প্রয়োজন, সবই আধুনিকদের হাতে আবার এসে পৌঁছলো, বাংলা কবিতা নতুন প্রাণশক্তি ও শরীর নিয়ে ঝলসে উঠলো, হলো বহুস্তরবাদী, উপলব্ধিময়, চৈতন্যআশ্রিত; মুখরতা ও নৈঃশব্দ, সঙ্গকাতরতা ও নৈঃসঙ্গ্য, ব্যাঞ্জনা ও বর্ণনা, একাকীত্বকাতরতা ও বহুজন-স্পর্শকাতরতা, সবই এলো কবিতায়; ভাষা এল সময়ের সর্ব দাবীর সঙ্গে জড়িয়ে, বিষয় এলো সব দায়কে স্বীকার করে নিয়ে, আমরা মহাসঙ্গমে পৌঁছে গেলাম।

বিষ্ণু দে এই নতুন কবিতার অন্যতম মৌলিক স্থপতি। কি কঠিন কাজই না ছিলো তখন, যখন রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে নতুন কালের উপযোগী নতুন ভাষা রচনা করা, কবিতার জন্যে যা কিছু আনুষঙ্গিক উপাদান তার অব্যবহৃত জগতের সন্নিবেশ, নিয়ে আসা ভাষা, ভাবনা রচনাশৈলীতে একই কালে স্বদেশিয়তা ও আন্তর্জাতিকতা। হয়তো এই প্রাথমিক অভিনবত্বের প্রয়োজনে নানা ধরনের পরীক্ষা করতে হয়েছে যাদের, তাদের কিছু অবাস্তবের সাহায্যও নিতে হয়েছে, আর যখনই প্রচলিত থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন শরীর, ঠেকলো তা অদ্ভুত ও কিমভূত প্রচলিত অভ্যাসের দাস যারা তাদের কাছে। হতেই হবে তা এবং হয়েছেও, যে কোনো মৌলিক স্বভাবই বিদ্রোহী; দ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপ শান্ত জলে চিৎ সাঁতারুরা সহজে মেনে নেয় না। আর চমৎকারভাবে যার দাবিকে পাশ কাটিয়ে বিষ্ণু দে নতুন ভাষায় কথা বললেন; ঠেকলো অনভ্যস্তের কাছে দুরূহ, দুর্বোধ্য। আর ন্যাকা, প্যান পেনে এলিয়ে পড়া কবিতাকে সরিয়ে দিতে কিছু অতিরিক্ত পেশীশক্তিরও প্রয়োজন হলো, সেখানেই এই দুর্বোধ্যতার জন্ম, তবে, তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

নাগরিক বৈদগ্ধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সমধর্মী বিষ্ণু দে। আবেগের অসংযত গ্রাম্যতাকে তিনি বুদ্ধির শাসনে বাঁধেন বলে কবিতার উচ্চারণে এসেছে গদ্যের চারিত্রিক ঋজুতা

ও তীর্যকতা। বাঙালী পাঠক আবেগের হাতেই ধরা দিয়ে এসেছে, আবেগের যথেষ্ট অভাব সহ্য করতে শেখেনি। স্বল্পতম বাক্যে বা হ্রস্বতম স্তবকে নিবিড় ভাবনাকে সংহত করার যে নতুন রীতি, তাতে অনভ্যস্ত পাঠক কবিকেই দোষারোপ করে বসলেন। ধরা যাক 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বই-এর প্রথম কবিতা 'পলায়ন'কে দৃষ্টান্ত হিসেবে।

> সফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
> কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে—চিকন কপোল,
> সিল্‌ক্ মসৃণ সাদা আর ছোটো পাণ্ডু ললাট।
> ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।
> স্বল্প পরিধি রক্তসূত্রে সরস অধর
> মুখে রেখেছি ও শুনেছি বক্ষে গ্রহদের বেদপ
> দেখি মুহূর্তবিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
> উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।
> —সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
> প্রেমের কবিতা করেছো আমাকে।
>
> ফোটালে যে ফুল
>
> সে ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
> আর নাহি রয় এ কয়দিনের পান্থশালায়।

নিবিষ্ট পাঠক লক্ষ্য করুন, এই কবিতাটিতে এমন একটি অপরিচিত শব্দ নেই যা কবিতাটির মধ্যে অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, অথচ যে ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রভাবে এটি রচিত তাতে প্রাচীন ব্যবহৃত শব্দ ও চিত্রধর্মী শব্দগুচ্ছ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে; কবিতাটি প্রেমের কবিতা, অথচ আবেগের তরল প্রগলভতা নেই, আছে বুদ্ধির প্রখরতা, অথচ অনুভবের তীব্র জ্বলন। এই কবিতায় পেলাম 'সফরী চোখ', সিল্‌ক মসৃণ ললাট', 'মুহূর্তবিম্ব', 'তীর্থযাত্রী হৃদয়'। এই সংবেদনশীল ছবি, যা প্রেমকে করেছে স্পর্শযোগ্য, অনুভবগ্রাহ্য। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিষ্ণু দে-র দায়িত্বপূর্ণ লেখনী অসার আত্ম-প্রকাশের গরজে অস্থির নয় বলেই তাঁর লেখা অল্পবিস্তর অসরল।'

অল্প বিস্তর অসরল হওয়ার কারণ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে 'অসার আত্মপ্রকাশের গরজে অস্থির নন' বলেছেন, রবীন্দ্রঅনুজ, অনুকারী কবির দল ভাবালুতাকে আশ্রয় করে অসার পদ্যবস্তুর পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন। অল্পতেই উচ্ছ্বাস ও তুলতুলে মেরুদণ্ড নিয়ে এলিয়ে পড়া তাঁদের কবিতা; কবিতা যে প্রজ্ঞাশাসিত হতে পারে, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান নিয়ে সমান্তরাল জীবন গড়ে তুলতে পারে, সে ধারণা

তাঁদের ছিল না। বিষ্ণু দে কবিতাকে ভাবালুতা মুক্ত করেন প্রথম থেকেই, কাজে লাগান অধীত বিদ্যায়, সেই নানা দেশের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ; সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ, সব কিছুই তাঁর বিশ্বে পাংক্তেয়, ফলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক লিরিক-উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতা থেকে নির্বাসিত হলো। তিনি পুরাণ-প্রতিমার বহুল ব্যবহার করলেন, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, ইউরোপের দু' দুটি মহাকাব্য থেকে প্রয়োজন অনুসারে, এই প্রয়োজন এসেছে কবিতাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা এনে দেবার জন্যে, কবিতার সমকালীনতা ও অতীতকে একসূত্রে মিলিয়ে দেবার জন্যে। এলিয়টের মতন বিষ্ণু দে-ও মনে করেছেন, 'যদি কেউ অন্যযুগের গভীরে সত্যিই প্রবেশ করতে পারে, তাহলে সে তার নিজের যুগের মধ্যেই প্রবেশ করছে।' সম-সময়ের জীবনের নানা বিমিশ্র জটিলতা পুরাণ-চরিত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন বিষ্ণু দে। কখনো গোটা একটি চরিত্র প্রতীকী হয়ে উঠেছে, কখনো বা অনুষঙ্গরূপে উল্লেখ, ফলত কবিতা মনস্কতার দাবী করে, মেধা ও কল্পনা প্রতিভার নির্য্যাস যেখানে শিল্পায়িত সেখানে পাঠকের উদাসীনতা না বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটাই দায়ী। প্রশ্ন হলো, পাঠকের কথা কবি কি রচনাকালে স্মরণে রাখবেন? কতটা গ্রহণ করতে পারবে, কতটা পারবে না—এই ভাবনা অন্ততঃ রচনাকালীন মুহূর্তে কবির ভাবনার বিষয় হতে পারে না। আবার কবি যদি পাণ্ডিত্য প্রকাশের মাধ্যম রূপে তার শিল্প আঙ্গিককে ব্যবহার করেন, পাঠকের বীতস্পৃহাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাবালুতা বর্জিত ও মেরুদণ্ডে দাঁড় করাতে গিয়ে বিষ্ণু দে ভাষাকে নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বলেই অনেক ক্ষেত্রে দুরূহতা বর্তেছে। বুদ্ধদেব বসু চোরাবালির কোনো কোনো কবিতা সম্পর্কে সমীচীন প্রশ্নই রেখেছিলেন।

কবিতার স্তবক আসে ভাবনা, আবেগের সম্বন্ধসূত্র অনুসারে। বিষ্ণু দে ফ্লিসমিক কাট পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, দুটি স্তবকের মধ্যে আপাত আবেগের সম্বন্ধ ছিঁড়ে দিয়েছেন, ফলত কবিতায় দুরূহতা বর্তেছে। এ এক ধরণের পরীক্ষা, যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে; আমি এ জাতের কবিতায় শ্রমেরই শুধু দেখা পাই, শুধু মেধায়, মনন-জাত অনুভবের নয়। 'ওফেলিয়া', 'ক্রেসিডা' এ জাতের কবিতা। কিন্তু এই ধরণের কবিতাতেও চিত্রকল্পে স্বাতন্ত্র, পংক্তির উজ্জ্বলতা ও বাকপটুত্বের স্বাক্ষর রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বিষ্ণু দে দুর্বোধ্য নন, তাঁর কবিতা যারা একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেন তাদের অভিনিবেশের অস্থিরতাই প্রমাণিত হয়। ধরুন 'উভচর' কবিতাটির কিছু পংক্তি—

(১) পাখির আবেগ জাগাবে শরীরে মনে ?

(২) গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ !
শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ।
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক।
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ।

এরকম ধ্বনিপ্রধান ছন্দে আমাদের মুখের ভাষাকেই গেঁথে চলেছেন কবি, একটি শব্দ এখানেও নেই যা অচেনা, শুধু প্রকাশের তীর্যকতা অপরিচিত লাগে। কী অসামান্য প্রকাশভঙ্গী / 'নিসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক'। এই কবিতারই একটি পংক্তি—

কাটুক আমার জীবন মরণে সেতুবন্ধনী দিন। এর পরের কবিতায় 'নির্ঝ'রের স্বপ্নভঙ্গ'-এ প্রয়োজন ছিল না এই পংক্তির দুর্বোধ্যতার।

আত্মীয়া নও, সমাজের ইকরার-নামায়
কস্মিনকালেও বাঁধা হয়নিকো হায় বাসা।

'ইকরার-নামা' মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়, ব্যঞ্জনাধর্মীও নয়। পংক্তিটিকে আড়ষ্ট করেছে এই অবাঞ্ছিত শব্দগুচ্ছ। এরকম অনেক শব্দ বিষ্ণু দে-র কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে, যার নানা প্রতিশব্দ ছিলো, কবি হয়তো তাঁর বিশেষ ভাবনাকে সেই সব শব্দে বেঁধে দিতে চাননি, কিন্তু পাঠকের বিরক্তি অনভিধানিক শব্দ ব্যবহারে আসতেই পারে।

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণা মায়া', এখানে নতুন তৎসম শব্দ পেলাম মদিরেক্ষণা, যার বা যে নায়িকার ঈক্ষণে মদিরতার মায়া আছে ; যদি শব্দটির অর্থ আমাদের নাও জানা থাকে তবু শব্দটির ধ্বনিমাধুর্য অসাধারণ ভাবে তাৎপর্য পেয়েছে এখানে ; শব্দটি তুলে নিলে নিছক গদ্যের statement পড়ে থাকে। . শূন্য কলসি। নায়িকার শরীর বর্ণনায় sensuousness

স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিদেশে ছায়া
....
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে
....
ভাস্বর তব তনুতে অমৃতজ্যোতি।

কোন পংক্তি উদ্ধার করবো। প্রতিটি পংক্তিই অসামান্য। কবির ব্যক্তিক-প্রেমানুভব পৌরাণিক মহাশ্বেতাতে সঞ্চারিত কোনো কালই বিচ্ছিন্ন নয়।

যযাতি কবিতায় অপরিচিত পুরাণচরিত্র উল্লেখে দুরূহতার সৃষ্টি হয়েছে—

প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃ-সারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

এই জাতের প্রয়োগ কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি উপভোগে এসব পংক্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কবিতার সব পংক্তির অর্থ না বুঝলেও ধ্বনিস্পন্দন কবিতাকে স্বাস্থ্যবান করে তোলে।

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।

এই একমাত্রিক ভৌগোলিক বর্ণনা পদ্যের চরিত্র, কবিতায় শব্দ বা বাক্য পায় বহুকৌণিক দ্যুতি।

দু'চোখ ছায় বাংলাদেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

[এক পৌষের শীত]

এখানেও ভৌগোলিক উল্লেখ আছে, আছে পালপার্বনের খবর, কিন্তু আমাদের চোখে পরিচিত দৃশ্য স্বতন্ত্র কাব্যিক মহিমায় জ্বলে ওঠে।

ইনিয়ে বিনিয়ে আবেগের তাপ উত্তাপের পরিবর্তে গদ্যের চরণ-বিন্যাসের ঋজুতা ও স্পষ্টতা বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রথম আধুনিকতার সূচনা করেছে।

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তার গলিতে
পূর্ণিমার নীলনম্র শীতে
মরণের আসন্ন ভঙ্গীতে
থেমে যায় সুসজ্জিত পশ্চিমা সঙ্গীত।

[কোজা]

কবিতাক্রান্ত গদ্যই যেনোবা, শুধু ছন্দে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেনো, অথচ এরই মধ্যে অকথিত বাণীরও আভাস পাই যেনো। না-ই বা আক্ষরিক অর্থ ছাত্রব্যাখ্যার উপযোগী অর্থ পেলাম, কবিতার কাছে সে রকম কেই বা আশা করি; পেলাম কবিতার পরিমণ্ডল, কল্পনাপ্রতিভাসৃষ্ট এক সমান্তরাল পৃথিবী, এটাই পরম লাভ।

পাউণ্ডের নির্দেশ স্মর্তব্য : 'শান্তির অস্পষ্ট ভূমি' এ জাতীয় প্রকাশভঙ্গী ব্যবহার করবে না। চিত্রকল্পকে এ ভোঁতা বানিয়ে দেয়। মূর্তের সঙ্গে বিমূর্তের জট পাকিয়ে ফেলে, এগুলি তখনই আসে যখন লেখক বুঝতে পারে না যে প্রকৃতির বস্তুই সর্বদা

যথেষ্ট প্রতীক। জটিলতা এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সারল্য উপেক্ষিত ও সরল মানুষ নানাভাবে বঞ্চিত। জটিলতা ভেদ করার মধ্যে মুক্তি মেলে, মহৎ রচনায় জটিলতা থাকতেই পারে, তার সমাধান এনে দেয় মহৎ অনুভব। কিন্তু অস্পষ্টতা আসে কবির মনোজগতের উপরিতলের ভাসা ভাসা ভাবনা থেকে, সেখানে পাউণ্ড কথিত শাস্তির অস্পষ্ট ভূমি-জাতীয় উচ্চারণ কবিরই দুর্বলতাকে প্রমাণ করে।

বিষ্ণু দে মহৎ কবি, তাঁর জটিলতার সমাধানের সূত্র আবিষ্কার যখন করি, আনন্দ পাই ; কিন্তু কখনো কখনো অনাবশ্যক অস্পষ্টতা তার দুর্বলতাকেও হাজির করে। কবি কি এ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন ? যতোই পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন, তার শিল্পরীতিতে এসেছে গদ্যের প্রসাদগুণ ; টান টান ছিলা, লক্ষ্যভেদী ;

> দুইদিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
> এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
> রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে চোখ,
> নেচে লাফ দেয় কচি কাঁচা খরগোস।
>
> [পরবাসী]

আভ্যাসিক পদ্যচর্চা নয়, সচেতন নির্মিত বিষ্ণু দে-র কবিতা। পাঠক অমনস্ক হলে আপাত-অনাবেগের তলে আবেগের ফল্গুস্রোতের ধ্বনিস্পন্দন অনুভব করতে হবেন অসমর্থ। আমরা, পদ্য ও কবিতার পার্থক্য যেন গুলিয়ে না ফেলি, যেমন করে থাকেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা আরো কেউ কেউ। আবেগের অবাধ নিঃসরণ-জাত পদ্য, বোধ ও অনুভবের সংহতিতে কিভাবে কবিতা রচিত হয়, এই স্বচ্ছ বোধিলাভ ব্যতীত মহৎ কবি হওয়া অসম্ভব। বিষ্ণু দে আমাদের ভাষার মহত্তম কবিদের একজন, সে তার সর্বত্র কবিতার জন্যে, পদ্যের নয়।

এক সময় ছিলো যখন কি কি নিয়ে কবিতা লিখবো, কি কি নিয়ে নয়, এজাতের বাছবিচার সংস্কারের কাজ করেছে। গোলাপ নিয়ে কবিতা লিখবো, সজনে ফুল নিয়ে নয় কেন ? সব সময়ই সুন্দর হবে কবিতার উপাস্য, অসুন্দর গ্রাহ্য হবেনা ? জীবনতো অবিমিশ্র শান্তি সৌন্দর্য ও মঙ্গলের নয়। কবিকে পূর্ণ দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে, আধুনিকদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে-র জীবনের সামগ্রিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁদের কবিতার জগৎ থেকে কোনো কিছুই অসুন্দর বলে নির্বাসিত হয়নি। কবিতার সীমা প্রকৃতির প্রয়োজনই তাঁদের নানা পথ ও ঐতিহ্য পরিক্রমনে বের করে-ছিল, বিষয়ের দৈন্য আর রইল না, সংস্কার হল অগ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতায় বিষ্ণু দে যেমন বলেন—

রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা কখনো,
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি।…

একবার যা কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেলাম, তাকে আবর্তন বা চর্বন করেই দিনকাটানো, তা মহৎ কবির লক্ষ্য হতে পারেনা ; নানা পথ খনন করতে গিয়ে কখনো কখনো, খেই হারানো সম্ভব, গভীর লক্ষ্যে স্পষ্ট হবে, 'গানে গানে নেমে সমুদ্রের দিকে' চলেছে কবিতা। বিষ্ণু দে'র 'কোনার্ক' কবিতাটাই ধরা যেতে পারে। পণ্ডিতের কূটজাল, ব্যাখ্যা ক্রমশই যাকে দুর্বোধ্যতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, তাকে সহজ ভাবে দেখা যাবে যদি পূর্ব সংস্কার বর্জন করি একবার। কোনার্ক নামক প্রত্নমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কবিকে বর্তমান থেকে অতীতের প্রত্যক্ষ বাস্তবে নিয়ে গেছে, তিনি কল্পনা দৃষ্টির সাহায্যে দু'হাজার বছর আগে এই মন্দিরের নির্মীয়মান পরিবেশটি প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তাতে অতীত হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষতর, জীবন্ত।

আকাশে বালিতে সূর্য, আদিগন্ত উন্মুক্ত মুখর কলরোল,
চোখে সূর্যমায়া জ্বলে, কানে বাজে নির্মাণের জনতার হাসি ;
মাকাড়ামুগনী আর বেলেপাথরের গানে, করতালে, খোলে
জীবনের সাধারণ্যে আনন্দের তীক্ষ্ণ সুর ওঠে পাশাপাশি
নির্মাণের জয়ে জয়ে, মানুষের জয়ে জয়ে, ভাস্কর স্থপতি
এ-দেশের মানুষেরই প্রাণসূর্য উঠে যায় আকাশে আকাশে,
অনড় পাথরে এই জড় পৃথিবীব দেহে যেন বা উল্লাসে
লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি।

এর ভাবের সংহতি ও ভাষার সংযত প্রকাশ, প্রতি শব্দে ইতিহাসবোধ, সমগ্র কর্মিষ্ঠ মানুষের জয়ের উল্লাস কতো বর্ণনা ও ব্যঞ্জনায় ধরা পড়েছে। সমস্ত কবিতাটি এমন নিবিষ্ট, এমন গতিময়, এমন প্রত্যক্ষ শব্দ চিত্রে বিন্যস্ত, পাঠমাত্রই আবেশগ্রস্ত হতে হয়। 'তাজমহল' অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের সাজাহান ভাবাবেগের হালকা হাওয়ায় ভাসমান, অতিরিক্ত সংগীতধর্মিতা আমাদের আপ্লুত করে, আর সত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। পংক্তির পর পংক্তি সেখানে এসেছে মুগ্ধতার তরল আবেশের যুক্তিতে, বোধিসারিত, কালবাহিত সত্য নিষ্ঠ নয় সে রচনা। অথচ 'কোনার্ক' ভয়ানক ভাবে কালচেতনার কবিতা, যে কাল মরণজয়ী মানুষগুলোর মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে আছে, যার সঙ্গে সবসময়ের বর্তমানেরই সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর। এই ব্যাপ্ত কালচেতনাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে গ্রহণ করার মধ্যে বিষ্ণু দে-র কবিতার উপ-

ভোগের সার্থকতা। কোথাও কোথাও দুরূহতা এই উপভোগে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর একথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিই—শিল্প সব সময়ই প্রতীকী, ব্যাখ্যা ধর্মী হতে পারেনা। প্রতীক বলে জীবনের তাৎপর্য তাতে ব্যঞ্জিত হতে থাকে। যে কবির লেখা জীবনকেই সমগ্রসত্তায় গ্রহণ করেছে, তাকে বোঝা মানেই জীবনকে গভীর সত্যে জানারই অন্যনাম। এক্ষেত্রে শ্রম নিষ্ফলে যায় না, যেতে পারে না।

বিনয়কুমার মাহাতা

এলিঅট অঙ্গীকরণ ঃ বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র কাব্য-অভিষেক এলিঅটীয় কাব্যবারি-সিঞ্চনে, এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ সে ঋণ স্বীকারে, কি কাব্যবিচারে কি কাব্য-অনুশীলনে, দ্বিধা নেই বিষ্ণু দে-র। বর্তমান শতকের বিশেষ দশকে একেবারে যৌবনের সুরুতেই তাঁর পরিচয় ঘটে এলিঅটের কবিতা এবং প্রবন্ধের সঙ্গে। সে-পরিচয় প্রভাবে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব ঘটে নি এবং তা সর্বদা স্মরণে রাখতেও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্ত :

It was on the basis of this slight familiarity that Mr Eliot's 'Poems 1925' captured me completely and I was at first surprised and dazed. And continued to be, as it were, possessed, by this poetry,

অনুরূপ অকপট স্বীকারোক্তির অনুরণন তাঁর নানা গদ্য-রচনায়। এমনকি, সাহিত্য-পাঠে তথা রচনায় আধুনিকতাবাদী ভারতীয় কবিদের 'অপ্সু দীক্ষা' যে এলিঅটীয় বীজ-মন্ত্রেই সে-বিষয়েও মুক্তকণ্ঠ উদ্‌ঘোষণায় তিনি পশ্চাৎপদ নন :

...Mr Eliot teaching Indian writers how to Write and how to read—not merely the literature of Europe, but that of India, of Bengal...

কেবল স্বীকারোক্তিতেই নয়, তাঁর কাব্যানুশীলনে এলিঅটীয় উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এলিঅটীয় চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা স্বীকরণের মধ্যেও এলিঅটীয় প্রভাবেরই স্বীকৃতি। আর তা প্রথম বয়সের রচনাতেই নয়, পরিণত বয়সের রচনাতেও অনুভূত। দু-একটি কবিতার প্রাসঙ্গিক চরণের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণেই এর সত্যতা ধরা পড়ে।

'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি কবির প্রথম বয়সের রচনা। যদিও এলিঅটীয় রচনায় আলোড়িত হওয়ার কাল থেকে প্রায় এক দশকের ব্যবধানে রচিত, তা হলেও

এলিঅটীয় আঙ্গিক তথা কাব্যরীতির বিভিন্ন প্রকরণ-ব্যবহারে কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি স্তবক তুলে দিচ্ছি :

জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বায়ুর চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুন্‌ছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধ্ হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্ পেগ্।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
-এব্‌ল্ ইন্
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ?
কাণে কাণে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খসরু বেগ্ ?

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও 'জন্মাষ্টমী'-র দৈর্ঘ্যের তুলনায় অংশটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, একটি পূর্ণ স্তবকের অর্ধাংশমাত্র। (লক্ষণীয়, 'জন্মাষ্টমী' দৈর্ঘ্যে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর সমপর্যায়ভুক্ত তো বটেই, বরং চরণসংখ্যায় সামান্য ছাড়িয়েই গেছে।)

এলিঅটীয় আঙ্গিক তথা কাব্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির (অর্থাৎ কার্যধর্মী বাক্‌ভঙ্গি, চরণের অসম দৈর্ঘ্য, অন্ত্যানুপ্রাসজাতীয় তথাকথিত কাব্যধর্মিতার প্রতি ঔদাসীন্য, শব্দ ব্যবহারে প্রচলিত সংস্কার উল্লঙ্ঘন প্রভৃতি) অস্তিত্ব উদ্ধৃত চরণগুলিতে অনায়াসলভ্য; তাছাড়াও এলিঅটীয় কাব্যরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও এই উদ্ধৃতিতে সুপ্রকট। তাদেরই কয়েকটি এখানে বিশ্লেষিত হল:

ক. পার্সোনা সৃষ্টি: 'প্রুফ্রক' বা 'জেরনশান' কবিতায় যে ধরণের পার্সোনা বা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন এলিঅট তার সঙ্গে কবির কোনো সম্পর্ক নেই রোমাণ্টিক কবিতার মতো। এর ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক, আবেদন বস্তুনিষ্ঠ। তবে লক্ষ্যণীয়, অনুরূপ চরিত্রে কবির ব্যক্তিসত্তার আরোপ অসমীচীন হলেও এর তির্যক আক্রমের (approach) মধ্যেও কবির প্রকৃত প্রবণতাটুকু ধরতে সচেতন পাঠকের অসুবিধে হয় না। উদ্ধৃতাংশটি অনুরূপ পার্সোনারই সংলাপ।

খ. একক সংলাপ ব্যবহার: ব্রাউনিং অনুসৃত একক সংলাপ (monologue) সার্থকভাবে প্রযুক্ত এলিঅটের 'প্রুফ্রক', 'জেরনশান', 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' প্রভৃতি কবিতায়। উদ্ধৃতাংশে বিষ্ণু দে-ও তা ব্যবহার করেছেন, প্রতিপক্ষের সংলাপ অনুপস্থিত।

গ. অন্যপূর্বা চিত্রকল্প: কাব্যের ধারাবদল মানসে এলিঅট নানা অভিনব কাব্যপ্রকরণ ব্যবহার করেছিলেন। তিরিশের দশকের বাঙালী কবিরাও সে সমস্ত নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যপূর্বা চিত্রকল্প (নামকরণ আমার) তাদেরই একটি। পূর্বসূরী কবির ধ্রুপদীকল্প রচনার বিখ্যাত চরণ (বা চরণ সমষ্টি) বিশেষ ব্যঞ্জনাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে (কখনো বা তির্যগ্‌ দৃষ্টির প্রয়োজনে) বিকৃত বা অবিকৃতভাবে ব্যবহার ক'রে ঐ সমস্ত চরণের ব্যঞ্জনা বা প্রতীক মূল্যটুকু স্বীয় কবিতায় সার্থকভাবে সঞ্চারিত করতেন এলিঅট। শেক্‌সপিয়ার, মিল্টন, গোল্ডস্মিথ, স্পেন্‌সার প্রমুখের কাব্যচরণ অনুরূপভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যে। 'জন্মাষ্টমী'র উদ্ধৃতাংশের এই চরণগুলিতে অন্যপূর্বা চিত্রকল্প সৃষ্ট হয়েছে:

> জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
> চরণতলে
> আমি অভাগ্য মানি,……

আভাসিত রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' ('চিত্রা') কবিতার সংশ্লিষ্ট চরণগুলি :

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরনতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া ··

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা (সাধনার ব্যর্থতা আরাধ্যার কৃপাদৃষ্টিপাতে সফল করতে ভক্তের আকুলতা) পশ্চাৎপটে রেখে স্বীয় কবিতার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনাটুকু উজ্জ্বল ক'রে তুলতে উত্তররৈবিক কবি কাব্যচাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন। সেই সঙ্গে তির্যগ্‌দৃষ্টির ফলশ্রুতিতে রাবীন্দ্রিক ব্যঞ্জনার ভক্তিমার্গীয় পবিত্রতা তথা শিহরণ করা হয়েছে বিকৃত ও হাস্যাস্পদ।

ঘ. স্বগত ভাষণ (parenthesis) : উদ্ধৃত স্তবকে এলিঅট অনুসৃত রীতিতে বন্ধনীর মধ্যে স্বগত ভাষণ সংযোজিত।

আর চুপি চুপি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)

ঙ. ঐতিহ্য হাস্যাস্পদকরণ : আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং যন্ত্রসভ্যতার প্রাদুর্ভাবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইয়োরোপে ধর্ম, সমাজ, জীবন প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়তে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মানসিকতায় ক্ষীণ আস্থাটুকুও রইল না, হয়ে উঠল উপহাসাস্পদ। ঈশ্বর, দৈব প্রভৃতি সংক্রান্ত আস্তিক্যবোধের সঙ্গে অপার্থিব ও একনিষ্ঠ প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতিও আক্রান্ত ও উপহাসাস্পদ হল। বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কবিদের এলিঅটসুলভ মানসিকতায়ও একনিষ্ঠ অপার্থিব প্রেম অবাস্তব কল্পনা, সতীত্ব প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ অলীক এবং উপহাসযোগ্য।

হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙ্ময় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।…
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)

চ. আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যান্ত্রিকতা : হৃদয়-ব্যতিরেকী যান্ত্রিক বহুপ্রণয়, ক্লাব-কাফের গতানুগতিকতায় প্রাণস্পর্শের অভাব, জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-রেখার বিলুপ্তি (টেনিস প্রসঙ্গে) কেবল এলিঅটীয় কাব্য-ঐতিহ্যের প্রতিই নয় আধুনিক সভ্যতা তথা জীবনের যান্ত্রিকতা ও জটিলতার প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে।

ছ. অন্তঃসারশূন্যতা : 'দি হলো মেন', 'প্রুফ্রক', 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড প্রভৃতি কবিতায় এলিঅট আধুনিক মানবের যে অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অনুরূপ অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ধৃত অংশে নায়কের মুখে লেনিন-স্টালিনের সপ্রতিভ উল্লেখ সত্ত্বেও অনুধাবনে পাঠকের অসুবিধে হয় না। লেনিন-স্টালিন আধুনিক মানবের মুখোশের মতো বাহ্য আবরণ, জিহ্বাগ্রের বিলাস।

জ. সর্বগ্রাহিতা (comprehensiveness) : উদ্ধৃতাংশে বিষয় ও বক্তব্যে এলিঅটের কবিতার মতোই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভেদরেখা মুছে গেছে—লেনিন-স্টালিনের উল্লেখ যেমন এক বিশ্বব্যাপকতা এনেছে, তেমনি 'রাজাস্ পেগ্', 'রিমার্ক-এব্‌ল্', 'ইণ্টারেষ্টিং', 'কাকটুস্ গ্রাণ্ডিফ্লোরা' প্রভৃতি ঐতিহ্যবিরোধী শব্দপ্রয়োগ ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা এনে দিয়েছে।

ঝ. উল্লেখপরায়ণতা (allusiveness) : বিষ্ণু দে-র কবিতাও এলিঅটের মতোই অনেক সময়ই উল্লেখ-ভারাক্রান্ত এবং 'জন্মাষ্টমী'-র উদ্ধৃত অংশটিও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ঞ. তির্যগ্ দৃষ্টি : প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায় সাবেকী সংস্কারের প্রতি আস্থাহীনত্ব বোঝাতে উদ্ধৃতাংশটিতেও তির্যগ্‌দৃষ্টি ভর করেছে।

ট. বৈদগ্ধ্য : এলিঅটের কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যার বাহন, তাই আস্বাদ্য কেবল সমধর্মা বিদগ্ধ ও মননশীলের কাছে। প্রকৃত প্রস্তাবেই এই কবিতা 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। বিষ্ণু দে-র কবিতাও বৈদগ্ধ্যধর্মী এবং উদ্ধৃতাংশটিও।

ঠ. লিলি প্রসঙ্গ : উদ্ধৃতাংশে অন্ত্যচরণে লিলির অবতারণা আকস্মিক এবং 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর সঙ্গে নামগত সাদৃশ্য কাকতালীয় মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়।

এলিঅটের লিলি বিশ শতকের মহাযুদ্ধোত্তর জৈব বা দেহনির্ভর প্রেম-ভালবাসার

মূর্ত মানবী। প্রাচীন আদর্শ কিংবা সংস্কারের নিগড়ে তার দাম্পত্যজীবন বাঁধা পড়েনি, তা তার কাছে জৈব অভ্যাসের পরিপূরক। হৃদয়হীন সামরিক পুরুষ অ্যালবার্টও তাকে প্রয়োজন-পূর্তির উপকরণের বেশি মর্যাদা সম্ভবতঃ দেয় না।

...and think of poor Albert,
He's been in the army four years, he wants a good time,
And if you don't give it him, there's others will,...

বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই লিলি প্রতীক নারী। রবীন্দ্র-রোমান্টিক তিলোত্তমার ভাবমূর্তি অতিক্রম ক'রে সে রক্তমাংসের মানবী। পরবর্তী একাধিক কাব্যে সে মহাযুদ্ধোত্তর দেহসর্বস্ব প্রেমের প্রতীক, এলিঅটীয় দ্যোতনারও ধারক। 'উর্বশী ও আর্টেমিস্' কাব্যগ্রন্থে আবির্ভাব লগ্ন থেকেই লিলি বাস্তবের নারী।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি,
তোমার চিত্তের, লিলি, চামেলিসৌরভ
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়
সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে

পৃথিবীর পরম আশ্বাস।...
আগামী রাত্রির ছায়া নীড় বাঁধে শান্ত নির্নিমেষ
অনন্ত সে পাণ্ডুমুখে তার। (প্রজ্ঞাপারমিতা তাকে করে আশীর্বাদ')

আংশিক রোমান্টিক আচ্ছন্নতা থাকলেও স্বীকার করতেই হয় যে মুখের পাণ্ডুরতা আধুনিকতার মোক্ষম যুগচিহ্ন। 'গ্রীষ্ম' কবিতায় লিলি অধিকতর রক্তমাংসের নায়িকা।

অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে।
আকাশ পৃথিবী আমরণ
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হল বর্ণহীন প্রদাহে রৌদ্রের।
শুধু লিলি, তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল।

প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় সংগ্রামক্লান্ত অবসন্ন অসহায় মানুষের জৈব সান্ত্বনা কেবল লিলির পাণ্ডু অথচ রক্তমাংসের শরীরে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'-তেও লিলি প্লেটোনিক তথা রোমান্টিক প্রেম-বিরোধী মহাযুদ্ধোত্তর ত্রিশ দশকের জৈব নায়িকা। এলিঅটের নায়িকার মতোই তারও ভূমিকা ভালবাসার অভিনয়ের এবং তা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ও আভ্যাসিক।

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি ;
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি।
তোমার শাড়ির ছটায়, কথায় কথায় হাসি—

অনুরূপ নিষ্প্রাণ আভ্যাসিক যান্ত্রিকতা এলিঅটেও দ্যোতিত ;

She turns and looks a moment in the glass,
Hardly aware of her departed lover ;
Her brain allows one half-formed thought to pass :
'Well now that's done : and I'm glad it's over.'
When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.

'শিখণ্ডীর গান (কথকতা)' এর লিলি প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ ঐ ঘটনারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঃ

ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়,...

একথা অনস্বীকার্য যে বিষ্ণু দে-র লিলি তাঁর ডলু (মৈত্রেয়ী ঘোষ)-রমা-অলকাদেরই (অলকা বসু) একজন কিন্তু ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো নয়, সে স্বতন্ত্র। তাই ডলু-রমাদের আবির্ভাব এক-আধটি কাব্যে এক-আধবারই। লিলির বিচরণ কিন্তু কবিতা থেকে কবিতান্তরে। কাব্য-কাব্যান্তরে মহাযুদ্ধোত্তর নায়িকার আদর্শ জাগরূক রাখতেই যেন তার অন্তঃশীল প্রবাহ। সর্বোপরি লিলিও এলিঅটীয় নায়িকাসুলভ মহাযুদ্ধোত্তর অনুর্বরতারই প্রতীক এবং সে-ভূমিকায় এলিঅটের লিলির যেমন প্রতিষ্ঠা অ্যালবার্ট প্রমুখ নায়কের বিপরীতে, বিষ্ণু দে-র লিলিরও তেমনি প্রতিষ্ঠা সুরেশ প্রমুখেরই বিপরীতে।

'পূর্বলেখ'-সমসাময়িক কিংবা অদূর-পরবর্তী নয়, সার্ধ তিন দশক পরে প্রকাশিত

কাব্যগ্রন্থেও বিষ্ণু দে-র এমন কবিতা সুলভ যাতে এলিঅটীয় প্রভাবের হদিশ সহজেই মেলে। 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থের 'আমৃত্যু চৈতন্যে' কবিতাটি অনুরূপ একটি রচনা।

চতুর্দিকে পোড়ো জমি, বিলাসী পশ্চিমা নয়, বিরিক্ত, আদিম।
বিদেশী-দেশীর তিন শতাব্দীর ভোজে-লেহে-পেয়ে বিকৃত শিকার,
ফাঁপা ফাঁপা মানুষদের সঞ্চয়াতিরিক্ত মৃত্যু ভূত নৃত্যে বাজায় ডিণ্ডিম
দেখি শুধু, যত চলি চতুর্দিকে রেখে গেছে বঞ্চনার দুরন্ত শিকার।...
ক্ষুধায় কাতর, শ্বাসরুদ্ধ, তৃষ্ণায় জর্জর, পথ বুঝি শেষ হল জন্ম তেপান্তরে
অরণ্যের ভুক্ত অবশেষে। বহু লোক, মেয়ে ও পুরুষ, বহু শিশু খায়, যেন দেয় হন্যে,
ভুরিভোজ পাথরে নুড়িতে, খরা আণব ধূলায়
আর কুড়ি হাত ভ'রে ভ'রে
পরিবেশনে মেতেছে একাই দানব মৃত্যু, দেখি একদণ্ড কেবা পর কেবা আত্ম।
ব'সে পড়ি ফণিমনসার ঝোপে, শূন্য পাতে দুই হাত ভ'রে
আমৃত্যু চৈতন্যে॥

সহজেই অনুধাবন করা যায় যে এলিঅটীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বীকরণ ক'রেই কবিতাটির জগৎ কল্পিত, আলম্বনও 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', 'দি হলো মেন' প্রভৃতি কবিতার কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রতীক। এলিঅট কল্পিত মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের অনুরূপ বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ। 'বিদেশী-দেশীর তিন শতাব্দীর' শোষণে ভারতবর্ষও 'পোড়ো জমি'—ক্ষুধার অন্ন নেই, তৃষ্ণার জল নেই, স্নিগ্ধ ছায়া নেই, শ্বাসরুদ্ধকর 'জন্ম তেপান্তরে' আছে কেবল ছায়াহীন 'ফণিমনসার ঝোপ'। ছবিটা 'দি হলো মেন'—এর অনুরূপ :

This is the dead land
This is cactus land
এই তো শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ (বিষ্ণু দে-র অনুবাদ)

মানুষেরাও 'হলো মেন'-এর প্রতিরূপ— ফাঁপা ফাঁপা মানুষ'। বিষ্ণু দে-র 'পোড়ো জমি', 'জন্ম তেপান্তর', 'ফাঁপা ফাঁপা মানুষ', 'ফণিমনসা' প্রভৃতি প্রতীকের উৎস এলিঅটেরই 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড,, 'হলো মেন', 'ক্যাকটাস' প্রভৃতি প্রতিভাস।

বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' এবং 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে'-র 'আমৃত্যু

চৈতন্যে' কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশের প্রয়োজনীয় আলোচনা থেকে অন্ততঃ এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে কবি এলিঅটের কবিতা এবং কাব্যধারা কবি বিষ্ণু দে-র সামগ্রিক কবি সত্তাকেই আমূল আলোড়িত করেছিল। একথাও সুস্পষ্ট যে এই আলোড়ন সাময়িক বা ক্ষণিক নয় এবং কোনো একটা বিশেষ যুগেই এর প্রভাব শেষ হয়ে যায় নি। এলিঅটের প্রভাব বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ কালব্যাপকতায় প্রসারিত। একথা শুধু তাঁর এলিঅট অনুবাদেই আভাসিত নয়, মৌলিক কবিতা প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'আমৃত্যু চৈতন্যে' কবিতায় ব্যবহৃত এলিঅটীয় প্রতীক এবং দ্যোতনা থেকে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে এলিঅটের প্রভাব বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনায় এমন এক মৌল ব্যাপার যা তাঁর কাব্যবিবর্তনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত।

সুজিৎ ঘোষ

কবিতার আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যসন্ধান : বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে-র কবিতার আলোচনায় টি. এস. এলিয়টের কথা বারে বারেই এসে পড়ে এবং এ প্রসঙ্গের সূত্রপাত সর্বপ্রথম সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথই করেছিলেন বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট্ ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিকে বেড়িয়ে আসেন"[১]—এ কথা লেখা হল ১৯৩৭ সালে, বিষ্ণু দে-র বয়স তখন আঠাশ বছর। অথচ ১৯৩৪ সালে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট' প্রবন্ধে বলেন, "কবি যশঃপ্রার্থীর পক্ষে কবি বিশেষের নাম জপা বিপজ্জনক"।[২] কোনও কবির কাছে কেউ প্রিয় কবি হলেই, তিনি তাঁর নাম জপবেন, এ রকম নাও হতে পারে। কেননা কবিকে ঐতিহ্য অনুসরণ করেও তাঁর পূর্বসূরীকে অতিক্রম করে যেতে হয়; কখনও সচেতনভাবে অস্বীকার করতে হয়, বিরোধিতাও কখন বা। যেমন বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা করেছিলেন মধুসূদনের, মধুসূদন অতিক্রম করেছিলেন ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্তকে।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ-কথিত বিষ্ণু দে 'নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় কাব্য লেখেন না' বক্তব্যের মধ্যে প্রশ্ন নিহিত, —তা হলে কিসের তাড়নায় লেখেন? এবং এ প্রশ্ন পূর্বেই একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে (বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, ১৯৬৬ পৃঃ ৭৯)। এ-প্রশ্নের উত্তর যে ভাবেই দেওয়া যাক, সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ইঙ্গিতটি ধরতে আমাদের অসুবিধা হয় না, সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-কে আবেগ নির্ভর নয়, বুদ্ধি নির্ভর কবি বলতে চেয়েছেন। বিষ্ণু দে-র কাব্যরচনার প্রক্রিয়ায় ভাবের চেয়ে মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই প্রাধান্য বেশী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু 'চোরাবালি'র অনেক কবিতাই আবেগে থরোথরো। 'চোরাবালি', বিষ্ণু দে-র প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, কিন্তু চোরাবালির অনেক কবিতাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর আগের রচনা। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে' ১৯২৯-৩৩ খৃষ্টাব্দে রচিত কবিতার সংকলন, আর চোরাবালির অন্তর্গত কবিতাগুলি রচিত হয় ১৯২৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

অবশ্য উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালি শুধু কাব্যআঙ্গিকে নয়, গুণগতভাবে পূর্ববর্তী তিন খ্যাতিমান ও উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্য থেকে স্বতন্ত্র। মোহিতলালের 'পান্থ' কবিতার পাশে ঘোড়সওয়ার বা ক্রেসিডা পাঠ করলেই স্বাদের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। যতীন্দ্র সেনগুপ্তের কাব্যের মতো অসহায় ঈশ্বরকে আঁকড়ে থাকার ইচ্ছাও বিষ্ণু দে-র কাব্যে নেই। নজরুলের উচ্চারণের সঙ্গেও চোরাবালির ব্যবধান দুস্তর। অথচ, উর্বশী, মহাশ্বেতা প্রভৃতি মিথের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে ঐতিহ্যের সন্ধান করে চলেছেন। কিন্তু এ-ঐতিহ্যের খোঁজ শুধু ভারতীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকছে না। দেশকালের সীমাকে সচেতনভাবেই ঐতিহ্যের সন্ধানে বিষ্ণু দে অতিক্রম করতে চাইছেন। সে-কারণেই আর্টেমিস, ক্রেসিডা, ওফেলিয়া বা কনডিশনড্ রিফ্লেক্স্-এর মতো বিষয়ও তাঁর কাব্যের উপজীব্য হতে পারছে। যেখানে এই অনুসন্ধান আবেগের সঙ্গে অদ্বৈত সূত্রে ধরা পড়েছে, বিষ্ণু দে-র এই পর্যায়ে তা উপভোগ্য কবিতা হয়েছে। একথা অবশ্য সুধীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, অন্যভাবে, "এবং যেখানে তিনি সত্যই সফল সেখানে তাঁর চর্যা ও চর্চা একাগ্র, বোধ ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন।...এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা এবং যাঁদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়"[৩]

এলিয়টের প্রভাবকে বিষ্ণু দে 'চাঁদনী রাত' এবং মার্কসের প্রভাবকে 'সৌর বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৪] সমগ্র দিনের বৃত্তে যেমন দিন ও রাত্রি—দু'এরই উপস্থিতি, বিষ্ণু দে-র চেতনার বৃত্তে মার্কস ও এলিয়টের উপস্থিতির গুরুত্ব ও তারতম্য তাঁর এই উপমায় প্রকাশ পেয়েছে। এবং আপাত দুই বিপরীত ভাবনা-চেতনার মধ্যে দাঁড়িয়ে, এলিয়ট-ভক্ত হয়েও বাঙালী কবিদের মধ্যে কবি হিসেবে মার্কসবাদকে প্রথম স্বীকৃতি জানালেন বিষ্ণু দে। কিন্তু এ-স্বীকৃতির মধ্যেও তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্য তীব্রভাবেই ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও পার্টির সংস্কৃতি-কর্মী নেতাসংগঠকদের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সম্পর্ক খুব হার্দ্য ছিল না।[৫] এবং সে কারণেই 'পরিচয়' ইত্যাদির মতো পার্টির নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও 'সাহিত্যপত্রে'র মতো একটি স্বতন্ত্র পত্রিকামঞ্চ তাকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। অনেক পরে বিষ্ণু দে লিখেছেন,

'A poet or an artist realises, however dimly and even in a self-contradictory manner, the laws of development which his particular talent and his social affiliations—his whole being—demand from him, with their own logic of foresight and discipline."[৬]

আরো কম বয়সে এই অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী পদ্ধতিতেই বিষ্ণু দে-রও নিজের কবি প্রতিভার বিকাশের সূত্র অনুসন্ধান করতে হয়েছে। নিজের সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকে পরিশ্রম করে বিস্তৃত করতে হয়েছে। তার জন্যে পারিবারিক ঐতিহ্যের সীমাও তাঁকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হয়েছে। যেমন, গান বা চিত্রশিল্পের সমাদর ও সমজদারী—যা পরিণত বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যগত নয়, তাঁকে স্বীয় প্রয়াসে তা আত্মস্থ করতে হয়েছে।

এই আত্মীকরণের একটি বিশেষ পর্বে এলিয়ট তাঁর বিকাশে সহায়ক হয়েছেন। শুধু বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেই এলিয়ট সহায়ক নন। বিশের দশকে ইংল্যাণ্ডের বহু তরুণ লেখকের ক্ষেত্রেই এলিয়টের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই মার্কসবাদী।

১৯২৮-এ এলিয়ট নিজেকে ক্যাথলিক, ক্লাসিকবাদী ও রাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। এর আগেই তাঁর Waste Land (১৯২২), The Hollow Men (১৯২৫) ইত্যাদি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এলিয়টের মতাদর্শগত ঘোষণা অবশ্যই তাঁর মার্কসবাদী অনুরাগীদের অস্বস্তিতে ফেলে থাকবে। উত্তরোত্তর তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার প্রকাশ এলিয়টকে প্রচ্ছন্ন প্রগতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও ক্ষেত্র রাখেনি। কিন্তু তাঁর প্রকাশিত কবিতায় এলিয়ট সমকালীন সমাজের যে পরিচয় রাখলেন, তা একান্ত বাস্তব। এই বাস্তবতার সূত্রেই তিনি শিল্পমনস্ক মার্কসবাদীদেরও ভাবালেন, তাঁদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন। যুগের কবি প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন।

ঐতিহাসিক মর্টন লিখেছেন, "When in 1923, at the age of 20, I first came upon the Waste Land, I was already a socialist, or rather perhaps, was feeling my way, with many hesitations, towards socialism. To anyone but a fully conscious revolutionary, Britain and Europe at that time seemed a desperate chaos. We indeed welcomed October Revolution but were far from understanding its significance. Elsewhere the revolutionary wave was ebbing. We saw hunger and misery and unemployment everywhere".[৭] এই পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী দশকের কবিতার স্বচ্ছন্দ আরামপ্রদ ধারাটি, পাঠককে আর তুষ্ট

করতে পারছিল না। ইয়েটস্ বড়ো কবি, কিন্তু তাঁর মধ্যেও এলিয়টের মতো সমকালের কাব্যরূপ অনুপস্থিত। রোজেনবার্গ এবং ওয়েনের কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রূপ, যুদ্ধের অর্থহীনতা ফুটলো, কিন্তু সমগ্র সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তি মানুষের সংকট তাঁদের কাব্যে নেই। এই পটভূমিতে Waste Land-এর প্রভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। এবং এর আগে রচিত এলিয়টের কবিতায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে এলো :

> The hippopotamus's day
> Is passed in sleep ; at night he hunts ;
> God works in a mysterious way—
> The Church can sleep and feed at once.
>
> (Collected Poems P. 51-52)

তখন পাঠক ও কবিদের কাব্যিক চাহিদা অন্য কোনও কবি পূরণে ব্যর্থ। এলিয়ট সমকালীন নিঃসঙ্গতা, জঘন্য দারিদ্র্য, নৈরাজ্য ও অস্থিরতাকে প্রকাশ করে, পাঠককে চমৎকৃত করে দিলেন। তাঁর কবিতার অস্পষ্টতা, অপ্রত্যাশিত ও অত্যাশ্চর্য বিষয় পরিবর্তন—এর মধ্যেও সমকালের ছাপ থেকে গেছে। এলিয়টই একমাত্র কবি যিনি বাস্তবের থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়নতৎপর নন, যিনি অন্যদের সঙ্গে পাঠকের মতোই পৃথিবীর পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত। কল্পনার জগত সৃষ্টি করে তার মধ্যে মুখ লুকোতে চান না। সে কারণে এলিয়টের নৈরাশ্যবাদ ইয়োরোপের এই উষরতার ক্ষেত্রে বেমানান হয় নি। এলিয়টের প্রজন্মের কাছে Waste Land একটা কাব্যিক মুক্তি নিয়ে এলো ; এ-কাব্য আরো প্রত্যক্ষত কাব্যিক এবং যুক্তিসহ। তার পূর্বে রোমান্টিকতার চর্বিতচর্বনে ইংরেজী কাব্যের পরিমণ্ডল সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এলিয়ট রোমান্টিকতার বিরোধিতা করলেন - শুধু রোমান্টিকতার দুষ্ট অপভ্রংশের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না, রোমান্টিক আন্দোলনের সমস্ত সদর্থক অভিজ্ঞতাকেও অস্বীকার করলেন। যে রোমান্টিকতা একদা কাব্যের মুক্তি এনেছিল, তা-ই কালে শ্বাসরোধী নিয়মতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। রোমান্টিকতার বিরোধিতায় এলিয়ট নিজেকে ক্লাসিকবাদী বলে ঘোষণা করলেন।

প্রসঙ্গতঃ বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন, যে তিনি তাঁর ব্যঙ্গে বিদ্রূপে, তিক্ত সমালোচনায় স্বীয় শ্রেণীর প্রতি মমতা ও রাজনৈতিক সংস্কারের কার্যত বিরোধিতা করেছিলেন, অভিজাততন্ত্রের পতনের অনিবার্যতা দেখলেন এবং ভবিষ্যতের মানুষকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন।[৮] এলিয়টের মধ্যেও বালজাকের মতোই এক শিল্পীসত্তাকে পাওয়া যায়, যিনি মুখে রাজতন্ত্র, ক্যাথলিক ধর্মের কথা বললেও, সমগ্র পশ্চিমী ধনতন্ত্রের সংকটকে

কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। অর্থনীতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মার্কস এই সংকটের রূপ তার আগেই অবশ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

এলিয়ট তাঁর Choruses from 'The Rock' (1934) কবিতায় যেমন লিখলেন 'in the semi-darkness the voices of the WORKMEN are heard chanting.

In the vacant places
We will build with new bricks
There are hands and machines
Where the beams are rotten
We will build with new timber

বা, Voices of the UNEMPLOYED.

No man has hired us
With pocketed hands
And lowered faces
We stand about in open places
And shiver in unlit room

* * * *

No man has hired us.
Our life is unwelcome, our death
Unmentioned in 'The Times'.

বা, Chant of WORKMEN again,

There is no begining no movement, no peace and no end
But noise without peace, food without taste

(Collected Poems P. 163-165)

কিন্তু, তার পরিণামে,

A Church for all
And a job for each
Each man to his work.

চার্চের কথা বাদ দিলে, এই সব বক্তব্যে এলিয়ট সমকালের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন বলা চলে এবং এলিয়টের ইতিহাস-চেতনায় মধ্যে একটি

দ্বান্দ্বিক ধারাও লক্ষ্য করা যাবে, "the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. This historical sense, which is a sense of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time what makes a writer most acutely concious of his place in time, of his contemporaneity."[৯]

বিষ্ণু দে এলিয়টের কাব্যের ও কাব্যচেতনার এই দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন " work of art which bear the indelilble stamp of their total personality, all the more ..resolving their crisis in this modern world of the alienated individual.. And Mr. Eliot, to me, had been the supreme example of the modern mind in a divided society, of the modern poet exploring and revealing the rock and the fountain in the garden in midst of the Waste Land of our life.[১০] এলিয়টের কাব্যে জীবনের স্বর্ণধারার সন্ধান ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনেও এলিয়ট বিষ্ণু দে র এক সাময়িক আশ্রয়। সেই আশ্রয় অবলম্বন করে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকেও আধুনিক ইংরেজী কবিতার সঙ্গে পরিচিত করতে চেয়েছেন, আধুনিক কাব্যের কাব্যত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। এবং সে প্রয়াসের ফলেই 'পুনশ্চ' কাব্যের তীর্থযাত্রী কবিতা।[১১]

বিষ্ণু দে-র প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থের সময়কালে অর্থাৎ ১৯২৬—১৯৩৭ পর্বে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আঘাত, ছাত্র আন্দোলন, নানা সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনা, শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে ওঠা, কৃষক আন্দোলন, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ও পূর্ণস্বরাজের দাবি-বিতর্ক, অসহযোগ আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা, হরিজন আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় কংগ্রেসের আবার কাউনসিল রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন, প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণপন্থীদের সংহত হওয়া ইত্যাদি নানা ঘটনার আবর্তে, চোরা ঘূর্ণিতে প্রতিটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে পড়তে হয়েছিল।[১২] একই সঙ্গে কবিকে নিজের মতাদর্শগত ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে নিতে হচ্ছিল।

ইওরোপে ১৯২৯ এর মন্দার পর থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র। ফলে সে দেশগুলিতেও নানা নতুন সংকট দেখা দিতে থাকে। তার পরিণামে স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬), যা কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

এ-রকমই এক দেশীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবীদের নিজের নিজের মতাদর্শগত ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে নিতে হচ্ছিল। বাস্তব ও মতাদর্শগত সংকট থেকে বেরোবার পথ এলিয়টে পাওয়া গেল না।

এলিক ওয়েসটের কথায়, "The poem finally leaves us where we were. In which respect it is in striking contrast to its sources. As we have already indicated, the idea of the waste land is taken from primitive fertility ritual,...In old ritual there was the purpose of making the land fertile ; in old romances the fertility was restored. In the Waste Land the land remains waste."[১৩]

চোরাবালি প্রকাশের সময় পর্যন্ত বিষ্ণু দে-কে ছাত্র আন্দোলন, সমকালীন রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকতে দেখা যায় নি। একই সঙ্গে উনিশ শতকের কিছু বুদ্ধিজীবীর মতো পশ্চিমের প্রতি বিমুগ্ধ বিস্ময়ও বিষ্ণু দে-র মধ্যে ছিল না, বিশ শতকের কিছু বুদ্ধিজীবীর মতো পশ্চিমী দুনিয়াকে মোক্ষস্থল বলেও তিনি ভাবেন নি। খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে কখনও বিদেশে যান নি। সারা জীবনে বিদেশী পোষাক পরেন নি।

জীবনচর্যায় এই দেশীয় মানসিকতা অথচ দেশের সাধারণ জীবনধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্যদিকে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সপ্রয়াস সচেতনতা বিষ্ণু দে-কে এক স্ববিরোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালি পর্বের কবিতায় এই বিরোধের মীমাংসার-একটি প্রধান ক্ষেত্র : প্রেম। এ ছাড়া, বহু কবিতায় ব্যঙ্গ, সমাজের প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব, তির্যকভাবে জীবনকে দেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। একাধিক এলিয়ট-চিত্রকল্পও খুঁজে পাওয়া যাবে, যেমন,—

A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.

(Collected Poems, P-65)

আগে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,

জানি নি আগে ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি।

(চোরাবালি, পৃঃ ৮০)

কিন্তু, হাওড়া ব্রীজের জনস্রোতের সঙ্গে এলিয়টের London Bridge is falling down falling down falling down—(ঐ, P 79) এর যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা, ধনতন্ত্রের ও পশ্চিমী দুনিয়ার সমূহ সর্বনাশ ও পতনের প্রত্যক্ষতা, বিষ্ণু দে-র উপলব্ধিতে সেই সর্বনাশের চিত্র স্বভাবতই আসে নি। কবি হিসাবে এলিয়টের পরিচয়ের পাশাপাশি সমালোচক এলিয়টের ভূমিকার গুরুত্ব মনে রাখা প্রয়োজন। কাব্যাদর্শ ও কবি-বিষয়ক এলিয়টের প্রবন্ধগুলি সে সময়ে অন্য বহুজনের মতো বিষ্ণু দে-কেও প্রভাবিত করেছে। Critarion পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এলিয়টের ভূমিকা সম্পর্কে মর্টন বলেছেন, "I should add that during all the years of my association with the Critarion, I had complete freedom to express in it, a viewpoint which Eliot must have thought entirely mistaken . This leads us to a further contradiction. The editorial policy of the Critarion was avowedly reactionary .... policy was the defence of the West and the Christian values . yet alongside all this it contained a remarkable amount of positive and even actively progressive writings, both critical and creative.[১৪]

এই নীতির পিছনে যে মনোভাব কাজ করেছে, তা এলিয়ট নিজেই ব্যক্ত করেছেন, "The ideas with which you did not agree, the opinions which you could not accept, were as important to you as those which you found immediately acceptable... ..It was our business not so much to make any particular ideas prevail, as to maintain intellectual activity on the highest level."[১৫]

এলিয়টের সম্পাদকীয় ও ব্যক্তিগত আচরণে এই বৌদ্ধিক মুক্তির যে পরিবেশ, মনে হয়, সাহিত্যপত্রের ভূমিকাকে বিষ্ণু দে অনুরূপভাবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু দে এই মানসিকতা নিজেও লালন করেছেন। সমকালে ইউরোপে এবং আমাদের দেশেও কণ্ঠরোধী স্বৈরতন্ত্রের প্রবল চাপের মুখে এলিয়টের এ-ধরণের ব্যক্তিগত নীতিবোধ আকর্ষণ না করে পারে না। অবশ্য, সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে The

Critarion-এ ক্রমাগত মার্কসবিরোধী লেখা প্রকাশিত হত, কিন্তু সর্বদাই মার্কস সম্পর্কে সশ্রদ্ধ।[১৬]

ইয়েটস্ প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছিলেন, "But in fact, very few poets have shown this capacity of adaptation to the years. It requires, indeed, an exceptional honesty and courage to face the change. Most men either cling to the experiences of youth, so that their writing becomes an insincere mimicry of their earlier work or they leave their passion behind, and write only from the head with a hollow and wasted virtuosity.[১৭] একথা লিখেছিলেন এলিয়ট ১৯৪০-এ। এই সততার স্বীকৃতিতেই সম্ভবত ১৯৪২-এ এলিয়ট কবিতা রচনা বন্ধ করে দেন।

উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালি কাব্যের প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এ-কাব্য মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের কাব্য থেকে স্বাদে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু, স্বাদের ভিন্নতা ছাড়া প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। আছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নিয়ে সফল পরীক্ষা। সংলাপের ঢঙে কাব্যপংক্তি রচনার প্রয়াস, রবীন্দ্র কাব্য-পংক্তি ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র (এবং সমর সেনেরও) এক নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ পদ্ধতি। কিন্তু এলিয়ট স্বতন্ত্র কাব্যিক শব্দের বিরোধিতা করেছিলেন। আধুনিক বাঙালী কবিরাও ধীরে ধীরে পূর্বে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী ত্যাগ করেছেন। কিন্তু উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালির বহু কবিতায় এ-ধরণের শব্দের (রয়, হেরিলাম, মোর, শুধিয়ে, যবে, মাগি, রবে, ইত্যাদি) প্রয়োগ বিষ্ণু দে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বাক্যবন্ধে একই কবিতায় সাধু চলিতের মিশ্রণ-জনিত দুর্বলতাও লক্ষ্য করা যাবে। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও এ-পর্বে তাঁর কাব্যে স্থান পায়নি। কিন্তু, যা লক্ষ্য করার, তা হল বিষ্ণু দে-র মৌলিক কবিত্বধর্ম—তাঁর লিরিক প্রবণতা উর্বশী ও আর্টেমিস এবং চোরাবালির বহু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্য হিসেবে মনে রাখা প্রয়োজন, এলিয়ট ১৯৩৭-এ কবি হিসেবে প্রায় নিঃশেষিত, মাত্র তিনটি কোয়ার্টেট রচনা বাকি। একই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির দিকে একবার তাকালে আমরা দেখি, ভাবনায় ও শিল্প প্রকরণের দিক থেকে কবি নিজেকে ক্রমাগত নবায়িত করছেন। আধুনিকতায় আত্মস্থ হচ্ছেন—নটীর পূজায় (১৯২৬) মতাদর্শের স্বাধীনতার আদর্শ, রক্তকরবীর (১৯২৬) শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই জীবনের যা কিছু মৃত্যুহীন প্রাণময় সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করলেন, ১৯৩০-এ মহুয়ার মতো আধুনিক প্রেমের কাব্য, এর পরে রাশিয়ার চিঠিতে (১৯৩১) বিপ্লবোত্তর স্তালিন-রাশিয়ার কর্মকাণ্ডের

যে পরিচয় তিনি রাখলেন, তাতে কবি যে শুধু শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, মানবতার প্রতি মহৎ শিল্পী দায়বদ্ধ,—এ সত্য প্রত্যক্ষ হল ; এর পরে পুনশ্চ (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ—যেখানে কাব্য লিখলেন গদ্যে, ছন্দ গেল বাদ, প্রচলিত কাব্যিক শব্দাবলী বাদ দিলেন, চলিত ভাষা ব্যবহার করলেন, "কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করার চেষ্টা করেছি। যেমন, তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।" (ভূমিকা : পুনশ্চ) শুধু তাই নয়, কবিতায় অচলিত ছিল, এমন বহু শব্দও এ-কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম প্রকাশিত হল ১৯৩৩-এ। ওই বছরেই 'চণ্ডালিকা'য় অস্পৃশ্যতা-জাতিভেদের বিরোধিতা করে মানুষের অবিচ্ছিন্ন মানব-রূপকে তুলে ধরলেন। প্রকাশিত হল তাসের দেশ (১৯৩৩),—স্বৈরতন্ত্রের নিষ্প্রাণ শৃঙ্খলার ছবি ফুটে উঠলো। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত হল 'চার অধ্যায়' ; সমকালের রাজনীতির প্রতিটি ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার প্রমাণ এ-গ্রন্থ, বিতর্ক সত্ত্বেও। ১৯৩৫-৩৭ এ যথাক্রমে 'শেষ সপ্তক' 'চিত্রাঙ্গদা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র গদ্য কাব্য। রক্তকরবী কবির ছেষট্টি বছর ও পুনশ্চ বাহাত্তর বছর বয়সের রচনা। একই সময়কালে সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫) ও ক্রন্দসী (১৯৩৭) প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষের পক্ষাবলম্বন যদি প্রগতিশীলতার মানদণ্ড হয়, রাশিয়া ভ্রমণের আগেই 'রক্তকরবী' রচনায় রবীন্দ্রনাথই বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীলতার পথিকৃত। চণ্ডালিকার বক্তব্যে স্বীয় দেশকাল ও সর্বদেশকালের মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠা। কাব্য প্রকরণের ক্ষেত্রে পুনশ্চ থেকে পত্রপুট শ্যামলী পর্যন্ত যে ভাষা-ছন্দ ব্যবহৃত, তাই পরবর্তী আধুনিক কবিরা ধীরে ধীরে আত্মস্থ করেন।

সে কারণে উর্বশী ও আর্টেমিসে ও চোরাবালিতে বিশ্ব-ঐতিহ্যকে সচেতনভাবে কাব্য পরিমণ্ডলে আনার প্রয়াস ও লিরিকে স্বকীয়তা ছাড়া বক্তব্যে কাব্য-প্রকরণে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে কোথাও অতিক্রম করেন নি। যা উল্লেখযোগ্য, তা হল তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অন্যতমে পরিণত হন নি।

পূর্বলেখ (১৯৩৭-৪১) কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণু দে-র স্বনির্ভর পরিণতি লক্ষ্য করা যাবে। এর আগে একদিকে রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চতা ও এলিয়টের finally leaves us where we were এর খিলভূমির মধ্যে দিয়ে ক্ষুরের ধারায় চলে তিনি নিজের পথ তৈরী করে নেন। এই পর্বে এসেই রোমান্টিকতার পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, পদধ্বনি কবিতায় অর্জুন-সুভদ্রার প্রেমের মিথের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা, "চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার

/ চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি অবসর।" 'বিভীষণের গান' '১৯৩৭' বা 'জন্মাষ্টমী' এ-ধারারই উদাহরণ। জন্মাষ্টমীতে "লেনিনের চিঠি পড়েছো, রিমার্ক—/ এব্‌ল্‌ ইন—/ টারেস্টিং।" বা "অলকা, আমার দিন রজনীর স্বপ্নভাসে/নিদ্রাহীন পাঁচ বছর, স্ট্যালিনের মতো" ইত্যাদি পঙক্তি যখন বিষ্ণু দে রচনা করেছেন, তখন তিনি ক্রমাগত এলিয়টের কাব্যজগত থেকে সরে আসছেন। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে এলিয়টের যে বোধ

There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From the doors of mud cracked houses

* * * *

Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountain
Cracks and reforms and bursts in the violet air

(Collected Poems P. 76-77)

এবং এই সব পংক্তির কাব্যিক অস্পষ্টতা না রেখেই Waste Land এর টীকায় এর ব্যাখ্যা লেখেন, "the present decay of eastern Europe"

এলিয়টের কাছে রুশ বিপ্লব এক নতুন বর্বরতার যুগ, যা সভ্যতা বলতে যা কিছু বোঝায়, তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। বিষ্ণু দে-র চেতনায় রুশ বিপ্লবের রূপ ভিন্ন, তিনি এলিয়টের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন নি। তিনি রুশ বিপ্লবকে মানব জাতির প্রগতির পদক্ষেপ বলেই মনে করেছেন এবং এলিয়টের থেকে এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হয়ে গেছেন।

এই পর্ব থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের সমালোচনা অতি-ক্রম করে, মানব সমাজের রূপান্তর ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা বিষ্ণু দের কাব্যে প্রকাশ পেল। তার পটভূমি হিসাবে স্পেনের যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি, জনজীবনে অনিশ্চয়তা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, বেকারত্ব, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রুশ সাফল্য ইত্যাদি তথ্য মনে রাখা যেতে পারে। পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সাতভাই চম্পা' (১৯৪১-৪৪) এবং সন্দ্বীপের চর (১৯৪৪-৪৭)—এই কাব্য দুটিতে এসেছে দেশীয় রূপকথা, সাঁওতাল ছত্তিশগড়ী ওঁরাও কবিতার অনুবাদ। রীতির দিক থেকে এই গ্রন্থদুটি 'পূর্বলেখ' কাব্যের রীতির অনুবর্তন। নতুনত্ব বিষয়কে সহজভাবে, সহজ ভাষায় প্রকাশ করায় এবং স্বদেশের প্রতি আকর্ষণও এই পর্বের কবিতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমার মাটি সোনালি সমতলে
ফিরেছি গাঁয়ে চষি আপন মাটি
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাটি।

(সাতভাইচম্পা : এক পৌষের শীত)

অন্বিষ্ট কাব্যগ্রন্থ (১৯৪৭-৪৯) রচনাকালেই বিষ্ণু দে-র কাব্যভাবনার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই সময় বিষ্ণু দে-র চেতনায় আন্তর্জাতিকতার রূপটি ভিন্ন মাত্রা পেল। ইংরেজীতে কসমোপলিটান বলতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নাগরিকতা, বিশ্বনাগরিকতা, সে নাগরিকতা 'পূর্বলেখে'র আগে পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাবে। পূর্বলেখেই অবশ্য ইংরেজীতে যাকে ইন্‌টারন্যাশানালিজম বলে, সেই আন্তর্জাতিকতার সূচনা। বাঙলায় প্রতিশব্দের অভাবে দু'টি ধারণাকেই আমরা প্রায়শ আন্তর্জাতিকতা বলে থাকি, কিন্তু কসমোপলিটানিজম ও ইন্‌টারন্যাশানালিজম—আপাতসাদৃশ্য সত্ত্বেও গুণগত-ভাবে ভিন্ন, তা অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণুদে-র তুলনামূলক বিচারেই ধরা পড়বে। (শব্দ দু'টিকে যথাক্রমে বিশ্বনাগরিকতা ও আন্তর্জাতিকতা শব্দে অনুবাদ করা চলে।)

অন্বিষ্ট প্রকাশিত হল ১৯৫০ সালে। কিন্তু, অন্বিষ্ট নামাঙ্কিত কবিতাটি সাহিত্য পত্রের ১৩৫৬ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সঙ্গে এই প্রথম প্রকাশের একটি পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। কবিতাটি শুরুর আগে ছিল দুটি উদ্ধৃতি এবং সেই উদ্ধৃতিদুটির উপসংহারে অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই "আমারও অন্বিষ্ট তাই"—বিষ্ণু দে-র কাব্য অন্বেষণ। উদ্ধৃতি দুটির একটি Wordsworth এর The Prelude কাব্যগ্রন্থ থেকে, অন্যটি মার্কস থেকে :

An auxilia r light
Came from my mind, which on the setting sun
Bestowed new splender...
Extrinsic differences, the outward marks
Whereby society has parted man
From men, neglect the universal heart.

The Prelude

অন্যটি :

Hence man also creates according to the laws of beauty. —**Marx-Engels** Gesamatausgabe.

অনেক পরবর্তীকালে এলিয়ট প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে যে "modern world of alienated individual"[১৫]-এর কথা বলেছেন, সেই বিচ্ছিন্নতার কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ উদ্ধৃত কাব্যাংশে বলেছেন, এবং বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্যে প্রকৃতির মধ্যে, সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্যতার মধ্যে আত্মমগ্ন হতে চেয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ উপলব্ধি করেছিলেন যে বিশ্বজনীন হৃদয়টিকে অবহেলার ফলেই মানব (men) থেকে মানুষ (man) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মার্কস-এর উদ্ধৃতির উৎসের সঙ্গে কি সম্পর্ক ? সম্পর্ক এই যে, মার্কসের বক্তব্যটি Economic-philosophic Manuscirpt of 1844 নামে প্রকাশিত রচনা থেকে নেওয়া—এই গ্রন্থেই মার্কস তাঁর দার্শনিক-অর্থনৈতিক ভাবনার ভিত্তিভূমি তৈরী করেছেন এবং এখানেই তিনি তাঁর বিতর্কিত alienation বা বিচ্ছিন্নতাবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি বললেন অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মানুষ এমন এক প্রজাতি যে প্রজাতি জগতকে তৈরী করে নিতে গিয়ে নিজেকে সচেতন প্রজাতি বলে প্রমাণ করে, আপন সারসত্তার প্রতি যে আচরণ করে, প্রজাতির প্রতিও তেমনই আচরণ করে। জীবজন্তু উৎপাদন করে আশু প্রয়োজন মেটায়,—নিজের এবং শাবকদের প্রয়োজন। তা একদেশদর্শী, মানুষ আশু, দৈহিক প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবিক স্বাধীনভাবে উৎপাদন করে, প্রজাতির সঙ্গে সমগ্র প্রকৃতিকে পুনরুৎপাদিত করে। মৌমাছির বাসা তৈরীর সূক্ষ্ম কৌশল ও চমৎকারিত্ব অনেক স্থপতিকেও লজ্জা দিতে পারে, কিন্তু সে প্রকৃতির অন্ধ নিয়মে যুগ যুগ ধরে একই কাজ অচেতনভাবে করে চলেছে। মানুষ কিছু করার আগে তার চেতনায় সেটা রূপ পায় এবং তার পরে বাস্তবে তৈরী করে। "জীবজন্তুর উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে তাদের দৈহিক সত্তারই অন্তর্গত, কিন্তু মানুষ স্বাধীনভাবে তার উৎপন্নের সম্মুখীন হয়। জীবজন্তু যে প্রজাতির অন্তর্গত, তাদের প্রয়োজন ও মান অনুসারে সৃজন করে, কিন্তু প্রত্যেক প্রজাতির মান অনুসারে কিভাবে তৈরী করতে হয়, মানুষ তা জানে এবং এও জানে যে কিভাবে ঐ অন্তর্নিহিত মান সর্বত্র বস্তুতে প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং মানুষ সৌন্দর্যের নিয়ম অনুসারেও বস্তুর রূপ দেয়।"[১৮] সুতরাং (hence বা therefore) এই অব্যয় পদ দ্বারা ওয়ার্ডসওয়ার্থের উদ্ধৃতির সঙ্গে মার্কসের উদ্ধৃতিকে বিষ্ণু দে চেতনায় একত্রে গ্রথিত করেছেন। এর মার্কসবাদী তাৎপর্য কি তা আমরা অন্যত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি।[১৯] কিন্তু, এই প্রচেষ্টায় বিষ্ণু দে রোমান্টিক আন্দোলনের একটা দিককে স্বীকার করে নিলেন যে, রোমান্টিকতাও মানুষের বিচ্ছিন্নতার চেতনাকে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং শ্রেণী-সংগ্রামে নয়, মানব প্রজাতির সমগ্রতার জন্যে প্রজাতিগত বিশ্বজনীনতায় কবি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেই বিচ্ছিন্নতা বা alienation-কে অতিক্রম করতে পারেন। বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৭ সালে দেশ

বিভাগ বাঙালী চৈতন্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের তত্ত্বকে যেন প্রকট, বাস্তবায়িত করে তুলেছিল। এবং এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শিল্পীর করণীয় বলে যা মনে করলেন, তা রাজনীতি বা সমাজসেবা বা উদ্বাস্তু মানুষের জন্যে লঙ্গরখানা চালানো নয়, হতাশাগ্রস্ত বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে প্রজাতির সমগ্রতাকে বোঝানোর জন্যে "আমারও অম্বিষ্ট তাই" এবং সে অন্বেষায় "সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক সুরে সুরে / বাঁচার বিস্ময় ছড়াক রঙের ঝর্ণা।" ১৯৪৭-৪৯-এর দ্বিখণ্ডিত বাঙলায় কবি এভাবেই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে বাস্তবের মায়ালোক (illusion of the reality) সৃষ্টি করে নিয়েছেন। বাস্তবের আঘাতের বিরুদ্ধে এ এক ধরণের প্রতিরোধ এবং একই সঙ্গে নিজের চারিপাশে এক অবরোধও সৃষ্টি করা। এই প্রতিরোধ ও অবরোধের টানাপোড়েনেই বিষ্ণু দে-র কাব্য-আঙ্গিক সম্পর্কে অতিসচেতনতার জন্ম, "টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে"[২০]

একদিকে টেকনিক বা আঙ্গিক, অন্যদিকে এলিয়ট থেকে প্রাপ্ত কসমোপলিটান ঐতিহ্যের উত্তরণে মার্কসবাদী ইন্টারন্যাশানাল ঐতিহ্যের সমন্বয়ে বিষ্ণু দে-র পরবর্তী কাব্য গ্রন্থগুলির বক্তব্য আঙ্গিক ও নিজস্ব কবিভাষা তৈরী হয়েছে। এলিয়টের মতো সমগ্র রোমান্টিক আন্দোলনকে নির্বিচারে ত্যাগ না করায় বিষ্ণু দে-র কাব্যের নানা পুরাণ প্রতিমা, উল্লেখ ইত্যাদি থাকলেও, অধিকাংশ কবিতায় লিরিকধর্মিতা থেকে যায়। এবং সংক্ষিপ্ত প্রেমের কবিতাগুলি কবির অত্যন্ত উৎকৃষ্ট লিরিক হিসেবে কোন সময়েই পাঠকের রসগ্রহণের বাধা হয় না। প্রেমকে উপজীব্য করেই সেখানে বিষ্ণু দে মানবিক বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক কাব্য ঐতিহ্যের কবি হয়ে ওঠেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ :

(১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'চোরাবালি', পৃঃ ২৯৯ যাদবপুর বিশ্বঃ ১৯৭৩।

(২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, স্বগত, ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট, পৃঃ ১৫০, সিগনেট, ১৯৫৭।

(৩) সুধীন্দ্রনাথ : প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃঃ ৩০০।

(৪) বিষ্ণু দে, সাহিত্যপত্র, শারদীয়া, ১৩৫৫, 'টি. এস. এলিঅট', পৃঃ ১২৯।

(৫) বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, 'রাজায় রাজায়' পৃঃ ৬৩, সিগনেট, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, নিউ এজ, পৃঃ ১১৪-১১৫।

(৬) বিষ্ণু দে In the sun and the Rain, P.P.H. পৃঃ ১৮৮।

(৭) A.L. Morton, The Matter of Britain, Lawrence & Wishart, পৃঃ ১৫৫।

(৮) Marx-Engels, On Art and Literature, Progress Pub, পৃ: ৮৯-৯২
(৯) The Sacred Wood, T. S. Eliot, 1969, P-49
(১০) বিষ্ণু দে, In the sun and the Rain, পৃ: ১৬৭।
(১১) ঐ, পৃ: ১৭৬-১৭৮।
(১২) Sumit Sarkar, Modern India, MacMillan, 1984, পৃ: ২৪৭—২৪৮।
(১৩) Alick West, Crisis and Critrcism, Lawrence & Wishart, 1975, পৃ: ৩৫।
(১৪) A.L. Morton, The Matter of Britain, পৃ: ১৬২।
(১৫) T.S. Eliot. Selected Prose, Penguin, পৃ: ২৪৪।
(১৬) এলিয়টের বক্তব্য :

About certain very serious fact^ no one can dissent. The present system does not work properly, and more and more people are inclined to believe that it never did and that it never will ; and it is obviously neither scientific nor religious. It is imprefectly adapted to every purpose except that of making money ; and even for money-making it does not work very well, for its rewards are neither conducive to social justice not even proportioned to intellectual activity .. Secondly, no one, who is seriously concerned can fail to be impressed by the work of Karl Marx. He is of course, much more cited than read ; but his power is so great, and his analysis so profound, that it must be very difficult for any one who reads him without prejudice on the one hand, on the other, to avoid accepting his conclusions The Critarion, April, 1932, Quoted by Morton.

(১৭) T.S. Eliot, On Poetry and Poets, Faber, P 257
(১৮) Karl Mark, Economic-Philosophic Manuscript of 1844, FLPH, Moscow, 1961, 2nd Edition P-76
(১৯) সুজিৎ ঘোষ, 'বিষ্ণু দে : 'উক্তি ও উপলব্ধি', রূপান্তরের পথে, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৯৮৫।
(২০) বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃ: ১০।

মালতী ঘোষ।

বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতা

বিষ্ণু দে-র কবিতায় অতীত কাল থেকে সমকালের পৃথিবী, তার শ্রেণী বিভক্ত মানব সমাজ, শোষণ-অত্যাচার বঞ্চনা এবং শোষিত শ্রমজীবি মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ স্থান পেয়েছে। এরই সঙ্গে স্থান পেয়েছে মানুষের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি—চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, প্রভৃতি এবং মহাকাব্য, রূপকথা, লোককথা, নাটক এবং বর্ত-মানের সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজের বিশিষ্ট চরিত্র সমূহ।

তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

এই কাল সচেতন, ঐতিহ্য সচেতন, শ্রেণী সচেতন আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন কবির সব চেতনতার মূলে আছে প্রেম সচেতনতা। তাই প্রেমকে বিষ্ণু দে কখনো দেশ-কাল-সমাজ-সংগ্রাম-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখান নি তাঁর কবিতায়।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতা রচনার প্রথম দিকে এলিয়টের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ এলিয়ট তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কবিতায় অবক্ষয়ী ধনতান্ত্রিক যুগের অন্তঃসার শূন্য চেহারাকে আবেগহীন অননুকরণীয় ভাষায় চিত্রিত করেছেন। এছাড়া কবিতায় আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যের অনুসরণ করে নূতনকে গ্রহণ এবং কবিতা ও মুখের কথার দূরত্ব ঘোচাবার চেষ্টা এই সবগুলিই বিষ্ণু দেকে আকৃষ্ট করে।

তাই বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের মত এই অন্তঃসারশূন্য যুগের অন্তঃসারশূন্য মানুষের দেহ-ভোগ আকাঙ্ক্ষাকে প্রেম বলে চালিয়ে দেবার হাস্যকর প্রচেষ্টাকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর প্রথম দিকের প্রেমের কবিতায়—

"এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস পেগ।"

এলিয়ট যেমন আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগকে "বন্ধ্যাভূমি" মনে করেছিলেন বিষ্ণু দে তেমনি মনে করেছেন 'চোরাবালি'। তাই তাঁর মনে হয়েছে—"এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া"। এ যুগে প্রেমও হয়না বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল—

"আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাইতো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
এরি নাম প্রেম। (মন-দেওয়া-নেওয়া)

এলিয়টের মতো ফ্রয়েডও আধুনিক বাঙালী কবিদের প্রভাবিত করেছিলেন। বিষ্ণু দে-র প্রথম দিকের প্রেমের কবিতাতেও সেই প্রভাব—

"আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?
(টপ্পা-ঠুংরি)

পাভলভের কন্‌ডিশনড্ রিফ্লেক্সের তত্ত্বও বিষ্ণু দে-কে আকৃষ্ট করে। নাগরিক প্রেমকেও তাঁর মনে হয় শুধুই কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স—

"অভ্যাস, শুধু অভ্যাস লিলি, তাইতো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাইতো বাসি ;"
(গার্হস্থ্যাশ্রমঃ কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স)
আবার—"মুখোস পেয়েতো তবে পাশাপাশি মিলি,
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি।"
(গার্হস্থ্যাশ্রমঃ আত্মজ্ঞান)

এই ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে কেউই একনিষ্ঠ প্রেম করে না—"অলকা, বলোতো।

আমাকে বলতে কিছু ভয় পেয়ো নাকো ; একাধিক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ-কানে ; তা ছাড়া প্রেমের ফুলও বিবেচনা মতো তুলি আমি। (গার্হস্থ্যাশ্রমঃ পূর্বরঙ্গ)

আর এই প্রেম একান্তই শরীরী প্রেম—

"একেলা আমি অন্ধকারে বারান্দার কোণে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে"
(গার্হস্থ্যাশ্রমঃ তামাদি)

এই বন্ধ্যা যুগের ভালোবাসাও যেহেতু বন্ধ্যা ও শরীর সর্বস্ব, তাই একদা যাকে অন্ধকার বারান্দার কোণে নায়ক ভালোবেসেছিল তাকে আজ অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে দেখলে তার মনে কোন ঈর্ষা বা বেদনাবোধ জাগ্রত হয় না—তার কাছেও প্রেম করার থেকে কেরিয়ার করাটা বেশী প্রয়োজনীয় মনে হয়। তাই রয়ে বসে ভালো-বেসে সময় নষ্ট করতে সে নিজেও রাজী নয়—

"তোমাকে দেখি প্রিয়ের সাথে মধুব আলাপনে
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে ;
জীবন চলেছিলো যখন সফলতার রথে ;
দেখেছিলাম তোমাকে ভিড়ে দ্রুত জীবন-পথে,
কাজের মাঝে ফিরিয়েছি কি হৃদয়ামন্ত্রণে—
বেসেছিলাম তোমাকে ভালো, পড়ছে আজ মনে।'
(গার্হস্থ্যাশ্রমঃ তামাদি)

এই অবক্ষয়ের যুগের নাগরের প্রেম করার দৃশ্য—

"সুঠাম সুশ্রী মেদ সুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি
গলিতে ছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে
নাগরিকা মোর করুণ-কোমল"
(বজ্রপাণি)

এই চোরাবালির যুগে এই নাগরালি প্রেম কবি জীবনে আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি তাই নাগরিকা প্রেমাকাঙ্ক্ষিনীকে বলেন—

"আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই—লবণাক্ত জলে
আমার হৃদয় ভাসে—
সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে।
তুমি যে এসেছ আজ পরিশ্রান্ত, যৌবনে কাতর
সৌখীন শিল্পীর গড়া, ক্ষীণকণ্ঠ, পেলব শরীর—

প্রেম আজ ঘরছাড়া, জনহীন বালুকার কূলে
এ হৃদয় অন্যমনা, পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর।"
(সমুদ্র)

এই চোরাবালির বন্ধ্যাভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি নিঃসঙ্গ বোধ করেন। তাঁর একদিকে চোরাবালির নির্জন বন্ধ্যাভূমি, অন্যদিকে সমুদ্রের বলিষ্ঠ প্রকাশ—দুয়ের মাঝখানে কবি অন্যমনা। অথচ তাঁর হৃদয় সাগরের পিয়াসী। অর্থাৎ শ্রমজীবি সংঘবদ্ধ বলিষ্ঠ সাগরের মতো মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ রচনা করতে তিনি চান, কিন্তু ন্যগরিক মধ্যবিত্তের মানসিকতা তাঁকে দ্বিধান্বিত করছে। অথচ সুস্থ সমাজে সুস্থ প্রেমই তাঁর অন্বিষ্ট। কবি তাই ভাবেন—

'কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্র মন্থনে
রূপ নেবে এক নারী
মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি?
(খোঁয়ারি)

অবশেষে কবির সোনালি লগ্নে দেখা হয়ে গেল সেই নারীর সাথে যাকে হৃদয় দেওয়া যায়।

'হৃদয় প্রিয়া দিয়েছি দুই হাতে,
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী,
তোমাকে আমি আপন বলে চিনি,
তোমাতে প্রাণ ঘূর্ণী স্রোতে মাতে।'
(চতুরঙ্গ)

কবির প্রাণ চায় প্রিয়াকে প্রাত্যহিক জীবনে একান্ত করে পেতে—

'কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে (অন্বিষ্ট)'

কবির সমস্ত সত্তা এই শুচিস্মিতা প্রিয়ার আশ্রয় প্রত্যাশী—

'তোমার মনের শুভ্র শিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ।
এ নিরালম্ব জনতাসাগরে চুকেছে ভাসা
রুদ্ধ শ্বাস।' (সপ্তপদী)

কবি আজ উপলব্ধি করেছেন যে মনের মতো নারীর হৃদয়ের আশ্রয় ছাড়া পুরুষের

জীবন শান্তি স্বস্তি ও পূর্ণতা পায় না—প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষ কখনই স্বয়ম্ভর হতে পারে না। কবি তাই বলেন—

ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হল আপন
ভাটায় ঢিমা।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড় আকাশ
জেনেছে মন
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস
তাই আপন।' (সপ্তপদী)

প্রিয়াই কবির জীবনে জায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কবি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। প্রিয়া জায়ার প্রাত্যহিক প্রেমলাভে ধন্য হৃদয় প্রিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে—

'তোমার দাক্ষিণ্যভারে,
হৃদয় আমার
বার বার হয়েছে প্রণত,
হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায় (পদধ্বনি)

প্রিয়া-দয়িতা যদি কখনো 'আর কারে ভালোবাসে' তবুও কবির হৃদয় এই প্রিয়ার প্রতি প্রেমেই চিরকাল উদ্দীপিত থাকবে—

'তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,
হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক ক্যাথিড্রাল্। (সপ্তপদী)

বাস্তবকে এড়িয়ে প্রিয়াকে নিয়ে দূর নির্জনে রোমান্টিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কবি করেন না; আবার মধ্যবিত্তের নিস্তরঙ্গ সংসার-যাত্রাও তিনি চান না—প্রিয়ার সাহায্যেই গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হতে তিনি আগ্রহী—

'চাই না সংসারে বন্দী আপাত পয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে (অশোক সেনকে)

ধনতান্ত্রিক অবক্ষয়ের যুগে, সাম্রাজ্যবাদের সংকট কালে বাজার দখলের জন্য তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। তার দ্বারা আক্রান্ত জনগণের বিপর্যস্ত অবস্থা। এর মধ্যেই তিনি প্রিয়াকে নিয়ে 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর'—এমন ভাবে সংসার করতে চান—

—'আজকে যেখানে জীবন মরণে বাঁধে সেতু
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তারা চক্রচর,
শিবির কিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু।
মরণের তীরে জীবনোল্লাস অগ্রসর!
জনসঙ্ঘাতে খেচর আঘাতে যবনিকায়
ক্ষান্তিই মানে প্রেমের প্রবল প্রাকৃত গান
তবু জানি তুমি চিরায়ুষ্মতা! প্রাণশিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জ্বালাও আমার প্রাণ।
প্রেয়সী, যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন,
প্রাণের নীলিম দীপ্তি নয়নে, মন্দ্র স্বর;
তোমার মধুরে নীড় উভয়ত ছন্দলীন।
বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে;
ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে॥

(সংসার)

মার্কসীয় সাম্যবাদের সঙ্গে কবির পরিচয় প্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের আগে, এবং এই মতবাদের প্রতি একটা সমর্থনও তাঁর ছিল। কিন্তু প্রিয়ার প্রতি ভালবাসাই তাঁকে বিশ্বের শোষিত মানব-সমাজের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রিয়ার মধ্যেই তিনি নূতন বলিষ্ঠ সমাজের আভাস পান, তাই প্রিয়াকে নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের অজেয় শক্তির শরিক হবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চান—

অন্তিমের তৃষিত পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।
তোমাকে তাইতো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ। (অশোক সেনকে)

তাঁর প্রিয়া তো শুধু জায়া নয়, কবির জীবনে তিনি নারীর বিভিন্ন রূপের

এক সামগ্রিক রসময়ী সত্তা (যা অনেকটা বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের মতো) এবং তিনিই আবার প্রাকৃত গতি—

তুমি সখী বধূমাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি। (এলসিনোরে)

'কালের মালিনী ! তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক আগামীর সন্ধানী—(পঞ্চবটী)

কবির মনে হয় তাঁর ও প্রিয়ার পরিপূর্ণ মিলনে প্রেম যে তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে তৃতীয় পক্ষের মতো বাধা সৃষ্টি করে তা কবির কাছে অসহ্য—

'প্রেমের স্বতন্ত্র সত্তা, কে জানত যে এমন যন্ত্রণা ! এ-যন্ত্রণা কতকাল হবে বলো, প্রেয়সী, সইতে ?

* * * * *

মিলাও প্রেমকে প্রিয়া তোমার আমার এক দ্বৈতে,
কঙ্কণ ঝঙ্কারে তাকে বশে আনো ঘনিষ্ঠ ধমকে।"

(প্রেমকে তৃতীয়কে)

প্রিয়া যখন কবির জীবনে ছিলেন না, তখন তিনি যেন 'শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর'-এর মতো ছিলেন। প্রিয়া এসে সেই পাথরে তাঁর শকাব্দে শিলালিপি লিখে শূন্য পাথরের মতো কবির হৃদয়কে ভরিয়ে দিলেন। সেই প্রিয়া যদি অভিমান করে দূরে চলে যেতে চান, কবি তাঁকে বলেন, তবে যাবার আগে প্রিয়া যেন সমস্ত শিলালিপি মুছে দিয়ে কবিকে যেন আগের না লেখা পাথরের মতো ফেলে রেখে যান। কবি জানেন যে তা অসম্ভব। তিনি তাই প্রিয়াকে বলেন—

'কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড়।'

(সনেট)

প্রিয়ার মধ্যেই আছে কবির বেঁচে থাকার সার্থকতা—

'তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

(জল দাও)

'চিরসুন্দরের দূতী' প্রিয়ারও সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছেন কবি—কবির হৃদয়েই বেঁচে আছেন প্রিয়া, প্রিয়ার হৃদয়ের মৃদঙ্গ মন্দিরায় তাঁর অজ্ঞাতে কবিরই আকৃতি তাই অবিরাম বেজে চলে। প্রিয়াকে কবি তাই সচেতন করে বলেন—

'তুমি তো জানো না। তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে
আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে'

(আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে)

কবির কাছে ক্রমশঃ প্রিয়াই বিশ্ব, প্রিয়াই প্রকৃতি, প্রিয়াই চন্দ্র-সূর্য, মানুষের সংগ্রামী ভবিষ্যৎ, প্রিয়াই জীবন আর শাশ্বত চৈতন্য-বিশ্বতে পরিণত—

'আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী রাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।'

(দামিনী)

আবার,—

'তুমি শাশ্বতী বরাঙ্গ প্রাণে ভাস্কর
পবমান তুমি পূর্ণিমা দেহী মর্ত্যে,
জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় তুমি কোজাগর,
তোমার রাত্রে তীর্থযাত্রী করেছ সূর্যাবর্তে,'

(উজ্জীবনের স্বপ্ন সদ্য চক্ষে)

কবির এই প্রেমের আকৃতি প্রিয়া বুঝি শুধু দেহ-সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষাই ভাবছেন! কবি তাই পরিপূর্ণ প্রেমে যে দেহ ও মন দুইই সমান সত্য—এই মহাসত্য প্রিয়াকে বোঝাতে চান—

'কেন তুমি ভাবো, এ-আকৃতি শুধু যৌন?
অংশত তাই, আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য।
কেন তুমি খোঁজো কোনটা মুখ্য গৌণ?
তা কি খুঁজে পাবে? প্রেম জেনো অবিভক্ত।
চৈতন্যের বিশ্বেই বাঁচে প্রণয়,
যেন সহজিয়া গান আমাদের দোতারায়।
তাইতো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
গান হয়ে ওঠে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, হে চিরপ্রৌঢ়া তন্বী !
তাই আদিকাল থেকে আছি অনুরক্ত।
তুমিই বাহুতে দেহে দেহাতীত বহ্নি
তুমি সত্তায় স্বর্গে পূর্ণ সত্য ॥' ('কেন তুমি ভাবো')

প্রেমতত্ত্ব বোঝাতে কবি প্রেমে শরীরের অপরিহার্যতা বোঝাতে চান—

'প্রেমেরই জানা যুগলে বাঁধা মন,
আমরা শুধু চিনতে পারি শরীর।
মন দিয়ে কে করে আলিঙ্গন ?
অতনু কবে ছবি আঁকল রতির ?
হে প্রেম ! বলো মনের কথাটাই
বলো হে এর হৃদয়ে ওর কানে

প্রেমেরই জানা স্নায়ুর কাঁটাবনে
কোথায় কে যে চিরঝুলন বাঁধে।
আমরা বৃথা শমীশাখায় খাটাই
শরীর-মন মরণসন্ধানে,
কারণ প্রেমে জীবন পায়ে সাধে
মৃত্যুকেই, দেহকে সাধে মনে ॥' ('দেহকে সাধে মনে')

বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই তা হল :

১. বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতার নায়িকা স্বকীয়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' থেকে বাংলা কাব্যে যে পরকীয়া প্রেমের যাত্রা আরম্ভ হয়ে আধুনিক কালেও বয়ে চলেছে, বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতা স্বকীয়া প্রেমে তার মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই নায়িকা শুধু স্বকীয়া প্রেমিকা নন, তিনি বিবাহিতা, দয়িতা। কবি দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে প্রেমকে শতরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন।

২. মার্কসীয় দর্শন কবিকে স্বকীয়া প্রেমে আকৃষ্ট করেনি-বরং স্বকীয়ার প্রতি অবিচল প্রেমই কবিকে মার্কসবাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট করেছে। কারণ কবির অন্বিষ্ট সুস্থ সমাজে স্বকীয়া প্রেম, যা একমাত্র সমাজ-পরিবর্তনের ফলেই কবি এবং অন্যান্য সুস্থতার সন্ধানী মানুষেরা পেতে পারবেন। (ব্যক্তিগত জীবনে কবি তাঁর স্বকীয়া প্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এবং বিবাহ হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে।

কবি মার্কসবাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হতে থাকেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।) কবি ক্রমশঃ উপলব্ধি করেছেন বর্তমানের শোষণ, যান্ত্রিকতা, শ্রেণী-বৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-বেকারী ও ব্যক্তি-জীবনের হতাশা-ক্লান্তি-কুশ্রুত একাকিত্ব-বিকৃতি-প্রেমহীনতা ও অবৈধ প্রেম থেকে মার্কসবাদই পারে ব্যক্তিকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই জগতে উত্তীর্ণ করতে যেখানে ব্যক্তি তার প্রেমকে, ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিকশিত করতে পারবে নারী-পুরুষের মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণ-হীন মুক্ত-সমাজের প্রতিষ্ঠায়। কবি তাই তাঁর মর্ম সখীকে কর্ম সখী করে শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের লড়াই-এর সাথী হতে চেয়েছেন।

৩. বড়ু চণ্ডীদাস থেকে বাংলা প্রেমের কবিতায় বিরহ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। রবীন্দ্র-কবিতায় বিরহ প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পর্যায় হিসেবে গৃহীত। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের এবং সাম্প্রতিক কবিদের কবিতাতেও বিরহই সার্থক প্রেমের কবিতার উদ্দীপন বিভাব। বিষ্ণু দে এককভাবে এই ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রচুর সার্থক প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাছে প্রেমের পরিপূর্ণ-তার জন্য বিরহ অপ্রয়োজনীয় এবং প্রেমের ক্ষেত্রে কোন সময়ই বিরহের প্রয়োজন নেই। বাংলা প্রেমের কবিতার ধারা থেকে বিষ্ণু দে-র এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর নায়িকা স্বকীয়া বলেই। কারণ পরকীয়ার সঙ্গে প্রেম বিরহকেই ডেকে আনে।

৪. প্রেমের কবিতায় বিষ্ণু দে একটি নতুন সুর এনেছেন—কৃতজ্ঞতার সুর। আমরা এতোকাল কবিদের কাছে যেমন শুনেছি প্রিয়া বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে গেলে প্রেম চলে যায় তেমনি শুনেছি প্রেমের সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা এলে প্রেম থাকে না। কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর প্রেমের কবিতায় এই দুই মতেরই বিরোধিতা করে বিবাহিতা স্বকীয়া প্রিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ-তায় বার বার তাঁর প্রণত হৃদয়ের কথা জানিয়েছেন। কারণ প্রেমের গভীরতার ফলেই এসেছে প্রিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

৫. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' প্রেমের দেহ-প্রাধান্য দেখি, কারণ জয়দেব প্রেমের একটি খণ্ডিত চিত্র এঁকেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' সেই দেহ-প্রাধান্য দিয়ে আরম্ভ করলেও ক্রমশঃ দেহ থেকে মনে, দেহ-প্রাধান্য থেকে মনের প্রাধান্যে যেতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে এই মনের অতি প্রাধান্য লক্ষ্য করি—পরকীয়া প্রেমে ক্রমশঃ মনের প্রাধান্যই যৌক্তিক-কারণ বিরহ এখানে অবশ্যম্ভাবী। গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিত-লাল প্রেমে আবার দেহ-প্রাধান্য আনলেন—কিন্তু এঁরা পরকীয়া প্রেমের কথা বলেন নি। বিষ্ণু দে তাঁর মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রণালী দিয়ে প্রেমকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় দেহ-মনের এমন সামঞ্জস্য দেখা যায়।

৬. প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা বৈষ্ণব কবিতা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কবিতা পর্যন্ত দেখি আক্ষেপ, হতাশা, সন্দেহ, অতৃপ্তি প্রভৃতি অনেক পর্যায়। এগুলির মধ্য দিয়ে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র প্রেমের কবিতায় এগুলির কোনটিই নেই। অথচ দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিণীতা প্রিয়ার প্রতি প্রেম এতটুকুও শিথিল হয়নি। জীবনানন্দ যেখানে বলেন—'হেমন্ত এসেছে আজ পৃথিবীর বনে। সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে। হেমন্ত এসেছে তবু' বিষ্ণু দে সেখানে বলেন—

'তোমায় বিজয়ী সংগঠনের পাশে
আমার গ্রীষ্ম পাক্ শরতের সংগতি
দুই দিকে আজ আমার শারদ জীবনের প্রান্তর, (ত্রিপদী)

৭. প্রেমে তৃতীয় পক্ষের বিরূপ উপস্থিতি প্রেমিক প্রেমিকার কাছে চিরদিনই অসহ্য—সেই বৈষ্ণব কবিতার কাল থেকেই এটা প্রেমের কবিতায় দেখা যায়—কখনো ব্যক্তি, কখনো সমাজ, কখনো প্রকৃতি এই তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেয়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রেমই তৃতীয় পক্ষ তাঁর প্রেম সম্পর্কে এক নতুন উপলব্ধি পাই, যা এর আগে পরে অন্য কোনও কবিতে পাই না।

৮. বিষ্ণু দে তাঁর প্রেমের কবিতায় যখন আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের নাগরিকা নায়িকাদের কথা বলেছেন তখন তিনি তাদের নাম দিয়েছেন লিলি, অলকা প্রভৃতি; কিন্তু যখন তিনি তাঁর যথার্থ প্রিয়ার (যিনি স্বকীয়া) কথা বলেছেন তখন তিনি নায়িকার নাম দিয়েছেন স্বদেশ-বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসরণে সুভদ্রা; মহাশ্বেতা, ওফেলিয়া প্রভৃতি অথবা কোন নামই দেন নি।

৯. "তোমার শরীরে পাই প্রকৃতির প্রতিটি উপমা / তোমার মনের মধ্যে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস," বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতায় ক্রমশঃ প্রিয়াই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, জল-একাধারে সমগ্র প্রকৃতি জগৎ নিয়ে প্রিয়াই পৃথিবী, আবার পৃথিবীর মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎও প্রিয়া এবং ক্রমশঃ প্রিয়াই কবির সমগ্র সত্তা, প্রিয়াই জীবন হয়ে ওঠেন। যতদিন জীবন আছে, ততদিন প্রেমও বেঁচে আছে কবি আর তাঁর প্রিয়ার মধ্যে। এই চিরায়ু প্রেম যা প্রাত্যহিকে মলিন হয় না, বহু বছরের সান্নিধ্যেও অভ্যাসে পরিণত হয় না—প্রেমানন্দের নব নব প্রকাশে কাব্য সৌন্দর্যের অফুরান ফুল ফুটিয়ে চলে—এই বিস্ময়কর প্রেম বাংলা কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসেই দুর্লভ এবং দুর্লভ এমন প্রেমের কবিতা। বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার পরকীয়াবাদ ও রবীন্দ্র প্রেম-কবিতার রোমান্টিকতা ও বিরহবাদকে বাদ দিয়ে স্বকীয়া নায়িকার প্রতি অবিরহী এই

প্রেম প্রেমের সংজ্ঞা ও তত্ত্ব সম্পর্কে নতুন করে ভাবায়—এইখানেই বিষ্ণু দের প্রেমের কবিতার অনন্যতা।

বিষ্ণু দের প্রেম-চেতনার পরিণতিতে অনেকে আরাগঁ ও এলুয়ারের প্রভাবের কথা বলেন। নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীতে সমধর্মী ও সমমর্মী কবি থাকবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। বিষ্ণু দে'র প্রেম-চেতনার সঙ্গে আরাগঁ-এলুয়ারের প্রেম-চেতনার নৈকট্য ছিল বলেই তাঁদের প্রেমের কবিতা বিষ্ণু দে'কে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতার পরিণত রূপ বিষ্ণু দে'রই নিজস্ব, কারণ বাস্তব জগতে স্বকীয়া প্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ জীবন ধরে পরিণত প্রেমেরই ফসল তাঁর প্রেমের কবিতা।

বিষ্ণু দে'র প্রেমের কবিতাগুলি আস্বাদন করে আমরা কবি বিষ্ণু দে-র যে পরিচয় পাই তা হল এই যে তিনি অপরিণত যৌবন থেকে পরিণত বার্ধক্য পর্যন্তই প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে সার্থক প্রেমের কবিতা লিখতে পারার কারণ, প্রেম তাঁর কবি-চেতনার গভীরে প্রোথিত এমন এক চেতনা যাকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্য সব রকমের চেতনাই আবর্তিত হয়েছে। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থটিতেও একথা সমান সত্য। তাই আমাদের মনে হয় সামগ্রিক বিচারে বিষ্ণু দে'কে 'প্রেমের কবি'—এই অভিধায় ভূষিত করলে তাঁর কবিসত্তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

শুভ্রা শীল

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে

রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে—এই দুই কবির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, বিদগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সুধী ও গুণীবৃন্দ বলেছেন এবং নিশ্চয়ই আরও বলবেন। তারই সঙ্গে আমি তুলে ধরতে চাই—রবীন্দ্রের আটখানি ও বিষ্ণু দে-র দু'খানি চিঠি। এই চিঠিগুলিতে কী আছে! আছে, অ-নে-কে কিছুই।

পারস্পরিক আন্তরিকতার, উষ্ণতার স্পর্শ, যা কেবল খুব বেশি করে ধরা পড়ে চিঠির পৃষ্ঠাতেই—প্রবন্ধে, অভিভাষণে, কিংবা আর কিছুতেই নয়। তাই তো চিঠির গুরুত্ব এতো-খানি। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিষ্ণু দে এবং বিষ্ণু দে-র কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কতখানি তার সম্পূর্ণ পরিচয়টুকু তুলে ধরতে না পারলেও অন্ততঃ তার কিছু আভাস, কিছু ছোঁয়া তো আমরা পেতেই পারি ঐ—চিঠিগুলির মাধ্যমে। পারস্পরিক বিনিময়ে যতগুলি চিঠি ব্যবহৃত হয়েছিল তার সবগুলি পেলে নিশ্চয়ই একটা সম্পূর্ণতার ধারণা গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু যা পাওয়া গেছে তার মূল্যও অপরিসীম।

যখন ১৯৪১-এ পৌছতে রবীন্দ্রনাথের আর বছর চার-পাঁচেকের অপেক্ষা—এসব চিঠির আদান-প্রদানের কালসীমা সেইটিই—১৩৭৫-৪৪ বঙ্গাব্দ। তখন কবি-কণ্ঠে শেষ-রাগিনীর সুর লেগেছে—'আমার আর সময় কোথায়'; বেড়েছে উত্তরসূরীদের প্রতি ভরসাও—'তোমরা কেবল নবযুগের প্রবর্তন করবে না, তাকে সুগমও করবে।'

এই সময়কালে, অসুস্থ, 'অত্যন্ত ব্যস্ত,' 'নীরন্ধ্র অবকাশে' আবৃত বিশ্বকবি-রবীন্দ্রনাথ। তবুও বিষ্ণু দে-র কাব্য ব্যস্ততার ফাঁকে পড়ে ফেলবার বিষয় একেবারেই নয় তাঁর কাছে—যখন পাবেন ছুটি—সে-ই সময়ের জন্যে তুলে রেখে দেন 'চোরাবালি'।* আমরাও

চোরাবালি-১৯৩৮ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)।

পড়েছি চোরাবালি, বিস্মিতও কম হই নি। কিন্তু যখন দেখি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এতো-খানি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে চান সে-ই 'চোরাবালিকে' – মনটা ভরে ওঠে।

অনেকটা ঠিক এমনি করেই, কলিকাতা, ১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের অধিবাসী বিষ্ণু দে-কে কবির লেখা ২৯শে আষাঢ় ১৩৪০-এর চিঠিতে ধরা পড়ে যায় আরও একটি দিক-সাধারণ আধুনিক কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ এবং কবি বিষ্ণু দে-কে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখেছেন!

কেবল 'নতুন পথ' নির্মাণ নয় তা খননেরও যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যবসায় তিনি লক্ষ্য করেছেন বিষ্ণু-দের মধ্যে। আরম্ভের অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়েছেন, 'উঁচোট খেয়েও' বুঝেছেন এ কোদালখানা জোরে চলবে। যা না বুঝেছেন তা নিয়েও এ-সম্ভাবনায়-উজ্জ্বল-কবির বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ নেই—'শেষ বেলাকার পক্ষে তাই যথেষ্ট।' এই চিঠিতে এ-সবের সঙ্গে আমরা আরও একবার রবীন্দ্র-কণ্ঠে সেই শাশ্বত বাণীটি ঘোষিত হতে দেখি—'সৃষ্টিকার্য্যে নতুন কাল এবং পুরানো কাল দুটো কালকেই এড়িয়ে চলতে হয়—চিরকাল বলে আর একটা কাল আছে সেইটের পরেই ভরসা' কারণ 'সাহিত্যের লক্ষ্য আগামী কালেরই জন্যে।' অন্যত্র গদ্যছন্দ-আলোচনা করতে গিয়েও বলেছেন—'এ ক্ষেত্রে ভোট গণনার মূল্য নেই, হয়তো একটিমাত্র ভোটেরই জিৎ হতে পারে। রুচিভেদ সম্বন্ধে কবিমাত্রেরই অবিচলিত সহিষ্ণুতার চর্চ্চা করাই শ্রেয়।'

কিন্তু বিষ্ণু দে-র কাব্যবিচার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ নয়—অনতিবিলম্বে পরবর্তী পত্রে জানিয়েছেন—'বিচার সম্পূর্ণ হয়নি!' তাহলে পূর্বপত্রের মন্তব্যগুলি কি? পূর্বপত্রের মন্তব্যগুলি হল তাই—যা 'একদৃষ্টিতে দেখি তার বেশি আর' নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে বারে বারে পড়বার, নিবিষ্ট মন নিয়ে গভীরতর দৃষ্টিতে পড়ে নেবার বিষয় বিষ্ণু দে-র কাব্য; তাৎক্ষণিকমাত্রায় রেখে ভাবতে পারেন নি 'তাজা মনের লেখা'গুলিকে। তাঁর কাব্য 'কায়দার নূতনত্ব' বা ভঙ্গি দিয়ে মন ভোলাবার জন্যে নয়—সে সব কাব্যের আন্তরিক দীপ্তিতে, ব্যক্তিত্বের প্রভায় অভিভূত হয়েছে রবীন্দ্র-মন ক্ষণে ক্ষণে। কোনক্রমে 'চালিয়ে দেবার' প্রবণতায় বিষ্ণু দে যে বিশ্বাসী হবেন না—এ আশা রবীন্দ্রনাথের—এ ভরসা রবীন্দ্রের বিষ্ণু দে-র প্রতি।

২০ মাঘ ১৩৪৪-এর পত্রখানির প্রথমেই আমাদের কৌতূহল জেগে ওঠে একটু ভুল আন্দাজকে কেন্দ্রে নিয়ে। কি ছিল সেই আন্দাজ! তা আজ আমাদের জানার উপায় প্রায় নেই বললেই চলে—তাহলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কাব্য রচনার প্রসঙ্গ।* আবার এ-সবেরই ফাঁকে ছোট্ট করে কবি

১৩৪৪ অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, প্রান্তিক ইত্যাদি।

জানিয়ে রেখেছেন তাঁর রচনার বহু দিগন্তের কথা, কাব্য তার অন্ততম একটিমাত্র; এ-চিঠির আরও একটি খবর আমাদের পুলকিত করে তোলে যে, অভ্যস্ত আদের্শ বিচার করতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিষ্ণু-কাব্যের দেয়ালে ঠেকে ঠেকে ফিরেছেন। ভেবেছেন অন্য আদর্শের কথা—যা তাঁর কাব্য বোঝার পক্ষে (বা বাজার পক্ষে—এ প্রসঙ্গে যদি আমরা কবির সেই কথাটিকে স্মরণ করি—'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে') অপরিহার্য্য। শুদ্ধচিত্তে মেনে নিয়েছেন—যুগের স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে, রস ভোগের রীতি বদলেছে, তাই বিচারের পদ্ধতিও বদলানো চাই। আক্ষেপ করেছেন প্রায় সূর্যাস্তলগ্ন-কবিজীবনের জন্যে – 'সময় কোথায় !'

আবার এমনও আছে যে, চিঠি লিখতে গিয়েই আত্মস্মৃতি জেগে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের। তাই রবীন্দ্রকণ্ঠেই আমরা জানতে পেরেছি—'যখন বালক ছিলাম, ভারতী* কাগজের উপর ভর দিয়ে সাহিত্যের বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম—সেই প্রশ্রয় না পেলেও হয়ত একটা কিছু গতি হত কিন্তু তবু সুযোগ জিনিষটাকে উপেক্ষা করা যায় না।'

আর একদিকে দেখতে পাই—রবীন্দ্রের প্রতি বিষ্ণু-দের অগাধ আস্থা, যখন আর কাব্যের সাহায্য না পাওয়া যায় তখনও একমাত্র ভরসা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিষ্ণু-দের দু'খানি চিঠিতে তারই অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত যেন ধরা আছে। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই মানুষ—যাকে নিজের আন্তরিক ব্যাকুলতার কথা ; ভাবী-সম্ভাবনাময়-জাতকের কথা – যে বিষয়ে নিজেই নিশ্চিত নন, সেই বিষয়ের কথাও জানানো যায়। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'পুনশ্চ' দেখে আশ্বাস পেলেও দ্বিধা সরে না, আর সেই দ্বিধারই অবসানে রবীন্দ্র-লিপির প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। তাঁর নিজ-রচনায় আত্মপ্রত্যয় তখনই জোরালো হয়ে উঠবে বলে ভাবেন—যখন দেখবেন—তাতে 'আপনার (রবীন্দ্রনাথের) সংশোধন ও যথাস্থানে লাইনস্থাপন' দেখতে পারেন। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথের উপরে বিষ্ণু-দের এতো নির্ভরতা ছিল। অপরের প্রতি কতখানি বিশ্বাস রাখতে পারলে একজন-আধুনিকযুগের-পুরোধা-মন্ময় কবি এ-ধরণের কথা বলতে পারেন ! সার্থক তাঁর অঙ্গীকারটি—'জ্ঞানে-অজ্ঞানে চেতনার নীলে আমরা রাবীন্দ্রিক যে।'

১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে তারিখহীন এই চিঠিটিতে ভিন্নতর একটি প্রসঙ্গ আমাদের কুতূহলী করে তোলে—'একটি কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছি'। কি কবিতা ? কিসের অনুবাদ ? কেনই-বা পাঠাচ্ছেন !

* ২৮০ পাতায় পাদটীকা দেখুন

আমাদের এই কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন বিষ্ণু দে স্বয়ং, অন্যত্র। —"১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিঅট সাহেবের 'এরিয়েল কবিতা'বলীর কটি পুস্তক কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল। তার ৮ নম্বর হল 'জানি অব্ দি মেজাই', ১৬ নম্বর, হল 'সিমেঅনের গান'। তারপরে 'পরিচয়'-পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরোল আধুনিক কাব্য বিষয়ে। সেই বিরোধী প্রবন্ধে তিনি এলিঅটের প্রথম দিককার কাব্য অবজ্ঞায় প্রয়োগ করেন। এই লেখক ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ ৮ নম্বর কবিতাটির যে অনুবাদ করেছিল সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসাও ছিল। তাই অনুরোধ করে ঐ নামহীন কবিতাটি যদি তিনি তাঁর তৎকালীন (অর্থাৎ লিপিকার নয়) গদ্যকবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে সে ঐ ছন্দের স্বরূপটা ধরতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তার ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে। আমার বন্ধু পরিচয় সম্পাদক*[১] একদিন তাঁকে বলেন: স্যার আপনাকে এই সুযোগে বিষ্ণু এলিঅটের সাম্প্রতিক কবিতা পড়াল। তিনি বলেন: তাই বুঝি? এলিঅট তো তবে ভালো লেখে, তার প্রতি আমি তো অন্যায় করেছি, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছেপো।"*[২] ['পরিচয়' / মাঘ ১৩৩৮]

আরো আছে, ঐ পত্র দুখানির অন্তরে-লুকিয়ে আছে—একটু অভিমান-মিশ্রিত-কণ্ঠ—'কিছুমাত্র অধিকার না পেয়েও আপনাকেই লিখছি'। অধিকার তো পেয়েই ছিলেন, নইলে অভিমান জন্মালো কি করে! কিংবা স্মরণ করিয়ে দেবার এই ভঙ্গিটি—'আশা দিয়েছিলেন যে সময় হলে আমার বইটা পড়ে' মতামত বলবেন। ...জানি অক্ষমের চাঞ্চল্য আপনার ক্ষমা পায়'—এরা কি আমাদের চিনিয়ে দেবে না—দুই কবির পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বরূপটিকে? আপনারাও দেখুন, সকলে দেখুন, সর্বসাকুল্যে এই দশ-খানি পত্র তুলে দিচ্ছি—

[১] বিশিষ্ট কবি শ্রীসুধীন দত্ত। ১৯৩১ খ্রী, থেকে ১২ বছর 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

[২] এই সময় রবীন্দ্রনাথ ছবি-আঁকার দিকে যে বেশ একটু ঝুঁকেছিলেন একথা আমাদের অনেকেরই জানা। এখানে কবি বিষ্ণু দে-র কথায় আমরা সে-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি। 'দেখ আমি কি রকম ছবি আঁকি।' গাঢ় লাল, প্রায় কালোর আভাসে ফুলের ছবি আঁকছিলেন তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—বরাহনগরের শ্রীপ্রশান্ত মহালনবিশের বাড়ীতে বসে। আমি বিশেষ করে এ-বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই এই-কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্য এবং ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করতে করতেও ছবি এঁকে চলেছেন।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু

চিঠি লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। শরীর ক্লান্ত হওয়াতে কুঁড়েমি প্রবল হয়ে উঠেচে অথচ কাজের তাগিদ কমেনি। মোটা যে সব কর্তব্য ঘাড়ে নিয়েছি তাকে এক মুহূর্ত্ত নাবিয়ে, রাখবার জো নেই—তাই ছোট ছোট কাজের দাবিগুলিকে ভুলতে হয়। দুই দিক বজায় রাখবার মত শক্তি নেই—যে অল্প একটু অবকাশ পাই সেটুকু নিয়ে কৃপণের মতো ব্যবহার করতে হয়। আমার পূর্ব্বার্জিত খ্যাতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে যে বিদায় নিতে পারব এমন আশা নেই।

সাহিত্যের পথে তোমরা নূতন যাত্রা করতে প্রবৃত্ত, তোমাদের জন্যেই আজকাল ছোটখাট এত মাসিকপত্রের প্রচলন দেখতে পাই। এই বাহনের যোগে সব যাত্রীই যে গম্যস্থানে পৌঁছবে তা নয়, সেটা পাথেয়ের উপরে নির্ভর করে। সে পাথেয় কার যথেষ্ট পরিমাণে আছে তার প্রমাণ যথা সময়ে হবে কিন্তু আপাতত বাহনটাতে সুবিধা আছে। যখন বালক ছিলাম, ভারতী কাগজের উপর ভর দিয়ে সাহিত্যের বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম—সেই প্রশ্রয় না পেলেও হয়ত একটা কিছু গতি হত কিন্তু তবু সুযোগ জিনিসটাকে উপেক্ষা করা যায় না।

'স্পর্ধা'* কবিতায় একটা ছাপার ভুল আছে। হওয়া উচিত ছিল 'মন তারে করে কষাঘাত' হয়েছে 'মন তার করে কষাঘাত।' মানেটা একেবারে উলটিয়ে গেছে।

ইতি শুভাকাঙ্খী

১০ অগ্রাণ ১৩৩৫ রবীন্দ্রনাথ

বিঃ দ্রঃ—সেঞ্চুরি ক্যালেণ্ডার অনুসারে চিঠির খৃষ্টাব্দানুসারী তারিখটি হল—২৬ নভেম্বর ১৯২৮ সোমবার।

* 'মহুয়া' ১৯২৯ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) কাব্যের অন্তর্গত 'স্পর্ধা' কবিতা।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়েষু

ছন্দ সম্বন্ধে অনেক তর্ক করেচি আর ইচ্ছা নেই। তোমার কী ভালো লাগে বা না লাগে সেটা ভালো লাগবার চরম কথা নয়, আমার কথাও তথৈবচ। তবু নিজের কানে যে

লয় আছে, নিজের কাব্য সেই লয়েই পা ফেলে চলে, তোমার পদচারণের সঙ্গে তার মিল না হবারই কথা। এ ক্ষেত্রে ভোট গণনার মূল্য নেই, হয়তো একটিমাত্র ভোটেরই জিৎ হতে পারে। রুচিভেদ সম্বন্ধে কবিমাত্রেরই অবিচলিত সহিষ্ণুতার চর্চা করাই শ্রেয়।

ইতি ১৪ মার্চ ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—চিঠিটির বঙ্গাব্দানুসারী তারিখটি –৩০ ফাল্গুন ১৩৩৯, মঙ্গলবার।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর দিতে হলে লম্বা করে লিখতে হয়। সময় থাকলে লিখতুম। কিন্তু বর্তমানে কাজে ও লেখায় এত বেশি জড়িয়ে পড়েছি যে এরকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় মোকাবিলায় গদ্য-পদ্যের ছন্দসীমানা নির্ণয়ের বিচার করা যাবে।

ইতি ৪ চৈত্র ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—চিঠিটির খৃষ্টাব্দানুসারী তারিখটি হল এই-১৮ মার্চ ১৯৩৩, শনিবার।

শ্রীবিষ্ণু দে
১০৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ব্যস্ততার মধ্যে তোমার বইখানি* পড়েছি। খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ। সাহিত্যে অনেকে নতুনের বড়াই করে কিন্তু চলে পুরাতনের পিছু পিছু। তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায় দেখা গেল। কিন্তু প্রথম আরম্ভে জমিটা থাকে এবড়ো-খেবড়ো, সম্পূর্ণ সুগম হয় না, সেটা বোধ হয় অপরিহার্য্য। মাঝে মাঝে উঁচোট খেয়েছি কিন্তু বুঝেছি যে জোরে চলবে কোদালখানা। কালের চলতি পায়ের তলায় পথটা ক্রমে সমান হয়ে আসবে। কিন্তু তখন আবার নতুন কালের জোয়ালো পথিক বেশি সমান পথ পছন্দই করবে না। আমাদের বয়সে সাহিত্যে শুধু কেবল জোর নয়, আরামেরও দরকার লাগে। কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য আগামী-

কালেরই জন্যে, সাবেক আয়োজন যা অক্ষয় হয়ে আছে আমাদের শেষ বেলাকার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আশীর্ব্বাদ করি তোমার কলম কীর্ত্তির অভিসার পথে নতুন বা পুরানো কোনো সংস্কারেরই লতাপাশে জড়িয়ে পড়বে না। সৃষ্টিকার্য্যে নতুন কাল এবং পুরানো কাল দুটো কালকেই এড়িয়ে চলতে হয়—চিরকাল বলে আর একটা কাল আছে সেইটের পরেই ভরসা।

ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—এই পত্রের খৃষ্টাব্দানুসারি তারিখটি হল—১৩ জুলাই ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার।

---

* উর্বশী ও আর্টেমিস-১৯৩২ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)

শ্রী বিষ্ণু দে

১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে চিঠি লেখার পরেই মনে হলো বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচি—বোধ হয় বয়সের প্রভাবে। কুঁড়েমিটা সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো জীবনে ঘনিয়ে এসেচে—তাই একদৃষ্টিতে যা দেখি তার বেশি আর যাইনে। তেমনি করেই উড়ে-চলা মন নিয়ে তোমার বইয়ের অংশে অংশে চোখ বুলিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল এর চালটা নতুন, সেইজন্যে অভ্যস্ত আরাম নিয়ে এর সর্বত্র সঞ্চরণ করা চলেনা। সেইটেই প্রথম ধারণা, আর সেই কথাটাই তাড়াতাড়ি তোমাকে লিখে কাজ সেরেচি—এও কুঁড়েমির লক্ষণ। চিঠি ডাকে রওনা হবার পর বইখানা আর একবার হাতে পড়ল—দেখলুম কবিতাগুলি এমনতরো সরাসরি বিচারের যোগ্য নয়। এ তাজা মনের লেখা যৌবনের ঢেউ পাথুরে উপকূলের উপরে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌চে—কঠিনের সঙ্গে তরলের চলচে লীলা। বাঁধা নিয়মে সুঠাম ভঙ্গীতে স্রোতের ধারা চল্‌চে না—সহজে গা-ভাসিয়ে দেবার মত প্রবাহ নয়, থেকে থেকে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে ওঠে, ধাক্কা খেতে হয়। একরকম নূতনত্ব আছে যেটা কায়দার নূতনত্ব, সেইটের অতিকৃতিটাই চোখে পড়ে—আর একরকম আছে যেটাতে মানুষেরই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, মনে হচ্চে তোমার মধ্যে সেই বিশিষ্টতা আছে। নতুন কালের বিদেশী আদর্শ সামনে রেখে সযত্নে ভঙ্গী অভ্যাস করে নিজের রচনাকে নতুন হাটে চালিয়ে দেবার প্রয়াস তোমার নেই এই আশা করি। কেননা, সেই হাট আজ বাদে কাল ভাঙবে—আজ যে ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে ঢাক বাজাচ্চে

প্রবলতার আড়ম্বরে ; তার মধ্যে অচিরতার অশান্তি—বর্ষাকালের আকস্মিক স্রোতের মতো, যা নির্ভর করে দূরের কোনো গিরিমালার মধ্যে হঠাৎ বর্ষণের উপরে।

ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—পত্রটির খৃষ্টাব্দানুসারী তারিখটি হচ্ছে—১৭ জুলাই ১৯৩৩, সোমবার

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে উত্তর দিতে দেরি হোলো। তোমাকে আমি যে চিঠি লিখেছি যদি তা তোমার কোনো কাজে লাগে তবে ছাপতে পারো।

ইতি ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—এ-চিঠির বঙ্গাব্দানুসারী তারিখ—৮ ফাল্গুন ১৩৪২, শুক্রবার।

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, নীরন্ধ্র আমার অবকাশ। তোমার চোরাবালি বইখানি একটু খুলেই দেখলুম এর মধ্যে নিবিড় মনোযোগের দাবি আছে। তাই রেখে দিতে হোলো—ছুটি যখন পাব পড়ে দেখব এবং যদি কিছু বলবার থাকে বলব।

ইতি ১৪/১/৩৮

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

বিঃ দ্রঃ—এই চিঠির বঙ্গাব্দানুসারী তারিখটি হলো—৩০ পৌষ ১৩৪৪, শুক্রবার।

বিষ্ণু দে
পি ২৪১ ডি রাসবিহারী এভিন্যু
কলকাতা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি ভুল আন্দাজ করেছ—কবিতার মহলে সম্প্রতি আমি নেই, আছি তার সতীনের

মহলে। চণ্ডালিকাকে আগাগোড়া সুরে ঢালাই করছি। এতে কলমের কৃতিত্ব অল্পই, নিরন্তর শব্দভেদীর লক্ষ্য নির্ণয় করতে করতে যদি কোনো শিকার জুটে থাকে সে আমার অবকাশ—তাকে পেড়ে ফেলেছি। কাব্যে তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে আছ, দ্বৈধের উপসর্গ নেই—আমার অবস্থা বুঝতে পারবে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করিনি তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে। অভ্যস্ত আদর্শে বিচার করতে পারি নে অন্য আদর্শ আমার জানা নেই। মনে ভাবি যুগের পরিবর্তন হয়েছে, দূরে পড়ে গেছি—রস ভোগের রীতি হয় তো বদলেছে, বিচারের পদ্ধতিকেও নতুন রাস্তা বের করতে হবে, আমার আর সময় কোথায়। আশা করছি তোমরা কেবল নবযুগের প্রবর্তন করবে না, তাকে সুগমও করবে.

ইতি ২০ মাঘ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ

বিঃ দ্রঃ—পত্রটির খৃষ্টাব্দানুসারী তারিখ—৩ জানুয়ারি ১৯৩৮, সোমবার।

১০৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

শ্রীচরণেষু

আপনার সময়স্বল্পতা ও মনের অবস্থা সত্ত্বেও এ বিরক্তিকরণ মার্জনা করবেন। "পুনশ্চ"* পড়েই চঞ্চল হয়েছি। তা ছাড়া সাহায্যও পাচ্ছি না আপাতত আর কারো কাছে। তাই কিছুমাত্র অধিকার না পেয়েও আপনাকেই লিখছি। কিছুকাল ধরে আমার অনেক পদ্যই মিল্‌হীন হয়ে' যায়। সেটা নিয়মছাড়া অমিত্রাক্ষর বা মুক্তছন্দ কি যে তা জানি না—নিশ্চিত হয়ে' scan করতে পারি না বলে ভয়ে ছাপাই নি—"পরিচয়"তে শুধু ছোট একটি বেরিয়েছিল পুরানো লেখা। তারপরে সমস্যা ছিল ছন্দময় গদ্য ও "লিপিকা-*"তে তার ও মুক্তছন্দের সমাধানের আশা পাচ্ছি। কিন্তু কানকে বিশ্বাস করা ছাড়া কি এ বিষয়ে আর কোনো উপায় নেই? অনেকের কোনো কোনো শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণাও থাকে ত? তাছাড়া সকলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও সমান নয়। আমার পক্ষে তাই নিজের লেখা রচনায় আপনার সংশোধন ও যথাস্থানে লাইন্‌স্থাপন দেখ'লে সুবিধা হয়। তাই আপনাকে সাহস করে' একটা কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। এর পরে একটা আরো স্পষ্ট ছন্দগন্ধী অনুবাদ করেছিলুম। কিন্তু সেও এর মতো অদ্ভুত

ও দুর্ব্বল ছিল ও অপাততত সেটা হারিয়ে গেছে। এ উৎপাত ক্ষমা করবেন। আশা করি আপনি সম্পূর্ণ ভালো আছেন।

সপ্রণাম

শ্রীবিষ্ণু দে

বিঃ দ্রঃ—তারিখবিহীন পত্র। দু'-একটি বানান চলতি-বানানের সঙ্গে মেলে না। কবির নিজস্ব বানান-ই রেখে দিলাম। যেমন—একটী, অদ্ভুত।

---

* পুনশ্চ—১৯৩২ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত।

লিপিকা—১৯২২ (১৩২৯ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত

পি ২৪১ ভি রাসবিহারী এভিন্যু

কলকাতা

২/২/৩৮

শ্রীচরণেষু

আপনার আগের চিঠিতে জানি যে আপনি কাব্যরচনায় ব্যস্ত। সে চিঠিতে কিন্তু আশা দিয়েছিলেন যে সময় হলে আমার বইটা পড়ে' মতামত বলবেন। সেই আশাতেই এই নিলর্জ্জভাবে আবার বিরক্ত করছি। জানি অক্ষমের চাঞ্চল্য আপনার ক্ষমা পায়।

আপনার কাব্যটি কি শীঘ্রই বেরোবে? প্রান্তিকের* বিষয় মাহাত্ম্য ও আঙ্গিকের বিস্ময়করতায় অভিভূত হয়ে' তাই-প্রতীক্ষা করছি।

আশা করি আপনার শরীর সুস্থ আর কলকাতায় কোনো দিন আবার পাঠে দেখা দেবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

বিঃ দ্রঃ—মূল চিঠির উপরে লেখা—'গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৪/২/৩৮'। চিঠিটি টিস্যুপেপারের উপরে লেখা আর সম্পূর্ণ বাঁকা। সেঞ্চুরি ক্যালেণ্ডার অনুসারে চিঠিটির বাংলা তারিখ হল—১৯ মাঘ ১৩৪৪,বুধবার।

---

* প্রান্তিক—১৯৩৮ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 'দেশ' পত্রিকা

পাদটীকা

১৮৭৭ (১২৮৪ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে) প্রথম ভারতী প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা রবীন্দ্র-রচনার সাক্ষাৎ পেতে থাকি। প্রসঙ্গতঃ ভারতীর ১২৮৪ থেকে ১২৯৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে রবীন্দ্র-রচনার হিসেব করলে দেখা যায়—যে, ১২৮৪তে 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা ছিল ৪০টি। তার মধ্যে এ-পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন রচনার সংখ্যা ৭টি। সবচাইতে বেশি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল—ভারতী / মাঘ ১২৮৪তে ১০টি রচনা; আর সর্বাপেক্ষা কম দেখা যাচ্ছে ভারতী / কার্তিক:২৮৪ সংখ্যায়—২টি রচনা।

১২৮৫-র 'ভারতী'তে রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা—১৩টি। যার মধ্যে এ পর্যন্ত অ-গ্রন্থভুক্ত রচনার সংখ্যা—৪টি।

১২৮৬-র 'ভারতী'র রবীন্দ্র-রচনা—১৭টি এবং ১৭টি বিদেশী কবিতার অনুবাদ। গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন রবীন্দ্ররচনার সংখ্যাও দেখা যাচ্ছে—২টি।

১২৮৭-র 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের মোট ২৪টি রচনা বেরোয়। কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি এমন রচনার সংখ্যা—৪টি।

১২৮৮-র 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের ৫৮টি রচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন রচনার সংখ্যা—১১টি।

১২৮৯ 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা—১৬টি। গ্রন্থভুক্ত হয় নি মাত্র একটি রচনা।

১২৯০-তে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা—১৮টি। এর মধ্যে ৮টি রচনা এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

১৯টি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯১-র ভারতীয় পৃষ্ঠায় এবং তার মধ্যে ২টি রচনা আজও গ্রন্থভুক্ত নয়।

১২৯২-তে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা—৮টি। গ্রন্থভুক্ত হয়নি ৩টি রচনা।

১২৯৩-র 'ভারতী'তে রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা—১১টি

১২৯৪-তে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা—১২টি। তার মধ্যে ১টি রচনা এখনও পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত নয়। অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এই সময় 'ভারতী' এবং 'বালক—এই দুটি পত্রিকা মিলিতভাবে 'ভারতী ও বালক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। আর ১২৯৫ তে 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্ররচনার সাক্ষাৎ মেলে নি।

রবীন্দ্র-মানসের-নির্মাণ-কাল-পর্বে 'ভারতী' পত্রিকার ভূমিকাটি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল—

সে কথাটিকে বুঝে নেবার পক্ষে উপরিউক্ত হিসেবটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। পুরোনো জীর্ণ পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে এই দুর্লভ রচনাগুলি উদ্ধার করে আবার একালের পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করে দেবার বাসনা থেকেই আমার এই প্রচেষ্টার জন্ম—এ-পর্যন্ত ১২৯৫ বঙ্গাব্দে পৌছোনো গেছে।

বিষ্ণু দে : কিছু চূর্ণ মন্তব্য

...বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রা দোষে পেয়েছে,—সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে, কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাট বাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইনবনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আঁকাড়া ইংরেজি শব্দ বাংলা কাব্যের জঠরে, চালান করতে পারো, কিন্তু সেটা হজম না হয়ে, আস্ত থেকেই যাবে।......

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ইতি ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৫)

(বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি)

......শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র মনে এ উত্তাপের অস্তিত্বে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্যাসানের ঠাণ্ডা বাতাসে সে তাপ উবে যাচ্ছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আধুনিকত্বের সর্বলক্ষণ যুক্ত কবিতা ছাড়া তিনি লিখবেন না। পাছে সমস্ত কবিতাটার আবছায়া গোছ ছাড়া একটা স্পষ্ট অর্থই দাঁড়িয়ে যায় সেই ভয়ে কবিতার এক অংশ থেকে অন্য অংশকে খাপ-ছাড়া করেই তাঁর মনে শান্তি নেই, প্রতি শ্লোকের এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের যথা সম্ভব অসংলগ্ন অসঙ্গতি রক্ষা করে চলেছেন।

"ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ
স্বয়ম্বর ধর্ম বৃথা, ওরে নষ্ট নীড়।"

রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার চরণ বা চরণাংশ আচমকা এনে ফেলা এ অসঙ্গতি

রক্ষার একটা প্রধান উপায়। ...উদ্দেশ্য যাই হোক শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। এ অসংলগ্নের আনন্দ বিষ্ণু-দের একচেটিয়া নয়।

—অতুল চন্দ্র গুপ্ত

(কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৪০ সালে)

(আধুনিক বাংলা কবিতা প্রবন্ধ থেকে)

তাঁর (বিষ্ণু দে) কাব্যে ছন্দ, মিল, উপমা অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ তো বটেই, এমন কি বিষয় মাহাত্ম্যে বা অর্থগৌরবে ভাবের স্বল্পতা তিনি কোথাও ঢাকতে চাননি, সার্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দ জাগিয়েছেন।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(চোরাবালি, কুলায় ও কালপুরুষ)

রবীন্দ্রোত্তর-যুগের অন্যতম সুকবি বিষ্ণু দে এলিয়ট থেকে সুরু করে এলুয়ার এবং আরাগঁর সমধর্মিতায় উপনীত হবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর কবিতায় হঠাৎ চমক লাগানোর মত কিছু হয়তো নেই ; তবে কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। ভাবগূঢ় হলেও বিষ্ণু দে সর্বদাই যে দুর্বোধ্য তা নন।

—সরোজ আচার্য

(বাংলা সাহিত্যের আপৎকাল)

আপনার রচনায় নানা বর্ণ নানা ধারা মিলচে—সব সময়ে যে বুঝেচি তা নয়, অনেক সময়ে না বুঝেও নিবিড় ভালো লেগেচে। আপনার রচনা আলোচনা করা সহজ নয়। অনেক ভাবতে এবং পরিশ্রম করতে হবে। পূর্বলেখ-এর শিল্পকাজ সহজে ধরিয়ে দেবার আশা রাখি না। নিজেও ভাষায় বাধা পাই তাতেই বুঝতে পারি স্বতন্ত্র একটা বড়ো শিল্প জগতের ভাষা তো নূতন হবেই। তা না হলেই প্রমাণ হত সেই জগৎ সত্য জগৎ নয়। কিন্তু সেই জগতে প্রবেশ করতে এবং তার পরিচয় দিতে সাধনা চাই। অবশ্য এমন অনেক কবিতা আপনি লিখেচেন যার সোনার দরজা সহজে খুলে যায়।।

—অমিয় চক্রবর্তী

(চিঠিপত্র, সি-সাইড পুরি থেকে ২রা অক্টোবর ১৪৯১)

মিছিলের কথা তিনি (বিষ্ণু দে) মাঝে মাঝে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে হয়, তাহা অনেকখানি একটা নিরাপদ ব্যবধান হইতে, মিছিলে ভিড়িয়া দশের মধ্যে এক হইয়া উঠিবার আগ্রহের সততা, অন্তত সেই আদর্শ নিষ্ঠা আমার নিকট সন্দেহাতীত হইয়া ওঠে নাই। এ বিষয়ে আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে অধিক স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী।

—শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৭৪

(বাংলা কমিউনিস্ট সাহিত্য, মধ্যাহ্ন ৮ম বর্ষ)

কিন্তু এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, বিষ্ণুবাবুর গলদ শুধু কলা কৌশলেই। কলা কৌশল তাঁর ভাবধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে, অথবা তাঁর ভাবধারারই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হল তাঁর কলা কৌশল। তাঁর কবিতায় বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, জনগণ, ধর্মঘট, তেভাগা, এসব সত্যকার মানুষের সত্যকার সংগ্রাম নয়, এসব হচ্ছে কতকগুলি আধ্যাত্মিক আইডিয়া, উপকথার লালকমল আর নীলকমলের মত প্রহেলিকা, মনের একটা আলোড়ন, ভাবের একটা রঙীন নেশা।

—বীরেন পাল

(বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ধারা)

(মার্কসবাদী পত্রিকা)

নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী

—এমন কবিতা লেখা শুধু সাধ্যাতীত নয়, বিষ্ণুবাবুদের কল্পনাতীত ও বটে। তাঁদের পেশাই হল ফাঁকিবাজি, ফাঁকির শূন্যকে আঙ্গিকের ফাঁকা চটকে মুড়ে লোক ঠকানো।

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা)

(মার্কসবাদী পত্রিকা)

আমি অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না। বিজ্ঞজনের মুখে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডার' নানারকম দুরূহ ব্যাখ্যা শুনে আরো বেশী বিচলিত বোধ করি—ও দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর এক স্তবক আসছে ; সেটা আমার কাছে সবসময় স্পষ্ট নয়। তবু, ও দুটি কবিতাই

আমি পড়তে ভালোবাসি ; মাঝে মাঝে চমকপ্রদ চিত্রকল্পের দেখা পাই ; মনের মধ্যে বিচিত্র ছবি ফোটে, আর ছন্দের কৌশল ধ্বনিমর্মরের মোহ ছড়ায়।

—বুদ্ধদেব বসু

(বিষ্ণু দে : চোরাবালি / কালের পুতুল)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণুদে-র কবিতায় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের বাহুল্য বা অভাবিত প্রয়োগ আপাতত বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে ; কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় ঐ শব্দগুলি বাগ্‌বাহুল্যের বা অস্পষ্টতার প্রতিষেধক।

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

(পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পুস্তক পরিচয়)

……বিষ্ণুবাবু শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধপক্ষ, তিনি একজন বুর্জোয়া ভাববাদী। এই জন্যই তিনি মার্কসবাদ সংশোধন করার চেষ্টা করেন, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পান। এই জন্যই যান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বিষ্ণুবাবুর সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। এ জন্য শুধু অচিন্ত্য নয়, এলিয়টের মধ্যেও তিনি জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ দেখতে পান। এ জন্যই তাঁর কলাকৌশল কাব্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখার কৌশল। বিষ্ণুবাবু এবং তাঁর সমধর্মীরা নানারকমের ইজমের ধুয়োয় ফর্মের পাঁচিল তুলে সাহিত্য কাব্য সংগীতকে জনসাধারণের নিষিদ্ধ এলাকা করে রাখার জন্য চেষ্টিত।

—প্রদ্যোৎ গুহ

(সাহিত্য বিচারে মার্কসীয় পদ্ধতি-মার্কসবাদী পত্রিকা)

রবীন্দ্রবিদূষণ আমাদের অভিপ্রেত না হলেও, কার্যত তাই হয়েছিল। ভবানী-বাবু রবীন্দ্র ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। আমার সে সুযোগ হয়নি, যোগ্যতারও অভাব আছে। তাছাড়া কথায়ই আছে চুণ খেয়ে মুখ তাতিলে দই দেখে ভয় হয়। আজ এই সুযোগে তাই-কৃতকর্মের জন্য সকলের কাছে অকপটে মার্জনা ভিক্ষা করি। আমি সত্যিই গুরুনিন্দার পাতকে পাতকী। ক্ষমা প্রার্থনা করি শ্রী গোপাল হালদারের কাছে, যার পাদমূলে আমার মার্কসবাদে দীক্ষা। ক্ষমা প্রার্থনা করি কবি বিষ্ণু দে'র কাছে যাঁর সাহিত্য এবং জীবন বিগত ত্রিশ বছরে আমাদের মূল্যায়নকে হীনতম মিথ্যা বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে।

—প্রদ্যোৎ গুহ

(মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা—ভূমিকা অংশ)

সর্বব্যাপী সৌরপ্রভাব থেকে মুক্তি পাননি বিষ্ণু দে-ও—এমন কি যে পর্যায়ে তিনি মার্কসীয় তত্ত্বে অনুপ্রেরিত হয়ে কবিতা লিখেছেন তখনও। 'চোরাবালি'তে এজরা পাউণ্ড ও এলিয়টের কৌশল গ্রহণ করে রবীন্দ্র কবিতার পংক্তি বা শব্দ উদ্ধৃত করেছেন এমনভাবে যাতে বিদগ্ধ সমালোচক অতুলগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, 'শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি'—

—রমেন্দ্রনাথ আচার্য চৌধুরী

(প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ)

জীবনচর্চা ও কাব্যচর্চা দিয়ে তিনি বুঝেছেন বিচ্ছিন্নতায় নয়, মূলহীনতায় নয়, সত্তাকে পেতে হয় নিজের আবহমণ্ডলে, স্বদেশের মৃত্তিকায়, দেশজ জীবনে, মাতৃভাষায়। তাই 'জল দাও আমার শিকড়ে'। বিয়াত্রিচে দান্তেকে বলেছিল, সত্যের মূলে যেতে হবে; বিষ্ণু দে উপলব্ধি করেছেন সত্তার শিকড়ে যেতে হবে।

—অশ্রু শিকদার

(আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় বিষ্ণুদে'র অন্বেষণ : বর খুঁজে ফেরে সত্তা)

বিষ্ণুদের কবিতা প্রসঙ্গে সঙ্গীতময়তার কথা বার বার উঠেছে। বোধ হয় এই কারণেও যে সাংগীতিক উপমা বা প্রতিমা তিনি অবিরল ব্যবহার করে চলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বুঝতে সংগীত বোধ সত্যিই সাহায্য করে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বভাবতই এই ধ্বনি বৈশিষ্ট্য এসেছে মূলত তাঁর শব্দ চেতনা থেকেই। সাংগীতিক নানা রীতি তাঁর কবিতার চলনে উপমিত হতে পারে, কিন্তু তা তাঁর শব্দ ব্যবহার কৌশলের অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের সুর ছোঁয়া থাকার ফলে হয়তো ভিন্ন মাত্রা এসেছে—কিন্তু তাঁর প্রকরণের নন্দনকে ধরতে হলে এই শব্দ কৌশল থেকেই যেতে হবে সংগীতের দিকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায় : রচনাবলির সমগ্রতা / অরুণ সেন)

১৯৭১ সালে তিনি পেলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। নিজেকে পাঠকের কাছে গ্রহীতব্য করার জন্য তিনি ইংরেজি ভাষণে বললেন "বিশ্বাস করুন সারা জীবন আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অনুসারে চেষ্টা করেছি নিজের প্রতি এবং পাঠকের প্রতি সৎ থাকতে। ...হ্যাঁ, আমার মধ্যেও ছিল সংকট বা ক্রাইসিস।" (অনুবাদ : অরুণ সেন) এগুলি কি বলার অপেক্ষা রাখে? এগুলি কি একজন খেই হারিয়ে ফেলা কবির শিথিল উক্তি নয়? আমরা লক্ষ্য করি এই সময়ের কবিতায় তিনি গল্পও বলতে চাইছেন। সাংবাদিকতা আক্রমণ করেছে তাঁর কবিতাকে। 'সংবাদ' আমরা জানতুম, 'মূলত কাব্য' এই পরিবর্তন, এই সরে আসার চেষ্টা, বিষ্ণু দে-র কবিতার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে কিনা তা সুধীজন

বিচার করে দেখবেন। সন্দেহ শুধু এইটুকু যে এ হেন প্রয়াস নিশ্চয় লঘু জনপ্রিয়তা অর্জনের দিকে কবিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কবিতা হয়ে ওঠে সর্ববোধ্য, জটিলতাহীন, পরমুখাপেক্ষী। কবি এ বিষয়ে যে সচেতন ছিলেন না তা নয়।

—উৎপল কুমার বসু
জল দাও আমার শিকড়ে
(দেশ পত্রিকা, ৫ই আগস্ট ১৯৮৯)

শুধু সাহিত্য নয়—চিত্র, সংগীত, নৃত্য, নাট্য শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের নব নব আন্দোলন থেকে রস আহরণ করে বিষ্ণু দে-র কবি মানস সমৃদ্ধ। সেজান থেকে পিকাসো মানে থেকে মাতিস, যামিনী রায় থেকে গোপাল ঘোষ, বালা সরস্বতী ও রুক্মিনী অ্যারুণ্ডেল, আইজেনস্টাইন ও স্ট্যানিস্লাভস্কি সকলের সম্বন্ধেই বিষ্ণুদে-র চৈতন্য জাগর। বিজ্ঞানে, বিশেষ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বে, বিষ্ণু দে-র দখল বিস্ময়কর। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তাঁর কবিতা শুধু বিদগ্ধই নয়, তা বিচিত্র, এলিয়টের ভাষায় বলা চলে—Variety and complexity playing upon a refined sensibility.

—দীপ্তি ত্রিপাঠি
(আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় বিষ্ণু দে)

.... তাঁর কবিতায় বৈদিক ও ঔপনিষদিক কল্পনা ও উদ্ধৃতি সুন্দর মানিয়েছে । এ ভাবে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যস্রোতে অবগাঢ় এক কবিপুরুষ। এককালে যিনি 'এলিঅটের কবিতা' অনুবাদে আমাদের উপহার দিয়েছেন, তিনি এলিঅট প্রদর্শিত পথে ব্যক্তিগত প্রতিভাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত করেছেন। এই যোগ স্থাপনে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য রবীন্দ্রনাথ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা বার বার কবিতারাজিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণের নিভৃত ইতিহাস ধরা পড়েছে। এলিঅট তাঁর 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা' শীর্ষক অতিখ্যাত প্রবন্ধে বলেছিলেন যে ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় কঠোর শ্রমে এবং তার জন্য চাই ইতিহাসবোধ। এই ইতিহাসবোধ থেকেই বিষ্ণু দে জেনেছেন যে বৈদিক উষাসূক্ত বা রাত্রিসূক্ত যাই হোক না কেন, তাকে আধুনিক অর্থে নেওয়া যায়। কেননা ইতিহাসবোধ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে অতীত নিঃশেষ হয়ে যায় নি, তার অস্তিত্ব বর্তমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এলিঅট তাঁকে এই শিক্ষা দিলেও এ শিক্ষার একটি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যরূপ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

—দেবদাস জোয়ারদার
(তোমার সৃষ্টির পথ)

……আজকের বাংলা কবিতার পুরাণ পিতা যদি হন রবীন্দ্রনাথ, তবে বিষ্ণু দে তাঁর এমন একজন উত্তরাধিকারী, যিনি সবচেয়ে সচেতন ভাবে তাঁকে পিতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়েও অবরোধ করেছিলেন ঘোড়া। জীবনানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে তিনি চানই নি, বিদ্রোহের প্রয়াস করেন নি বুদ্ধদেব বসুর মতো, বরং সরবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রবিভক্তের ভূমিকা। 'প্রগতি' নিয়মিত লেখকদের একজন হয়েও তিনি প্রতিবাদ করেছেন এর কোনো কোনো লেখার রবীন্দ্রবিরূপ মনোভাবের, মনে করিয়ে দিয়েছেন : 'সাহিত্যেও অতীতের মর্যাদা আছে, জীবনে মা বাপ স্বীকার্য।

—সুতপা ভট্টাচার্য

॥ বিষ্ণু দে : রবীন্দ্রনাথ ॥

(কবির চোখে কবি)

……প্রকৃত মার্কসবাদী কবির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, যে মেলামেশা থাকা বাঞ্ছনীয় বলাবাহুল্য, খুব কম মার্কসবাদী কবিই এদেশে তা দাবী করতে পারেন। এর মূল কারণ মধ্যবিত্ত নির্ভর মার্কসবাদী দলগুলির ব্যর্থতা—কিন্তু দলের ব্যর্থতার পাশাপাশি ব্যক্তির নিজস্ব সার্থকতা ও ব্যর্থতার একটা প্রশ্ন আসে। বিষ্ণু দে সে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চান না বলে মনে হয়। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রবঞ্চনা ধরতে পারেন, 'নিজভূমে পরবাসী' হবার যন্ত্রণার কথাও বলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মূল জনতার সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করে যদি ব্যর্থও হয়ে থাকেন, তবে তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতে পারতেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'ঐকতান'-এ। কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, ব্যক্তিগতস্তরে তিনি প্রাজ্ঞ লেলিনের মতই, ভ্রান্তি যত তা সব এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির।

—দীপেন্দু চক্রবর্তী

(কবি বিষ্ণু দে'র দুর্ভেদ্য কেল্লা)

অনুষ্টুপ, বিশেষ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৫

বিষ্ণু দে-র অপ্রকাশিত কবিতা

তাই ভয় রিখিয়ার রুখু নির্জনে

সাধ ছিল পাহাড়ে বেড়াতে
হাল্কা হাওয়ায় মেঘে লঘু রৌদ্রের পথে
চড়াই উৎরাই বেয়ে
বুঝে নিতে সূর্যের ইশারা
রাত্রি কেমন আসে অনায়াসে যায়
যেন কোন্ অলস ইঙ্গিতে
বৃক্ষেরা দিঘল হয়
ফুল ফোটে ঝাঁকে ঝাঁকে
পাতা ঝরে আচমকা নতুন ঋতুর বাঁকে
সাধ ছিল এইসব একবার দেখে নিতে
বামনের দুই হাতে ছুঁয়ে দিতে চাঁদ

পাহাড়ে হয় নি ওঠা

সে অবশ্য জানেই নি এতসব কথা।
আশ্চর্য এ পর্বতের মন, চায় নি কখনো হতে পলাতক বৈশাখী মেঘ
দূর সমতলে
কে আছে যায় না দেখা, তবু ঝুঁকে পড়ে ছ্যাখে
সহসা কী মন্ত্রবলে পাঠায় বাতাসি লেফাফা
চলে এসো কথা হবে রিখিয়া-নির্জনে

সে চিঠি ফেলেছি মুহূর্তেই ছিঁড়ে

সেই থেকে ত্রস্ত ফেরারী
খঞ্জ দুপায়ে ঘুরি
আড়ালে আড়ালে আজো কবন্ধ শহরে

পাহাড়ের ছায়া দেখে কাঁপি
তাই ভয় রিখিয়ার রুখু নির্জনে।

(সমীর দাশগুপ্তর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বনাদের জন্যে দুটি ছড়া

(১)

এক ছিল নিপ্পনের যুবা এক ছেলে,
যার ছড়া কখনও না কদাচিৎ মেলে।
তাকে সব বন্ধুরা যখন তা বলে,
সে জবাব দেয় : হ্যাঁ রে, আমি তাও জানি।
আমি কিন্তু সদা চেষ্টা করি যত শব্দ
শেষের লাইনটায় ক'রে দিই জব্দ॥

(২)

ছিল এক বুড়ো লোক, বড় যার দাড়ি
যে বলে , যা ছিল ভয়, যত দাড়ি নাড়ি।
দুইটা হুতোম পেঁচা, আর এক কোঁকর-কোঁ,
চারটে চাতক আর মাছরাঙা দেয় ছোঁ—
সবাই বেঁধেছে বাসা। আমারই যে দাড়ি।

মৃত্যুর বিশ্রাম চাই পরিশ্রান্ত আমি এই সবে
যোগ্যতা জন্মায় নিত্য দেখেছি যে ভিখারীর ঘরে
আর দীন নেতি ধড়াচূড়া পরে কৌতুকে উৎসবে
আর শুদ্ধ খাঁটি বিশ্বস্ততা কর্দমাক্ত দুঃখের গহ্বরে
আর স্বর্ণময় মান লজ্জা অপাত্রে গচ্ছিত
আর শুচি গুণাবলী বর্বর লালসে পণ্য যতো
আর ন্যায্য উৎকর্ষ অন্যায়ের অপমানে হৃত
আর শক্তি বিকলাঙ্গ খঞ্জের প্রতাপে অপহৃত
আর শিল্পকলা শাসকের দুরন্ত দাপটে
আর নৈপুণ্য চালায়
আচার্যের মতো নির্বুদ্ধিই
আর স্বচ্ছ সত্য স্থূলবুদ্ধি বলে অপরম রটে
আর ক্রীতদাস সৎ মালিক মন্দের পিছু ধায়
পরিশ্রান্ত এই সবে এ সবের থেকে যেতে চাই
শুধু এক এক মৃত্যু সে যে ফেলে যাওয়া প্রিয়াকে একাই ।

একটি কবিতা

স্তব্ধ আকাশ পাহাড়ের সার মৌন পৃথিবী দোলে
নিগূঢ় নৃত্যে সংহত সত্তার,
তিমিরে তারায় নীলিমা নিথর শীতল হ্রদের কোলে

তোমার কোমল শরীরে কণ্ঠহার।
প্রবল আবেগ ঘূর্ণীনৃত্যে মধ্যমণির চূড়ে
মুহূর্তে পায় কেন্দ্র গভীর যতি
শিল্পরচনা এই ক্ষণিকের ব্যাপ্ত কেন্দ্র ঘুরে
নটরাজে থামে, উজ্জীবিত যে সতী।

(নামবিহীন মূল রচনাটি সুজিৎ ঘোষের সংগ্রহে)

বিষ্ণু দে-র অপ্রকাশিত কবিতা

আমার প্রিয়ার চোখ মোটে নয়, সূর্যের সমান
প্রবাল অনেক লাল সে বিম্বাঙ্কুরের তুলনায়
তুষার শুভ্রতা যদি খোঁজো তবে বক্ষ তার ম্লান
কেশ যদি তন্ত্রী হয় কালো তার বাঁধা সে মাথায়
দেখেছি গোলাপ নানা বসোবাই, লাল ও পাণ্ডুর
গোলাপ দেখি নি কিন্তু আমি তার গালে চুমাখেয়ে
এবং আতরে নানা গন্ধ সত্য অনেক সুধা
আমার প্রিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসের চেয়ে।
ভালোবাসি কথা তার তবু আমি এই সত্য জানি
সঙ্গীতের স্বর নয় যতই মধুর তার গলা।
অবশ্য দেখিনি আমি দেবীর কোনো মরালগামিনী
তবে জানি প্রিয়া যদি চলেন ত' মাটীতে
অথচ আশ্চর্য জানি চলা আমার প্রেয়সীর
ব্যর্থ সব তুলনার মতোই সে তুল্য যারা নয়॥

শ্রীমান চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়—জ-কে

জীবন প্রত্যূষ, তবু গৃধ্নু মৃত্যু ঘোরে অশনায়া
ঝিকিমিকি বাপীতটে ; তুমি স্বচ্ছ তরুণ তমাল,
সূর্যের সঙ্গীতে ভরো রৌদ্রেছায়ে ঋজু তনু কায়া
প্রবল প্রাণের বাহু জেলে দেখ দিগন্ত কঙ্কাল,
কঙ্কাল পৃথিবী দেশ ছদ্মবেশী বিরাট শ্মশান ।

রৌদ্র যাক্ হাহাকার, শতচ্ছিন্ন শতক্ষতধারা
শুকাক্ তোমার জন্মে অগ্নিহোত্রে পাক অবসান
হে রৌদ্রসম্ভব' জ্বালো আশ্বাসে শিখায় স্বর্ণকারা,
সৌরকেন্দ্রে কেন্দ্রে আজ সদ্যস্নাত হানো তামসীকে,
মাটি শিহরাক্ সূর্যে, পৃথিবীতে মেলাও আকাশ ।

অণুতে অণুতে আজ মানুষের মুক্তির উল্লাস,
সংহত সূর্যের গানে জয়যাত্রা তোমার চৌদিকে—
চাঁদিনী হোক না গত, প্রতিবাদী তোমার রচনা,
কতো শত দীপ্ত প্রাণে তোমার জন্মের সম্ভাবনা ।

পত্রাবলী

১/১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা
১৭/৩/৭৩

অন্নদাশঙ্কর রায় কে

অন্নদাশঙ্কর রায়, মহাশয়

প্রিয়বরেষু,

আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে খুশি লাগছে। প্রণতিই আপনাকে ও লীলা রায়কে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছেন। আমিও সুস্থ থাকলে আজকে যেতুম।

আপনাদের বিষ্ণু দে

(সম্ভবত অন্নদাশঙ্করের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে)

১৮ই মার্চ, ১৯৭৮

প্রিয়বরেষু,

না হল আপনার সত্তরের অভিনন্দনের সভায় যোগ দেওয়া, না হল চিত্রপ্রদর্শনীতে দেখা করতে গিয়ে দীর্ঘায়ুর আনন্দিত শুভইচ্ছা স্বমুখে জানানো কিন্তু জানবেন, আমাদের আনন্দ ও প্রত্যাশা আন্তরিক।

গাড়ি চেপে রাস্তাঘাটের অসমতল হোঁচটের মধ্যে যাওয়া কষ্ট-কর। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা সত্ত্বেও ধাক্কা লাগে, শারীরিক দুরবস্থার কারণে। তাছাড়া গাড়িও নেই।

আশা করি আপনি বেশ ভালো আছেন এবং অনেক বছর ভালো থাকবেন। শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে শুভেচ্ছা।

আপনার

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কে

রিখিয়া, সাঁওতাল পরগণা, বিহার
১০. ১. ৭৭

স্নেহের বটু বাবু,

তোমার নববর্ষের শুভাকামনায় গুণে জ্বরটা ছাড়ল। ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, সকাল থেকে বিকেল।

মার্চ মাসের আগে বোধহয় যেতে পারব না। হোমগার্ডস্ নামক বহু জীব এখানে চরে বেড়াচ্ছে। হয় মার্চে যেতে পারব, অথবা একটু আগেই।

গান শোনাতে হবে, যখন কলকাতায় যাব। রেকর্ডের কি করলে ?

তিনটি শালিক ছটিতে আছে। ভিড় খুব—হোমগার্ডস্ চরে বেড়ায়। বেরোনো যায় না। শারীরিক অসামর্থ্য তো আছেই।

দেখা হবে।

তোমার শ্রীবিষ্ণু

ক্ষিতীশ রায় কে

রিখিয়া, ১৫/১১/৬৯

প্রিয়বরেষু,

ভাবছিলাম সব খবর কি, আপনার পত্র-অচ্যুতিতে হিম লাগছিল, কিন্তু যে হিম ভালো লাগে সেটা মাঠপাহাড় আকাশের হিমই।

উমারা[১] ফিরেছেন জেনে আশ্বস্ত, যদিও উমাপতি গান্ধিবাদী। কারণ গান্ধীজি যা যা খেতেন তা রাজশেখর বসু[২] এবং শরৎ বসু জায়ার [৩] কাছে শুনেছি, তা আপনার মতো প্রকৃত গান্ধীবাদীর পক্ষে স্বাভাবিক বা শোভন নয়, যা বর্তমান দরে দিনে ৫০ টাকা হবে।

তারা-রা[৪] সায়ন্তন সঞ্জিত গাবুবুবাবুকে[৫] নিয়ে ১২ই রাজধানী গেল, কুপে-ই পেয়েছিল। সঙ্গে আমরুয়ানিবাসী একটি নবযুবক ভৃত্যও। ছোট নাতি বেশ বড় ও গাবরু হয়ে গেল, তারা তো শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাময়ী, ছেলেটি ফলে শান্ত সুস্থ। ওরা তিন-জনে কদিন বাদলা সত্ত্বেও বেশ ছিল, সঞ্জিত[৬] ছেলেটি শান্ত শিষ্ট সংবেদনে বিচক্ষণ। তাকেই রুসদের জানাতে বলেছিলুম ১০ই তার পেয়ে ১২/১৩ই দিল্লি যাওয়া এখান থেকে সম্ভব নয়—ভাগ্যিস নয়।

যা বলেছেন, রামায়ণ মহাভারতের বড়নাতি[৭] এবং স্বেচ্ছাবীর মেজনাতি[৮] বাড়িটা নিস্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু দাদিরার জন্যে মন কেমন করছে বৈকি দানির আর তানতামার, উদ্বেগও আছে। তবে পেন-নেই।

পুনঃ যা বলেছেন, অধম বরাবরই দ্বিতীয়, অকাদামি বা সোঃ দেশ তো বটেই—

অজ্ঞানোদয়টা বাদ দিই, কি বলুন। যেটা সদাসর্বদা আত্মজ্ঞান জাগ্রত রাখে তা তো জানেন ঐ তিনজনের অনেক তলায় দ্বিতীয়ত্ব—দান্তে শেকসপিয়র ও দেবেন ঠাকুরের ছোটছেলের। কালকেই স্বাস্থ্য পিপাসায় হণ্টনে রবীন্দ্রটিলার সামনে সঙ্গিনীর[১০] প্রশ্নে বলতে হল : হয়তো এখন একমাত্র মেজর পোয়েট কিন্তু দেবেন্দ্রতনয়ের তলায় মাইনর মেজর পোয়েটমার্ক! দাম্পত্যহাস্যে আলোচনাটা আকাশজোড়া রঙীন আলোয় সমাপয়েৎ। গৃহিনী আজকাল সকালেই রান্নাটা সারেন ফলে হাঁটা সম্ভব।

কাল শৈলেনবাবু[১১] আবার খবরাখবর নিয়ে গেলেন, আপনি যাবার পরে একদিন তিনি বহুকাল পরে শক্তিপরীক্ষা ক'রে এসেছিলেন। কিন্তু নাইরোদ[১২] কে জমিটা বেচেই দিন। কাল শুনলুম naurpurটা, কৈলু মিঁয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের চক্রোক্তির ব্যাপারটা কি? অস্থির মতি বালক দেখছি। অজ্ঞানোদয়ই ভরসা—বাণীপীঠে[১৩] থাকা তো সুখকরই হবে। কি বলেন দেখুন ত্রয়ীকে বোঝাতে পারেন যদি।

না, জগিং প্রায়ই দরকার হচ্ছে না, দিবানিশির স্তব্ধতায়। এক আদ্দিন হৃদয় উত্তোক খেয়েছি। বাংলা কবিতার কপিটা প্রায় তৈরী এবার পাঠাব। ইংরেজি প্রবন্ধ অধিকাংশ বিলি গেছে গাববুবাবুর সঙ্গে। বড় বাণ্ডিল জোয়ী কাল পাঠিয়েছেন, তিনটে পাঠাতে হবে এবার। দৈনিক কবিতা নামক ভুলে ভর্তি পত্রিকা দেখেছেন কি? ভুলগুলির ভিকটিম প্রণতিই সমধিক।

উমার চিঠি পেয়েছি এত ভুগছেন কেন?

দিল্লি কে আর ত লাইন দিয়ে পাঠাবেন না চারবার।

আকাশ ঝকঝকে, হিমের হাওয়া। আপনার দাক্ষিণ্যে বেতার শ্রোত্রী কৃতজ্ঞ।

বিষ্ণু দে

১. উমা রায়, ক্ষিতীশ রায়ের স্ত্রী তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন।
২. রাজশেখর বসু, বিষ্ণু দে-র জামাইবাবু হতেন।
৩. শরৎ বসু জায়া, বিভাবতী বসু বিষ্ণু দে-র জাঠতুতো দিদি।
৪. বিষ্ণুদে-র কনিষ্ঠা কন্যা।
৫. বিষ্ণু দে-র তৃতীয় নাতি (দৌহিত্র)।
৬. বিষ্ণু দে-র কনিষ্ঠ জামাতা।
৭. বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আহিতাগ্নি চক্রবর্তী।

৮. বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় দৌহিত্র।

৯. রিখিয়া নামক দেওঘরের নিকটে গ্রামে একটি টিলা আছে যেটি কথিত আছে রবীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন।

১০. কবিপত্নী প্রণতি দে।

১১. নীরদ মজুমদার, রিখিয়ায় বিষ্ণু দে-র বিশেষ বন্ধু।

১২. অমিয় চক্রবর্তী।

১৩. ক্ষিতীশ রায়ের আশ্রয়।

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়কে

প্রিয়বরেষু, ১০/১০

চঞ্চল, আসবার আগে তোমার ছেলে দেখে আসতে গেলুম কিন্তু দেখা হল না। তোমাদের খবর কি? আশা করি বাচ্চা ও অমিতা ভালো হচ্ছে আরো।

সঙ্গের লেখাটা পছন্দসই লাগছে না এখন, তবু পাঠাচ্ছি কারণ মাস তিন আগে তোমার কথা ভেবেই লিখেছিলুম। লেখা নয়, আবেগটাই গ্রহণ কারো।

লিখছ কিছু? প্রবন্ধ? কবিতা?

অশোকের খবর কি? সে তো তোমার চেয়েও দুর্লভদর্শন। করছে কি? সেন্সাস্? না ইলেকশন? না রেশন? "সাহিত্যপত্র" কেমন লাগল? সময় হলে জানিও।

শুভার্থী বিষ্ণু দে

প্রিয়বরেষু,

তোমার পক্ষে দীর্ঘ অন্তর্দেশীপত্র পেয়ে যৎপরোনাস্তি খুশি। দেখা হলে, তুমি এলে আরো খুশি লাগত।

সায়ন আশা করি পছন্দসই কাজটি পাবে। অস্তিত্ব বিষয়ে যা লিখেছ, তা আমরাও শুনি এবং এখানেও হাড়ে হাড়ে বুঝি। প্রণতির নিজ ক্ষেতের আলু মূল ভক্ষ, তাতে

রুটিও কিছুটা হয়। দুধটা পাওয়া যায় এবং খাইও। দেওঘর থেকে পাউরুটিটা আনালে খাওয়া যায় অবশ্য টোস্ট করে খেতে হয়—এদিকে দাঁত পড়ো পড়ো। স্বাস্থ্যে লাভ হয়েছে, ছুতোর মজুর মিস্ত্রি সত্ত্বেও। অবশ্য আমি কিছুই করি না, বৎসরাধিক কাল ধরে বেরেন-প্যাগ্ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এসে অবধি মাত্র দুটো কবিতা লিখেছি। প্রবন্ধ হয়নি কিছু। কিন্তু তুমি যদি লেখো, গদ্যে ও পদ্যেও, তাহলে খুবই খুশি। কারণ চিন্তা ও জ্ঞানার্জন বড়ই দুর্লভ। সেটা এখন আরো বেশি বুঝি।

এ বাড়িটায় গ্রামোফোনের আওয়াজটা দারুণ খোলে। সেকালের পেটানো দেয়াল ও মেঝে, ঢাকা দালানটা লম্বাও খুব। একটা ভালো স্টেরিও-কম-সাধারণ গ্রামো থাকলে আরো জমতো।

তুমি একবার এলে ভালো লাগত। এবং আমাদেরও ভালো লাগত ... ... ইত্যাদি খাঁটি কথা।

প্রণতিকে যাদবপুর এক আধবার যেতে হবে। আমারও প্রকাশক ধরার ইচ্ছা আছে। আমরা ওমাসের দ্বিতীয়-কি তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় যাবার ইচ্ছা পোষণ করছি। আশা করি দেখা হবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে।

চঞ্চল,

তোমার ২৫ ৬ ছাপমারা পোষ্টকার্ড কাল পেয়ে ভালো লাগল।

তোমার মাতৃবিয়োগের খবর একটা কোথায় শুনি। শুনে মনে হল নিশ্চয়ই ভুল খবর। তোমার কাছে কিছুকাল আগে শুনেছিলুম, চোখ অপারেশনান্তে তিনি খুব ভালোই ছিলেন। অবশ্য তাঁর বয়সও হয়েছিল, নব্বই-এর ওপরে তো।

আবার সরকারের সঙ্গে মামলা কেন? যেন যথেষ্ট দুর্ভোগ নেই।

তোমার চোখের ডাক্তাররা কি বলেন? দোদোর জামাই বুঝি চোখের ডাক্তার? দোদোর ছেলেও তো ডাক্তার না? আর মেয়ে সংস্কৃতজ্ঞ? ডাক্তাররা স্বচ্ছ হাওয়াতে থাকতে বলে না—'চেনজ্'-এর জন্যে?

প্রণতির চোখ পুরো সারেনি। এখনও অসুস্থ চোখটি ফুলো ও শক্তভাবাপন্ন এবং যেন শ্লেষ্মাময় হয়—বেশ কষ্টকর। সময় লাগবে আরো। (কালো spotsও, আপনার মতো।)

অমিতা কেমন আছেন এবং সায়ন ?

তুমি একটু লেখো। আমাদের ভালোবাসা জেনো।

শ্রীবিষ্ণু দে

চঞ্চল,

পত্র পেয়ে সব অবগত হলুম। রোজ ভাবছি তুমি আসবে। আসছ না! বাস-ভাড়া নেই কেন ?

বাসভাড়া বাবদ ১৲ পাঠাচ্ছি। অতি অবশ্য আসবে। শুক্রবার ৫°৩৫-এ আসতে চেষ্টা কোরো।

বিষ্ণু দে

শনিবার

C/o K. P. Mitra

Civil Surgeon

1/10 Monghyr

প্রিয়বরেষু,

আসবার দিন লেবরেটরি থেকে ফিরে শিরঃপীড়া ও গাত্রব্যথা, ট্রেনে ও এখানে দুদিন তার জের। আশা করি রেকর্ডগুলি ঠিক পৌঁছেছে। দিয়ে আসতে পারি নি বলে লজ্জিত, ট্যাক্সি চাপতে গিয়ে চোখে পড়ল। মাধবও ভুলে ছিল। টেলেমেকস্ বেশ লাগল। ছান্দিক নাট্য আরো থাকলে জমত কি আরো বেশি ? এর পরে লেখা উচিত ডায়োনিসস্-এর বিপ্লববহ উন্মত্ত জয়যাত্রা।

বটুবাবু কি করছে ? মণীন্দ্রবাবু ফিরেছে ? পরিচয়-খবর কি ? বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম বারে বারে—ক্লেয়ারের খবর কি ? এখানে বেশ আছি। টিপির ওপর বাড়ী, বারান্দা থেকে নদী আর পাহাড় দেখা যায়। তবে এখনও দিনরাত পাখা খাচ্ছি। জুঁই ফুটছে এখনও। খাওয়া-দাওয়া তুলনায় এখানে সস্তা ও সুলভ। শত্রু মিত্রের রেডিও শুনছি আর খাচ্ছি। তিনটে রিভিউ লিখেছি আর চেষ্টা করছি লেবরেটরির কাজটা করতে। তারপর চঞ্চলবাবুর খবর কি ?

স্নেহের চঞ্চলবাবু,

এত বয়স কম, এখনই এত ভগ্নস্বাস্থ্য হলে তো চলবে না, আমার যে বন্ধুটি অচঞ্চল বরাবর। কবিতা প্রবন্ধ লিখলে নিশ্চয় শরীর ভালো থাকবে।

বিষ্ণু দে

চ,

কাল মীরার পাঠানো এক 'private and confidential' চিঠি, বোম্বাই-এর ব্যাংক, অব ইণ্ডিয়া থেকে। বেঃ শ্রীসায়ন চ্যাটার্জী।

আজ পরিচয় দিয়েছি সাক্ষীর চিঠি। সায়ন তাহলে বিজ্ঞানাদি ছেড়ে ব্যাংকে যাচ্ছে। চাকরি নিশ্চয়ই চাকরি হিসেবে ভালো। তোমার খবর কি? শরীর? মন? অমিতা? মা?

কিছু লিখলে? কবিতা ও প্রবন্ধ? লেখা দরকার।

আমরা হট্টগোলে কালাতিপাত করছি আসা ইস্তক। বর্তমান পর্বটা হচ্ছে বাড়ি সারানো থেকে সংযোজনা অবধি। অনেক রাজমিস্ত্রি ততোধিক মজুর। কতিপয় ছুতোর কানের ও স্নায়ুর শক্তি ধারালো করছে প্রবল গোলমালে। জিনিষপত্রও দেওঘর থেকে—এমন কি কলিকাতা থেকে আনাতে হচ্ছে। সত্যেন সঞ্চিত সাহায্য করেছে অনেক। পাঠাও কিছু, প্রণতির তো স্নায়ু ও বটুয়া প্রায় শূন্য হবার পথে। ঠাণ্ডা খুব পড়েছে। রোদ্দুরেই আরাম।

তোমার বিষ্ণু দে

চঞ্চল প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এখানে অনেক ভালো আছি। ধুলো, ধোঁয়া, হৈ চৈ কম।

তোমার শরীর ও চোখ কেমন? অমিতার শরীর ভালো যাচ্ছে না জেনে আমরা দুঃখিত। খবরাখবর দিও।

সায়ন তাহলে কলকাতার লোডশেডিং কর্পোরেশনে শিক্ষানবিশ হয়েছে। ভালোই তো?

সত্যজিতের অক্সফোর্ডের সম্মান জেনে ভালো লাগল।

এখানে রাস্তায় গোলমাল, ধূলো প্রায় নেই। চোখ নাক ভালো থাকে। তবে খাদ্যকষ্ট যানবাহনের কষ্ট আছেই। আনন্দ আছে, তাকে কয়েক মাস পরে ওর দেশে ছাড়তে হবে। ঢেংকানালে কাঠ কাটতে যায়।

তুমি এখানে এই গ্রাম্য স্থানে এলে খুশি হতে। একদিকে ত্রিকূট পর্বত, অন্যদিকে দিঘারিয়া। পুরুষ ও কোমল—দুই।

লেখক সমবায়ের কি খবর? তুমি কি ও পাড়ায় মাঝে মাঝে যাও?

চিঠি লিখো। খুব খুশি হব। এবং একবার এলে ভালো লাগত, তোমার ও আমাদেরও।

তোমার বিষ্ণু দে

কমল কুমার মজুমদারকে

C/o Dr. K P. Mitre,
Fort, Monghyr
২/৬/৫৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার কল্যাণে ট্রেন যথাসময়ে ছাড়ল, যথাসময়ে না পৌঁছলেও নিরাপদে এসে পড়লুম। এবারে বেশ সুখকর, গরম নেই, আছি ভালো। বিশেষ করে, বাড়ীর মেরামতী নরক থেকে এসে।

দিন দশেকে ফেরার ইচ্ছা। আপনি তো এখন গৃহস্থ? লিখছেন? ১৪ই বেরোবেন?

আমার অধমজনোচিত কথাটা মনে রাখবেন—টীকা বা ভাষ্যটা লিখে দেবেন, সার্তের সবচেয়ে দামী-কাজ হবে আপনার টীকা।

আশা করি রাধামাধবের ইচ্ছায় দয়াময়ী ও আপনি ভালো আছেন। আর গুণমুগ্ধ সেবক।

পপা কমলকাকাকে প্রণাম জানাচ্ছে। বিষ্ণু দে
২১/৬

প্রিয়বরেষু,

আজ আপনি বলেছিলেন আসবেন। যেহেতু আসার সম্ভাবনা কম, তাই চিঠি লিখছি। কাল্ বা পরশু ৫টা ৫॥টায় আসবেন ঠিক। T.A. Bill গুলি ফেরৎ এসেছে। কিছু সংশোধন করতে হবে।

আশা করি উভয়ে ভালো আছেন। সেবকাধম।

বিষ্ণু দে

১/১০ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা ২৬
৩০/১১

প্রিয়বরেষু,

কদিন আপনার দেখা পাই নি। ইতিমধ্যে ললিতকলা-র দুটি চিঠি পেয়েছি। তাঁদের শীঘ্রই বোর্ডের ও কৌন্সিলের মিটিং আছে। তার আগে তাঁরা সমস্ত ব্যক্তিক রিপোর্ট,

আপনার মন্তব্য বা টীকাটি,
দুটি চারটি প্রবন্ধের কপি,
ক্রীত জিনিষগুলির হিসাবনিকাশ
এবং জিনিষগুলি পেতে চান।

আপনি প্রথম তিনটি কি শীঘ্রই দিতে পারেন? অনেকমাস তো কোনো ১নং রির্পোর্ট পাঠাতে পারি নি।

আর, ক্যামেরার কাজ কি হ'য়ে গেছে?

আশা করি উভয়ে কুশলে আছেন। চিঠিটা প্রায় তাগাদার চিঠি হ'য়ে গেল, নিজগুণে মার্জনা করবেন জানি। বরদা-বাবুরও মুস্কিল, দশজন-কে খুশি করার কাজ। শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা ২৬
৩/৫

প্রিয়বরেষু,

তাহলে নাম ধরেই ডাকছি। তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষর কমেই খুশি হলুম। অভিভূতই হয়েছি সহৃদয়তায়।

কোনো লেখার পক্ষে আর কি প্রশংসা হতে পারে তুমি যা করেছ জলদাও নামক কবিতাটির? ব্যক্তিগত কথা বলেই অভিভূত হয়েছি, এবং সে ব্যক্তিগত কথা তো তোমারই, একজন কুশলী সংবেদনশীল আধুনিক সুকবির কারাবাসের পরের কথা।[১]

কবিতা এখানে সেখানে লক্ষ্য করেছি। ভালো লেগেছে এবং মনে হয়েছে ভবিষ্যতেও আরো লাগবে। এবারে সাহিত্যপত্র-তে শুনলুম জায়গা নেই। শ্রাবণে-তোমার কবিতা ছাপা হবে। প্রবন্ধ যদি লেখ, তাহলে সাহিত্যপত্রের লোকেরা খুশি হবেন। বাংলা গল্প উপন্যাস বা ঐ ধরণের কোনো বিষয়ে লিখতে পারো তো?

একদিন সাক্ষাৎ আলাপ হলে বেশ হয়। সুবিধা হলে কোনো রবিবার বিকালে আসতে পারো কি?

র‍্যাঁবোর কটি অনুবাদ তো সাহিত্যপত্রে বেরিয়েছিল। তুমি না দেখে থাকলে পাঠাতে বলতে পারি। শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

পরমপ্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৬ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি এবং কাজের বিবরণে খুশি বোধ করছি। দয়াময়ী সমভিব্যাহারে দুচারদিন কাটিয়ে গেলেন কৈ? বল্লেন আসবেন, গচ্ছিত করলেন। আপনার শ্রীপদার্পণের আশায়।

নোটস্ লেখা চলছে জেনে উৎসুকতর বোধ করছি। অশোক সেন কি বলেন? দেখা হয়? তাঁর আসবার কথা আছে, আপনাদের সঙ্গে।

দেশী ৩০্ এখন আপনার কাছেই গচ্ছিত থাকুক। চতুরঙের খবর কি?

দুদিন আপনার পৈতৃক হর্ম্য উহিরাবণঞ্চ ঝুলাদি ঝাড়াপোঁছা করেছি, দুদিন স্বহস্তে চীরচ্ছদ যষ্টিসহযোগে শৌচগৃহপাত্র পরিষ্কার করেছি।

মূষিকভুক্তাবশেষ বইগুলি গতবছরে বিরিঞ্চিধাম এসে ঝেড়েছি কিন্তু ডিডিটি সত্ত্বেও এবারে আবার মূষিককুলের জুলুমের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা ধরেছি। জঙ্গলসাফ ও সর্পনিধনও করেছি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

[কবি বিষ্ণু দে-কে প্রথম দেখেছিলাম রিপন কলেজে ১৯৪৩-এ। সুদর্শন, শান্ত, ব্যক্তিত্ববান মানুষটিকে দেখে সেদিনের কিশোর মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কাছে যেতে সাহস পায়নি। অনেক পরে বার তিনেক দেখা ও মুখোমুখি আলাপ হয়েছে। কিন্তু পত্রালাপ ছিল আরো বেশি অব্যাহত। তারই কয়েকটি এখানে ছাপা হল। ব্যক্তিগত চিঠি প্রকাশের ব্যাপারে আমার একটি সঙ্কোচ আছে। অবিনয়ের আশঙ্কাই সে সঙ্কোচের মূল। তবু চিঠিগুলি ছাপতে দিলাম। —যে ব্যক্তিত্বের জন্য বিষ্ণু দে বিশিষ্ট ছিলেন, তার কিছু ছায়া চিঠিগুলিতে আছে। আর আছে এক সহৃদয়, স্নেহশীল, আমন্ত্রণে মুক্তপ্রাণ বাঙালি ভদ্রলোক—যাঁদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে, তার পরিচয়। আত্মোন্মোচনে একান্ত বিমুখ মানুষটিকে দু একবার কথা বলাতে পেরেছি বৈকি! এর মধ্যে একখানি চিঠির লেখিকা শ্রীমতী প্রণতি দে। সে চিঠিটি এই পত্রগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হল কেন, তা চিঠিটি পড়লেই বোঝা যাবে।]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২.১.৮৯

১৫/১২/৫৯

প্রিয়বরেষু,

উপন্যাসটি [১] আমার ভালো লাগল, এবং আশীষকে দিয়েছি। ত্রুটি নিশ্চয়ই বার করা যাবে, এখন আমি সে বিষয়ে মন দিতে অপারগ, পরে হয়তো মনে হবে। একমাত্র ঐ কর্মীর সংস্থান একটু আকস্মিক, একক লেগেছে, সেকেলে স্বদেশীবিপ্লবীরা ঐরকম ভাবে আসতেন বোধ হয়। খুশি লাগল প'ড়ে, বাংলা উপন্যাসে যা দুর্লভ।

নরেন্দ্রবাবু [২] তো একদিন আসতে পারেন, পারেন না? দিনক্ষণ জানালে আমি নিশ্চয় থাকব। ২৫শে শুক্রবার চারটে থেকে ছটা? বা তিনটে থেকে ছটা? তোমরা সবাই এলে খুশি হব। শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

আমাদের বাড়ীটা লেক বাজারের সামনে উত্তরের রাস্তায় ঢুকে একটা পচাপুকুরের উত্তরপূব কোণে।

1/10, Prince Golam Muhammad Road
Calcutta-26
21/8

স্নেহের সরোজ,

তোমার পোস্টকার্ড পেয়েও বোধহয় অতিরিক্ত খুশি হয়েছি, অন্তত সেটুকুও লিখলে বলে! লেখা প্রবন্ধ তো আর পাঠাবে না, কবিতা তো লেখোই না, দর্শনদান তো করোই না!

রবীন্দ্রনাথ-এ প্রবন্ধটি [১] পড়েছি, তার পরিসরের মধ্যে প'ড়ে ভালোই লেগেছে। আমার জিজ্ঞাসা তৃপ্তি পাবে যদি এই আলোচনা বিস্তৃত করো সমস্ত রবীন্দ্ররচনাবলীর বিরাট তথ্যের উদ্ধৃতি উল্লেখে। কেন রূপক থেকে প্রতীকধর্মী কবিতা এল, কেন ইমেজ প্রতীক হ'য়ে উঠ্‌ল? কেনই বা হয় না? 'দুঃসময়' বিষয়ে তোমার কথা বেশ লাগল, শেষ স্তবকে রূপক ব্যাখ্যাতা মন জয়লাভ করল, যেমন করল 'উর্বশী'র শেষ স্তবকে। শেষ কটি বই-এর নিরাভরণতার পিছনে কি সমগ্র রবীন্দ্রজীবন ঐশ্বর্য জোগায়, যার জন্য প্রায় অর্থহীন আকস্মিকতায় 'সূর্যই' হ'য়ে ওঠে যথেষ্ট, যেমন হয় 'রূপনারায়ণ' বা 'ছল-নাময়ী'?

যা মনে আসছে, তাই লিখছি, কাজেই থামি। বক্তব্য বোধহয় বলা হল না।

তোমার বইদুটি পেয়ে খুশি হয়েছি, প'ড়েও। তর্ক নিশ্চয়ই করা যায় জায়গায় জায়গায়। যেমন, 'চতুরঙ্গের' শেষ অধ্যায় বিষয়ে তোমার মত আমার গ্রাহ্য লাগল না [২]। কিন্তু তুমি যে বিচারবুদ্ধিতে ও শ্রমস্বীকার ক'রে বইটি লিখেছ, তার জন্য তোমাকে অভিনন্দিত করি খুশিমনে।

অনন্তবাবুর[৩] সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়ই? তিনি বুধবার আসবেন, থাকব। আশা করি সবাই ভালো আছ।

বিষ্ণু দে

১/৪/৬৮

স্নেহের সরোজ,

তোমার ৩০শের চিঠি আজ পেয়ে খুশি হয়েছি। তুমি যে আমার একটি কবিতার উপরে আবার বড় প্রবন্ধ লিখবে, তা জেনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ বোধ করছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসুতাও। আশা করি এক্ষণ-এ দেখব। না হ'লে সাহিত্য-পত্রতে!

তুমি যে বিষন্নতার কথা লিখেছ, তা আমিও বুঝতে পারি। বার্ধক্যের ক্রমবর্ধমান দূরত্ববোধ ও নির্লিপ্তিচর্চা সত্ত্বেও। আশাভঙ্গের কথা বলেছ, আমারও সে মনের কষ্ট

হয়েছে ও হয়ও, রাগও হয় দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে। তবে অনেক বছর ধরে তো হচ্ছে, তাই আশাটাও থেকে যায় প্রবল—যদিও হয়তো ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষণের আত্মরক্ষক একটা অস্পষ্টতার দূরবীন চশমার মধ্যে দিয়ে। এবং ভেবে দেখতে চাই থেকে থেকে, যে অন্যেরাও অন্যরকম আত্মরক্ষার অস্পষ্ট কলাকৌশলে বা মনোলৌল্যে আশ্রয় চান কোন্ তাগিদে? অনেক সময়ে অবশ্য মনে হয় যে ঐ আশ্রয় চাওয়াটা নিছক মননের সংকট থেকে নয়, বা কর্মক্ষেত্রের গোলযোগেও নয়, হয়ত অহংকারের বা কেরিআর্-বাদী মনোলৌল্যবশতই।

যাই হোক তুমি যদি কাগজের অভাবে বা নৈরাশ্যে লেখা কমাও তাহলে অন্তত আমি খুবই দুঃখিত হই ও হব জেনো। তোমার উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতার আমি একজন মনোযোগী পাঠক। কিন্তু আজকাল দেখি কম, কবিতা তো দেখিই না। কবিতা লেখো না কেন? তোমার এক্ষণ-এর প্রবন্ধ পড়েছিলুম, ভালো অর্থাৎ শুদ্ধ সীরিয়াস এবং চিন্তাপ্রসূ।

আমাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, তবে কতদূর উত্তর দিতুম জানি না। আজকাল মনেও থাকে না বা সময়ে পড়ে না সব কথা। যেমন – পার্থকে[১] বোলো তো—John M. Cammett-এর বই-এর নামটির। নাম: Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism (Stanford University Press)। মার্কিন অনেক ইউনিভার্সিটির বই পাওয়ার বোধহয় একমাত্র ব্যবস্থা করতে হয় Oxford University Press-এর মধ্যস্থতায়। "মনীষা" বোধ হয় চেষ্টা করছে।

এরিকসনের আরও দুএকটি বই পার্থ পড়তে নেবে বোধ হয়। তোমরা সবাই সময় থাকলে পড়তে পারো।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

সাহিত্যপত্র-তে তুমি, পার্থ, নরেন্দ্রও কিছু লিখবে?

২৫/১৯

প্রিয়বরেষু,

তোমার—তাই তো? চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। পরিচয়স্থ[১] লেখাটি ভালো লেগেছে, তোমার অনেক লেখাই লাগে। তাই সাহিত্য পত্র-র প্রতি নিষ্ঠুরতায় আরো দুঃখিত। লেখা দিয়ে ফেরত নেওয়া। শুধু শনী-র বিষয়ে মন্তব্যটা ঠিক বুঝতে

পারি নি, সে কি সত্যিই অতটা প্রতিভস্বরূপ? উল্টোরথারূঢ়[২] তারাশঙ্করের লেখাটা আশ্চর্য symptomatic – raging, hysterical, Lear-এর মতো উন্মাদ কল্পনার তারাশঙ্করী বঙ্গরূপ। নয়?

কবিতা লেখা কি হল? উপন্যাস এখনও দেখা হয় নি, তারাও লেখকের মতো দুর্লভদর্শন।

আশা করি সপরিবারে সবাই ভালো। অনন্তবাবুদের খবর কি?

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা ২৬
২৭/১০/৭১

স্নেহের সরোজ,

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। পার্থ মাঝে মাঝে লেখে। এক আধবার পার্থ ও নরেন্দ্র এসেছেও। হ্যাঁ, তোমাদের বিষয়ে আমার আগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী। অনাবৃত সীমান্ত পড়েছি, ভালোই লেগেছে, যদিও সমালোচক বলতে পারে একটু ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তা হবেই বা না কেন? আমার নিজের কোনো কোনো লেখাও বোধ হয় হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কাব্য নাটক নিয়ে ভাবছ এবং লিখবে সেটা ভালো কথা, আমার নিজের পাঠ-বা দর্শনশ্রবণ কম, হঠাৎ হঠাৎ পড়েছি দেখেছি। ভূমিকায় বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আসেন প্রথমেই। কাব্যনাটক বলতে কি গদ্যকাব্যনাট্যও ধরা যায়? তোমার কি মত? ধরো, 'মুক্তধারা' বা 'রথের রশি'? পদ্যকাব্যনাটক 'চিত্রাঙ্গদা'-র অনুবাদ 'চিত্রা' দেখেছ? সে বিষয়ে ফর্স্টরের রিভিউ বেশ লেগেছিল। বুদ্ধদেব বাবুকে নিশ্চয়ই স্থান দিতে হয়, যদিও সেগুলি হয়তো খুব সুস্থ বা সময়োপযোগী বলে অনেকে মনে করেন না। আর, তরুণদের মধ্যে বোধহয় রাম বসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বেশ পরিচিত। মনীন্দ্র রায়ের নাটকটি[১] একটা বৈশিষ্ট্য পেয়েছে, সাম্প্রতিক জীবননাট্য প্রায়ই কেমন তুচ্ছতার denonement ছড়ায়, মনীন্দ্র সেটায় ভীষ্ম-নাট্য এনে ব্যাপ্তির সার্থকতা আনতে পেরেছে। তাই নয়? তোমার প্রবন্ধ পড়লে নিশ্চয়ই আমার অসম্পূর্ণ পাঠ ও মতামত

সাহায্য পাবে। কাব্যনাট্য বিষয়ে তাত্ত্বিক বিচারে এলিঅটের একাধিক প্রবন্ধে আমি অনেক জ্ঞান ও চিন্তার সূত্র পেয়েছি।

আশা করি তোমরা ভালো আছ।

শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে

তোমার "সংবাদ" ও "ইতিহাসে"র সমালোচনা পড়বার জন্যে উৎসুক।

১/১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,
কলকাতা-২৬
৭/৬/৭২

স্নেহের সরোজ,

তুমি তো দুর্লভ দর্শন, পার্থ [১] ও নরেন্দ্র [২] তোমার খবরাখবর দিলে, বইও উপহার পেলুম। [৩]

পড়লুম সবটা। তুমি ভেবেছ অনেক, মনোযোগ দিয়ে পড়েছও অনেক। ভালো লাগল।

আমার কবিতার বিষয়ে-যা লিখেছ, তা আশা করি পক্ষপাতদুষ্ট বলে লোকে ভাববে না। আমার অবশ্য তোমাদের পরিগ্রহণে এখনও একটু অস্বস্তি লাগে, পাছে মাথা মোটা হয়ে যায়!

আশা করি অপরিচিত পাঠকেরা তোমার বই পড়বেন। তাতে সকলেরই লাভ। আরো লেখো। গদ্য ও কবিতাও। উপন্যাসই বা নয় কেন?

আশা করি তোমরা ভালো আছ—যতটা থাকা যায়।

শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের
বিষ্ণু দে

৭//৬/৭২

স্নেহাস্পদেষু,

আজকেই তোমায় চিঠি লিখেছি। তারপরে এল তোমার চিঠি।

ঐ দুটো পাঠই হয়তো [১] আমারই করা। কোনটা তোমার পছন্দ? সেইটাই গ্রাহ্য। 'কবিতা কল্পনালতা'; উল্টেপাল্টে নয়, সবটাই পড়েছি, ভালো লেগেছে।

তোমাদের বিষ্ণু দে

Rikhia etc
৮/১২/৭৪

স্নেহের সরোজ,

তোমার ৪ঠার চিঠি কাল পেয়েছি। আশ্চর্য তৎপরতা, হয়তো বা তোমার গুণে। আমি ভাবছিলুম তোমাদের কথা এবং কালকেই-বাঁধনকে [১] উত্তর দিতে গিয়ে তোমাদের খবর চাইছিলুম।

তোমার ছাত্রীরা তো বেশ ভালো মেয়ে। [২] ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে খানিকটা সজীব কাঁচা মনের তাপ পাওয়া যায়, যা ক্লাস সম্পর্কের অতিরিক্ত। পাঠ্যজগতে ঘুরতে ঘুরতে এইরকম জিজ্ঞাসা পেলে তৃপ্তি হয়—তেত্রিশ বছর মাস্টারি তো করেছি। তবে 'ঘোড়সওয়ার' লেখাটা জ্বরের ঘোরে লেখা। প্রণতি৩ তার ইতিহাসটা মনে রেখেছেন। স্টিভনসনের উত্তর স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে ঘোড়া-ডোবার একটা গল্প বোধহয় একটা মনের রূপান্তর, মৈমনসিংহের মহারাজা শশীকান্তের হাতীর চোরাবালিতে ডোবা আরেকটি। ইয়ুং সেই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে জানাই, ফ্রয়েড-উত্তর অবচেতনতত্ত্বের বিবর্তন তারই দান। কোনো দানই তো একমাত্রও চরম দান নয়। যে কোনো বিজ্ঞানেই ক্রমান্বয়ে রূপান্তর হয় না কি? (ইয়ুঙের ব্যাখ্যাসহ একটি চীনা গূঢ়মনস্তত্ত্বের বই পড়ে আমার ভালো লাগে (final conclusion নয়, stimulation ব'লে), সুধীন্দ্রনাথও সেটি পড়েন এবং তাঁর পিতাকে 'পরিচয়'-তে রিভিউ করতে দেন। Richard Welhelm-এর চীনা থেকে অনুবাদ, টীকা ইয়ুঙের। যাই হোক, 'ঘোড়সওয়ার'-এর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎযোগ তার নেই। 'চোরাবালি'-র ভূমিকা লিখতে চান সুধীন-বাবু, অনেকদিন ধ'রে পাঠ-ও আলোচনা হয়, মূল বক্তা ওরকম ভালো শ্রোতা কমই পেয়েছে (রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এক মহান্ ব্যতিক্রম)। মজাটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ও কবিতাটা পত্রিকা প'ড়ে ভালো লেগেছিল। যখন বইটা বেরোল, তখন শান্তিনিকেতনী কতিপয় মান্যগণ্যজন 'গুরুদেব'-কে গিয়ে আতঙ্কিত ধিক্কার জানান্।

বাকিটা আমার স্ত্রী 'তোমায় জানাচ্ছেন'-যদিচ বিষয়টি অত কিছু গুরুতর নয়।

বরেন্দ্রপ্রসাদ রায় আমার এম-এ-র সহপাঠী বন্ধু। বন্ধু এখনও।

শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে

রিখিয়া দেওঘর, বিহার।
২২/১২/৭৪

স্নেহের সরোজ,

তোমার 'মহাশ্বেতা' বিষয়ে উৎসাহে ও প্রশ্নে প্রণতি [১] ব্যস্ততার মধ্যে ও পিঠে কিছু লিখেছেন। সুধীন্দ্রনাথও [২] ঐ কবিতায় উত্তেজিত হন।

তোমার উৎসাহে আমার …… বা বক্‌বকে মেজাজ আসছে। তিন নাতনিও তানতামা আর দানদানির কাছে জমিয়ে আছেন! গান, খেলা, ছুটোছুটিতে মেতে। সেই বাক্যবাহুল্য আমাকেও পেয়েছে।

জানো 'পদধ্বনি'-ও ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েত প্রবেশ—মানেরহাইম্‌ দুর্গ-প্রাচীর তৈরীর সময়ে। একটানাই লেখা। অর্জুনকে উল্টিয়ে। 'জন্মাষ্টমী'-র শেষ অংশের প্রথম কয়েক লাইন বছর উনিশে লেখা হয়, তারপরে হারিয়ে যায়, কিন্তু বেশ কয়েকবছর পরে এক দীর্ঘ কবিতার আবেগ আসে—বাখের fugue-এর মেজাজে। কিন্তু তার মধ্যে 'অস্তাচলে অন্ধকার', ছাড়াও 'উর্বশীও আর্টেমিস'-এর অন্ধকারে যাত্রা ও ডায়োটাইমা বা ডিয়োটিমা-কে সম্বোধন এসে যায়। এসব 'খবর' খবর মাত্র—তোমার ঔৎসুক্যেই। কাব্য নয়।

এসব দিক থেকেই 'অন্বিষ্ট' আমার মনে হয় গুরুভার হলেও পূর্ণতর। তাই নয় কি? '১৪ই' ও '১৫ই আগস্ট'—ঝোঁকের মাথায় লেখা ইত্যাদি।

অনেক বকলুম।

আশা করি তোমরা ভালো আছ। এখানে স্বাস্থ্য ভালো, তবে আমার শরীর—ও বয়সও—ভোগায়।

শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে

"মহাশ্বেতা" কবিতাটিও আমাকে খুব অভিভূত করেছিলো; যেমন সকলকে করে নিশ্চয়। ওটা যখন লেখেন তখন শরীরটা অনেকটা ভালো, মার্চের গোড়ার দিকে। সেটাও খুব ভোরে উঠেই একেবারে, মানে যাকে বলে একনাগাড়ে, লিখে ফেলেছিলেন। সাধারণত এই সময়টাতে ওঁর শরীরটা খুব দুর্বল ছিলো বলে অনেক সময়ে দেরি করে উঠতেন। আমরা ওঁকে জানাতুম না। আমার শাশুড়ী-মা নিজে চা করতেন, এবং পছন্দ করতেন সবাই এক সঙ্গে বসে খাবেন—শুধু ওঁর শরীরের দুর্বলতার জন্য এর ব্যতিক্রম হয় মাস কয়েক। কবিতা লেখার আগে বেশ একটা "ঘোর" বা অন্যমনস্ক ভাব, চোখে বিশেষ করে ধরা যেতো (এখনও লক্ষ্য করলেই যায়)—শরীর খারাপ

হলে আরো বেশী লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে পড়ে এরকম কথা উনি ছোট ভাইদের সঙ্গে বা চঞ্চলবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, আমার মজা লাগতো শুনতে, যে শরীর খারাপ থাকলে কবিতা লেখার মেজাজ ভালো আসে। যাই হোক, একেবারে লাইনটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখে ফেললেন। ঘোড়সওয়ারও বদল আর করেননি—"ওফেলিয়া" "ক্রেসিডার" লাইন বা কথা পালটেছেন। টুকরো টুকরো এখানে ওখানে লিখেছেন, মনে যখনই এসেছে। "মহাশ্বেতা" লিখে নীচে চা খেতে নেমে এসেছেন দেখে আমরা সবাই অবাক হয়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিলো বেশ একটা exhilaration হয়েছে। "ঘোড়সওয়ারকে" অর্ধেক লিখে ঘুমিয়ে পড়ে, পরে উঠে বাকি অর্ধেক লেখেন। মহাশ্বেতা যেন মহা আনন্দে লেখা। কোনো ক্লান্তি হয়নি, একটুও, পরে।

আমার জীবনে আমি এই একটা দোষ করেছি—diary রাখিনি। এমন কাজের চাপ ছিলো—প্রথম বছর কম, কিন্তু তখন আমার নিজের শরীরটা ভালো ছিল না, আর নতুন জীবনে অনেক কিছু শিখছিলুম, খুব তাড়াতাড়ি। তারপর স্কুলে কাজ, বাড়ীরও কিছু কাজ, এই করে diary আর লেখা হয়নি। এখনও মনে করি লিখবো, কিন্তু সময় সুবিধা হয়ে উঠছে না। আশা করি এর কিছুদিন পর থেকে পারবো, বাড়ীর কাজ শেষ হয়ে আসছে, ভাগ্যিস!

প্রণতি

Rikhia

Via Deoghar, S. P. Bihar

৮/১/৭৫

স্নেহের সরোজ,

তোমার চিঠি পেয়ে আমরা খুশি বোধ করছি। তোমাদের ঐ প্রকাশক তো খুব ভালো, সাহসীও বটে। তোমরা দুভাই তো বটেই, কিন্তু প্রকাশকও তো তারিফ করবার[১] মতো। আমি তো আরেকটা কবিতার বই তৈরি করে রেখেছি, বিশ্ববাণী ছাপবে বলেছে। দুটো প্রবন্ধের বই ছাপাবার ইচ্ছা ও একটা অনুবাদ কবিতার বইও। কথা হয়েছে মাঝে মাঝে প্রকাশক কারো কারো সঙ্গে, শেষ অবধি তাঁরা আসেন নি। দেখা হলে আগের দিনের দুএকটা গল্প বলব, বৃদ্ধের স্বাভাবিক ইচ্ছা, তাই নয়? বুদ্ধদেববাবু বন্ধুভাবে পরামর্শও দেন।

'জলদাও'-এর একটা ইতিবৃত্ত অলোকরঞ্জনকে[২] লিখে পাঠাতে হয়েছিল তাদের

হাইডেল্‌বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে। সেটা প্রায় দুটো ফুলস্ক্যাপ্‌ জোড়া। পরে সেটা পাঠানো হবে। আমরা প্রস্তাব করি যে এবারে মধুপুর না গিয়ে দেওঘরে এসো, রিখিয়া থেকে পাঁচমাইলটাক্‌। মধুপুরের চেয়ে খারাপ নয়, রিখিয়ার মতো ভালোও নয়—অবশ্য।

প্রণতি উৎসাহী। তিনি যা জানেন তা নিশ্চয়ই জানাবেন। তোমরা কাছাকাছি থাকলে সহজ হত। তাকে সব কথা সময়ে পড়ে না।

কিন্তু অরুণ সেন, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অশোক সেন, বৌধায়ন[৩]—অনেকে সাহিত্যপত্র নবপর্যায় বার করছে। তোমাদের সাহায্য চাই। মনে রেখো।

তোমাদের খবর আশা করি সব ভালো—যতটা সম্ভব।

পার্থ-কে বোলো তো, দুই ভাই মিলে বই লিখবে—এ প্ল্যানটা খুব ভালো লাগছে। নিশ্চয়ই বেশ ভালো বই হবে। Third person হিসেবে বলছি। যামিনীদা ঐ ভাষাটা বলতেন নিজের কাজ বিষয়ে—অন্তত আমাকে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

Rikhia

(Via Deoghar, Bihar)

২২/২/৭৫

স্নেহের সরোজ,

তোমার চিঠি ও 'অমৃত'-র[১] লেখাটি পেয়ে খুশি হয়েছি প্রণতি ও আমি। তুমি খুব পরিশ্রমী ছেলে বাপু। 'অমৃত' পাই, কিন্তু ঐ সংখ্যাটি দেখা হয় নি, তুমি না পাঠালে হয়তো দেখাই হত না। দু কপি 'ঘোড়সওয়ার' লাভ হল। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা তো ওঠে না, তাই খুশিই জানাচ্ছি।

বড় ঘোড়া ছোটবেলা থেকেই দেখতে ভালো লাগে। সেকালে মধ্য কলকাতাতেও দেখা যেত। দুই জ্যাঠার দুটো অস্ট্রেলীয় ঘোড়া ছিল, গাড়ি ছাড়াও তাদের দর্শন হত যখন সইসরা কর্তাদের দেখাতে বাড়িতে উঠোন অবধি আনত, আর রাঙা জ্যাঠাবাবুকে হাতে তুলে দানা খাওয়াতে হত, তাতে নাকি ঘোড়া খুশি হত। পাড়াতেই

কলেজ স্কোয়্যারেই পিসতুতো দাদা। ছুটির দিনে তাঁর শ্বশুর মোহনবাগানের এক কর্তাব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে ক্যালকাটা লাইট হর্সের সভ্য—ময়দানে যেতেন। দৃশ্যটা বেশ। তারপরে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় দফায় যখন পাড়ার গোলদীঘি তালা দেওয়া, তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাঁচিল টপকানো মিটিং-এ গোবেড়াং মার লাগাত সরকারী যমদূতরা। একদিন এক বালক বেগতিক দেখে এ রাস্তা ও গলি দিয়ে জনহীন রাস্তায় পালাচ্ছে এবং লাটের বডিগার্ড বাহিনী ও মাউন্টেড পুলিস ঘোড়ায় চেপে পাগলের মতো কলেজ স্কোয়্যার ও স্ট্রীট রাস্তা ও বাঁধানো পেভমেণ্টে ছুটছে। প্রায় বাড়ির কাছে এসেছি বলে গোলদীঘির পূর্বপথে ঢুকে পড়েছি দোকান বাড়ি ঘরদোর সব ভেতর থেকে বন্ধ। মনে আছে কৃষ্ণকুমার মিত্রর বাড়ির দেয়ালে লেপটে থাকাটা। মরি নি। আরেকবার ঘোড়ার কাণ্ড দেখি। হ্যারিসন রোডে মামার বাড়িতে মার সঙ্গে গেছি। রাস্তার দিকে এক নং উঠোনের তিনদিকে দোতলায় বারান্দা ও ছাদ। রাস্তা দেখছি, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িটাড়ি উধাও। দেখি বাবা দাদামশায়ের কাছে আসছেন। প্রায় এসে পড়েছেন, ফটক দারোয়ান বন্ধ করে দিয়েছে। একটা পাগলা ঘোড়া এদিক ওদিক ছুটছে লাফাতে লাফাতে। বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, প্রায় মাড়িয়ে ছুটে পালাল। বাবা ৬ ফুট রোগা শরীর নিয়ে রাস্তায় অজ্ঞান, একটু কেটেকুটেও গিয়েছিল। দৃশ্যটা খুব ছাপ দিয়েছিল। ঘোড়ার শক্তি! বড় বেশি বকছি। কিন্তু তার দায়িত্ব তোমারও খানিকটা। তাই নয়?

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

Yet, "the horse is a noble animal". দু'জনেই ছেলেবেলায় আলাদাভাবে Royal-এ চড়েছি। মজার না? জল দাও পরে হবে। মাথা ও মধ্যঅভ্যন্তর কাবু। এবং প্রণতি সংসার, মিস্ত্রি আদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

Rikhia,
S. Pargs, Bihar
4/8/75

স্নেহের সরোজ,

তোমাদের বই পেয়ে আমরা যে খুশি, তা বলাই বাহুল্য। প্রণতি এখন পড়ছেন,

নানা কাজের মধ্যে সময় করে। তোমাদের আর কি বলব? পড়ে যেমন খুশি হয়েছি, তেমনি অন্তত আমি একটু লজ্জিতও বোধ করি—বোধ হয় সেটাই স্বভাব।

আশা করি তোমাদের খবর ভালো। পার্থ-র পারিবারিক খবর কি? পূজোয় নরেণের বেলাবাগানের আস্তানায় আসছ তো ঠিক?

আমার হাতের অস্থি প্রচ্ছদ[৬] ছিন্ন পিষ্ট, ফলে লিখতে (বা দাঁত মাজতে! খেতে) লাগে। তাই শুধু খুশি জানিয়ে শেষ করি।

তোমাদের

বিষ্ণু দে

Rikhia
18th Aug. '75

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু,

আপনার ৭/৮ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনাদেরই কাছে আমাদের ঋণ বাড়ছে—সেটাই ঠিক। আসলে, সেটাও ঠিক নয়—কারুর কাছেই কারুর ঋণ নেই—অনুসন্ধানে ঋণের কথা আসেই না। তাই নয় কি?

আমারও[১] নিজের অনেকবার মনে হয়েছে-লিখি। আমি যা জানি। কিন্তু এতো কম জানি, আর ভালো তো লিখতে পারি না, তাই লেখা হয় না।

"ঢল" নামে আর "জোয়ারে" ওঠে—এখনও উনি বলছেন, তফাৎ। জলস্রোত পাহাড় থেকে নামা—"ঢল",—জোয়ার ওঠে সমুদ্রের থেকে নদীতে, নদীর জল স্ফীত করে, তাই না? তাই "জেগেছে" = উঠেছে। জোয়ার ওঠে, ভাঁটা নামে-নদী-সমুদ্রে জল ওঠা-নামার: flow and ebb tides, চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া জেগেছে—অর্থাৎ সচেতনতা। ওঁর অনেক আগেই এই ভুলটা ঠিক করা উচিত ছিলো। কিন্তু কবিতা লিখে বেশী revise করেন না, আর এ কবিতা তো একেবারেই করেননি। হঠাৎ record করবার সময়ে মনে পড়ে গেলো, পড়ে দিলেন!

ঐ "ক্লান্তি নেই" কবিতাটির শেষ পংক্তিতে আসবার আগেই "অপরিসীম স্বপ্ন" ও কবির "মনে কোনো ক্লান্তি নেই"-এর সঙ্গে বহির-বিশ্বের ছবির contrast আসছে—"ডালে ডালে শুকনো হাহাকার" "মাঠে অসাড় হিম", "আকাশে কান্নারও ক্লান্তি নেই"। কবির মনে একটা transformation, পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত। ভয় ভাবনা,

(success, failure) সব এখানে জড়িত, তাই কি মিশ্র সুর ? সংগ্রামী আশা ? তাই "আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার"—নীল আরে রং ante-তেও আছে), লাল—("রেঙেছে") রক্তের। কয়লার নীল আগুনের রঙেই উত্তাপ বেশী, লাল লোহা তো steel-এ পরিণত হয়। তাই মন ভিক্ষা চাইছে, কিন্তু সেই চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে অনেক নীল লাল স্তরের ব্যথার ব্যবধান। তবু 'সেই-পাওয়া'ই চাই, শান্তি সহজে নয়, এবং 'সেই চাওয়ার'ও ক্ষান্তি নেই।

প্রথম পর্বের "ডালে ডালে শুকনো হাহাকার" শেষ স্তবকে হয়েছে উন্নত, রক্তের রঙে, শুকনো আর নয় ফুলে,—"কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার" [ইংরিজিতে, rhetoric-এ যাকে বলে pathetic fallacy] "আমারই হৃদয়ের কান্তিও।" সেই জন্যই তোমাকে যে জেনেছে তাব আর জীবনে শান্তি নেই, কারণ সে তো সেই কঠিন উজ্জ্বল হীরা চেয়ে বসেছে ! [এখানে মনে করিয়ে দি "অঙ্গার" ও "হীরা" একই carbon, chemically transformed through the ages--তাই তো ? কাজেই "হীরা"টা anticipated হচ্ছে দ্বিতীয় স্তবকের "অঙ্গারে"ই।] হীরার মতো হতেই হবে, এই শুকনো হাহাকারের জীবন বদল করে। তার পর্বে পর্বে আছে আঘাত নীল, লাল-কালো অঙ্গারই তো শাদা ঝকঝকে (scintillating) উজ্জ্বল হীরা ! "হীরা" উজ্জ্বল সংহত জীবনও বলতে পারা যায়—আকাঙ্ক্ষিত সেই উজ্জ্বল জীবন, যা বহু কষ্টে আয়ত্ত করা যাবে।

আমি ওঁকে এই লেখাটা দেখিয়েছি, এবং বলেছিলুম এটা আদর্শের কবিতা। political—দেশপ্রেম। উনি বললেন, ওটা এক হিসাবে প্রেমেরও কবিতা। ওঁর কবিতায় সব জড়িয়ে যায়, দেশপ্রেম, প্রিয়ার প্রেম। Ambiguity থাকতে পারেই, অনেক কবিতাতেই থাকে—জীবনও হীরা, এবং যে সেই জীবনকে খুঁজছে, তাকেও তো হীরা হতে হবে। যামিনীদার কথা মনে পড়ে যায়। Nature-এ straight line বা সহজ পথ, নেই। ওদিকে সবই সহজ ! জানি না, আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কিনা—আমি যা বুঝেছি। লিখলুম।

আমার চিঠিটা লিখতে একটু দেরি হয়ে গেলো, মধ্যে বাঁধনের আগে জ্যোতি সাহা ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমাদের বাড়ীতে নয়। কিন্তু খুঁজে থাকবার জায়গা জোগাড় করতে হলো। একটু ঝামেলা, এখানে থাকবার ভালো বাড়ী পাওয়া খুব কষ্ট। তারপর সব ব্যবস্থা করাও। তারপর এল, সনত ইলা। আর, ক্রমাগত মিস্ত্রি খাটছে। একটু হয়রাণ হতে হয়, মাথা ঠিক থাকে না। আর, আমি ঠিক স্পষ্ট করে বোঝাতেও পারি না, যতটুকু বুঝি। ওঁকে দিয়ে লেখাতে পারলে ভালো হোতো,

কিন্তু উনি বেজায় bored হয়ে যান। নিজের কবিতা বিষয়ে। আর, এখন তো হাতটায় ব্যথা, কমই লিখতে পারছেন। কবিতাই কম লিখছেন। গত বছর এ সময়ে অনেক বেশী কবিতা লিখেছিলেন। তবু আপনারা প্রশ্ন করলে, আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করে করে হয়তো লিখতে পারবো, বা ওঁকে প্রশ্ন করলে, উনিও হয়তো উত্তর দেবেন। আপনাদের মতো serious reader দের উনি উত্তর দেন। অনেকে এতো বাজে চিঠি লেখেন, রাগ হয় আমারই!

আপনারা যদি পুজোর ছুটিতে দেওঘরে আসেন, তাহলে রিখিয়ায়ও আসতে পারবেন মাঝে মাঝে। অনেক প্রশ্নের উত্তর এবং অনেক কবিতার background মিলে যাবে।

আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমাদের শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে শেষ করি। ইতি—

আপনাদের

প্রণতি দে

আমি তো খুশী হবোই—সে তো জানা কথা। কয়েকটা ছাপার ভুল আছে—আমি সব correction করে রাখিনি, করে রাখবো। কিন্তু, একটা কথা লিখতে ইচ্ছা করছে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, জোর করেই বোধ হয়, "সুতরাং 'নেমেছে জোয়ার'-ই কবিতার লজিক-সম্মত পাঠ"। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম আগেও, এবং কাল সন্ধ্যায় আবার। তাতে উনি বললেন, "ইচ্ছা করেই বদলেছি। কারণ জোয়ার 'জাগে', ভাঁটা নামে। আর তিনটে 'জ'-র শব্দ ভালো, alliteration ও। আমার ইচ্ছা হল alliteration টাও আনি!" ২

আরেকটা কথা আমার বলবার আছে (for whatever it is worth) ৫২ পৃষ্ঠায় "সোনার তরীর" মতো শ্রাবণ মাসে ধানকাটার..

[এবং পাল তো ভরা বাতাসে তুলে চালালে খুব তাড়াতাড়ি নৌকো চলে—আমি তো আমার মামারবাড়ী কুমিল্লার কাছে নদীতে অনেকবার চেপেছি, এ রকম] মেরু ও বালুচর, নদী ও হিমশিলাপাত, বরফ ও মৃগতৃষ্ণিকা একই সঙ্গে উপস্থিত।" এখানে কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো মেরু ও বালুচর-expanse এর জন্য আনা হয়েছে। নদীর সঙ্গে তো হিম শিলাপতি হয়, glaciated regions এ avalanche নামে তো, যেখানে নদী থাকে তার কাছেই, বা পাশেই। বরফ ও মৃগতৃষ্ণিকা—সেটাও কি expanse, বা wilderness

(ice and sand and marriage) তাই বোঝাতে চান নি ? আমার "inward eye" এ vast expanses তার মধ্যে ঘোড়া (animal energy) এই সব ছবি এসেছিলো ! যাহোক, এসব আমার মনের কথা কিছু মনে করবেন না। বইটা দারুণ ভালো হয়েছে- নামটাও ! কঠিন বিষয় এতো ভালো করে, সহজ করে দিয়েছেন—আপনাদের আমি কি বলে সাধুবাদ জানাবো ? আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করি। প্রণতি দে

১৬/৬/৭৭

স্নেহের সরোজ,

তোমার ১৪/৬-এর চিঠিটি পেয়ে খুশিই হয়েছি। 'কোমলে গান্ধারে' নামে পাণ্ডিত্যের ক্ষতি হয়েছে ? [১] গান্ধার ও কোমলগান্ধার—শুদ্ধস্বর ও 'বিকৃতস্বর—এই তো ?' নানা কোমলে গান্ধারে' হলই বা, কি বলো ? শুদ্ধস্বর গান্ধার, আর বোধহয় তো চারটি 'বিকৃতস্বরে' 'কোমল' আছে, তাই না ? কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত আর কোমল নিষাদ—চারটি তো ?

ও নিয়ে যদি কোনো লেখক পণ্ডিতোচিত মন্তব্য করেন, তাহলে সরোজ ও পার্থ এবং অধমের কি বলা উচিত ? নিশ্চয়ই সত্যজিৎ[২] সবল ওই উক্তি লিখেছেন ? তোমার তাতে কি বিশেষ কিছু সমালোচনা হল ? কারণ নানা নিষাদে মধ্যমে ক্ষেত নদী-ইত্যাদিতে তো সবটাই জড়িত।

তাই না ? সংশয় তো থেকেই যেতে পারে—কোনো পাঠকের। নিরুপায়। সত্যজিৎ নিশ্চয়ই কিছু—ইংরেজিতে যাকে বলে mean করেন নি। আশা করি তোমরা গোটা পরিবার ভালো আছ।

প্রণতির চোখ অনেক ভালো। আপাতত বুড়ো আঙুলে ব্যথা ও স্ফীতিতে আঙুলটি অক্ষম প্রায়। আমার ডান হাতের ব্যথা ও স্ফীতি এখনও ভোগাচ্ছে এবং অন্য কষ্টও আছে। তবু আমি তো।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে

২২/৭/৭৭

Rikhia, Deoghar, Bihar
8/4/12

স্নেহের সরোজ,

তোমার চিঠি পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি। তাহলে তোমার পছন্দ হয়েছে নতুন কবিতার বইটা? লিখেছ: পড়ছি—পরে আরো লিখব। লিখো। প্রণতি ও আমি খুশি হব। পার্থ কি বলে?

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বিষয়ে হয়তো কোনো দিন লিখতে পারব। এখনও ডান হাত বিকল।

'দেওঘরে যাবো' লিখেছ, রিখিয়ায় এলে দেখা হবে, খুশি হব। নরেন্দ্র আগে বলেছিল যে তার হাতে বাড়ির সুবিধা আছে।

'উত্তরে থাকো মৌন' বিষয়ে লিখবে কিছু?

আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। এবং পূজোয় দেওঘরে আসছ।

তোমাদের বিষ্ণু দে

৮/২

স্নেহের সরোজ,

প্রকাশ্য পুরস্কারাদির আমি বিরুদ্ধে, বিব্রত বিধ্বস্ত[১] হয়ে আছি। কিন্তু দেখছি যে —ঐসব পেলে তোমার খবরও পাওয়া যায়।

তোমরা আমার শুভ-ইচ্ছা জেনো।

তা, ঐ সা: পত্র-র[১] বক্তৃতামালা পাঠে তোমার মতামতটা শেষ অবধি জানাও না কেন? জানিও। পার্থও যেন জানায় তার মতামত।

তোমাদের বিষ্ণু দে।

Rikhia
via Deogher
Bihar
22/6/74

স্নেহের সরোজ,

মনে হচ্ছে তোমার ১৩-র চিঠির উত্তর দিয়েছি, কিন্তু নিশ্চিত নই। তাই আবার

লিখছি। তোমার বর্তমান বাসস্থান বর্ণনা পড়ে একটা ধারণা হল, এ বাড়ি আমার জানা নেই বোধহয়। কলকাতা কি নৈহাটির চেয়ে ভালো হত? তোমরা তো নৈহাটির পুরানো বাসিন্দা, তাই না? তাতে সুবিধা জনক। আমাদের যেমন কলকাতার দক্ষিণের দিকে থাকা হল ১৯৩৫ থেকে, তার আগে পটলডাঙায়।

আমার স্ত্রী[১] তোমার মারফত মীরার[২] কথা শুনে খুশিই নিশ্চয় কিন্তু তা তাঁর স্বভাবমতো বললেন, নিশ্চয়ই যা খুশি তাই আমার বিষয়ে লিখেছ। বিনয় তাঁর মজ্জাগত।

পরিচয়ে-এ তোমার লেখা ভালো লাগল। বাঁধাই-এর গোলমালটা তোমার লেখার ক্ষতি করে নি। তোমার আগামী বই পড়বার আগ্রহ আছে। তা তো জানোই। আবার দিন কয়েক হল কবিতা লিখছি, জানি না কেমন হচ্ছে: একইরকম একঘেয়ে বোধ হয়। তোমরা আমাদের শুভেচ্ছা জেনো এবং ভালো থেকো।

তোমাদের বিষ্ণু দে

প্রথম পত্র

১। ১৯৫০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি উদ্‌ভ্রান্ত। এমন সময়ে 'জল দাও' কবিতাটি পড়ি। কবিতাটি পড়তে চিত্তের ব্যর্থতাবোধ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। সে কথা জানিয়ে কবিকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এই পত্রে কবি দিলেন তাঁর বিনীত উত্তর।

দ্বিতীয় পত্র

১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিনতাসের খেলা' উপন্যাস সম্বন্ধে বলছেন

২। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

তৃতীয় পত্র

১। গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' নামে যে সংকলনটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছিল, তাতে আমার 'রবীন্দ্রচিত্রকল্পে' বিষয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলছেন।

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তরের প্রথম সংস্করণ।

৩। অনন্তকুমার চক্রবর্তী।

চতুর্থ পত্র

১। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

পঞ্চম পত্র

১। পরিচয়ে আমার একটি প্রবন্ধে শশী (পুতুল নাচের ইতিকথা) সম্বন্ধে আমার মন্তব্যে বিষ্ণু দে সম্মতি দেন নি।

২। এই বছর শারদীয় উল্টোরথে তারাশঙ্করের উপন্যাস—যতদূর মনে পড়ছে 'যোগভ্রষ্ট'।

ষষ্ঠ পত্র

১। মনীন্দ্ররায়ের 'ভীষ্ম' কাব্যনাটক।

সপ্তম পত্র

১। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

৩। আমার 'কবিতা কল্পনালতা'।

অষ্টম পত্র

১। 'ক্রেসিডা' কবিতার একজায়গার পাঠভেদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। তার উত্তর,
২। এসেম পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত আমার বই।

নবম পত্র

১। ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত।
২। আমার ছাত্রীদের বিষ্ণু দে-র কবিতা 'আমাদের মেয়েরা' পড়ে শুনিয়েছিলাম। তাঁরা খুব তারিফ করেছিলেন।
৩। কবিপত্নী প্রণতি দে।

দশম পত্র

১। কবিপত্নী প্রণতি দে
২। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

একাদশ পত্র

১। পার্থপ্রতিম ও আমার দ্বৈত রচনা সংকলন 'কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে'
২। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।
৩। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়।

দ্বাদশ পত্র

১। সাপ্তাহিক 'অমৃত পত্রিকায় আমার লেখা 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার নির্বিষ্ট পাঠ।

ত্রয়োদশ পত্র

১। এখানি শ্রীমতী দে-র লেখা। 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার' না 'জেগেছে জোয়ার' (যা রেকর্ডে আবৃত্তিতে রয়েছে) তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। প্রশ্ন ছিল 'ক্লান্তি নেই' কবিতা প্রসঙ্গে।

চতুর্দশ পত্র

১। রিখিয়ায় একটা দুর্ঘটনায় বিষ্ণু দে হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। চিঠি লেখাই তখন দুষ্কর ছিল। তবু ··

২। আগের চিঠির জের চলছে।

পঞ্চদশ পত্র

১। পরিচয় পত্রিকায় আমাদের 'কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে' গ্রন্থটির আলোচনা লিখেছিলেন ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী। তিনি গ্রন্থনামে একটু দোষ ধরেছিলেন।

ষোড়শ পত্র

১। রিপন কলেজের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অধ্যাপক।

২। ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী।

সপ্তদশ পত্র

১। আকাদমি পুরস্কার পেলেন বলে চিঠি দিয়েছিলাম।

২। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা বিষয়ে যে বক্তৃতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন, সাহিত্যপত্রে যা ছাপা হয়েছিল।

অষ্টাদশ পত্র

১। শ্রীমতী প্রণতি দে।

৩। আমার গৃহিনী শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিষ্ণু দে সম্বন্ধে শ্রীমতী দে-র ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা সেবা আবেগকে পত্নীত্বের আদর্শজ্ঞান করেন। সে কথা স্মারকে জানাতে এই প্রত্যোত্তর।

Professor Bishnu Dey,
1/10, Prince Ghulam Mohamed Road (off Rash Behari Avenue)
Calcutta,
INDIA

October, 1956

Dear Professor Dey,

Through our mutual friend, Professor Shils of Chicago University, I have received a copy of your Bengali translation of my poems, for which I thank you, and also the very striking canvas by the eminent Bengali painter, Mr. Jamini Roy. I must thank you most warmly both for translating my poems, and for the gift of a painting by such a well-known artist, which I shall treasure.

I find that although we had some correspondence with you about the translation of my poems some years ago, we do not appear ever to have heard from your publisher, and one of my colleagues who deals with such matters will be writing to you so that we may in the usual way regularise the matter and have a contract drawn up.

With best wishes,

Yours sincerely,
T. S. Eliot

টি. এস. এলিয়টের চিঠি ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে

রিখিয়া, দেওঘর, বিহার
২২।১১।৭২

প্রিয়বরেষু,

অনেকদিন ধরে ভাবছি তোমায়, সুবিধা হলে কদিন কাটিয়ে যেতে বলব। পপামীরারা সব আমাদের প্রতিষ্ঠিত ক'রে ১৫ই ফিরে এসেছে। এখন স্থানাভাব নেই এই কৃপণকুঠিতে। তোমার কোনো জরুরি কাজ না পড়লে কদিন থেকে যাবে? হতাশ হবে, জায়গাটা এমন কিছু মনোহর নয়, মর্মান্তিকমনোহারিত্ব মনে। তবু তোমার পোয়েট্রি বেঙ্গলী উৎসাহ তো আছে। তাই শেষ অবধি তোমার ঠিকানা উদ্ধার করে এই আমন্ত্রণ। একটা শোবার ঘর পাবে।

পপামীরা লিখেছে যে তোমার বাড়িতে এবার যাবে। কিন্তু ওদের যাওয়ার অনেক বাধাবিপত্তি ঘটতে পারে এবং তোমাকে নাও পেতে পারে। তাই আমিই জাড্য দূর করলুম এবং তোমার ঠিকানা পুনর্সংগ্রহ করলুম। যদি আসো, তাহলে তুফান এক্সপ্রেস সুবিধা, সকালে ৯-৩৫, ৮নং প্লাটফর্ম। জসিডিতে নামবে ৪·৫ বিকালে। বৈদ্যনাথদেওঘরের গাড়ি ছাড়ে সাড়ে চারটে নাগাদ। দেওঘরে অবশ্য সাইকেল রিক্সা-বা টঙা-ও যাওয়া যায়। জসিডি স্টেশনের বাইরে পাবে। ৪/৫ নেবে বোধ হয়। মাইল নয়েক হয়। দেওঘর থেকে মাইল পাঁচেক, রিখিয়া, হাট ছাড়িয়ে বাবুডি। সোম, বেস্পতি, শনিবার বম্বে জনতা ১২·২৫-এ ছাড়ে। জঃ ৬·৪০ লেট্ না হলে, তারপরে ৭টা ৭·২২-এ দেওঘর। রিখিয়ায় সন্ধ্যার পরে আসতে অনেক চালক ভয় পায়। তবে পাওয়া যায়। ভাড়া কমে বাড়ে, ২ থেকে ৩, ৩॥! নাহলে মিথিলা এক্সপ্রেস, রাত্তিরে ছাড়ে, ভোরে জসিডি।
ঝঞ্ঝাট বিস্তর। তবে তুমি যুবক এবং আমার মতো অপারগ নও।
আসতে পারলে পরোপকারও করতে পারবে। পপারা কিছু রেকর্ড দেবে, বেশি না ৭/৮টা লং প্লে। হয়তো কিছু ওষুধও। চেষ্টা কোরো আসতে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

১৫।৯।৬৪

স্নেহের পার্থ,

তোমার সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ডে দুঃসংবাদে[১] আহত বোধ করছি। কয়েকদিন ধরে তোমাদের সকলের বিষয়ে অস্পষ্ট উদ্বেগে ভাবছিলুম তোমাদের খবর ভালো তো। সরোজদের তোমাদের সকলের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি।

রবিবারে প্রমোদ[২] আমাকে দুঃখে খবরটা দিয়ে গেল। ইচ্ছা হল তখুনি সরোজকে লিখি। কিন্তু কি লিখব, ভাবলুম!

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। শোক যখন স্মৃতির পরোক্ষ স্নেহৈশ্বর্য পায়, তখন সওয়া যায়।

তোমাদের

বিষ্ণু দে

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মিতুর মৃত্যুসংবাদ।

২. কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়।

রিখিয়া,

২৩।১২।৭৩

স্নেহের পার্থ,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি, অবশ্য বিব্রতও। বৃদ্ধ ব্যক্তি, শারীরিক কারণে বৎসরাধিক কাবুও বটে। ধরা যাক ঐ দুটিই কারণ, যার জন্যে এমন লেখা হচ্ছে না, যা তোমাদের খুশি পাবে। অন্য কারণও থাকতে পারে। লেখকের পক্ষেও, পাঠকের পক্ষেও, তাই না? নতুন পরিবেশ এখানে আসে নি, নাহলে তোমার লেখা পড়তুম। বই ছাপানোর অসুবিধার কথা যা বলেছ আমারও প্রায় তাই বলার অবস্থা, জানো? প্রবন্ধের, কবিতার, অনুবাদের বই পড়েই আছে। আশা করি তুমি, তোমরা সুস্থ আছ। সকলকে শুভেচ্ছাসহ

বিষ্ণু দে

২।৭।৭৭

স্নেহের পার্থ,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি—স্বভাবতই। হ্যাঁ, নীরদের[১] মন্তব্যাদি দেখেছি। নীরুবাবু মস্তলোক। কিন্তু যামিনীদার বিষয়ে ভ্রান্ত। যামিনীদা নীরদকে তাঁর বাড়ি-ও-চিত্রশালায় যেতে বলেছিলেন একাধিক বার কিন্তু ছোট শিল্পীর যা হয়, বড়র কাছে কিছুতেই যান নি। রূঢ়তায় তো বাহাদুরি। আমরা তাঁকে বহুকাল চিনি—ক্যালকাটা গ্রুপের সময় থেকে। কি আর করা যাবে বলো! অবশ্য আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগরিমা কাজে লাগে বোধহয়।

একদা যিনি মার্কসীয় আন্দোলনে জড়িত ছিলেন তিনি তাতেও ছেদ কাটেন। ইংল্যাণ্ডে যখন, তখন, এবং ফ্রান্সেও, প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায়, প্রতিষ্ঠানে তিনি সাহায্য পান। কিন্তু সেসব কথা গৌণ। নীরদ নিশ্চয়ই দক্ষ চিত্রকর কিন্তু তাঁর প্রেরণা মনে হয় আত্ম-গরিমায় বোধ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরোজকে পাকড়ে নরেনের সাহায্যে তার জানা দেওঘরের বাড়িতে এসো না কেন? পুজোর ছুটিতে আমাদের বাড়ি ভরে যায়, আমাদের পরিবারের সবাই প্রায় আসে, কেউবা কম দিন কেউবা বেশি।

প্রণতির[২] চোখ একেবারে সারে নি, তবে অনেক ভালো।

আমার ডান হাত এখনও ব্যথিত, হাতের লেখা নিয়ন্ত্রিত থাকে না।

তোমরা আশা করি ভালো আছ। মাঝে মাঝে খবরাখবর দিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে

করুণাপ্রসাদ[৩] কি বলে? রিখিয়া, দেওঘর বিষয়ে? করুণার চিঠি আমার স্ত্রী ও আমি পেয়েছি।

১. প্রখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদার।

২. কবিপত্নী প্রণতি দে

৩. করুণাপ্রসাদ দে।

২৯/৬/৬৬

স্নেহের পার্থ,

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম, কবিতা পড়ে'ও। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারছি না। কয়েকটি কাজের হাঙ্গামায় ক্লান্ত লাগে। সাহিত্য-পত্র-ওয়ালাদের কবিতাগুলি দেব, তাদের পছন্দ হলে ছাপবে।

গান্ধিজীর নেতৃত্বেই প্রথম ভারতীয় রাজনীতি কৃষকমজুরের মধ্যে পৌছল, সে চারিত্র্য আগে আসে নি। সেই চারিত্র্যই সাম্যবাদের আরম্ভে প্রেরণা ছিল। অন্তত থাকা উচিত ছিল। কাজেই ভূমিকাটায় মহত্ব নেই কি?

আশা করি তোমরা ভালো আছ। আমি একটু কাবু আছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

৭/৭/৬৭

স্নেহভাজনেষু,

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। অরুণ[১] যদি নৈহাটি যাবার আগে এদিকে আসে, তাহলে তাকে "লুথর" বইটি দেব তোমায় ধার দিতে। তুমি এরিকসনের কোন বই পেয়েছ? Childhood and society? Insight & Responsibility? না, Psychological Innes?

তোমার 'চতুরঙ্গ' প্রবন্ধটি পড়েছি এবং ভালো লেগেছে। অবশ্য এও মনে হল যে তুমি স্থানসঙ্কুলান বা অন্য কোনও বাধাও তোমার বক্তব্য সব কথা বোধহয় বলো নি। তাই কি? তোমার লেখায় আস্থা বেশি বলেই মনে-হওয়ার ঐ প্রশ্নটা করতে পারলুম।

সরোজ[২] ও তুমি দুই ভাই সাহিত্যপত্র-কে পুষ্টি দেবে আশা করি। সরোজ কি আজকাল গল্প বা উপন্যাস এবং কবিতা লেখে? আর তুমি?

তোমরা সবাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী জেনো। নরেন্দ্র[৩]-কেও জানিও। অনন্ত[৪]-র কি খবর? তোমার আর সত্যজিতে[৫]-র ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকা পেয়েছি।

তোমাদের

বিষ্ণু দে

১। "বিষ্ণু দে—এ ব্রতযাত্রায়"-এর লেখক অধ্যাপক অরুণ সেন

২। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৪। অধ্যাপক অনন্ত কুমার চক্রবর্তী

৫। অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী

২২/৬/৭১

স্নেহের পার্থ,

তোমার চিঠি পেয়ে বেশ লাগল এবং তোমরা মোটামুটি সুস্থ আছ জেনে। সাহিত্যপত্র-র তোমার ও সরোজের প্রবন্ধ ভালো লাগল। সরোজ বড় কম লেখে। নরেন কেমন আছে?

কবিতা তো আমি প্রচুর লিখি। গত আড়াই তিন মাস লেখা প্রায় হয় নি। যেটা আমাকে পীড়া দেয়, কারণ লেখার habitus এ বিশ্বাস করি তো। অনেকদিন পরে তাই একটা লিখে নিজেরই স্বস্তি হল, সেটা 'অমৃত'কে দিয়েছি।

"আমাদের শিল্পকলার সমাজপ্রেক্ষিত মঞ্চ কোনও আলোচনার বই" আমার তো জানা নেই। আমার খুচরো লেখা সাহিত্যের ভবিষ্যতে আর মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা যা আছে তা ছাড়া আর কিছু বোধ হয় লিখি নি।

মাওৎসেতুঙের কবিতা পাওয়া যায় না। অনুবাদ হয়েছিল অধ্যাপক তান য়ুন সান্-এর ইচ্ছায় ও সাহায্যে এবং তাঁর ছেলে তান্ চুঙের সঙ্গে ব'সে ব'সে প্রায় একমাস ধ'রে খেটে।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। যামিনীদা তাঁর ছবি বিষয়ে যখন বলতেন, তখন মাঝে মাঝে বলতেন: থার্ড্ পার্সন্ হিসেবে বলছি এই কাজটা ইত্যাদি। সেই থার্ড্ পার্সন্ হিসেবে বলতে পারি যে তোমাদের এই রিদের বিষয়ে উৎসাহ আমাকেও,—আমার স্ত্রীকেও উৎসাহ যোগাচ্ছে। কিন্তু ধন্যবাদ তো বাহুল্য হবে।

'স্মৃতিসত্তাভবিষ্যতে'র তারিখ তো লিখিনি, মনেও নেই। তবে ঐ বই-এর সমসাময়িক, আগের বই-এর পরবর্তী কবিতা। আমার কাছে সব বই পত্রিকা এখন নেই। তবে প্রবীরগোপাল রায়-এর অসাধারণ উদ্যম এবং 'সাম্প্রত' পত্রিকায় সাহিত্যপত্র-র ১ম-১৭শ খণ্ডের পঞ্জী (?)। তিনি বোধ হয় আমার বইটই নিয়েও একটি সংখ্যা করেন। সেটি এখানে নেই। তোমরা তো 'সাম্প্রত' দেখেছ। প্রবীরবাবু সিঙ্কিতে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী কলকাতায় স্কুলে পড়ান। ঠিকানা: ২২, কে. সি. কাঠুরিয়া লেন, কলিকাতা-৫৭। অরুণ সেনও হয়তো বলতে পারবেন।

জানো, আমার স্বভাবজ আলস্য বা বিনয় বা ভ্রান্ত গর্বের কারণেই বোধ হয় আগে কবিতা টবিতা বা প্রবন্ধের কপি রাখতুম না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গঞ্জনা দিয়ে তারপর থেকে কপি করে ছাপতে দিতুম। তারিখ দিতুম না। আরেক বন্ধু ক্ষিতীশ রায় তারিখ দেওয়ানো করালেন। তা সত্ত্বেও দেখছি স্মৃঃসভঃর ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। লজ্জিত ও দুঃখিত বোধ করছি।

সরোজের আবৃত্তির সার্থকতা ও অজিত পাণ্ডে-র গান শুনে তোমার ছেলের[১] ঐ উৎসাহ আর গেয়ে ওঠা খুব ভালো লাগল। তার নাম কি? তোমাদের বাড়িতে এখন কটি শিশু? আর বৌমাদের নাম?

'পরিচয়' কেন জানি না, পাই নি।

'অয়রিডিকে' মুখ্যত Gluck-এর অপেরা শুনে লেখা। গ্লুকের সঙ্গীত আমায় তন্ময় করে, এখনও করে। আর আইসায়ার খেদ তো ওল্ড্ টেস্টামেন্টের বৃদ্ধ পুরুষের ল্যামেন্টেশন্স-এর আইসায়ার personaয় লেখা।

আমাদের একবার কলকাতায় যেতে হবে। ৩/৪ এপ্রিল যাবার ইচ্ছা, ফিরব ৩য় সপ্তাহ শেষে। আমার পক্ষে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর, তবু যেতে হবে।

তোমরা নিশ্চয় সবাই ভালো আছ। যতটা এখন সম্ভব।

শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের

বিষ্ণু দে (কিঞ্চিৎবাক্‌বহুল !)

চিঠিটিতে তারিখ নেই। ডাকবিভাগের ছাপও পড়া যাচ্ছে না। শ্রীযুক্ত প্রবীর গোপাল রায়ের পঞ্জীটির উল্লেখে হয়তো আন্দাজ পাওয়া যায়। চতুর্থ লাইনে··· বিষয়ে বোধহয় বইয়ের বিষয়ে হবে।

১. অত্রি বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তকুমার চক্রবর্তীকে

১।১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,
কলিকাতা-২৬
২২।৮।৭৪

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি লাগল। নৈহাটির সাহিত্যিক কেউ এলেই তো সকলের কথা জিজ্ঞাসা করি অবশ্য ঐ সুযোগ কমই হয়। সকলেরই তো কাজকর্ম থাকে আর যাতায়াত নামক ভয়াবহ ব্যাপারটাও কম নয়।

তাই আপনাকে যে একদিন আসতে বলব তাও পারছি না। আশা করি কোনো না কোনো সময়ে দেখা হবে। আপনারা ভালো থাকুন—চাই।

সরোজদেরও আমার কথা বলবেন। নিজের ও মেয়েদের ডাক্তারী ব্যাপার-জনিত কারণে রিখিয়া থেকে এসেছিলুম। আসছে মাসে ৪।৫ তারিখে ফিরে যাবার ইচ্ছা।

আপনি কোথাও লিখলেন? লিখবেন?

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

পুঃ আপনার চিঠি পেয়ে আমরা খুব খুশি।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে

রিখিয়া

৯/১/৭৭

প্রিয়বরেষু

কবিতা বেশি লেখা হয় না, চিঠিও তাই। ডান কব্জির ভাঙাটা এখনও সারে নি।

কবিতা কবে দিতে পারব, জানি না। লেখা কম, আর আর্থিক প্রয়োজনে কোথাও কোথাও দিতে হয়। আপনাকে কবে দিতে পারব জানি না।

আপনার জিজ্ঞাসা বোধ হয় ঠিক, সুধীন্দ্রনাথ বই পেলে অনেককেই উষ্ণ চিঠি লিখতেন কিন্তু প্রশংসা তাঁর মুখে কমই শুনেছি, অনেক কবিরই বিষয়ে। বোধ হয় সেটাই তাঁর সৌজন্য ছিল। কি মনে হয়?

ফেব্রুয়ারি মার্চ নাগাদ হয়তো যেতে হবে, আমার স্ত্রীর চোখের অপারেশন হয়েছে বেশ কয়েকমাস, ডাক্তারদের আরেকবার দেখাতে হবে।

আমার সার্জেন ডাক্তারও আমি গেলেই বাড়ি আসেন এবং পরীক্ষা করেন। এঁদের কাছে তাই বহুবছর ধরে কৃতজ্ঞ আছি।

আশা করি আপনার খবর ভালো। প্রফুল্লবাবু কেমন আছেন? শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

কার্তিক লাহিড়ীকে

১/১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা-২৬

১৬।১।৫৫

সনমস্কার নিবেদন,

আপনার চিঠি ও লেখা পেয়ে খুশি হয়েছি। কবিকর্ম বিচারে ধৈর্য ও বিনয় বিষয়ে যা লিখেছেন, তা অবশ্যই মানি।

আমার কবিতার বিষয়ে যা লিখেছেন, তা মোটামুটি তো ভালোই লাগল। মতভেদ যদি থাকে, সেও স্বাভাবিক, লেখকের তো নিজের বিষয়ে অনেক অবাস্তব ধারণা থাকে। সে বিষয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করি। তবু আপনি জানতে চেয়েছেন তাই ভাবছি কি লিখি। ৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "প্রথম জীবনের কবিতাগুলিতে বহুল পরিমাণে কল্লোলীয় উচ্ছ্বাস এবং আবেগ থাকা সত্ত্বেও"—"উর্বশী ও আর্টেমিস"-এর কবিতার

কথা বলছেন কি? অবশ্য "চোরাবালি"র অনেক কবিতা, সব নয়, তার আগে লেখা। "সন্দীপের চর"-এর আগে "সাতভাই চম্পা" নামে একটি জনপ্রিয় বই ছিল।

পরে, এলিয়টের শিক্ষার ফলে ধ্বনিপ্রবণতার কথা বলেছেন, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

যাই হোক্, আপনার প্রবন্ধে আমি উপকৃত ও খুশি। ধন্যবাদ জানবেন।

বিষ্ণু দে

পুঃ আপনার লেখাটি কি ফেরৎ পাঠাব? না, কোনো কাগজের সম্পাদক-কে দেবার চেষ্টা করব?

[বিষ্ণু দে-র কবিতা নিয়ে আমার প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি যতদূর মনে পড়ে নবযুগ আচার্য সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্র'-এ প্রকাশিত হয়।]

১।৮।৭২

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি (টেলিগ্রাম পেয়েও খুশিই হয়েছিলুম)। তা সে যাই বলুন।

জিষ্ণুকে বলেছি উপন্যাসালোচনাটি পড়তে। আমি আগেই কয়েকজনকে বলেছি আপনার বইটি আমার বিশেষ ভাবে ভালো লেগেছে।*

আপনার প্রকাশ্য প্রবন্ধটি সাহিত্যপত্রের পক্ষে কর্মকর্তা সুদীপ্ত ও তন্ত্র বন্ধু জিষ্ণু সাঃপত্রে ছাপতে উৎসাহী। ১।১০-এই পাঠাতে পারেন। আমিও একবার তাহলে দেখতে পারি কি সমালোচনা করলেন!

আক্রান্তি! ও ক্লান্তি চলছেই, তবে ভিড় কমেছে। আশা করি বর্ষাটা প্রাণ খুলে নামলে স্বাস্থ্য উন্নতি হবে, এ বয়সে যতটা সম্ভব। শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

[* আমার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের বই 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি।' প্রবন্ধটি বিষ্ণু দে-র গদ্যরচনা সম্পর্কে।]

১।২।৬৪

প্রিয়বরেষু,

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলুম, তাহলে আপনি আমার আগের চিঠি পান নি দেখছি। অশোক খাতাটি দেওয়ার পরে আমি সেটি পড়েছি, আপনার মুগ্ধ পাঠকের পক্ষে সমালোচনা, তাও ডাকে করা মুস্কিল। উপন্যাস হলে জমত আরো। মনোলোগ্ কি গল্পটিতে সব জায়গায় প্রয়োজন ? কারণ চরিত্রটি উপন্যাসোচিত বিস্তার অন্যদিকে তো পায় নি। আপনার লেখা পড়তে বেশ লাগে ; সীরিঅস্, সানুকম্প মানবিক।

আশা করি ভালো আছেন সপরিবারে।

'সমাচার' তো পাই নি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

[খাতাটি লাল বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতা, রুলটানা 'কলকাতা সমুদ্র'-র পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি যখন পাঠাই তখন প্রথম পাতায় দু-তিনটি নাম দেওয়া হয়েছিল। উপন্যাসটির খাতাটি যখন ফিরে আসে, তাতে দেখি আর একটি নাম—কলকাতা সমুদ্র, হাতের লেখা স্বয়ং বিষ্ণু দে-র, আমি কেনো দ্বিধা না করে উপন্যাসটির নাম রাখি কলকাতা সমুদ্র, উপন্যাসটি 'সাহিত্যপত্র'-এ ছাপা হয় কয়েক সংখ্যা ধরে, উপন্যাসটির শেষে আশীষ মজুমদারের একটি ছোট্ট প্রবন্ধ যুক্ত হয় কলকাতা সমুদ্র সম্বন্ধে।]

১২।১০

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেলুম একটু আগে। গল্প লিখেছেন জেনে আগ্রহান্বিত হলুম। গল্পটি আনছেন ? ১৭ই আমি থাকছি না। টিকেট কাটা হয়ে গেছে ১৬ই-র জন্য। কিন্তু আপনি কি অশোক সেন-কে গল্পটি দেখাবেন ? সেও আপনার উপন্যাস পড়ে খুশি ছিল। তার বাড়ী ৬৩ সি মহানির্বাণ রোড।

ফিরবেন কবে ? আমি বোধ হয় ফিরব ১৮ই নভেম্বর।

বিষ্ণু দে।

[ত্রিপুরার একটি বিখ্যাত পুজো কেরপুজো, সেই পুজোকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট উপন্যাস লিখি, দুর্ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়।]

1/10, Prince Golam Muhammad
Road, Calcutta-26
18/5/63

প্রিয়বরেষু,

আর কারো লেখা হলে বোধ হয় সমাচারের ছাপার অত্যাচার সইতে পারতুম না। যা হোক, আপনার উপন্যাস মাহাত্ম্যবলে শেষ অবধি পড়িয়েছে। পপার মতো আমি উচ্ছ্বসিত হব না, বিশেষ করে সে হয়েছে তাই সম্ভবত আমার স্বাভাবিক ডায়ালেকটিক মাথা চাড়া দেয়। তবে হ্যাঁ, সীরিঅসনেস নভেলটিতে স্পষ্ট, এবং সে গুণটি আজ দুর্লভ মহাগুণ। ছন্দটি অসমান লেগেছে, সেটা কি আপনার লেখা না সমাচারের নানান রকম ছাপার জন্য? বই ছাপা হবে? তখন পড়লে নিশ্চিত হব। নিউরটিক সমাজে নিউরটিক গুণী যুবকের বর্ণনে ছন্দ হয়তো অসমান হয়; কিন্তু কতটা ও কিভাবে? যেমন, কেতকী-কে আলিঙ্গন করতে যাওয়ার পরে যে লজ্জা ও গ্লানিবোধ কতটা স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয়?

আপাতত তর্ক রেখে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

[শারদীয় সমাচার (১৯৬২)-তে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' নামে আমার একটি উপন্যাস ছাপা হয়। কিন্তু ঐ নামে আর একটি উপন্যাস-এর অনেকদিন পর প্রকাশিত হয় বলে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী নামটি বদলে দিতে হয়। উপন্যাসটি পুস্তিকাকারে বের হয় প্রায় বাইশ বছর পরে 'অভী' নামে ১৯৮৪ সালের বইমেলায়।]

বাঁধন সেনগুপ্তকে

১/১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,
কলকাতা-২৬
৬।৯।৭৩

স্নেহের বাঁধন,

পরশু কাল দুদিন ধরে আমাদের রিখিয়া-চিন্তা ভাবিত করছে। তাই তোমাকে আজকেই লিখছি।

আমার দিদির কালকেও setback-টা সারে নি। ফলে আমরা চিন্তিত। এবং চিন্তার সুরাহা না হলে রিখিয়া-যাত্রা করতে পারব না। সুতরাং তোমার ২২শে যাব বলে ছুটি চাওয়াটা ঠিক হবে না। সুতরাং তুমি যদি কালীপূজোর মুখে ক'দিন ছুটি নাও, তাহলে বোধ হয় সেটাই যুক্তিযুক্ত হবে। পপারা[১] তখনও থাকবে। তখন সময়টাও সুখকর হবে। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে জীবনধারণ আরামপ্রদ হয়। পপাদের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরতে পারবে।

তাছাড়া যে বাড়িতে এবার থাকব, সেটিতে বাস্তবিকপক্ষে তিনটি ঘর। তারারা[২] অক্টোবরের গোড়ার দিকে ফিরবে। পরে তোমার থাকার সুবিধা হবে।

ভুল বুঝো না। সকলের দিক থেকে ঐ সময়টাই তোমার পক্ষে ভালো হবে।

গোপালবাবুর ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললে ?

আমার দিদির জন্যে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

1/10, Prince Golam Md. Road
Calcutta-26
8/9/73

শ্রীমান বাঁধনবাবু

স্নেহাস্পদেষু,

কাল তোমার কাছে চিঠি লেখার পরে ঠিক হল যে প্রথম কটা দিন সাবেক বিরিঞ্চি-ধামেই[৩] থাকব, তারপরে আমরা নবকুটিরে[৪] উঠে যাব। হাঙ্গামা; কিন্তু উক্ত-ধামে বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে তুমি দিন কয়েক থাকতে পারবে। ছোট কিন্তু দৃশ্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ঘর।

কাল নির্মাল্যবাবুকে[৫] লিখে দিয়েছি।

বিষ্ণু দে

পু: তাই টিকেট রিফণ্ড করছি না।

রিখিয়া,
সাঁওতাল পরগণা, বিহার
১০/১০/৭৩

স্নেহের বাঁধনহীন বাবু,

তোমার দারুণ কাগজে সুন্দর হাতের লেখায় বেশ চারু চিঠি পেয়ে আমরা সবাই যারপর নাই খুশি। কদিন ফাঁক ছিল, তারপরে মিস্ত্রিদের কাজ চলছে। এবং বৃক্ষ-রোপণোৎসবে ও কর্তনে সবাই ব্যস্ত। সূর্যচন্দ্র মেঘও ব্যস্ত।

তুমিও নিশ্চয়ই ব্যস্ত, থিয়েটার বন্ধুবান্ধবী নিয়ে। সুতরাং তোমার বেশি সময় আর নেব না।

তোমার চিঠিটিও পাচ্ছি না যে মিলিয়ে লিখব। প্রতিশ্রুত বিজয়ার পত্র আসে নি। আশা করি তোমাদের সকলের খবর ভালো। ইতি—বিষ্ণু দে

'পরিচয়'[৬] পাঠাতে পারবে? কষ্ট না করে?

পোঃ রিখিয়া, সাঁওতাল পরগণা,
বিহার
২৯/১০/৭৩

স্নেহের বাঁধনভাঙা,

তোমার চিঠিটি বেশ লিখেছ, আমরা পত্রপাঠ খুশি ও উত্তরত্বরিত।

পপারা ৫ জন, তারা ও তার পুত্রবর, ইরাসত্যেশ[৭] ও দুই পুত্র কাল কলকাতায় গেল। আমরা দুজন আছি, মিস্ত্রি খাটছে, খাটবেও। এক বন্ধু ডাক্তার হয়তো আসবেন। প্রেসক্রিপসন চাই।

তোমার বাবার[৮] রাজনৈতিক ব্যাপারটা তুমিই তাগাদা দিয়ে আদায় কোরো। থিয়েটারে কি নাটকে কি চরিত্রে করছ?

পরিচয় পেয়েছি। পাঠিও না। বাগান এখনও মাটিই প্রায়। ইট্-রাম্না এখন হবে না, হলে জানাব, তুমি তো ঘরতোলা-বিশারদ। সত্যেশ প্ল্যান আলোচনা (ঐ ঘর সংক্রান্ত) ক'রে গেল।

লেখ-পত্রটি কি সঠিক বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে খবরাখবর দিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

রিখিয়া,
১৮/১১

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ১৫-র পত্র পেয়ে সবই অবগত হলুম। যুবাপুরুষ তো, খুবই ঘুরে বেড়াতে পারো। ডকটর তো। আবার যাত্রাও[৯] ক'রছ। বাহাদুর। লোকনাথ[১০] তাহলে তোমাদের এনটারটেন্ করেছে ভালো। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত[১১] বহুকাল চেনেন এবং পছন্দ করেন।

লীলাদার হাড়ভাঙা·········এখনও সারে নি—পুরোটা। কলকাতার হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন মাসখানেক।

রুগী দেখছেন বাড়িতেই। প্রণতি[১২] রোজ 'ঘা-টা' ড্রেস করতে যান। সারছেন। আপাতত শেষ করি।

শুভার্থী বিষ্ণু দে

তথ্যসূত্র

১. পপা—বিষ্ণু দে'র একমাত্র পুত্র ড. জিষ্ণু দে, অধ্যাপক। সরকারী কলেজে অধ্যাপনারত।

২. তারা—বিষ্ণু দে'র কনিষ্ঠা কন্যা অধ্যাপিকা উত্তরা বসু। স্বামী ড. সঞ্জিত বসু বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসুর পুত্র। অধ্যাপিকা বসু লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে অধ্যাপনারত।

৩. বিরিঞ্চিধাম—চা-ব্যবসায়ী বি. কে সাহা পরিবারের অবসর-যাপনের জন্যে নির্মিত রিখিয়ার কুঠীর নাম।

৪. নবকুটির—রিখিয়ায় বিষ্ণু দে'র কেনা নতুন করে সাজানো বাড়ি।

৫. নির্মাল্যবাবু—রিখিয়ায় বিষ্ণু দে'র প্রতিবেশী, নির্বাচিত মুখিয়া এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক।

৬. পরিচয়—কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা।

৭. ইরা সত্যেশ—ইরা বিষ্ণু দে'র বড়ো মেয়ে ও প্রথম সন্তান রুচিরা চক্রবর্তীর নাম। স্বামী ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী, প্রখ্যাত ভূগোল-বিদ্। বর্তমানে আই, আই, এম (জোকা) -এ কর্মরত। শ্রীমতী চক্রবর্তী নব নালন্দার সঙ্গে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত আছেন।

৮. তোমার বাবার—লেখকের পিতা শ্রীভবেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর স্বতন্ত্র সেনানী পেনশনের কথা কবি লিখেছেন।

৯. যাত্রাও করছ—বর্তমান লেখক শ্রীবাঁধন সেনগুপ্ত একদা চীৎপুরের একটি পেশাদারী যাত্রা দলে এক বছর অভিনয় করেছিলেন।

১০. লোকনাথ—কবি ও নাট্যকার ভাটপাড়ার শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য। একদা তিনি কলকাতায় ও দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি কাব্যগ্রন্থের নাম—'বাবুঘাটের কুমারী ইলিশ'।

১১. রবীন্দ্রকুমার—অধ্যাপক ও সুলেখক (দিল্লী জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়) রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। একদা ইনি কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর ছিলেন।

১২. প্রণতি—কবি বিষ্ণু দে'র স্ত্রী অধ্যাপিকা প্রণতি দে।

অরুণ সেনকে রিখিয়া

স্নেহের অরুণ,

তোমার ১৮/১১/৭৭ চিঠি আর ২১-এরও চিঠি পেয়েছি। কালান্তর ও পরিচয়-ও পেয়েছি। রেজিস্ট্রীযোগে তো খরচ বেশ হল। শৌরীনকে ও চঞ্চলকে পাঠাবে জেনে খুশি হয়েছি।

'টপ্‌পাঠুংরি-র সিনেট প্রথম সংস্করণে ১৯৩৬ বোধ হয় ঠিক তারিখই দেওয়া হয়েছে। অথবা হয়তো ১৯৩৭-এ 'কবিতা'-পত্রেই প্রকাশিত হয়। সঠিক মনে নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাদুটি বিষয়ে আমার কিছুই এখন মনে নেই। সেদুটি দেখে আমি, সময়-কে 'টপ্‌পাঠুংরি' লিখি নি। তুমি ঠিকই লিখেছ ভিন্ন ঈসথেটিক্‌সের গদ্য কবিতা, রাবীন্দ্রিক মেজাজের নয়। তাই না?

জ্যোতিরিন্দ্র-র স্বরলিপি ও রেকর্ডিং যদি বেরোয়, তাহলে সবদিক থেকেই আমরা সবাই খুশি হব।

দীপেনের শরীর একটু ভালো হয়েছে? আশা করি দেবেশের দাদার শরীর আরোগ্যের দিকে।

দীপেরেন গল্প বা উপন্যাস (?) পড়ে উঠতে পারি নি। পড়ব।

তুমি সামনের সপ্তার পরে যখন খুশি এসো। আমরা খুশি হব। এই সময়ে নাতনীটা ছাড়া মাধব ও তার স্ত্রী মুখুজ্যের মেয়ে ও জামাই ও নাতনিরা আসতে পারে কবে আসবে জানিও।

শুভার্থী বিষ্ণু দে

স্বজিৎ ঘোষকে

১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা-২৬
৮/৭/৭২

স্নেহের স্বজিৎ

তোমাদের কথা কদিন ধ'রে মনে হচ্ছে। হরিসাধন[১] আমার প্রথম ভালো ছাত্র, মহাউৎসাহী ও পরিশ্রমী ছাত্র। বহুবছরের এই ভালোবাসার যোগ বিচ্ছিন্ন হল। অবশ্য তার কষ্টকর অসুস্থ অপারগ অবস্থা বোধহয় আরো কষ্টকর ছিল।

তোমরা আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহ তো জানোই। আর কি লিখব আজ! ইতি—

বিষ্ণু দে

১। বিষ্ণু দে সংখ্যার সম্পাদনা যিনি করেছেন, তাঁর পিতা কবির ছাত্র-অধ্যাপক হরিসাধন ঘোষ।

বিষ্ণু দে-র গল্প সমগ্র

একদা বিষ্ণু দে লিখেছিলেন—"আমার ও অন্বিষ্ট তাই / আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে / প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে / বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্ণা।" এ এমন এক বয়স, যখন মেঘে মেঘে গতি আর স্থিতির মিলন আর সন্তাপ। এমনই বয়সে কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন কিছু গল্প, যা অনেকেই জানেন না। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর গল্প এবং বিশেষ করে উপন্যাসগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার পর আজ আর আমরা বলতে পারি না যে সেগুলি নেহাৎই বন্ধুর পথে সৃজনমন্থনের খেয়ালী উৎসার মাত্র। আমাদের আর সংশয় নেই যে এ তাঁর মননের এক ভিন্নতর উন্মোচন—যা গদ্যের পথে-প্রান্তরে ছাড়া ঈপ্সিত প্রকাশ রূপ পেত না। বিষ্ণু দের সংকলন হতে যাওয়া এই গল্প কটির ক্ষেত্রে এমন কোনো দাবী করা হয়তো হবে অযৌক্তিক।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার বড়ো একটি বাঁকে বিষ্ণু দে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর অবদানের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু অস্বীকৃতি হবে অশোভন। রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—"তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায় দেখা গেল।" প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত বিরূপ সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হলে যে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে এমন কথা বলেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। সমর সেন 'পূর্বলেখ'-এ বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে হয়েছিলেন আনন্দিত। অরুণ মিত্র 'সাতভাই চম্পা' পাঠ করে তার প্রবলবেগ উদ্যম এবং তীব্র মানসিক সচেতনতার প্রশংসা করেছিলেন। আর সুধীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি স্পষ্ট —"আপনার সৃজনীশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, এবং অন্ততঃ আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।" এ সব স্মরণে রেখেই বলা চলে, বিষ্ণু দে তাঁর বিশিষ্টতার কারণেই আলোচ্য হয়ে যান নানা ভাবে। বড়ো কবির সমগ্র রচনাবলিই অনুসন্ধেয় হয়ে ওঠে পারম্পরিকতার টানে। কালানুক্রমের সচেতনতা নিশ্চয়ই জরুরী কিছু কৌতূহল নিবৃত্ত করে। গল্পগুলিকে পাঠ করা যেতে পারে সেই সূত্রেই। কিন্তু কবে লেখা হয়েছিল গল্পগুলি?

একটি হিসেব দাখিল করা যাক :— পুরাণের পুনর্জন্ম / লক্ষ্মণ—প্রগতি, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩৪

ফিরে ফিরতি—প্রগতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

বাসর রাত্রি—প্রগতি, আষাঢ় ১৩৩৪

সুররসিক—ধূপছায়া, কার্ত্তিক ১৩৩৫

বন্ধু—প্রগতি, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

পৌরাণিক প্রশাখা—কল্লোল—কার্ত্তিক ১৩৩৬

হিরো—প্রগতি

সৌর ট্রাজিডি—ধূপছায়া

একটি নামহীন গল্প—

শেষ তিনটি গল্পের রচনাকাল আমাদের জানা নেই, শেষ গল্পটি অপ্রকাশিত এবং নাম নেই। এছাড়া পাই 'নির্বাহ' নামে একটি অনুবাদ গল্প (হারুণ তাজিয়েফ) যা প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। এই তাঁর গল্পগুলির হিসেব, যদিও পরিচয় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রুস্তের উপন্যাসের কয়েক পৃষ্ঠার অনুবাদ এবং অনেক পরে ভেরকরের একটি উপন্যাসের অনুবাদের কথা বিষ্ণু দের অনেক পাঠকই জানেন।

১ম গল্পটি লেখা হয় বিপ্রদাস মিত্র ছদ্মনামে বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি'তে প্রকাশিত "পুরাণের পুনর্জন্ম / উর্মিলা" রচনাটির টানে। বুদ্ধদেবের লেখাটিতে তৎকালীন সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে উর্মিলার জীবনের ব্যর্থতার কথা আনা হয়েছিল বাংলার সামাজিক পরিবেশে। মনে হয়, 'প্রগতি"র তরুণ লেখকরা চাইছিলেন মহাকাব্যের প্রথাসিদ্ধ গাম্ভীর্যকে সমকালীন জীবনের পটে ও উপলব্ধিতে যাচাই করতে। একই নামে একই পত্রিকায় ৩য় একটি লেখা (প্রভু গুহঠাকুরতা) এই কথাই প্রমাণ করে। বিষ্ণু দে তাঁর গল্পে উর্মিলার প্রতি সহানুভূতি জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখান লক্ষণ চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক জটিলতা। সে সময়ের বন্ধুদের ভাষায় বিষ্ণু দে ছিলেন বইয়ের পোকা, অমলেন্দু বসুর ভাষায় তাঁর ছিল hydroptique thirst, তাই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও চিত্রে তার সমান অন্বেষণ—এ সময়ের বিভিন্ন গল্পে চিহ্ন আছে সে অনুশীলনের।

বিষ্ণু দের গল্পগুলিতে মেলে আধুনিক প্রেমের আবেগ ও প্রেমের কৃত্রিম ভাবালুতা। প্রধানতঃ যা ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ আশ্রিত। বিষ্ণু দের কবিতায় এই ধনোন্মত্ত সমাজের প্রেমই বিদ্রূপলক্ষ্য হয়েছে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ আমরা যে এক ইন্দ্রিয়সচেতন তারুণ্যের

সঙ্গে পরিচিত হই, তারই পরিচয় মেলে গল্পের আঙিনায়। তরুণ বয়সের রচনায় যৌনতা বড়ো হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু বিষ্ণু দের গল্পে যৌন প্রাধান্য বা যৌন সর্বস্বতা নেই। প্রেমের যে বিহ্বলতা এবং উচ্ছ্বাস কল্লোলের অন্ততঃ দু তিনজন লেখকের গল্পে প্রায়শঃই লভ্য, বিষ্ণু দে কল্লোলের অনিয়মিত লেখক হয়েও সেটা এড়াতে পেরেছিলেন হয়ত তাঁর পরিশীলিত মনোভঙ্গির অতিরিক্ত সংযমে—প্রমথ চৌধুরীর প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়কদের জীবনে প্রেম বা প্রেমহীনতাই যেন সমাজব্যতিরিক্ত এক সমস্যা—যার ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা মিলবে সমকালীন কবিতাতে। 'মন দেওয়া নেওয়া', 'শিখণ্ডীর গান' 'গার্হস্থ্য আশ্রম' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের অগভীর যে চাপল্যের প্রতি চাপা হাসির ঝিলিক দেখা যায় তা-ই তো মেলে 'হিরো', 'ফিরেফিরতি' প্রভৃতি গল্পে। অন্যদিকে যে সব নারীদের কথা মেলে তারা হয় কেউ চপল, কেউ বিব্রত, কিন্তু কোথাও যেন তাদের মধ্যে পরিণত মননের একটা অভাব আছে, যদিও কেউ কেউ অনেক বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে। আর "গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলা দেশের মেয়ে" যার ছোটো খাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন, যে জীবিকার লড়াইয়ে পুরুষেরই সাথী—তার পরিচয় কিন্তু গল্পে নেই। কবিতা যত অগ্রসর হয়েছে জীবনের মোহানায় সেখানে এমনটির আভাস মেলে নিশ্চয়ই। এখানে হয়ত তিনি সামান্যতঃ কল্লোলীয়দের সদৃশ, কিন্তু তাঁর রচনায় যে অটুট শালীনতা তা তাঁকে কল্লোলের থেকে পৃথক করে রাখে। বরং আত্মসচেতন আধুনিকতায় তিনি পরিচয়ের গোত্রজ। সবকটি গল্পের নাগরিক পটভূমিও কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর কবিতার প্রেক্ষণভূমির নাগরিকতা। তাঁর জীবন থেকে জানি বাল্যে ও কৈশোরে ব্যঙ্গমূলক কবিতা লিখে তাঁর যাত্রাশুরু, যার ছিটে ফোঁটা মিলবে এই সব গল্পে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যেন তাঁর তারুণ্যের ধর্ম— আর তিনি তো প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করতে অভিপ্রায়ী ব্যক্তিবাদ থেকে, সেখানে প্রমথ চৌধুরীর ঘরানা তাঁকে পথনির্দেশ করে। কয়েকটি গল্পে যে মননশীলতা, দেশী বিদেশী প্রসঙ্গের যে উত্থাপন, তা-ও তো আমরা দেখব বিষ্ণু দের আযৌবন কবিতায়, যা এক বিশেষ কালের আন্তর্জাতিক আধুনিকতারই বৈশিষ্ট্য।

আমরা দেখছি তাঁর গল্পের জগতে একটি পারিবারিক বৃত্তের প্রাধান্য—সেখানে জীবনের ব্যাপ্ততার কথা থাকলেও জীবনের ব্যাপ্তি নেই। প্রথম কাব্যগ্রন্থ "উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই তিনি অবশ্য তা কাটিয়ে ওঠেন। গল্পগুলির সংলাপ প্রাধান্যও কিন্তু আর একবার আমাদের তাঁর কবিতার কাছে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলার ভঙ্গিটাও তো তাই। বর্ণনার অতিরেক নেই, প্রকৃতির ব্যাপ্ত বিস্তার নেই তাঁর প্রথম

যুগের গল্পে বা কবিতায়। আস্তে আস্তে সে সব বদলে যায় চতুর্থ দশকের তরঙ্গে, পরে রিখিয়া যাওয়া আসার সূত্রে—যৌবনের উর্মি উচ্ছাস সংযত হবার কাল থেকেই। তখন আবার প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তাঁর অনেক বক্তব্যের যোগ্য ধারক। 'চোরাবালি'তে পৌঁছে গেলে আমরা দেখব কবি সন্ধান করছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজের নানাস্তরকে—সেখানে পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের পাশে জায়গা খুঁজে নেয় "বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া" এবং "বড়বাবুর গঞ্জনা", স্টক এক্সচেঞ্জ, ধর্মঘট, হাইকোর্ট আর শেয়ার বাজার আর শেয়ালদার শেড। গল্পে এসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ ও প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। যে কোনো কারণেই হোক বিষ্ণু দের পক্ষে গল্পে তা অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে তিনি যে পথ খুঁজছেন ইতি উতি, এটা ওটা তুলে নিয়ে অস্তিভূমি খুঁজছেন, সেটা গল্পগুলি পড়তে গেলে বোঝা যায়। হয়ত অতিরিক্ত সংযমপ্রিয়তা এবং মননশীল গল্পে স্বকীয়তা অর্জনে ব্যর্থতার বোধ তাঁর গল্পের কলমকে থামিয়ে দিয়েছিল। সেই অচারণার বেদনা নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হয়েছে কবিতার বিরাট জগতে।

তাঁর গল্পের ভাষার যে মার্জিত শিষ্ট ভঙ্গি, সংলাপের যে দৈনন্দিনতা অতিক্রমী বাকরীতি, সুযোগ বুঝেই ঠাট্টা, বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজী শব্দ ও প্রসঙ্গের ব্যবহার —এসবই তো কবিতার জগতে মেলে আরো স্থিতধী প্রত্যয়ে। দুইয়ে মিলিয়ে পড়লে এক ব্যক্তিত্বের অখণ্ডত্ব জেগে ওঠে পাঠকের মনে।

তাই তরুণ ও প্রথম যৌবন পর্বের কবিতার ভঙ্গি অধিগত করতে গেলে গল্পগুলি আমাদের সহায় হয়। আমরা পরিণত ফসলের সমারোহ নিয়ে হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে নিশ্চয় স্মরণ করব কি কি একজন মহৎ কবি ফেলে এলেন, কি কি তিনি স্বীকরণে করে তুললেন নিজস্ব, কোন কোন বাধা হারিয়ে গেল মরু পথে। আমাদের মনে হয়, গল্পগুলি কোনো চমক সৃষ্টির উদ্দেশে লেখা নয়, এর পিছনে আছে এক পথ সন্ধানের আন্তরিকতা। "তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড় / মানুষ", পায়ে পায়ে চমকাতে চমকাতে এ এক কঠিন পথে অবিশ্রাম নিদ্রাহীন যাওয়া—এসব কথা ভেবে, চেনাকে অতি চেনা করার অভিপ্রায়ে আরো কয়েক বার গল্পগুলি পাঠ করা যেতে পারে নিশ্চয়।

রবিন পাল

সৌর-ট্রাজিডি

দুনিয়ায় কত আশ্চর্য জিনিষই না ঘটে! শ্রীযুক্ত হলধর রায়ের ছেলে শ্রীমান স্থরেশ্বর রায় জগতের আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই—সপ্তের মধ্যে না হোক, কয়েক সংখ্যার মধ্যে অন্তত।

পাঁচ-দশ লাখের ব্যবসাদার হলধর, যিনি হিসাব ক'রে মাসে সাড়ে পাঁচশ' টাকা ভিখিরীদের দেন, যিনি ঘড়ি দেখে দুপুর বারোটায় আর রাত দশটায় খান, পাঁচটার বেশী যিনি চাকর রাখতেই দেবেন না, যিনি ফোর্ড মোট্যরকার ছাড়া চড়বেন না, তাঁর ছেলে কিনা স্থরেশ্বর রায়! অঙ্কে ফেল করে! এম্, এ, দেয় বাঙ্লায়! পাঁচ আলমারী বই শোবার ঘরে নিয়ে যায়। কোনোদিন দশটায় ভাত খেয়ে আড্ডায় বেরোয়, কোনদিন দুটোয় এসে খায়! চসার থেকে ইয়েট্‌স, ডি-ফো থেকে ওয়েল্‌স্, রবীন্দ্রনাথ থেকে চণ্ডীদাস, ভাস থেকে জয়দেব—বিশেষ বিশেষ কবির নিন্দে শুন্‌লে পাছে কিছু করে' বসে—এই ভয়ে সেস্থান হতে স'রে পড়ে; বাড়ী এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে আর স্ত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নাবলীর জবাব না দিয়ে মুখ গুঁজে থাকে—হয়ত কমলার চুলের গন্ধভরা বালিসের গন্ধ শুঁকতেই। — একে আশ্চর্য ছাড়া আর কি বলা যায়! স্থরেশ্বরের একুশবছর বয়েসে বাপ একদিন এসে বললেন,—(স্থরেশ্বর তাড়াতাড়ি অবনীবাবুর ছবির এলব্যমটা ঢেকে দাঁড়াল)— দ্যাখ্, খোকা, কাল তোকে বিকেলে দেখ্‌তে আস্‌বে, থাকিস্ যেন। বলে' তিনি চশ্‌মাটা ভালো করে' লাগিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দালানটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে' তাঁর আপিস-ঘরে চলে' গেলেন, বিস্মিত, বিহ্বল, বিশেষ-কারো-ওপর-নয়— ক্রুদ্ধ স্থরেশ্বরকে দেয়াল দেখতে রত করে' দিয়ে!

ঘণ্টাখানেক পরে কাশির শব্দে রিপোর্টটা থেকে মুখ তুলে' শ্রীযুক্ত হলধর রায় বললেন, কি রে কি চাই? বইয়ের টাকা?

স্থরেশ্বর যথাসম্ভব স্পষ্ট করেই বললে, আজ্ঞে না, বিয়ের কথা—

বাপ হেসে বললেন, কি বলবি? কবে হবে জান্‌তে চাস? ফাল্গুনের—

স্থরেশ্বর ধাঁ করে বলে ফেললে, আজ্ঞে না, যেন না-হয় তাই— মানে করব না তাই— মানে এখন এই পরীক্ষার সময়— তাই—

হলধর গম্ভীর-ভাবে বললেন, যা, ঘুমুতে যা। পরীক্ষা আবার কি রে? তোকে না বলেছি এম, এ, দিতে দেব না আর সেও কি একমাসের মধ্যেই নাকি?— যা, আমার কাজ আছে।

সুরেশ্বর রিপোর্টে-নিবিষ্টদৃষ্টি বাবামশায়ের দিকে করুণ চোখে মিনিট খানেক চেয়ে কিংকর্ত্তব্য ঠাওরাতে ঠাওরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

হলধর ডেকে বল্লেন, কাল থাকিস্ যেন।

বলা আবশ্যক ম্যাট্রিকে অঙ্কে ফেল করে' সুরেশ্বর খবর পেয়েই অপরিসীম বৈরাগ্যে —সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণায় শেয়ালদা ষ্টেশনে ট্রেনে চড়ে' বসে—বিনা টিকিটে ও বিনা পয়সায় এবং মামা-বাড়ী হুগলীর কাছে সভ্যতাবর্জ্জিত গ্রামে যাবার জন্তে।

সুরেশ্বর, রোমিও সুরেশ্বর সাম্নের বাড়ীর কলেজ-পড়া মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সুরেশ্বরের বিয়ের পরে এক মাস কেটে গেছে। বাপের আদুরে মেয়ে কমলা শ্বশুর বাড়ীতেই এখন আছে। বিয়ের পরে আসবার সময়ে সে নাকি কাঁদে নি। তার মা এতদিনে বুঝেছেন যে, মেয়ে—তাকে যতই ভালোবাসো না, বিয়ে হলেই সে পর। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কমলার বিধবা পিসিমা, জ্যাঠাইমারাও তা বুঝেছেন।

যখন হলধরকে মেয়ে দেখিয়ে কমলার বাপ বল্লেন, এই পনেরো বছর বয়সে—একটু শীগগীর Developed, তখন হলধর অবশ্য বুঝলেন যে কমলার বয়স পনেরোর বেশী। কিন্তু তাঁর ছেলেকে জানায় তিনি এতে খুসিই হয়েছিলেন।

আসলে তখন কমলার বয়েস ষোল। তার বড় বোন অমলার দুর্দ্দশা দেখে তার বাপ পাত্রদের বিষয়ে বেশ না জেনে বিয়ে না-দেওয়ায়, বা বেশ জেনেই বিয়ে না-দেওয়ায় তার বয়েস 'পনেরো' হয়ে' পড়েছিল।

বিয়ে যখন হয়েই গেল তখন সুরেশ্বরের উচিত ছিল 'চিরকুমার সভা' পড়া এবং দ্বিজু রায়ের সেই 'মত বদলে যাওয়া'র গানটা গাওয়া অর্থাৎ হাসা। কিন্তু সে হ্যামলেট পড়েছিল কিনা তাই হাসতে পারলে না। হয়ত তাতেও পারত কিন্তু সামনের বাড়ীর অতীন্দ্রিয় বাবুর কন্যাটীর ছবি তাকে সর্ব্বদাই মনে পড়িয়ে' দিত রোমিওর কথা। তার মনে হ'ত ঐ কমলা নাম্নী স্ত্রীলোকটী যেন নারী-সন্দীপচন্দ্র।

তাই সে আটাশ দিনে স্ত্রীর সঙ্গে তিনটি কথা বলেছিল। ফুলশয্যার রাতে, 'তোমার নাম কি? কি পড়ো? গাইতে জানো? রবীন্দ্রনাথের কিছু জানো?'

তারপরে একদিন কমলা ভারত-শিল্পের এলব্যমটা দেখছে দেখে, 'তোমার ও ভালো লাগে না ?' এবং খুব সম্প্রতি রাত্তিরে পাশে ফোঁপানির শব্দ শুনে 'কাঁদছ কেন ? বলে' 'মানসী'র বঙ্গ-দম্পতির আলাপটা স্মরণ করে 'পুতুলের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ?' এবং সেদিন কমলা সুরেশ্বরকে স্পর্শ করে' ফেলে—'যাও'বলে সুরেশ্বরের হাত গলা থেকে নামিয়ে নেয়। এবং—(গোপনে বলি, অতীন্দ্রিয় বাবুর কেউ শুনলে সুরেশ্বর আমার সঙ্গে কথা কইবে না)—কমলার ভিজে কোমল গালে সুরেশ্বর চুমো দিয়ে ফেলে। তাও একটা নয়—আড়াইটা। তিনটেরটা দেবার সময়ে হঠাৎ কমলা হেসে ফেলেছিল। কেন, তা অবশ্য আমি জানি নে।

তার পরের দিন সুরেশ্বর কয়েকখানা নূতনতম বই কিনে' নতুন বসন্তোৎসবের একটা গান গুণ গুণ করতে করতে ঘরে ঢুকে' দেখে—'বলাকা' পড়ছে কমলা। সেই দিন থেকে সুরেশ্বরের হৃদয় তার দ্বিতীয়-পক্ষের—স্ত্রী-নয়, মানসীর কাছে, কালিদাস বর্ণিত সেই বিশেষ্যের কাছে বাঁধা। আজকাল আর তার মনে হয় না কমলার তনুলতা কিছু বেশী নিটোল, রং কিছু বেশী ফরসা, চোখটা ঈষৎ অধিক টানা, কি ঠোঁট দুটো ঈষৎ বেশী লাল !

বছর তিন কেটে গেছে। হলধরের বয়েস পঞ্চাশ হয়েছে কিন্তু তিনি বনে যান নি। সুরেশ্বর বলে, তা আর আশ্চর্য্য কি ! রবীন্দ্রনাথ ত বলেছেনই—ইত্যাদি।

কিন্তু ইতিমধ্যে কমলার বয়েস যে উনিশ হয়েছে সেখবর তার দেহে বিদ্যুৎ চারিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং সে বিদ্যুৎ সুরেশ্বরের মনকেও কাঁপিয়ে গেছে। এমন কি তাকে আজ কাল সিল্কের—তাও আবার আস্ত পাঞ্জাবী পরতে হয়, দুপুরে আড্ডাখানা বন্ধ, সিগারেট নিষিদ্ধ, মোট্যর কিনতে হয়েছে, সন্ধ্যায় ষ্ট্রাণ্ডে বেড়াতে যেতে হয়, বইয়ের আলমারী নিজে ঝাড়া বারণ—আরও কত কি কঠিন কঠিন বিধি ও নিষেধ।

বাল্যে মা-হারা সুরেশ যে ভদ্রতায় এত অক্ষম হয়ে' উঠল, কার জন্যে—তা বুঝে' হলধর বৌমার ওপর, ভারী খুসী। কিন্তু স্পষ্ট বলবেন না।

শুনেছি মুখ ও ঠোঁট বিশ্রী হয় বলে ও গন্ধের জন্যেই সিগারেট বারণ।

আর একবার হলধর বুঝি মৃদুভাবে বলেন, দেখ মা নেহাৎ পুরুষ মানুষ বসে' বসে' খাবে আর বই কিনবে ! তা যদি আমার আপিসেই—কিন্তু কমলা নাকি নখ খুঁটে সেই 'সরোজিনী প্রয়াণের' বৌ-ঠাকরুনের মতোই বিবেচনা করে' বলেন যে তাঁর 'উঁনি' কি ও সব পারবেন ?'

দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে, জলের স্রোতে দাগ কাটার মতন—মনে কোন দাগ না রেখে। এই ভাবেই কাটত যদি না গুরুদেব অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সুরেশ্বরের জীবনে ছায়াপাত করে' তার জীবনটা প্রহসন করে' তুলতেন।

পত্রিকা-ছেঁড়া ছবি এবং ফোটো সুরেশ্বর সংখ্যাতীত জোগাড় করেছে। ইস্কুল থেকে সুরু করে' এই পর্য্যন্ত সুরেশ্বর গদ্যে পদ্যে রবীন্দ্রনাথকে খান পঞ্চাশেক চিঠি লিখেছিল, এমন কি খামও মুড়্ত; কিন্তু একখানাও পাঠাতে পারে নি। খামসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে। সম্প্রতি কিসের নেশায় বিপুল দুঃসাহসে, কোন্ এক বে-ফাঁস মুহূর্ত্তে শান্তিনিকেতনে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখে ফেলেছে।

আমার কাছে তাই ঘণ্টা দুয়েক করুণ অনুতাপ জানিয়ে সে-দিন বাড়ী গিয়ে যথা নিয়মে সুরেশ্বর দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে, 'চিঠি আছে ?'

দরোয়ান বললে যে, তা যথারীতি বউমার কাছে দেওয়া হয়েছে। বুকের দুরু দুরু শুনতে শুনতে তেতলায় উঠে' সুরেশ্বর ঘরে ঢুকে' দেখলে কমলা যথারীতি বইহাতে শুয়ে' নেই! যথারীতি টেবিলের কাছে এগিয়ে দেখে—সুরেশ্বরের যে কি হল তা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম— সেই চির-পরিচিত, ধ্যানে চেনা, স্বপ্নে জানা হাতের লেখা! সেই সুন্দর, সেই— সুরেশ্বরের মস্তিষ্কে তখন স্বপ্নের খেলা— হুইস্‌ল্যারের ইম্প্রেশ্যনিস্‌ম্ যেন।

সুরেশ্বর স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেন নিজের অজ্ঞাতেই papercutterটা ঢুকিয়ে খামটা ছিঁড়তে গেল— কিন্তু এ যে ছেঁড়াই! খুলে' দেখে— সুরেশ্বরের অবস্থা আপনারা একবার কল্পনা করুন— নেই! সে চিঠি নেই! নেই! (দশবছর আগে হলে' কিম্বা সুরেশ্বর নিতান্তই পুরুষ না হলে' নিশ্চয়ই মাটিতে আছড়ে পড়ে চীৎকার করে' ডুকরে কেঁদে উঠত) কমলা! কমলা! — এই ভোলা! বৌদিদি কোথায় ? জবাব শুন্‌ল—বাগবাজারে গেছেন। চিঠি আছে টেবিলে।

সুরেশ্বর দেখলে পাশে একটা, কাগজ— নিশ্চয়ই তাঁর— গুরুদেব কি লিখ্— হায়!—

শ্রীচরণেষু,

তোমার সেই চিঠির জবাব এসেছে। আমার কাছে তা রইল। তুমি যখন-তখন কবিতা আউড়ে, ব্রাউনিং, শেলি কি কালিদাস, কি টুর্গেনিফ রবীন্দ্রনাথ, কি আরো সব বেয়াড়া নামওলা— বড়লোকেরা কি বলেন তাই জোর করে' টেনে বসিয়ে শোনাবে; চুমো খেয়ে রবীন্দ্রনাথ চুমো সম্বন্ধে কি ফিলসফি লিখেছেন— 'দুইটি অধরে' ইত্যাদি তাই ব্যাখ্যা করতে বস্‌বে, মাঝ রাত্তিরে আলো জেলে চেঁচিয়ে পড়্‌বে, আবার

— বলবে আহা! কি ভাষা! কি ছন্দ! কি ভাব! আমি কিছু বললেই দিনের অর্দ্ধেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে, জবাব দেবে না; দিবারাত্রি গুণগুণ্ করবে; বাবার সামনেই 'ওগো জানো, সেই যে নতুন বইটা, তাতে—' বলে' যা তা বক্‌বে— এসব আর হবে না।

তুমি যা পড়েছ তা যদি ভুলে' যাও ত কাল আমি যাব। তা নয় ত এই রইলুম এখানে, চিঠিও রইল। আর বাপের বাড়ীও বহুকাল আসিনি, এলিজাবেথ ব্যারেটও বাপ বললে, বাপের বাড়ী যেত। আর তোমার ত ভালোই হল। নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসায় মালিন্য ধরে— রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না? তা এখন তুমি অন্ততঃ সেই বাউলের গানটা— 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' হারাই ক্ষণে ক্ষণ— ও মোর ভালোবাসার ধন।—' গুণ গুণ করতে পারবে।

যদি পারো ত, আমার ভালোবাসা আর প্রণাম নিও।

তোমার—বিয়াত্রিচেও নই, চিত্রাঙ্গদাও নই—নিতান্তই ইত্যাদি—

হ্যাঁ, শোন, রাত্তির জেগো না, আর আনলায় যে ফরসা কাপড়-জামা রেখে এসেছি তাই পোরো, আর ঠিক সময়ে খাবে আর বিছানার মাথার ধারের জানালাটা বন্ধ রেখো— ভোর বেলায় একটু ঠাণ্ডা পড়ে।—

সুরেশ্বর কপালে' হাত দিয়ে' চেয়ারে বসে' পড়ে' বোধহয়—মাথায় কি দারুণ তাণ্ডব সুরু হয়েছে এবং তার সঙ্গে নন্দলালের সেই ছবিটার কী বীভৎস বিসাদৃশ্য— তাই অনুভব করছে, এমন সময়ে হলধর— দশ-লাখের ব্যবসাদার হলধর, হাতে একটা বই — তাও আবার বাংলা— ঘরে ঢুকে' বললেন, তোর হয়েছে কিরে? শরীর খারাপ নাকি? বৌমাকে তবে বাপের বাড়ী পাঠালি কেন?

হায়! যদিও তিনি 'মুক্তধারা' পড়ে' লিপিকা' নিয়ে গেলেন কিন্তু বাবা কেমন করে' বুঝবেন—সুরেশ্বরের স্বল্প-পরিসর সরল মস্তিষ্কে কী ভীষণ হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা বেধে গেছে! যেন সুরেশ্বরের না-দেখা কোন্ ফিউচারিষ্ট আর্টিষ্টের আঁকা একখানা কাল-বৈশাখী ঝড়ের ছবি!

হায় রবীন্দ্রনাথ! কমলা! হায় সুরেশ্বর রায়!—

এই অবধি বলে' সুরেশ্বর চুপ করল। তার আঙুলগুলো পিয়ানোর ওপর বি মাইনরে লঘুভাবে চলতে লাগল। সে বললে, কি হে, কি ভাবছ? গল্প বলে' চালাবে?

সিগারেট ধরিয়ে বললুম, তাহ'লে এর ওপর কলম চালাতে হবে। এটা ঠিক একটা গোটা গল্প হয় নি! কি রকম যেন খাপছাড়া গোছ হয়েছে। organic whole হয় নি মুখে বলা কিনা, তায় আবার তোমারই বলা।

পুরাণের পুনর্জন্ম

ফোটোগ্রাফী যে আর্ট্ নয়, সে কথা আমরা সকলেই না মান্‌লেও সকলেই জানি। খবরের কাগজ সাহিত্য নয়, সে হচ্ছে ভাষার ফোটোগ্রাফী। আমিও সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করে' লিখ্‌ছি নে, কেবলমাত্র খবরের কাগজের দূতের মতো যথাযথ report কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। সাহিত্যের আশা কর্‌বেন না।

শ্রাবণ মাসের 'প্রগতি'তে যে 'পুরাণের পুনর্জন্ম' বলে' একটি জীবনী বেরিয়েছে, তা পড়ে' সত্যিই খুসী হয়েছি— তার লেখার কায়দার জন্যে ত বটেই—তার চেয়ে বেশী হয়েছি নায়ক লক্ষ্মণ আমার বন্ধু বলে'। লক্ষ্মণ হেরেদিয়ার সনেটে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সম্ভবত 'প্রগতি'র ও-লেখা লেখা হবার পূর্বেই— বোধহয় বাল্মীকির রামায়ণ পড়েই—একটি সনেট লেখে, অবশ্য ইংরেজীতে। কারণ তার বিশ্বাস সংস্কৃত জান্‌লেই বাংলায় লেখা যায় না। এখানে তার একটি ভাঙাচোরা, শুধু ভাবেই অনুসৃত, মৎকৃত অক্ষম অনুবাদ দিচ্ছি—

বাল্মীকি— করুণ কবি— পুষ্পকোমল-হৃদয়—
পাখীর শোক— সামান্য ক্রৌঞ্চীর শোক
তাঁর বুকে ব্যথা দেয়— আর সেই ব্যথাজাত
প্রথম কবির কান্না— আদিশ্লোক
আজো সেই কান্নার সুর ঘুরে' মরে,
বাতাসে ভেসে এসে তা কাণে বাজে,—
প্রাণেও,—রামায়ণের সুর ছাপিয়ে
সেই করুণ শ্লোক রামায়ণকে ব্যঙ্গ করে।
হায় উর্ম্মিলা—যখন পূর্ণযৌবন সজাগ-প্রাণ
তখন স্বামী তব বিদেশে— তাঁর ভাইয়ের পাশে!
আর মাণ্ডবী তোমার প্রিয় তোমার পাশেই
কিন্তু যৌবনের প্রেমবন্দনা ছেড়ে অসিধারব্রত স্বামী

তোমায় ছোঁয়ও না ! তোমাদের কান্না কৈ ?

— হায় বাল্মীকি ! পাখীর শোকেই শুধু কাঁদো !

পড়ে' অন্তত: আন্দাজে বুঝবেন যে লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার মতে রামের ছায়ায় গুপ্ত হ'লেও লুপ্ত অন্ততঃ নয়— অনুভব করবার, বোধ কর্‌বার দুর্লভ ক্ষমতা সে রাখে। এবং সে এই কাল আমাকে বিলিয়ার্ড ক্যুটায় চক ঘষতে ঘষতে বলছিল, যে উর্ম্মিলাদেবীও সীতাদেবীর ছায়ায় রাহুগ্রস্ত ছিলেন।

কিন্তু সে যাক। 'প্রগতি'র ঐ জীবনীমূলক লেখাটি পড়ে' চঞ্চল হ'য়ে থিয়েটার রোডে গেলুম— কিন্তু শুন্‌লুম লক্ষ্মণ উর্ম্মিলাকে নিয়ে নতুন yacht টায় সুন্দরবনে বেড়াতে গেছে— উর্ম্মিলা দেবী হয়ত ফরাসীসুলভ shrug-এর সহিত বলবেন, তার দাদার অনুরোধেই।

ভাদ্রের দশুই তারিখে ফোন্ বেজে উঠল—লক্ষ্মণ বললে যে আমার যাওয়া ও তার না থাকার জন্যে সে যথাক্রমে আনন্দিত ও দুঃখিত, সে আস্‌ছে, থিয়েটারে নিয়ে যেতে, শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখার যোগ্য ?

দেড়ঘণ্টা পরে প্রায় লক্ষ্মণ এল। সঙ্গে দেখি উর্ম্মিলা ও সীতা—সসঙ্কোচেই ভেতরে বসলুম। ইলকট্রিকচালিত রোলসরয়েস ইংরেজ শোফ্যরের হাতে তিন মিনিটে যথাস্থানে দাঁড়াল—তখন ন'টা আটাশ। তিনমিনিট সীতা ও উর্ম্মিলার রুষনাট্যের আলোচনা শোনা গেল, তাঁরা 'ডাকঘর' ও 'শকুন্তলা' রাশ্যায় দেখে তৃপ্ত হন্। ইণ্ট্যর্‌ভ্যালে লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করলে Bar আছে কিনা। ফোর্থ এ্যক্টে সীতা বল্‌লেন, ভারতীয় ষ্টেজের পক্ষে বেশ। লক্ষ্মণ বললে, কিহে ডে, ওঠা যাক্ এবার ?—বলে, একটা সিগার ধরিয়ে tortoise-shell-এর pince-nez টা নাকে তুলে' উঠে, দাঁড়াল। বাড়ীতে নাবিয়ে দিয়ে সীতা বললেন, কাল আসবেন—বিকেলে চা খেতে। উর্ম্মিলা বললেন, বাংলাসাহিত্য কি আজকাল আলোচনার যোগ্য ? তা হ'লে আস্‌বেন ঠিক। লক্ষ্মণ বললে, Well, old son, কাল এসো—আমার নতুন roan ঘোড়াটা দেখবে।

পরদিন গেলুম। বাঙালী হেন্‌রি ফোর্ড সামনেই ছিলেন—ছবির ঘরে সব ছবি দেখালেন— কোনোটা অরিজিন্যাল ; কোনোটা অনুকৃত। বিদেশীই প্রায় সব— বললেন বহুকাল বিদেশে ছিলুম, তারই স্মারক। সম্ভবত রাম সীতাকে সে সব ছবি দেখান্ ও স্মৃতিসাগরে ভেসে বেড়ান। আমি ভবভূতি নই, কাজেই তার বিবরণ আমায় বললেন না। তবে কোন্‌টা কোন্‌টা তাঁর ভালো লাগে তাও জানিয়ে দিলেন, যেমন, ঐ করোর সন্ধ্যা, মোনের ঐ এগুএ শরৎ, হুইসল্যরের শিল্পীর মা, Symphony in White, Pink and Grey প্রভৃতি, র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, অবনীবাবুর দু'একটা—

যেমন মা, শাজাহানের শেষশয্যা, গগনবাবুর impressionistic স্নিগ্ধ কোমল ছবিগুলো, অসিতকুমারের বীণাবাদিনী ইত্যাদি, সে এক catalogue বললেই হয়—এক কথায় বীর রামচন্দ্র স্নিগ্ধ কোমল রসের, romantic রসের ভক্ত।

সীতার সঙ্গে মতে মিলল, অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যের তিনি ভক্ত—এবং সরস cynicism ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—তা সে ভল্‌তেয়ার, কি সুইফট কি র‍্যাবেলে কি ওয়াইল্ড বা শ-রই হোক না। লক্ষ্মণেরও তাই। কিন্তু উর্ম্মিলার মত উল্টোমুখী, ডিকেন্স, ডষ্টয়েভস্কী, জেন অষ্টেন, হ্যান্‌স এণ্ডারসেন্ আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ-ই তাঁর প্রিয়। অবশ্য ফরাসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের দু'একটা তাঁর প্রিয়—যেমন sentimental শকুন্তলা, কি মৃচ্ছকটিক, পল এবং ভার্জ্জিনি, শ্যাতোব্রিয়াঁ, কি রুসো, কি বিষ্ণুশর্ম্মার লেখা। আঁদ্রে মোরোয়ার কায়দা আছে বটে, কিন্তু আঁদ্রে গিদের romantic লেখা তার চেয়ে ভালো। ব্রাউনিঙের 'রিং এণ্ড দি বুক্'-এর স্থানে টেনিসনের 'মর্ট্ ড্যার্থার' তাঁর প্রিয়। অর্থাৎ রামের মত উর্ম্মিলার, আর সীতার লক্ষ্মণের।

তারপরে সীতা কোথায় উঠে' গেলেন—সম্ভবতঃ নাকের ডগাটিতে একটু powder দিয়ে আস্‌তে। এবং লক্ষ্মণ তৃতীয় কাপ চা শেষ করে' বল্লেন, আমি আস্‌ছি এখুনি।

কথাপ্রসঙ্গে উর্ম্মিলাদেবী বললেন, আমার গল্পটা কেমন লাগল বলুন।

বল্লুম, গল্প হিসেবে বেশ।

তিনি অলসভাবে বললেন, অর্থাৎ confession হিসেবে নয়?

বল্লুম, ওটা কি আপনার confession নাকি? হ'লেও—confessionএ কখনও সত্য থাকে না—সে নিজের বিষয়ে কিনা।—থাকলেও ও হয়েছে একদিকের, যেন শুধুই 'বিমলার আত্মকথা'। যদিও আপনার 'রিং এণ্ড দি বুক' ভালো লাগে না, তবু এ-কথা মানতেই হবে যে ওর পন্থাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা—অর্থাৎ সব দিক দিয়ে আলো পড়ে' সারা মুখটা দেখা যায়।

হ্যাঁ—বাংলা সাহিত্য-আলোচনায় উর্ম্মিলার একটি মত তাঁর মনের প্রকাশক হিসেবে অনুধাবন যোগ্য। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের লেখা তাঁর ভালো লাগে না, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওরই মধ্যে ভালো—এ কথাটিতে তাঁর আর একটি কথা খোলসা হয়। তিনি বলেন, টলষ্টয় টুর্গেনিফের চেয়ে ভালো এবং বড়ো, বা বোয়ের হ্যমসুনের চেয়ে—এর মধ্যে ঐ একই মনোভাব। অর্থাৎ didacticism ই তাঁর প্রিয়। তাঁর temperament pure art-এর অনুকূল নয়।

লক্ষ্মণ একটা মরোক্কা-বাঁধাই বিচিত্র খাতা হাতে এসে বললে, ওহে ভাবী সাহিত্যিক, এইটে পড়ো দিকিন।

ঊর্ম্মিলা হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কি, তোমার সেই নিখিলেশের আত্মকথা?

লক্ষ্মণ ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত স্নিগ্ধহাসি হেসে বললে, মিলা-র নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি! না লাগাই স্বাভাবিক।

ঊর্ম্মিলা— এলেন কেই-র শিষ্যা ঊর্ম্মিলা বললেন, কেন, তোমার যদি আমার কথা ভালো লাগে ত আমার কেন তোমার কথা ভালো লাগবে না!

লক্ষ্মণ করুণামিশ্রিত হাস্যে বললেন, আমার লেগেছিল যেহেতু একলা থেকে-থেকে তুমি sentimental ও fanciful হ'য়ে একটা গপ্প লিখেছিলে, এবং তার কায়দাটি হয়েছিল ডিকেন্স-ভক্ত হৃদয়ের ও ষোড়শবর্ষের বোর্ডিংবাসিনীর পো আর বদলেয়ার-পড়া কল্পনার অদ্ভুত মিশ্রণে।

তার জবাব এল—আর তোমারটাই বা কি শুনি। ও-ও তো পুরো স্বকপোলকল্পিত —Mademoiselle de Maupin কি চারইয়ারী কথার চেয়েও।

কিন্তু কী সব বাজে বকছি বলুন ত!

লক্ষ্মণের খাতাটি পড়লুম। এই এখনও ২০শে অঘ্রাণেও আমার সামনে পড়ে' রয়েছে—তবে তার সব ছাপা আমার সাহসে কুলোয় না, কারণ প্রথমত তার ফরাসী-মিশ্রিত ইংরেজীর সব অনুবাদ করা আমার সাধ্যাতীত, দ্বিতীয়ত: সে পড়লে মনে হ'বে সে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে ফরাসী আর্টিষ্ট আর মস্তিষ্ককে জার্ম্মান ফিলসফার করে' তুলেছে। তবে বোধহয় প্রমথ চৌধুরী পুরো বাংলা করবেন, তবে তাঁর মতো অসমসাহসী ব্যক্তি— যিনি audacityতে বাংলা দেশে অদ্বিতীয়, তিনিও বাংলা-সাহিত্য-দেশের dictator (?) রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা চেয়েছেন। কিন্তু বোধহয় এখানে বলতে পারি যে লক্ষ্মণের যে বইটি হুইসমাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, বার্ণার্ড শ'র ভূমিকাশোভিত ও অগষ্টস্ জন্ সচিত্র করবেন। তার ফরাসী অনুবাদে আনাতোল ফ্রাঁসকে প্লাঞ্চেটে ডেকে ভূমিকা লেখানো হ'বে। তার জার্ম্মান সংস্করণে শুনছি সুডারমান ও নরওয়েজীয় ভাষায় হামসুন ভূমিকা লিখবেন। আর রুষ ভাষায় গোর্কীর পরিচয় লিপি থাকবে—আন্দ্রিয়েফ কেমন লক্ষ্মণের মধ্যে তাঁরই একটা refined সংস্করণ দেখতে পেতেন— এই মর্ম্মে। ইতালিয়ানে দান্নুনৎসিয়ো নাকি লিখেছেন যে এ দেখছি আগে নাভারের রাণী লিখল ভারতের ভাষায় Heptamerone, তারপরে হ'ল ইংরেজীতে Decamerone. আর প্যের হ্যালষ্ট্রোম নাকি নোবেল সভায় লক্ষ্মণের নাম ১৯২৮ সালের সাহিত্যের award-এর জন্যে তুলবেন। তা সে যাক।

লক্ষ্মণের খাতার বাদ দিয়ে ও ছোটো করে' এই দাঁড়ায়:—

শ-র John Tanner বলেছে— Compassion is the fellowfeeling of the unsound, উর্ম্মিলা—আমি বেশ জানি—আমায় করুণা করে। উর্ম্মিলা পুরো সুস্থ নয়—মানুষের নিজের tendencies, প্রবণতাগুলোই যখন পরস্পরবিরোধী হ'য়ে পড়ে, তখন তার মন কখনই স্বাভাবিক থাকতে পারে না। উর্ম্মিলা হচ্ছে একটা সজীব paradox—অবশ্য অল্প বিস্তর আমরা সবাই তাই। উর্ম্মিলার মধ্যে স্ত্রী হিসেবে দুটো রূপ আছে—একটি হচ্ছে ভারতবর্ষীয়—ঠাকুর-মশায়ের সেই ভারতবর্ষীয় বিবাহের স্ত্রী। আর একটি হচ্ছে রাজপুত্তুরদের গল্প-পড়া কনভেণ্ট-বাসিনী adolescent রোমান্টিক মেয়ে— এই মেয়েরই লেখা উর্ম্মিলার 'আত্মকথা'। একটি হচ্ছে হৃদয় —হৃদয়ে হচ্ছে উর্ম্মিলা সত্যিই—বিপ্রদাস মিত্রের ভাষায়—

বাংলার মেয়ে— সে উর্ম্মিলা শান্ত, সে উর্ম্মিলা তার স্বামী আর তার দু'টি শিশু পেয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত সার্থক। কিন্তু উর্ম্মিলার আর একটি হচ্ছে তার প্রখর বুদ্ধি —সে বুদ্ধি কল্পনার মদে চোখ লাল করে' ঘোরে, আর তার সর্বাঙ্গ হ'তে ঠিকরে' পড়ে অতৃপ্তির জ্বালা-ভরা দীপ্তি। পয়লা নম্বরের উর্ম্মিলা— যদি বাংলা দেশেই ধরি ত বলতে হয়, সে পূর্ব জন্মে সুচরিতা কি আশা, কি তারও আগে ভ্রমর ছিল—অর্থাৎ ওর গুরু রাধিকা নয়, সীতা—অবশ্য সেকালের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে Midle, de Maupin, Salome, Irene Forsyte, Emma Bovary. এই দ্বিতীয় উর্ম্মিলা বিশ্বজগতে তার মনোমতো পুরুষকে খুঁজে' বেড়ায়, অসম্ভবকে কামনা করে, যাকে পায় তাকে চায় না, স্বামীকে অবজ্ঞা করে, ignore করে, stupid মনে করে' brilliancy-র খোঁজে, জীবনের খোঁজে ঘর ছাড়ে। এ দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাধিকা— এ হচ্ছে নগরের নটী শ্যামা। এ হচ্ছে উর্বশী—এর মেষ চুরি যায় নি—অর্জ্জুনের কাছে আত্মদান করে' অগৃহীত লাঞ্ছিত রূপ নিয়ে এ ফিরে আসবে—তবু পুরূরবার ঘরে এবং অঙ্কে এ আসবে না। সাহিত্যে paradox বেশ লাগে বটে, কিন্তু জীবনে paradox না থাকলে মোটেই দুঃখিত হতুম না।

উর্ম্মিলা নিজেকে জানে না—এই বিরুদ্ধপ্রবণতার পাল্লায় পড়ে' এবং তার দিদি, আগুনের শিখা একালের সীতার ছায়ায় ঢাকা বলে'ই হয়ত। প্রথম যে দিন তাকে দেখলুম, তাকে ত দেখতেই পেলুম না! সূর্য্যের আলোর মত সে সীতার ছায়ায় ম্লান, স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। মনে আছে তখন মনে হয়েছিল সীতাকে পেলে খুসী হতুম। সীতা ত সে প্যানপেনে আদ্যিকালের সীতা নয়—এমন কি ভীরুকোমল শকুন্তলাও ত নয় সে হচ্ছে পরিপূর্ণ সুন্দরী, মোহিনী—তার মাথার কালো চুল থেকে ছোট পায়ের লাল নখ অবধি মোহিনী যৌবন-চঞ্চলা, আস্যে হাস্যে লাস্যে মন-মাতানো

স্নায়ু-কাঁপানো—কাদম্বরী যেন। Chevalier D' Albert-এর মতো তৃষিত মনে ক্ষুধিত চোখে ঘুরেছি—বই হাতে তাকে দেখেছিলুম—সাদা নিটোল বাহুতে রক্ত-লাল ব্লাউসের পাড়, বিপুল জাপানি ঢঙের কবরী, আইভরির মতো সাদা মুখে কালো জোড়া ভুরু আর টকটকে লাল পাতলা ঠোঁট দু'টো। মনে পড়ে, তখন আপনিই মনে পড়েছিল—

Cold eyelids that hide like a jewel
Hard eyes that grow soft for an hour,
The heavy white limbs and the cruel..
Red mouth like a venomous flower—

ভেবেছিলুম বুঝি মানসী মিলল। ইন্দ্রিয়গুলোর অসহ্য পুলক এবার অধ্যাত্ম আনন্দের মতো তীব্র বিধুরভাবেই পাব। মানসীর খেয়াল! দাদা—সে বেচারা আজীবন রোমান্টিক—স্নিগ্ধ প্যানপেনে মেয়ে পেলে সে ধন্য বোধ করত—তারই গলায় সীতার ফাঁস পড়ল। আমি ভাবলুম, যাক্, ভালোই হ'ল—ও আরাবেলা চাটার্জীকে ভালোবেসেই সুখ। কিন্তু ঘর করার পক্ষে এই শান্ত স্নিগ্ধ উর্মিলাই বেশ। বিয়ে হ'ল। দেখলুম মিলা-র কালো চুলে ঢাকা মাথাটা যত উদ্ভট কল্পনায় ভর্ত্তি। পড়েছে ঢের—কিন্তু নিজেকে তার মতো গড়তে পারে নি। বেজায় রোমান্টিক—যদিও জোলা আমি পড়তে পারি নে, তবু স্কট জোলার চেয়ে ভালো লেখক, এ-কথা শুনে, এত চমকে উঠেছিলুম যে মিলা-র মুখে না দিয়ে গালেই চুমো দিয়ে ফেলেছিলুম।

দাদা বলে, impressionistic ছবি তার ভালো লাগে। কিন্তু কেবল হুইসলার বা করোর মোলায়েম impressionism ;—যখন দাদাকে মানের Olympe কি Dejeuner sur l' herbe দেখালুম, তখন সে নাক শিঁটকে, মুখ ফেরালে। দেগার নগ্নতার আর্ট কি post-impressionistic সেজান ভ্যানগঘ, গোগাঁ কি পিকাসোর cubism ও দেখবেই না। দাদার মতে র‍্যাফেলই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চির ছবি দেখার পরে এক পাগলেই এ-কথা বলতে পারে। মিলা-রও সেই মত—অর্থাৎ ব্যর্ণ জোনস-এর আর্টের চেয়ে ওয়াটসের ভিক্টোরীয় romanticismই তার প্রিয়তর—ব্যালজাক ছেড়ে হুগো, ফ্লোবেয়র ছেড়ে গতিয়ে হুযস্থন ছেড়ে বোয়ের, শেহভ ছেড়ে ডষ্টয়েভস্কী।

কিন্তু মিলা-কে পেয়ে আমি তৃপ্ত। কিন্তু ওর morbid romanticism তৃপ্ত হ'তে পারে নি। বেশ জানি রাবণ রক্ষের সঙ্গে বৌদির সেই adventure-টা জেনে ওর

মনটা কি রকম ঈর্ষ্যায় মথিত হয়েছিল। ও চায় হেলেন্ হতে, কিন্তু বিধাতা ওকে করেছেন বড়ো জোর পেনেলোপি।

আমার মধ্যেও paradox আছে। আমার হৃদয়ে আছে morbid romanticism —তাই তার ভালো লাগে আনা কারেনিনা। আর আমার মগজ হচ্ছে সুস্থ, বাস্তবভক্ত —সে বলে, কাব্যে ও-সব বেশ, কিন্তু জীবনে ঘরোয়া নিরীহ কিটিই ভালো।

এই paradox-এ ঢাকা পড়ায় ও স্বভাবতই চাপা হওয়ায় মিলা আমায় বোঝে নি। সে যদি টুর্গেনিফের Elena হ'ত, সে যদি রাজপুত্তুর না চেয়ে আমায় দেখত ভালোবাসত ত নিশ্চয়ই বুঝত। কপালের রেখা ও মাথার ঈষৎ টাক ঢাকবার জন্যে যখন backbrush করলুম, তখন মিলা বল্লে, দাদার দেখে করেছি। য়ুরোপে যাবার আগে যখন মায়েদের বল্লুম, মিলাও যাবে—তখন বড়মা আর মা এমনভাবে চাইলেন যে বলতেই হ'ল, না, না, ও থাক। কিন্তু দাদার বলা সত্ত্বেও বৌদি বল্লে, সে যাবে। সম্ভবত, সে যে-অজানা মা-বাপের মেয়ে, তাদের কাছ থেকে ঘোরার উত্তেজনার নেশা পেয়েছে।

অবশ্য আমি জানি আমি ক্ষীণ—নিতান্তই artistic—পুরোণো চায়নার মতো। আর দাদা massive, যেন কোণার্কের অরুণাশ্বের শিল্পীর গড়া। আমারই ভালো লাগে মাইকেল এঞ্জেলো আর রোদ্যাঁ পঞ্চাশ ভল্যুম-এর বালজাক, War and Peace-এর আর Anna Kareninaএর, টলষ্টয় কিম্বা হুগোর সুবিপুলত্ব আমারই প্রিয়। জঁা ক্রিসতফ, আর Growth of the Soil, গোরা আর Forsyte saga আমারই ভালো লাগে। দেবী রায় চৌধুরী আর প্রমোদ চাটুয্যের bold sweep আমাদেরই প্রিয়—বৌদির আর আমার। সমর গুপ্ত আর চাঘ্‌তাই sentimental atmosphere দাদার আর মিলারই প্রিয়। দাদার যে কি অসহ্য sentimentalism তা ত তার নিট্‌শের স্থানে কার্লাইলকে আসন দেওয়াতেই বোঝা যায়। Man and Superman না পড়ে' সে পড়ে Heroes and Heroworship !

তেজী ঘোড়ার প্রতি টান আমার স্বভাবের। উর্মিলা হাসে। কিন্তু কি করব! ভালো লাগে! হয়ত তাই দ্য ভিঞ্চি আর ব্রাউনিং আমার অত প্রিয়!

কিন্তু উর্মিলাকে আমি ভালোবাসি। আমি তৃপ্ত। শেহভের সেই গল্পের মতোই ওকে ভালোবাসি—ওর কত দোষ সত্ত্বেও। ওর ঐ দোষগুলোই আমাকে আরো tender করে' তোলে' ওকে 'মিলি' কি 'মিলা' বল্লে ও ভারী খুসী হয়, ও ভারী ভয়কাতুরে, রাত্তিরে একা শুতে পারে না, ওর কড়ে, আঙুলের নখ দাঁতে চিবুতে ও ভালোবাসে, উর্দ্দু গান না গেয়ে ও বাংলা গান ভালোবাসে, আমার ছেলেবেলার কথা শুনতে

ওর বেজায় আগ্রহ, ওর ছেলেদের ও কিছুতেই নার্সের কাছে দেবে না—তবুও ওকে ভালোবাসি—হয়ত এই কারণেই বেশী করে'।

যৌবনের মোহে হৃদয় চেয়েছিল স্থইন্‌ব্যর্ণের Poems and Ballads-এর স্বপ্নে-গড়া দীপ্তিকে—হৃদয়হীন খেয়ালী রহস্যময়ী সুন্দরীকে। কিন্তু বুদ্ধি বললে, শান্তিই ভালো। পুরুষের হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধিরই শক্তি বেশী। তাই আমি মিলা-কে পেয়ে তৃপ্ত। কিন্তু ওর নারীসুলভ ভাববিলাসিতা এখনও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—সেই রকম মনেই ওর 'আত্মকথা' লেখা।

ও যখন ওর ছেলেদের কোলে করে বা ঘুম পাড়ায়, তখন ওর মুখে ফুটে' ওঠে র‍্যাফেলের স্নিগ্ধ শান্তি, বত্তিচেল্লির স্বপ্নালুতা আর দ্য ভিঞ্চির রহস্যময় চিরকালের মাধুর্য্য। স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব ওর নারীহৃদয় একেবারে পরিপূর্ণ করে' রেখেছে। মিলা-কে যদি গাঁয়ে নিয়ে যাই, যেখানে ওর বুদ্ধির খোরাক পাওয়া যায় না, যেখানে সভ্য মানুষ আর বই আর ছবি মেলে না, তা হ'লে ও ঠিক পনেরো আনা বাঙালী মেয়ের মতো সুখে থাকবে। আর morbid গপ্‌প লেখার mood ওর আসবে না। সেদিন ও পিয়ানোয় ষ্ট্রাউসের Sinfonia Domestica-ই বোধ হয় বাজাচ্ছিল, তখন ওর মুখে খাঁটি ঘরোয়া মেয়ের ছবি ফুটে' উঠেছিল, মনে হচ্ছিল যেন গানটা ওরই। মনে আছে, একবার সাঁজেলিজেয় ঘুরতে-ঘুরতে পিয়ের লোতির সঙ্গে দেখা। কথা কইতে-কইতে এক কাফেতে ঢোকা গেল—তাঁর একটি কথা মনে আছে—তোমাদের দেশে গিয়ে মুগ্ধ হই, ধন্য হই—নানা কারণে, অধ্যাত্ম, শিল্প, কত ভাবেই—কিন্তু তোমাদের ঘরের শান্তি আর মেয়েদের তৃপ্তিটুকু ভারী ভালো লেগেছিল।

কিন্তু সে তৃপ্তিতে খাদ পড়েছে। মনে আছে, একবার Park Lane-এর একটা বল্‌-এ ডাচেস্‌ অব শার্ল্‌বরা-র ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল। আপনাদের দেশে অতৃপ্তির জ্বালা?

গেছে বৈ কি। তাই ত বলছিলুম, যদি এই সভ্যতার ইলেকট্রিক আলো থেকে পিলসুজ প্রদীপের ছায়া-ভরা স্নিগ্ধ আলোয় নিয়ে যাই ত এই জ্বালার বিক্ষোভ— যা এখনও মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসে— একেবারে নীল আকাশে, সবুজে, মাটিতে, বাংলার নদীতে, স্নিগ্ধ শ্যামল বাংলার আবহাওয়ায় ঘরোয়া সুখ-দুঃখে মিশিয়ে যাবে। এই থিয়েটার রোডে জোর করে' dramatic হবার চেষ্টা ও আর করবে না। মিলার এই চেষ্টা হচ্ছে মূলত ওয়াইল্ডের Sphinx without a secret-এর সঙ্গে এক। একটা ব্যর্থ pose ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সেদিন পাভ্‌লোভার অজন্তানৃত্যের কথা বৌদি বলতে মিলা বলে' উঠল,

বাস্তবিক যদি ঐ রকম হতুম—সভ্য দুনিয়ার চোখ আমার দিকে পড়ে’! কিম্বা সারা বের্ণার্ড—আমারই জন্যে সালোমে লেখা হ’বে! এ-সব কথা হচ্ছে ঐ জ্বালারই বোতল-ছাপানো ফেনা। মেয়েদের culture ও বুদ্ধির বদহজম। কারণ এ-দু’টো জিনিষ য়ুরোপে পর্য্যন্ত যে নতুন। তাই ওর মন পাগলের মতো ঘোরে, দিশে পায় না, শেষে পশ্চিমের দিকে চেয়ে থাকে— ভাবে, বুঝি Faubourg Saint Germaine-এই সব মুক্ত, সব স্বপ্ন মূর্ত্ত।

মিলার বুদ্ধি এখনও বোর্ডিং হাউসে বদ্ধ কিশোরীর মতো, আজগুবি স্বপ্ন দেখলেও ওর হৃদয় তৃপ্ত, শান্ত। কারণ ওর হৃদয় পরিপূর্ণ নারীর, আর শ-ত বলেছেনই—Home is a Girl’s prison but a woman’s workhouse.

কিন্তু এ কথা অবশ্য মানি যে আমি ক্ষীণ, স্তিমিতব্যক্তিত্ব—নিরালা গোপনতা ভালোবাসি। কিন্তু সে আমার স্বভাব ও সে বিধাতার করা। কারণ ছায়ায় ঢাকবার মতো দাদার কিছুই নেই। সে ভাববিলাসিতার বুদ্‌বুদ— রাবণ রক্ষকে duel-এ challenge করে’ মরতে বসেছিল! বৌদি কোনো ছোক্‌রার সঙ্গে একটু হেসে কথা কইলেই মুখ ভার করে! এমন কি সেদিন হেয়ার হাইনেমানকে অপমান করে’ই বসল। আর সেই কোঁৎ দ্য গুহকের সম্বন্ধে তিক্ত কথা বলতে-বলতে ত কেঁদেই ফেল্লে! দোষের মধ্যে কোঁৎ সীতাকে Ma chere বলেছিলেন! আর সিন্যর সুগ্রীবকে নিয়ে কি হাঙ্গামাই পাকিয়েছিল। মেয়েদের coquetry জিনিষটা যে কাপড়-পরার মতোই দরকার— এ-কথা যে জানে না তার আবার ছায়া!

হ্যাঁ, ছায়ায় ঢাকা বরঞ্চ সীতার সম্বন্ধে খাটে। উর্ম্মিলা ত তাতে এতকাল আচ্ছন্ন, ম্লানই ছিল। অবশ্য উর্ম্মিলা তা আগে জানত না, ও এখন তা জেনেও মানে না।

সুররসিক

দাম্পত্য জীবনকে আমরা বড়ো বেশী প্রাধান্য দিয়েছি। দাম্পত্যজীবনকে আমরা অনেকে ব্রত করে' তুলেছি। তাই দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়ের বর্ণনা শুনলে মনে হয় মানুষের পৌরুষ থেকে সে মুক্ত, সে জীবনের দিক দিয়ে অবনত। খাবার পরবার ভাবনা নেই, পুরোনো সাবেককেলে হলে'ও জমিদারীর আয় আছে। তাই বংশানুক্রমে সুপ্রিয়েরা জীবন কাটিয়েছে যাকে সাংসারিক বলবে বাজে কাজে, সখের খেলায়। সুপ্রিয়ের প্রপিতামহ ছিলেন কুস্তিগীর পালোয়ান, তাঁর আনন্দ ছিল তাঁর পাইকদের দ্বারা প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করায়। সুপ্রিয়ের পিতামহ জহর সংগ্রহ করে জীবন কাটিয়েছেন আর তার পিতা গাইয়ে' বাজিয়ে' সংগ্রহ করে। সুপ্রিয়ের দাদার সখ শিকার আর সাহিত্য। আর সুপ্রিয়ের জহর, সাহিত্য ও ছবি ছাড়া আর একটি নেশা আছে— সে হচ্ছে সুর।

সুপ্রিয়ের ছফুট লম্বা শরীরে শক্তি আছে কিন্তু তার শরীর অতি পাতলা—এসরাজের সুরের মতন ক্ষীণ। তার দেশী ছবির মতো সরু সরু আঙুলগুলো এসরাজ ও সেতার—উভয়ের ওপরেই সমান চলে। তার চোখ সাধারণত অপরিসীম অবসাদ ও অবজ্ঞায় অর্দ্ধনিমিলিত। গানের সময় স্তিমিত ও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় স্নিগ্ধ বা দীপ্ত।

বড়োলোকের বাড়ী— ছেলের বিয়ে হলই বলতে হবে, ছেলে বিয়ে করল না।

কিন্তু ছেলে খুসীই হল। দেখতে চমৎকার—রং ফর্সা না হলে'ও চমৎকার। আশ্চর্য্য চোখ; পরিপূর্ণ, যেন হৃদয়ের সুধা উপছে পড়ে। মুখের গড়নটি পানের মতো অনেকটা, ভারী মার্জিত ও সুকুমার। আর তনু? তন্বুলতাই। মেয়েদের পক্ষে ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু সুগঠিত। একেবারে মূর্খ যে তাও নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়া আছে। বুদ্ধিও নেহাৎ স্থূল নয়। রসিকতা রসিকতা বলে' নেবার মতো বুদ্ধিটুকু আছে। আর নেহাৎ শিশুও নয়— বয়েস ষোলো।

সুপ্রিয় খুসীই হল। সুপ্রিয়ের মন ফুলশয্যার রাতের অস্ফুট গুঞ্জনেই বিকিয়ে গেল।

দাম্পত্যজীবনের প্রতি আমাদের এতই লোভ। নববধূ, সদাই সে সজ্জিত, চারুকেশী, ধীরে ধীরে সে কথা বলে, মৃদু পদসঞ্চারে তার চলা, একটুতেই লজ্জা পায়— মোহ এতে বেড়েই যায়। সুপ্রিয়ের দিনগুলো কদিন যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাটল।

দেখেছ ত, দুর্লভ অর্কিড যেমন আমরা যত্ন করি, তেমনি অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়েরা মানুষ হয় সুকুমার ফুলের মতো, লতার মতো যত্নে লালিত হয়।

সুপ্রিয়ের প্রিয় ছিল সংস্কৃত কাব্য, তাই তাকে বিশেষ করে'ই দাম্পত্যজীবনে মুগ্ধ হতে হয়। এই সংস্কৃত, মার্জিত ফুলটি তারই সংস্কৃত মনের মতো হল।

বিয়ের পর কটা দিন যেমন কাটে সেই রকমেই কেটে গেল। পরিচয় অপরিচয়ের মধুর দ্বন্দ্বে একমাস কাটল। এবং এ মাধুর্য্যের মোহে সুপ্রিয়ের সুরও চাপা পড়ল।

সুপ্রিয়ের এসময়ের মনোভাব গীতি-কবিতাতেই প্রকাশ হতে' পারে। সে নিয়ে' আমি কিছু বললে তা ন্যাকামি হয়ে পড়বে।

মাসখানেক পরে যখন অর্কিডের তনুমনের নবত্বের মোহ গেল, তখন সুপ্রিয় তার স্ত্রীকে নিয়ে' কলকাতায় এল। শুধু স্ত্রীকেই নিয়ে' এল। হৃদয়ের প্রেম যখন প্রথম সংসারের দৈনন্দিনতায় নেমে আসে, তখন নাকি তাতেও ভারী মাধুর্য্য থাকে। আর সে মাধুর্য্য নাকি শুধু দুজনের মধ্যেই চলে।

সুপ্রিয়ের স্ত্রী হলেন গৃহিনী। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিও সুপ্রিয়ের মনে মাধুর্য্যের মোহ সঞ্চার করল। ঐ যে না পারার লজ্জা, ঐ যে পারবার আকাঙ্ক্ষা, ও ভারী মিষ্টি। এ সব মিষ্টত্বও মাধুর্য্যও কবির জন্যে। তাই সে যাক।

সেদিন আকাশ ছিল শরত কালের, চাঁদ ছিল ত্রয়োদশীর। সুপ্রিয় ছাদে খর্বাকৃতি ইজি-চেয়ারটায় শুয়েছিল। আর একটা মিঠে প্রেমের সুর গুঞ্জন করছিল। সে উর্দু প্রেমের গানে সে নিজেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল।— মেয়েদের মধ্যে সত্যিই কবিত্ব নেই, মেয়েরা সাংসারিক। কমলার ভাঁড়ার দেওয়া কি আর শেষ হবে না?

সুপ্রিয় এসরাজটা তুলে' নিয়ে' ধীরে ধীরে বাজাতে লাগল। সন্ধ্যার মায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে সুর ঘুরে' ঘুরে' ফিরতে লাগল···

ক্লান্ত হয়ে', সুপ্রিয় ছড় নামাল। কমলা তার কোলে হাত রেখে বললে, আচ্ছা, তুমি ত খুব ভালো গাও। শোনাবে?

সুপ্রিয় নিমীলিত চোখেই কমলার কোমল হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ভালো গাই? তোমায় কে বললে?

কমলা একটু দুলে উঠে সুপ্রিয়ের হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বললে, বারে! আমি যেন জানিনা! না জানব না? দিদিমণি বলেছেন, তুমি খুব ভালো বাজাও আর গান

গাও। শুধু তাই না, তুমি নাকি— না সত্যি! এ তোমার অন্যায়। আমাকে পর্য্যন্ত গান শোনাবে না!

সুপ্রিয় কমলার পেলব গালে টোকা মেরে বললে, না সত্যি! এ অন্যায়!— না? কিন্তু ও কথাটা কি বলোত?

— কি কথা?

— ঐ— শুধু তাই না —

— ও:! ঐ কথা! ও কিছু না!

সরসস্বরে, লঘুস্বরে সুপ্রিয় বললে, না সত্যি! এ তোমার অন্যায় আমাকে পর্য্যন্ত সব কথা বলবে না।

পরিপূর্ণ উদ্বেল চোখদুটি মেলে কমলা বললে, আমি কি তাই বলছি! তুমি কি ভাবো আমি তোমার কাছে— তুমি রাগ করবে বলে'ই বলিনি— তা না ত আর তোমার কাছে আমার— না, রাগ কোরো না— সে কি ছাই কথা! আমার মনে নেই!

দিদিমণি কি বলেছিলেন সে কথা কমলা বলল না। কিন্তু তার মাথা গরম হয়ে' উঠল। দিদিমণি বলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন— ওর যা সুরের বাই, তাতে ভয় হয়। তোমার মতো বৌ ও যদি মনে না ধরে সে ঐ সুরের বাই।— কমলার হাতের আঙুলগুলো তার অজান্তে কেঁপে উঠল।

কমলা কোমলস্বরে গলায় একটা অনির্বচনীয় মাধুর্য্যের রেশ এনে বললে, গাইবে?

স্নিগ্ধ তারাভরা রাত্রির কালো ছায়ার মোহে আচ্ছন্ন সুপ্রিয় কমলার পানের মতো নিটোল মুখ সরু সরু আঙুল দিয়ে স্নিগ্ধস্পর্শে নিজের মুখের ওপর এনে বললে, বলো, আমার মুখে মুখ রেখে বলো, আমার কথা রাখবে?

কমলা ক্ষণকাল কিছু জবাব দিলে না। কিছু ভাবতে লাগল বলে'না এম্‌নিই জবাব দিলেনা। রাত্রির আকাশের তলায় চাঁদের ম্লানশুভ্র আলোয়, টবের জাপানী ফুলের গন্ধে যে ইন্দ্রজাল, তাতে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়ের এ আদর কমলাকে তন্দ্রাবৃত করেছিল।

কমলা বললে, বলো। বলছি রাখব।

সুপ্রিয় মরালের গ্রীবার মতো মসৃণ কমলার গলায় এক হাত দিয়ে আর এক হাতে তার চিবুক ধরে' বললে, আমি বাজাই তুমি গাও— সেই গানটা— সেই ভীমপলশ্রী।

কমলা করুণনয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। তার চোখে জল এল। কিন্তু সুপ্রিয় তা দেখতে পেল না।

সুপ্রিয় ছড়ি চালাল। সুর যেন শরৎরাত্রির মেঘের থেকে চাঁদের মতো বেরিয়ে এল।

কমলার গলা থেকে অতি ক্ষীণ বিকৃত স্বর বেরুতে লাগল। তাকে গান বলা ঠিক নয়।

সুপ্রিয়ের চোখ কখন আপনিই বিরক্তিতে পাতা মেলে' জলতে লাগল। সুপ্রিয় বললে, গলা খোলো কমলা, লজ্জা কি ?

কমলার গলা খুলল না।

সুপ্রিয় বললে, খোলো, খোলো, চড়ায় উঠলে থেমে যাও কেন ?

কমলা হঠাৎ মুখ তুলে' ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, সত্যি বলছি, গাইতে পারি না ? গলা ওঠে না। সত্যি বলছি—

কমলা চোখের লজ্জায় মুখ নামিয়ে ফেলল।

সুপ্রিয় হয়ত ঈষৎ বিস্মিতই হয়েছিল। ভুল বুঝে কমলা বললে, বিশ্বাস করছ না ? বেশ ! এসরাজ ধরো।

— কি বীভৎস ! কী বিশ্রী গলা। যেন কত নেশা কত অত্যাচার করার পর পুরুষমানুষের গলা। যেন কাঁসার ঘণ্টা বাজছে ! যেন — সুপ্রিয় কানের সঙ্গে মনও স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।— কী বীভৎস গলা ! এই কি তার প্রেয়সীর গলা ! তার প্রেয়সীর গানের গলা।

সুপ্রিয় এসরাজ রেখে মুহ্যমান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অপ্রতিভ লাঞ্ছিত, আহত কমলা কখন দিদিমণির কথা ভাবতে ভাবতে ধীর নিস্পন্দ পদে নেমে গেল। তার খেয়ালও হল না।···

সে রাত্রে কমলা যখন স্বামীর মুখে চুমা দিল, সে চুমা সাড়া পেল না।—

দার্শনিক থামল। বললে, একটা চুরুট দাও ত হে।

ভটচায্ তার মন্ত্রমুগ্ধ ভাব থেকে জেগে বললে, তাই বলো। তাই আমাদের সুররসিক আজকাল আসে না ! খোঁজ খবরও দেয় না ! কিন্তু তারপর ?

আর্টিষ্ট তারপর এলবামটা রেখে মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'তারপর ?'—আবার কি ? দাম্পত্য জীবনকে আমরা জীবনের একমাত্র সার্থকতা করে' তুলেছি। তাই দাম্পত্য ব্যর্থ হ'লে— ইত্যাদি।— আরে এ কে ! সুররসিক ! তুমি !

সুররসিক বা সুপ্রিয় তার গানের গলায় বললে, হ্যাঁ আমিই। নেমন্তন্ন করতে।

হিরো

—তোমরা আমায় দার্শনিক বলে' ব্যঙ্গ করো। তার মধ্যে তোমাদের স্নেহ আছে বলে'ই তা লাগে না। কিন্তু আমার মনে হয় স্নেহ না থাকলেও লাগ্‌ত না। আমি ওটা প্রশংসা বলে'ই নিই। আমি যে সাহিত্যিক নই, এই আমার গর্ব। আমি যে বাংলাদেশে bohemian হবার হাস্যকর চেষ্টা করি না, এই আমার গৌরব। অবশ্য আমি মানি আমার Praed-এর চেয়ে Plato ভালো লাগে, Burns-এর চেয়ে Bergson আমার প্রিয়। কিন্তু সে আমার দোষ নয়। আর আমি সাহিত্যিকদের মতো আমার পড়া বিদ্যার বহর দেখাই নে। সেও আমার মহত্ত্ব।

এই এক তোমরা ছাড়া আমি জীবনে মাত্তর একটি ঐ তথাকথিত সাহিত্যিকের সংসর্গে এসেছিলুম। মাত্তর—

কিন্তু দার্শনিক—আমাদের ত তুমি দিব্যি সহ্য করো, আমাদের প্রতি তোমার এ মূল্যবান প্রীতি—

না, তোমাদের সইতে পারি তোমাদের ভালোবাসি বলে'ই অবশ্য। কিন্তু ভালোবাসি কেন? তোমরাও সাহিত্যিক ত, তবুও—সত্যি! আশ্চর্য্য হই। আশ্চর্য্য! আমি তাকে ষোল বছরের সেন্টিমেন্টল্‌ মেয়ের মতোই ভালোবেসেছিলুম।

—সে?

সে? নিশ্চয়ই সেটা exploit করেছে। তারই ত ইতিহাস। শোনো। ছোট্ট কিন্তু। আর যেখানে তাকে একটু বুদ্ধিমান বা ভালো বল্‌ব, মনে রেখো সেটা আমাদের নিয়ম মতো। গল্পের খাতিরে তার নাম কর্‌বো না। তাকে তোমরা চেনো। ধরো তার নাম—ধরো সীতেশ। তার সঙ্গে আলাপ হয় এক ট্রেনে। সেবার পরীক্ষা দিয়ে মায়ের কাছে পুরী যাচ্ছি! কম্পার্টমেণ্টে সীতেশ আর আমি—দেশ্‌লাইর দ্বারা আলাপ হ'ল।

পুরীতে সে ম—র বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখানেও exploitation—কোনো আত্মীয়তা নেই, কিছু নেই—অধিকন্তু ম—র দুই বোন ছিলেন; কাজেই সাহিত্যিক সীতেশ চাটুয্যে গিয়ে হাজির।

এমন কি—মাকে ত চেন ?—মাকেও মুগ্ধ করল। কি পাকা ব্যবসাদার ! কোথায় কি বলতে হয়, করতে হয়, চোখে কি রকম ভাব আনতে হয়, সব জানে।

কোণার্ক ভুবনেশ্বর দেখ্‌লুম। গুরুদাস সরকারের বই পড়ে'ই ওর জ্ঞান, কিন্তু আমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলুম ওর জ্ঞান দেখে।

তখন বয়েস ছিল তরুণ, চোখে লেগে ছিল স্বপ্ন। Heroworship স্থরু হ'ল। সে কি হাস্যকর পূজা ! একটা মানুষকে আকাশ বলার মতো। কাব্য—কল্‌চার—ফরাসী ভাষা—যেন একেবারে সীতার আমল থেকে কেটি মিত্তিরের আমলে এসে পড়্‌লুম। আমাদের সাবেককেলে হুগো ডিক্‌ন্সের স্থানে এল, মোরোয়া, জয়স্। শেলি কীট্‌স্ গেল। এখন নাকি সিটওয়েলদের যুগ ! ইত্যাদি।

কলেজের পড়া পড়ব কি ! সিটওয়েলের বীভৎস উগ্র ঘৃণ্য জঘণ্য আবহাওয়ায় মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। টার্ণার ? Pooh ! এখন আগষ্টস্ জন।

কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সীতেশ আমার জীবনে এসেছিল। ঝড়ের মতোই যায় নি অবশ্য।

বাবার বই পড়ার সখটা সে জানল—দর্শন ও প্রবন্ধ গিয়ে আমার—মানে সীতেশের হুকুমে আসতে লাগল যৌনতত্ত্ব আর উপন্যাস। বেচারা বাবা ! একটা কথাও বলেন নি ! বৈঠকখানা থেকে বাবাকে পেনস্যন্ দিলুম। চা, চুরোট, তর্ক, গান—সময়ে সময়ে মদও চলতে লাগল। ফ্রেঞ্চ শিখলুম—সীতেশের চেয়ে ঢের ভালোই—ও আসলে কিছুই জানত না। ধরা পড়ে' গেল। ফরাসী নগ্ন সৌন্দর্য্য—গ্রীক্ নয়, শুদ্ধ নয়, কামমিশ্রিত নগ্নতা দেখতে অভ্যস্ত হ'তে লাগলুম। খেয়াল ধ্রুপদ বয়কট করো—ঠুংরি ধরো, গজল ধরো !

ভ্রমণ হ'ল। নর্ত্তকী ও গায়িকা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, দেবতা ও দেবদাসী—সবই দেখা হ'ল, শোনা হ'ল, স্নায়ুশিরা দিয়ে জানা হ'ল। অবশ্য আমার খরচে।

দেখো, মর‍্যালিসট বলে' ব্যঙ্গ করো। সে অবস্থায় পড়লে, ভ্যাগাবণ্ড ! তোমাকেও দার্শনিক হ'ত হ'তে। একদিন গান শোনবার আশায় গিয়েছি—কলকাতাতেই—গান শোনবার আশাতেই গিয়েছিলুম। কেন ভাবলে জানি না, হয়ত তার আশাতীত রূপো পেয়ে ভাবলে তার রূপই আমার লক্ষ্য, বল্লে—সে যা বল্লে, তার শুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত বাংলা হচ্ছে, এই স্থকুমার বয়সেই এই সখ ধরেছে ! এ সখ তোমায় যে ধরবে। ছি !—বলতে পারো, কোন স্থস্থ ভদ্র মানুষ এর পর মর‍্যালিসট না হ'য়ে থাকতে পারে ?

তা সে যাক্। ধীরে ধীরে আমার বইগুলো হারাতে লাগল। সীতেশ পড়তে নিত—তারপর কোথায় হারিয়ে যেত ! না হয় সে দিয়েই যেত, কিন্তু আমি পেতুম না।

না হয় সে একেবারেই ভুলে' যেত। আমিও অবশ্য মনে পড়াতুম না—সীতেশ যে পুরোনো বইয়ের দোকানে বই বেচে দিত, তাইতেই তখন আমার গর্ব, আনন্দ। জর্জ মূর ওয়াট্‌স-ডান্টন্‌কে স্থইন্‌ব্যর্ণের parasite বলেছেন, আমি তাহ'লে তার চেয়েও কিছু ছিলুম—parasite-তর ছিলুম। এবং তাই যে ছিলুম, তাইতেই ছিল আমার আনন্দ। প্রভুর জয়গান করে' কর্‌চা লিখব, এই তখন আমার ambition.

কিন্তু সে যাক। তখন আমি দেশে। খাজনার হ্যাঙাম—তাই সীতেশের আলাপ থেকে বঞ্চিত হ'য়েও গেছি—সীতেশের নতুন বই বেরোবে—প্রুফ দেখতে পাব না—কি দুর্ভাগ্য ভাবো! তবে গিয়েছিলুম অনেকটা সীতেশের জন্যেই—ওর বইয়ের খরচ—জাপানী বাঁধাই, হাতে-করা কাগজ, নতুন টাইপ বিলেতী আর্টিস্‌টের ছবি।

তখন সন্ধ্যা। সারাদিন ম্যানেজারের সঙ্গে বকে' ক্লান্ত হ'য়ে, দোতালায় দক্ষিণের বারান্দায় বসে' আছি। একেবারে নীরব, শান্ত, নির্জ্জন—সে ভারী চমৎকার আবহাওয়া! সীতেশ থাকলে কেমন appreciate করত তাই ভাবছি—মেট্যরলিঙ্কের ভাষায় বলত হয়ত, স্তব্ধতার স্বর। তাই ভাবছি। হঠাৎ আমবাগানের ওপর দিয়ে চাঁদ বিপুল অন্ধকার ষ্টেজের ওপর ক্ষীণ দীপশিখা-নায়িকার মতো দেখা দিলে। যেন একটা জাপানী ছবি।

হঠাৎ, কেন বলতে পারি না—মনটা উতলা হ'য়ে উঠল। কোথা থেকে কেমন করে' নৌকোর মতো ভেসে এল একটা স্নিগ্ধ কোমল ছবি। সে ছবি মনের মধ্যে দেখলে তখন মনটা স্বতই খুসি হ'য়ে ওঠে, স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে, ময়ূরের মতো উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। মনে হল, মালবীকে কতকাল দেখি নি। মনে হল, মালবীর স্নিগ্ধ পাণ্ডু মুখখানি। মনে হল তার সেই সরল ভাসা-ভাসা চোখটি—আমার ওপর এরই মধ্যে —পূর্ব্বরাগেই নির্ভরতায় ভরা। মনে হ'ল, তার সেই সব কথা, তার সেই বসার অনুপম ভঙ্গীটি, তার সেই লিখতে গেলেই আঙুলে কালি মাখা।

মনটা উতলা হ'য়ে উঠল। না-ই হ'লে শ্রাবণ-বরিষণ, তবু সে যদি থাকৃত! জানি, সে একদিন এইখানে আমার পাশেই থাকবে, কিন্তু আজ যদি থাকত। তার কাণে মুখ ঠেকিয়ে—একটা স্থগন্ধে নিশ্বাস ভারী হ'য়ে উঠত—আপনি ঠোঁট নড়ে' উঠত—সেই কথাটি বলতুম, যে কথা প্রাত্যহিকতার মধ্যে বললে ন্যাকামি মনে হয়, অর্থহীন মনে হয়। কেউ আর সে কথা শুনবে না, চারিধার নিভৃতনির্জ্জন, আকাশে অনিবার জল ঝরে, জগতে যেন আর কেউ নেই, দু'জনে মুখোমুখি বসে'—

মর‍্যালিসটের তখন এমনি আবেগ ছিল যে সেই রাত্তিরেই ট্রেণে চেপে বসলুম

কলকাতার জন্যে। সকালে পৌঁছে দুপুরে মালবীর উদ্দেশ্যে রোদ্দুরের মধ্যেই গাড়ী চালালুম।

কিন্তু তখন চলছে মাথুরের পালা। আমার ইনট্রোডকশনে আমার betrothed-এর মধ্যে আমার বন্ধু সীতেশ কবিতার খোরাক জোগাড় করছেন!

বেচারা মালবী! আর তার সাদা বুদ্ধি। সীতেশও একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল বই কি! তবে সে পাঁচ মিনিটের জন্যে।

মালবী ভেতরে পালিয়ে গেল। এমনি করুণ চাউনি তার! আমার hero মোটরে উঠলেন, পাশে বসলেন, গম্ভীরভাবে আমার পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট কেস বার করে সিগারেট ধরিয়ে' বাড়ী এলেন, চা খেলেন, প্রেসে নিয়ে গেলেন, আর রাত দশটার আগে একবারও ছাড়লেন না। সেদিন মনে হয়েছিল, আমার hero Apollo নন, জোঁক।

আশ্চর্য্য কি জানো, এও ক্ষমা করলুম।

—মালবী কোথায় হে?

—মালবী? সে কোথায় এখন—কোথায় একটা, তার স্বামী কোথায় ম্যাজিস্ট্রেট—she's expecting—তা সে যাক।

ইতিমধ্যে আমার কোনো আত্মীয়ার সঙ্গে সীতেশ আমার মারফতে আলাপ করে। সেই হ'ল আমার hero-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত। প্রথমত সীতেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—মঞ্জুর পক্ষে বিশেষ করে'। দ্বিতীয়ত তার—জানোই ত তোমরা। কিন্তু দরকার হ'য়ে পড়ল। The criminal—আর তাও with a mere child—she was about eighteen then.

কিন্তু এবার উঠি। আমাকে বাড়ী গিয়ে ষ্টেশনে যেতে হবে। সীতেশ আসছে।

তোমার অতিথি?

হ্যাঁ, আমারই guest, দেখ, মঞ্জুর করুণ আবেদন এই দু'বছরেই বিশবার আমায় জানতে হয়েছে—কখনো অর্থ, কখনো আরো জটিল ও হৃদয়গত ব্যাপার। তা সে যাক, চললুম। ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু সবটা বলে, যাও হে। গল্পটায় roundness কৈ?

সীতেশ is awfully angular—বিশেষ before ladies, আচ্ছা, বিকেলে যেয়ো। আর এ—আমার এ কনফেশন যেন ও শুনতে না পায়।

এখনও এই—

সেই ত ট্রাজেডি। হাসছ?

বাসর-রাত্রি

সন্ধ্যার রহস্যময় ছায়া প্রদীপহীন বারান্দায় পড়েছে। সাম্নে সাম্নে অন্ধকার-কালো আমবনের ভেতর দিয়ে ধূসর অস্পষ্ট পথটি। ঈষৎ হাওয়া দিচ্ছে—স্নিগ্ধ, স্বপ্নের মতো ধরা-ছোঁয়া যায় না এম্নি মৃদু একটা গন্ধভরা হাওয়া। দূরে কোন্ গ্রাম্যজন সুরহীন গান ধরেছে।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে' সিগারেটের কালো ধোঁয়া কেমন কালো অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে, সুরেশ তাই দেখ্‌ছিল। হঠাৎ চম্‌কে উঠে' যেন স্বপ্ন থেকে জেগে আগত ছায়াচ্ছন্ন মূর্তিটিকে বললে, এসো সুষমা, বোসো।

সুষমা ধীরে নিঃশব্দে রেলিঙের পাশে চেয়ারটায় বস্‌ল। শান্ত স্তব্ধতার আবহাওয়ায় উভয়েই নীরব। অন্ধকারে, সুরেশের মনে স্বতই পূর্বের জের টেনে চলল —আজ একমাস হ'ল, সে জাহাজ থেকে নেমেছে। বিয়ের দু'দিন পরেই সে বিলেতে পড়তে চলে যায়। এখন সে ফিরেছে—এখন তার বয়েস পঁচিশ, আর সুষমার উনিশ। এই বয়েসে প্রবাস-ফেরৎ স্বামীর সঙ্গে—অন্তত বাংলা দেশের—স্ত্রী যে-রকম ব্যবহার করে বলে তার ধারণা—কৈ তা?

মনে হয় সুষমা যেন তাকে ভয় করে, তার প্রতি সুষমার কি এক গোপন—হয়ত আত্ম-অচেতনই—বিতৃষ্ণা। এই আটাশ দিন ত হল,—কৈ—একটি দিনও সুষমার পেলব দেহমন ত তার স্নিগ্ধ আদরে সাড়া দিল না! তার স্নিগ্ধতম স্পর্শেও সুষমার দেহ স্বতই সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। যেন সে কুষ্ঠরোগী কিম্বা যেন মাঝরাতে বাইরে থেকে মাতাল হয়ে সে সুষমার কাছে বাকী রাতটা কাটাতে শুতে এসেছে।

এই তার সুন্দরী স্ত্রী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী তায় লেখাপড়া জানা স্ত্রী—একে কি সে পাবে না? এতকাল ধরে কি তবে সুষমা ফাঁকি দিয়ে এসেছে? সুরেশের মনে ফুটে উঠল তার বহুবার-পড়া চিঠিগুলি। তার মনে হল কী নীরস, কী সাংসারিক ছোটকথায় পূর্ণ সেই চিঠিগুলি! আর সেই মামুলি প্রেমজ্ঞাপন! সুষমা একদিনও তার উৎসুক দেহমনের প্রেম-সরস বাণী ত তারই দুরুদুরু হৃদয়ের নতুন ভাষায় পাঠায় নি! সে লেখাপড়ায়ই ব্যস্ত ছিল!

সুরেশের মনে এল সেই বিদায়ের দিনটি। বন্ধ ঘরে সুষমার কাছে সে বিদায় নিতে গেল। সুষমার মুখ শুকনো—তবে চোখে জল নেই। তাকে চুমো খেতে সে মৃদু হেসে বললে, দু'দিনের আলাপ ত, তায় আবার কেলে বাংলার মুখখু মেয়ে ত! আমায় কি আর মনে রাখবে! ওই মুখে কোন্ আবার চুমো খেয়ে সুরেশ সে কথা অর্দ্ধপথে স্থগিত করে দিয়েছিল। দু'দিনের আলাপে পনেরো ষোল বছরের নতুন বধূর কাছে এ সপ্রতিভ রসিকতা অবশ্য সুরেশ প্রত্যাশা করে নি—বিশেষ সুষমা যে-রকম চাপা। তবে সুরেশ এতে খুসীই হয়েছিল—যাক্, তবে স্ত্রীটা নেহাৎ কাপড়ের পুঁটুলি নয়।

হঠাৎ সুরেশ ফিরে দেখলে—চেয়ারে ঠেস দিয়ে সুষমা, তারই দিকে চেয়ে, তার বড়ো বড়ো টানা চোখ দু'টো হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে। যেন সে নিঃশ্বাস ফেলছে না—শান্ত স্তব্ধ দেহ। সুরেশের মনে হল, যেন কিসের শোকে, গভীর বেদনায় সুষমা মরে গেছে—তারই ছায়া এ। এর শুধুই চোখ দুটো আছে—উদাস বেদনার জ্বালাভরা এই দ্যুতিভরা চোখ—অস্পষ্ট অন্ধকারেও দেখা যায়।

সুরেশের মনের পটে, তার অজ্ঞাতেই, এই চোখ ফুটে উঠল—আরেকদিনের—তখন সদ্যযৌবনের তনু তনু-শুকনো মুখ, কাণে পান্নার ইয়ারিং, বাসন্তী শাড়ী আর লাললেসদেওয়া ব্লাউস্—সেই চোখ! হাঁা, সেই চোখ!

সুরেশের সারা দেহ যেন কেঁপে উঠল। সম্মোহিতের মতো সেও চেয়ে রইল। কি যেন সে বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। কি একটা বেদনা, অনুযোগ সুরেশের চোখে সামনের আকাশের তারার মতো জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ তার চৈতন্য হল। সামনের চেয়ার খালি, আর সিগারেটটা পুড়ে হাত জ্বলছে!

ক্ষণকাল বসে থেকে সুরেশ উঠে পড়ল। অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে পুরোণো জমিদারী বাড়ীর ঘরের পর ঘর পেরিয়ে তেতলায় উঠে ছাতে এসে দাঁড়াল। দেখলো তার শোবার ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে।

শ্রান্ত পায়ে সামনে এসে দেখল, তার সুন্দর তনুলতা ন্যস্ত করে বিছানায় মুখ গুঁজড়ে সুষমা আধশোয়া আধদাঁড়ানো অবস্থায়। সে কাঁদছে কি না তা বুঝলেও সে যে অন্তরের কিছু চাপছে, বা প্রকাশই করছে হয়ত তা বুঝেও সুরেশ ঘরের ভিতরেও এল না, বা চলে'ও গেল না। শুধু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুরেশের নিজেরই মনে হল যেন প্রথম সে একেবারে এক গ্লাস মদ খেয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কে জানে! দশমিনিটই হয়ত হ'বে।

একটা পেঁচার অতিকর্কশ ডাকে চমকে সুষমা স্বামীকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার দীর্ঘ নিটোল দেহখানি শান্ত, আর গালে জলের আভাসও নেই। কিন্তু তার চোখ তীক্ষ্ণ।

যেন অপ্রতিভ হয়ে ঘরে ঢুকে সুরেশ বললে, তোমার কি কিছু হয়েছে, সুষমা?

ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্টস্বরে জবাব এল, কৈ কিছুই না।

সুরেশ চেয়ারে বসে কোমলচোখে বললে, বোসো না, বুলু।

সুষমা বিছানায় বসল। এই আলোয় দেখেও সুরেশের মনে হল, সুষমা যেন বেঁচে নেই, কিম্বা তার মস্তিষ্ক রুগ্ন হয়ে গেছে, কিম্বা যেন সুষমা সম্মোহিত। শান্তশ্রী, সাদাশাড়ী, স্বল্পআভরণা সুষমাকে সুরেশ করুণ চোখে দেখতে লাগল, জানলার দিকে মুখ করে সে বসে, তার টানা বড়ো চোখ পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে কি এক করুণ মাধুর্য্যে ঐ চোখ টলটল করছে। সুরেশের মন একটা স্নেহের আবেশে ভরে' উঠল। সুরেশের মুখ দিয়ে বেরোল, সুষমা!

জবাব নেই। সুষমা জানলা দিয়ে চোখ চালিয়ে কি ভাবছে? একবার উদাস চোখে সুষমা স্বামীর দিকে চাইল। মুহ্যমান মাতালের মতোই সুরেশ স্থির হয়ে বসে কি ভাবতে লাগল। কত কথাই সে ভাবল! ভাবতে ভাবতে কখন কোত্থেকে সুরেশের চোখের সামনে ফিল্মের মতো ভাসতে লাগল সুষমার আর কাউকে ভালো-বাসার ছবি। কিন্তু এ ছবি ফিল্মের ছবির মতো শীগগীর চলে গেল না। অর্থহীন-ভাবে, নির্বোধের মতো সুরেশ এই ছবি, হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই, নানা রকমে দেখতে লাগল। সুরেশের একবার মনে হ'ল, যেন তার মাথাটা আর শরীরটা আলাদা হয়ে গেছে।

সুরেশ ফ্যালফ্যাল করে সুষমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তা হলে সুষমার মুখে আর কারো চুমোর দাগ দেখতে পাবে! তার মনে হল—এই জন্যই সুষমার এই কাঠিন্য, এই বিমুখিতা। হয়ত সেই রসিকতাও পার পাবার খুসীতে করা! তারপর সে ত এতকাল বিদেশেই ছিল। হয়ত সুষমা বিয়ের আগেই কাউকে ভালো বেসেছিল।

যন্ত্রচালিতের মতো সুরেশ চিঠিগুলো বার করে অতি দ্রুত চোখ বুলিয়ে চলল। যদি কোথাও সুর বদলে থাকে—কৈ! কোথাও না! তবে কি বিয়ের আগেই—?

আপন মনে সুরেশ হেসে উঠল—কী সব আজগুবি অসুস্থ মনের কথা ভাবছি! —চোখ তুলে' সুষমাকে দরজার কাছে দেখে সুরেশ বলে' উঠল, সুষমা?—জিজ্ঞেস করেই বললে, তোমার চিঠিগুলো দেখছিলুম, সুষমা—এদিকে ত প্রতি চিঠিতেই

লিখেছে যে তুমি আমার, আর ভালোবাসা আর চুমোও ত প্রতি মেলে পাঠিয়েছ ! কিন্তু এই আটাশ দিন ত একবারও নিজে থেকে চুমো খাও নি !

বেশ যা হোক্ !

বলেই বললে ওহো, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে না ?

এই উচ্ছ্বাসে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হয়ে সুষমা কোমলস্বরে বললে, তোমার খাবার হল কিনা তাই দেখতে ; —ন'টা বাজে।

সুরেশ বললে; বোসো, একটু পরে খাবো, ক্ষিদে নেই।

সুষমা ঈষৎ বিস্মিতচোখে, হয়ত বা ঈষৎ ভীত হ'য়েই নীরবে বসল।

সুরেশ সুষমার কোমল হাতটি দু'হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ তৃপ্ত-চোখে জানলার দিকে চেয়ে রইল। মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়ায় টেবিলের কাগজগুলো, উড়তে লাগল।

কিন্তু স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে আবার সেই পেঁচার ডাক ! সুরেশ চকিত হয়ে মৃদুস্বরে বলে উঠল, বুলু, বুলু।

তার গলার ব্যাকুলতায় ভীত হয়ে সুষমা বললে, কি ? কি হয়েছে ?

সুরেশ যেন কি জবাব দেবে ঠিক করতে না পেরে দু' মিনিট শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই রূঢ়স্বরে হাহা করে হেসে বলে উঠল, কৈ ! কিচ্ছুই না !

অন্ধকার প্রাসাদের ছাতে ঐ শব্দ ভীষণ হয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—হাহ,— ঐ না !

পাগলের মতো সুরেশ হেসে উঠতে লাগল, কৈ ! কিচ্ছুই না ! কৈ ! কিচ্ছুই না ! সুরেশ হাসিতে লুটোপুটি খেতে লাগল, হাঁপাতে লাগল !

ভয়ে বিমূঢ় হয়ে সুষমা কাউকে ডাকতে দরজার কাছে যেতেই সুরেশ উঠে পড়ে সুষমার হাত ধরে টেনে বিছানায় বসিয়ে দিলে।

মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বীভৎস গলায় বললে, যাও কোথায় ! কিচ্ছুই না !

বলে'ই পলকে ভূঁয়ে বসে' পড়ল, তার দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ল।

ব্যাকুল ত্রস্ত হয়ে সুষমা অস্বাভাবিক শক্তিতে সুরেশকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলে। টেবিল থেকে গোলাপপাশটা নিয়ে সুরেশের মাথায় গোলাপজল ছিটিয়ে দিলে। অভাবিত স্থৈর্য্যের সহিত হাওয়া করতে লাগল।

দাসী খেতে ডাক্‌তে এসে ফিরে গেল। চৌকীদারের প্রথম টহল হয়ে গেল। হাতপাখাও আপনিই মন্দগতি হয়ে এল।

সুরেশ চোখ মেলে দেখলে—স্নেহ-উদ্বিগ্ন আনত মুখ, কোমল দৃষ্টি। কী এক সুখস্বপ্নে সে আবার চোখ বুজল।

কপালে স্নিগ্ধ স্পর্শে সে স্বপ্ন চলে গেল। সুষমা মৃদুস্বরে বললে, ভালো বোধ করছ এবার ?

নীরবে মাথা তুলে সুষমার কোলে রেখে সুরেশ দুহাতে সুষমাকে জড়িয়ে ধরল।

চতুর দাসী আবার ফিরে গেল।

... ...

খেয়ে এসে সুষমা দেখলে, সুরেশ শুয়ে পড়েছে, ঘরের আলো কমানো। সুরেশ বললে, এই যে সুষমা, এসো—তোমারই জন্যে জেগে আছি।

দরজার খিল দিতে দিতে সুষমা বললে, ইস, ঘুম হয় নি তাই বলো! উনি আবার আমার জন্যে জাগবেন তা না ত!—তার মুখ মনোরম প্রেমের হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

মশারী তুলে মুখ বাড়িয়ে সুরেশ বললে, বেশ ত, আজকে এই ন্যর্ভেও জেগে থাকি কার জন্যে—ঘুমের, কি তোমা. কথার—তা জানবে এখন।

সুষমা হাসিমুখে স্বামীর দিকে চেয়ে কি বলতে গেল, কিন্তু না বলে পলকের জন্যে চেয়ে রইল।

শোবার ইজের জামা পরে সুরেশ ভাবলে এ চউনি সুষমার প্রেমের চাউনি।

যন্ত্রচালিতের মতো ব্লাউস খুলতে খুলতে সুষমার মনে যেন ওস্তাদের আঁকা একখানি ছবি স্পষ্ট হয়ে লঠল—বিলেতী বাড়ীর ছোট শোবার ঘর—দেয়ালের ধারে আগুনের চুল্লী—বিলেতী খাট—আর তার ওপর শুয়ে স্লিপিংসুটধারী সুরেশ, আর—ও কে ? —মুখটা দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু নারী—পরিপূর্ণ যৌবন, চারু তনু—শ্বেতগোলাপের, তুষারের রং—

সুষমার সারা দেহ হিম হয়ে উঠল, কঠিন হয়ে উঠল, অবশ হয়ে উঠল।

সুরেশ বললে, দাঁড়িয়ে কি ভাবছ, বুলু ? আজ আমাদের বাসর রাত্রি ?

যেন মোহতন্দ্রা থেকে জেগে উঠল সুষমা বললে, হ্যাঁ, যাই। তার গলার স্বর যেন কোন দূর দেশ থেকে আসা শব্দ, যেন যন্ত্রের ধ্বনি, একেবারে প্রাণহীন। তার চোখ যেন বিকল, তার কান যেন বিকল, তার সারাদেহ যে চেতনাবিহীন—বিদ্যুতের স্পর্শেও যেন তার স্নায়ুশিরার ও মস্তিষ্কের নেশা ভাঙবে না—

সুষমা ব্লাউসটা খুলে আনলায় রেখে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল।

একটা দমকা হাওয়ায় ফুলের গন্ধের মতো একটু সুরের আভাস ভেসে এল।

সুরেশ বললে, ছোটকাকা তাঁর প্রাত্যহিক বীণা ধরেছেন—দিনের শেষ রাগিণী।

নিশি-পাওয়ার মতো সুষমা মশারীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, আলোটা নিবিয়ে দিই?

সুরেশ বললে, আবার আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন?

গুণীর হাতের যন্ত্রে মিলন-পুলকের মৃদু সুর কেঁপে কেঁপে হাওয়ায় ঘুরতে লাগল।

ফিরে-ফির্তি

(১)

কাল অণি এসেছিল, বললে, অনেকদিন তোকে দেখিনি, তাই এলুম। বললুম, আমি কি তোর দেখবার জিনিস? আয়নায় নিজের মুখ দেখিস—তৃপ্তি পাবি।

আরেকটু নিজের প্রশংসা পেলুম। নানান কথাই হ'ল। অণি বললে, সৃষ্টীশবাবু তাদের কাছে গেছলেন, ঘণ্টা তিনেক বসে গপ্‌প করেছেন, গান শুনিয়েছেন,—ভারী ভালো লোক, এই অল্পক্ষণেই এত বন্ধুর মতো, ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করেছিলেন,—কোনো দেমাক নেই!

এমন করে বললে, যে গা জ্বলে যায়। বললুম, গেছলেন, সে সুখের কথা। আর ও বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠতা ওঁর স্বভাব—ওতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—যার তার সঙ্গেই ওঁর ওই রকম।

অণি বললে, রাগ করছিস কেন বল ত? জানিস ত আমাদের duel লড়ার উপায় নেই।

অনিটাকে খুব ধমকে দিয়ে বললুম, কেমন লাগল তোর, তাই বল। খুবই ভালো লেগেছে ওদের—তা লাগুক গে। আমারই বা কি, আর ওঁরই বা কি!

যাক। উনি এলে হয়। একটু গপ্‌প করি।

কিন্তু অণির রংটা কিরকম—বিশ্রী রকম সাদা! আর চোখ দুটোও কি রকম অতিরিক্ত টানা! দেখলে হাসি পায়!—'

এখানেই চিন্তা থামিয়ে সুব্রতা বারান্দায় বেরিয়ে দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, সৃষ্টীশবাবু এসেছেন কিনা। কিন্তু তার উত্তরের আগেই সৃষ্টীশবাবু স্বমূর্তিতে হাজির।—

বাগানের শুপুরি গাছের তলায় বসে সুব্রতা বললেন, আপনার জন্যে সারাদিন আজ বসে আছি, জানেন?

সৃষ্টীশ নিরুদ্বিগ্ন স্বরে সুব্রতার শাড়ীর পাড়টায় হাত দিয়ে আঙুলে পাকাতে

পাকাতে বললে, সত্যি? আমার ভাগ্য!

সুব্রতা স্বষ্টীশের হাতের দিকে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, তার মানে?

—তার মানে আমার জন্যে যে কেউ—বিশেষ করে সুব্রতা বসে থাকেন—তাও সারাদিন—সে আমার ভাগ্য।

—ইস! যেন জানেন না, রোজই আমার সেই অবস্থা!—পরিপূর্ণ চোখে সুব্রতা স্বষ্টীশের দিকে চাইলেন। মোলায়েম গলায় বললেন, কাল বুঝি অমলবাবুর বাড়ী গিছলেন?

স্বষ্টীশ তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোটেই চঞ্চল না হয়ে তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো সুব্রতার চোখে রেখে বললে, হ্যাঁ, অমল নেমন্তন্ন করেছিল। আর ওর বোন অরুণার আমার লেখা খুব ভালো লাগে—চিঠি লিখেছিল—সে কি উচ্ছ্বাস!

বাঁকা হাসি হেসে সুব্রতা বললেন, অণিটা চিঠি লিখেছিল! ও যে কাকে লেখে নি! সব লেখককেই ও চিঠি লিখেছে!

হাসি চেপে স্বষ্টীশ বললে, নিশ্চয় তা হলে সাহিত্যের প্রতি টান আছে। বেশ মেয়েটি।

সুব্রতা ডান পাশের জনহীন লনের দিকে চেয়ে বললেন, সবাই তাই বলেন।

স্বষ্টীশ বললে, তা বলবারই ত। আমার ত ভারী ভালো লাগল—

ওঃ—কি—পিঁপড়ে কামড়াল নাকি?

—না, ধন্যবাদ।

স্বষ্টীশ একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা, তা হলে উঠি নমস্কার।

—চললেন? কোথায়? আজও কি অমলদার নেমন্তন্ন নাকি?

—আপনার কিছু বলবার আছে নাকি? বেশ ত, বলে দেব এখন—চোখ দুটো ঈষৎ করুণ ও গাল দুটো ঈষৎ লাল করে সুব্রতা বললেন, হ্যাঁ, যদি দয়া করে বলে দেন, অণি যেন কাল না আসে, কাল আর পিকনিক হবে না—কাল আমার বোধহয় কাকিমার কাছে যেতে হবে।

স্বষ্টীশ বললে, বেশ, বলব এখন। তা কাল ত তা হলে আমিও আসব না?

সুব্রতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তা হলে কাল সে গানটা কেমন করে শিখব, শুনি?

স্বষ্টীশ যেন অপ্রতিভ হয়ে বললে, ওঃ তাও ত বটে। তা চলুন, আজও একটা গজল ঠিক করে এসেছি।

যথারীতি আবার সেই পরিপূর্ণ চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা, হাতে হাত ঠেকলেই অলক দুলিয়ে ঈষৎ লাল হয়ে ওঠা, সুর ভুল করা—সবই হ'ল।

(২)

অরুণা হেসে বললেন, চলুন না ; আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব, ট্রামে আর কেন যাবেন ?

সৃষ্টীশ মোটারে উঠে পাশে বসল। মোটার চলল।

অরুণা বললেন, আজ পার্টিটায় বেশ কাটল, না ?

সৃষ্টীশ কোমলস্বরে বললে, আপনি ছিলেন যখন—

ধীরে সৃষ্টীশের বাহুতে টোকা দিয়ে অরুণা বললেন, You flatterer ! সৃষ্টীশ কখন কেমন করে তার ডান হাতটি অরুণার পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিলে, যেন নিজেরই অজ্ঞাতে।

অরুণা কখন কেমন করে স্বতই ভালো করে, ঢুকে বস্‌তেই যেন পেছনে ঠেস দিলেন, যেন নিজেরই অজ্ঞাতে।

যেন ঈষৎ কুঁকড়ে বসে অরুণা বললেন, একটু শীত রয়েছে—সৃষ্টীশ তাড়াতাড়ি তার শালটা খুলে বললেন, এই যে—

অরুণা ঘাড় নেড়ে বললেন, না, না, ও চাই না।

সৃষ্টীশ বললে, আমি ব্যবহার করি নি এখনও, এই আজ সবে পাট ভেঙেছি—ঘেন্নার কিছু—

অরুণা হেসে বললেন, আমি কি তাই বলছি নাকি ? আপনার কেবল বাঁকা কথা—দিন গায়ে দিই—

সৃষ্টীশ ত্রস্ত করে অরুণার গায়ের উপর শালটা জড়িয়ে দিলে।

অরুণা বললেন How cosy ! কিন্তু আপনার শীত করছে না ত ?

সৃষ্টীশ বললে তা একটু করছে বৈকি। এক সঙ্গে গায়ে দিতে বলেন ?

অরুণার গাল অন্ধকারেও লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, যান, আপনি ভারী—আপনার সঙ্গে কথা কইব না—কাল ত খুব গিছলেন ! আমি সারাদিন আপনার জন্যে ব'সে—আপনার সেই কবিতার রাজকন্যার মতো।

সৃষ্টীশ কোমল স্বরে অরুণার কাঁধে হাতের ঈষৎ চাপ দিয়ে বললে, সত্যি ? আমার ভাগ্য।

অরুণা কাঁধটি একটু দুলিয়ে স্নিগ্ধ চোখে বললেন, তার মানে।

সৃষ্টীশ আর একটু জোরে অরুণার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, তার মানে আমার জন্যে যে কেউ—বিশেষ করে অরুণা বসে থাকেন—তাও সারাদিন—সে আমার সৌভাগ্য।

অরুণা নরম গলায় বললেন, যেন জানেন না, আমার রোজই সেই অবস্থা।

গাড়ী থামল। হাতে হাত চেপে সৃষ্টীশ নেমে বললেন, কাল যাব ত? আচ্ছা।

(৩)

সুব্রতা আর তাঁর সাহেব স্বামী নন্দদুলাল রায় চলে গেলে পরে অরুণা স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বললে, আচ্ছা—দেখো এই যে আমাদের স্বাধীনতা আছে অথচ নেইও, এ যে কি বিশ্রী আর করুণ, না?

সৃষ্টীশ বললে, এর মধ্যেই ডির্ভোস করার কথা ভাবছ না কি? 'আমাদের স্বাধীনতা'—

অরুণা রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইলেন। সৃষ্টীশ ঝুঁকে তার গালে মুখ রেখে বললে, হ্যাঁ, গা, রাগ করলে নাকি?

অরুনা বললেন, হ্যাঁ গা করেছি।—বলেই বললেন, এ যেন শেকল বেঁধে হরিণকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া। বাস্তবিক বাঙালী মেয়েদের মতো অবস্থা—যেন দু নৌকায় পা রেখে চলা!

সৃষ্টীশ পরিহাসের সুরে স্নিগ্ধ স্বরে বললে, ভাগ্যিস, স্বাধীন হও নি, হলে ত আর আমায় তোমার অধীন—'মালঞ্চের মালাকার' হতে হত না! বড়ো জোর তোমায় টাইপিষ্ট দেখে তৃপ্ত হতুম!

ঠোঁট বেঁকিয়ে সৃষ্টিশের কোমর জড়িয়ে অরুণা বললেন, অতটা অহঙ্কার ভালো নয়। বুঝেছ? তোমার অত কিছু মূল্য নেই। শুনছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু শুনতে বিশেষ ভালো লাগছে না—এক ঐ মুখ থেকে আসছে ছাড়া—

—তা ত লাগবেই না—

—লাগবেই না! না? কিন্তু তোমার মুখটি কেন অত ভালো লাগে বলো দিকিন!

—আঃ, কি করো, কেউ দেখতে পাবে।

—পেলেই বা—আমাদের—two soulsides, one to face the world with,

one to show a woman when he loves her !

—ওগো, একটু পড়ো না—

—তোমার রূপ দেখেও নন্দদুলাল পাগল না হতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় ত আর আলো টি'কবে না।

—ঘরে চলো।

পড়া আরম্ভ হল।

স্পষ্টীশ যখন পড়লে—Feel my heart ; let it die against your own.

অরুণা বললেন—Norbert বললে, Against my own ! Explain not ; let this be—this is life's height.

Constance—Yours ! Yours ! Yours !

Norbert—You and I—

Why care by what meanders we are here,

In the centre of the labyrinth ? men have died

Trying to find this place, which we have

Con.—Found ! Found !

Norbert—Sweet, never fear what she can do !

We are past harm now :—অরুণা বললেন, ওগো, খেতে ওঠো—নটা বাজল—খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

স্পষ্টীশ মৃদু হেসে বললে, বটে !—ও:—'tis the বাবুর্চি comes.

অরুণা বললেন, Kiss !

(৪)

অরুণা শ্রান্তমনে বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখছিলেন। আজ তাঁর শরীরটা খারাপ,—তাই স্পষ্টীশ সুব্রতাকে নিয়ে একাই চক্রতীর্থের দিকে বেড়াতে গেছে—তা সে গেছে পাঁচটায়। সাতটা বেজে আটটাও বাজতে চলল। অবসন্ন মনে অরুণা শুধু সন্ধ্যা-ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলেন।

সময় যেন চলে না—অসহ্য ভার। কখন ফিরবে কে জানে ? সুব্রতা আর স্পষ্টীশ একা গেছে ! নন্দদুলাল কলকাতায় গেছে—মক্কেলের জরুরী ডাকে। কখন ফিরবে কে জানে ! স্পষ্টীশ আর সুব্রতা—

অরুণা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বললেন, কে—সুব্রতা ? একলা ! এত দেরী যে ? একলা যে ?

সুব্রতা সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, উঃ, পা যেন ভেঙে যাচ্ছে। তবুও খানিকক্ষণ বালির ওপর বসেছিলুম—সৃষ্টীশবাবু কবিত্ব করছিলেন, ঐ যে আসছেন।

সৃষ্টীশ দুটি হাস্যরত ভদ্রলোক ও দুটি হাস্যরতা মহিলার সঙ্গে সামনে এসে বললে, এই যে অরুণা—এঁরা আমার পরম বন্ধু মালবিকা মিত্র আর রমলা সেন আর এঁরা মৃন্ময় মিত্র আর চিন্ময় রায়—আর এঁদের আপনারা চেনেনই।

নমস্কার করেই উক্ত রমলা সেন হেসে বললেন, কিন্তু যাই বলুন, সুষবাবু, আপনার ও duel-এর গপ্‌পটি simply funny !

হঠাৎ অরুণার চোখ পড়ল সুব্রতার গায়ে—তার গায়ে জড়ানো সৃষ্টীশের সেই শালটি !

পৌরাণিক প্রশাখা

ক

অনেক মানুষ আছে, উদ্ভিদের কোঠায় ফেললে যাদের পরগাছা আখ্যা দিতে হয়। ভরত সেই দলের।

পরগাছা যেমন তার বিচিত্র ফুল দিয়ে তার বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমি লুকিয়ে সবাইকে হাতছানি দেয় ভরতও তেমনি তার নাম পরের মুখে শুনতে ভালোবাসে।

পৌরাণিক জগতের ভরত সেখানে নিতান্তই পরগাছা। আমাদের ভরতের জীবন যদি ত্রেতাযুগের কেকয়দৌহিত্রের জীবনের জেরই বলি, ত বলতে হবে যে, সে জীবন পুরাণের পুনর্জন্মের নাটিকায় গৌণ।

তবুও বেচারা ভরত বিংশশতাব্দীর মানুষ না হলেও ভক্ত বলে তার নামজাহিরের চেষ্টাটা আমার ভালোই লেগেছে, ও চেষ্টাটা পুরাতন হলেও চিরন্তন বলেই। চিরন্তন নিয়েই ত আর্টিষ্টের কারবার।

ভরতের উনষাট পাতার কাগজের তাড়া থেকে এইটুকু ছাপান গেল। সে বেচারা দশরথের বিষয় পায় নি এবং তার দাম্পত্যজীবনের মিলনদুর্লভতাটুকু বৈষ্ণবকবিবর্ণিত 'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' গোছের ছিলনা। অর্থাৎ সেটা ছিল ওদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

মোটামুটি ভরত ছেলে ভালো, চেহারায় ও চামড়ার purse ব্যবহার দুয়েই। না, বাস্তবিক ভরতকে ভালো লাগে। ওর বুদ্ধি খুব আধুনিক অর্থাৎ সন্দেহজনক না হলে, ও আসলে আধুনিক অর্থাৎ ওর মূল্য স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত শূন্য বা ০। ও নিজেই ওর মোগল গড়নের মাথা খেয়েছে। ওর আশা ছিল।

ভরত*

(১)

ভরতের পুরোনো ডায়েরি থেকে :—

লক্ষ্মণের নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়েছিলুম। নববিবাহিত রামলক্ষ্মণের স্ত্রীদের সঙ্গে

* ফুটকিগুলো ভরতের নয় ও তারা বাদ দেওয়ার চিহ্ন।

আলাপ হল। ভালোই লাগল মোটের ওপর।

বাগানে বসলুম। জাপানী ঢঙে হ্রদ, অর্দ্ধচন্দ্র ব্রিজ, গাছে ঢাকা আঁকাবাঁকা জলধারা, মরাল, ময়ূর আর হরিণ, বাগানের মধ্যে পাথরে জাপানী দীপমন্দির। লক্ষ্মণ বললে, সে ডাক্তার বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে তোকিওতে শ্রীযুক্ত ওগাতার বাড়ীতে দেখেছিল।

নাচ দেখলুম। উর্ম্মিলার পিসতুত বোন, মিষ্টার যাজ্ঞবল্ক্য ও মিসেস মৈত্রেয়ী বসুর মেয়ে নাচলেন। বছর কয়েক পরে হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ভালো বলতে পারতুম হয়ত। এখন মুস্কিল। অপ্রচলিত। বোধহল জাভার ঢঙে যেন অনেকটা। বিষয়—নল পলাতক, দময়ন্তী ব্যাকুল হয়ে বিহ্বল হয়ে ঘুরছে। গভীর অরণ্য, তারই মাঝখানে সেই উতলা অন্বেষণ!

খড়েছাওয়া পাথরের মঞ্চ, চারদিকে অজস্র ফুলের গাছ, অদূরে কালো জল, হাস্নোহানার মদির গন্ধ হাওয়ায়, আর বেঁটে বেঁটে চেয়ারে আমরা কজন মহিলা ও পুরুষ বসে, আলো ম্লান, কালো জল ছলছল করছে, সহরের শব্দ কিছু নেই। মোটের ওপর কেটে গেল একরকম।···

দৃশ্যপট? বাগানের বড়ো বড়ো গাছই দৃশ্যপট। তারপর লক্ষ্মণের লেখা marionette নাটিকা হল। উর্ম্মিলা সীতাকেও দেখলুম। খাসা মজার পুতুলনাচ!

তারপর গান বাজনা, Bach-এর ariaa টা বেশ লাগল, যদিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হল না।

এসব ব্যাপার সীতার জন্যে। তাঁর অসুখ হয়েছে, তাই। তাঁর ennui হয়েছে। তাঁর—থাক্ গে।···

খাওয়ার টেবিলে সীতার পাশে বসতে হল। বললেন, কেমন লাগল? বললুম, চমৎকার। কেতা ছেড়ে সীতা গৃহিনীপনা ফলাতে লাগলেন। এত কাছে সীতাকে আগে দেখিনি। দেখেছি ত মোটে দুবার। সীতার রুক্ষ লালাভ, সুরভিত কেশভার তুসারশুভ্র রং, মুখে শুধু একটু সামান্য রুজ বোধ হয়। সীতার সরু সরু লম্বা আঙুল, চমৎকার নখ, মুক্তমসৃণ শুভ্র বাহু, মোহসঞ্চারী শুভ্র সুঠাম ঘাড় ও গলা, রক্তের চেয়েও লাল রঙের শাড়ী ও ব্লাউস। বিচিত্র ধরণের শাড়ীপরা, খস্‌খসের তীব্র সুগন্ধ।

এসব সত্ত্বেও মনে হল সীতা চমৎকার। মনে হল সীতা শান্তশিষ্ট ভীরু স্নেহশীলা বঙ্গবধূ। ভারী ভালো লাগল— অবশ্য এমনি ভাবেই। কারণ—থাক গে!

ভাবছিলুম সীতাদেবীর সম্বন্ধে লক্ষ্মণটার কাছে সেমত দেওয়া ভালো হয়নি। আর কেমন করে অনভ্যস্ত খাওয়ার অসুবিধেটা গোপন করব তাই ভাবছিলুম।

অকস্মাৎ সীতাদেবী বললেন, আপনি ত ভারী নিষ্ঠুর! আমি chaste নই, একথা বলতে আপনার বাধল না! একটু শিভ্যাল্‌রিও কি নেই আপনার! আপনি কি সত্যিই আমায় unchaste ভাবেন!

বিস্মিত, বিমূঢ়, বিহ্বল, ব্যাকুল হয়ে সীতাদেবীর নিটোল সাদা বাহুতে হাত দিয়ে ফেললুম, আপনি আপনি—মানে—

সীতা মুখের কাছে মুখ এনে লোভনীয় লাল ঠোঁটে ইসারার হাসি টেনে বললেন, আহ! অত বিচলিত হন কেন! দেখুন ত, ওঁরা কি ভাববেন! এমন করে হাতে—

সীতাদেবী বেহালার মতো সরুগলায় খিল খিল করে হেসে উঠলেন। তাঁর লাল পাতলা ঠোঁট আর ছোট সাদা দাঁত। হাস্‌লে তাঁর শরীর চমৎকার কাঁপে।

উর্ম্মিলা কোত্থেকে—সামনের চেয়ার থেকে হেসে বললেন, কি ভরত? টেবিলে বসেই প্রেম!

তাঁর পার্শ্ববর্তী ইটালিয়ানটী বিস্মিত হয়ে' উর্ম্মিলার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার দিকে তাকালেন এবং সেই সঙ্গে সবাই—মায় দূরস্থিত রাম ও সেই—বোধহয় কঙ্কালের স্ত্রী জাপানী মহিলাটী পর্য্যন্ত। লক্ষ্মণও একটু ইডিয়টের মতো হাসছে দেখি। এমনি স্ত্রৈণ! হাস্যকর! উর্ম্মিলার সবেই যেন ওর সঙ্গত করা চাই-ই…।

ক্ষণকাল পরে গাড়ীতে উঠে, লক্ষ্মণ বললে, এই, কিছু মনে করিস নি। সীতার সবই ঐরকম। আসলে ওর তোকে ভালো লেগেছে। মাঝে মাঝে আসিস। আমাদের ত য়ুরোপ যাবার কথা হচ্ছে।

সিগারেটটা ফেলে বললুম, শুধু সীতার নয়, তোর বউয়েরও তাই। না হয় সম্পর্কে বৌদিদিই হলেন—তুই ত মোটে দেড়মাস বড়ো—সেই বলে গাল টেপবার মানে?—

—তার মানে? উর্ম্মিলা তোর গাল টিপল নাকি?

আহা—না টিপুন, ছুঁলেন ত! ফ্যানের বদলে আঙুল দিয়েই ছুঁলেন ত! বয়সে কিন্তু আমিই বড়।…

আচ্ছা, আমি দেখতে ভালো কি?

(২)

বাল্মীকির খসড়াখাতার খানিক:—

একটু শীতের আমেজ আছে—অলসভাবে কৌচটায় পড়ে আছি। আকাশ মেঘে

ঢাকা—হাওয়াটা ভিজে। বেশ লাগছে—হাতে 'সোয়ান সং' বইখানা। ফ্লারের অসুস্থমনের ইতিহাস ভালো লাগছে না। গলসওয়ার্দির নায়ক নায়িকারা সব লালসায় অসুস্থ। লরেন্স্ যা বলেছেন তা ঠিক! সত্যিই ফোরসাইট ইতিহাসের প্রেম doggish.

অকস্মাৎ লক্ষ্মণের সুচারু সরু মোটরের সেই বিশেষ শব্দ।

লক্ষ্মণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই নাওহে—তোমায় দিয়ে গেলুম—সীতার ডায়েরি—ওকে বোলো না—আপিস যাচ্ছিলুম।—আ! চমৎকার আকাশ আজ—বৃষ্টিটা এলে হয়—বাড়ী চলে যাই—

O Western wind, when wilt thou blow
That the small rain down can rain ?
Christ, that my love were in my arms
And I in my bed again !

লক্ষ্মণের অক্স্ফোর্ডীয় পোষাক ও মনোকূল্ অদৃশ্য হল।

সীতার ডায়েরিতে কত মেয়ে, কত পুরুষের, কত দেশের, ছোট বড়, কত নাম! তাতে কত গভীর, কত হালকা আধ্যাত্মিক ও অশ্লীল কথা! তারই সামান্য নিরাপদ ও নিরীহ খানিক টুকছি।

সীতার ডায়েরি থেকে :—

কতকাল ডায়েরি লিখিনি। ডায়েরি লেখার মতো শ্রান্তিকর ব্যাপার আর নেই—প্রেম ছাড়া। আজ এমনি বিশ্রী লাগছে—এক নতুন লোকের (লোকটা কেমন লেখে কে জানে! নতুন লিখছে শুনছি) Du Cote de chez Swann পড়ছিলুম। পারলুম না পড়তে।

আমাদের এই তিনমাস হবে বিয়ে হয়েছে। ভেবেছিলুম অন্তত কিছুকাল—বেশ লাগবে। রামের অবশ্য বিশেষ ত্রুটি দেখিনি এখনও। বরঞ্চ ও অতিরিক্ত স্ত্রৈণ। অতটা ঘনিষ্ঠতা ও আদর সব সময়ে ভালো লাগে না। ওর কি হয়েছে—ওর কবে মনের কষ্টে ঘুম হয় নি, কবে ওর নখের রং কালো হয়ে গিয়েছিল এইসব কথা শুনতে হবে—আবার আগ্রহ দেখাতে হবে। এমনি naive! ওর temperament বড়ো warm—দক্ষিণের। শোবার ঘরটা আলাদা করতে হবে।...

রাম আজ আবার ওর বাবার কাছে গিয়েছিল। তিনি এখনও চটে আছেন। মহামুস্কিল! বাবা কাল যাবেন বোধহয়। আইনের নাম করে যদি বাধা দেওয়া যায়। তিনি রামের কাকার ছেলে ভরতকে বিষয় দিয়ে যাবেন নাকি! অন্যায় দেখ!

রামকে বলুন, যদি দরকার হয়, ত উর্মি আর আমি যেতে পারি, রাম যদি কান্নাকাটি করে ভোলাতে পারি।

রাম রাজি হল না। রাম লজ্জা পাবে। তিনি নাকি ভারী সেকেলে। যাহোক, শ্বশুর বলে না চিনলেও একটা সম্ভ্রম বোধ করছি।...আমি বেজায় Domesticated, ঘরের ওপর আমার বেজায় টান বলেই বোধ হয়।...

সেদিন আমাদের পার্টিতে ভরত এসেছিল। বেচারা! বেশ লাগল ছেলেটিকে। অত্যন্ত innocent. ভয়েই যায়! বেশ লাগল। ও লক্ষ্মণের কাছে একদিন খুব বক্তৃতা দিয়েছে—তাতে আমাকে কম্‌প্লিমেন্ট দেয় নি। ...

ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে প্রেমে পড়বে। ও (কাটা) রাম আবার চটে যাবে। মহামুস্কিল। কি যে করি। একটু thrill পাবার জো নেই। উর্ম্মিলাটা কিন্তু খুব দাম্পত্যসুখে মগ্ন হয়ে আছে।...

রাম আবার ওর সন্ধ্যাবেলার আলিঙ্গন ও চুম্বন দিতে আসবে। ভাবতেও ভয় হয়। রাম একটা Sentimental (কাটা)...

(৩)

বাল্মীকির খাতা থেকে বহুকাল পরে। তবে ভরত সেই ভরতই আছে।—

পাভ্‌লোভার নাচ দেখতে গিয়েছিলুম। বসে আছি। রাশ্যা সত্যিই প্রাচ্যদেশ। সময় উত্তরে গেছে। কিন্তু পাভ্‌লোভার দেখা নেই।

হঠাৎ ওপরে চোখ পড়ল। সামনেই শ্রীমতী উর্ম্মিলা। ঘাড় নাড়লেন ও হাসলেন। লক্ষ্মণ নেমে এসে বললে, মাণ্ডবীও আছে—চলো না।

বললুম, এখন—

লক্ষ্মণ বললে, কি ছাই acrobatic feats দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছ!

লক্ষ্মণের বিচিত্র শাল থেকে একটা তীব্র গন্ধ এল। লক্ষ্মণ চলে গেল। বিলম্বে শ্রীমতী পাভ্‌লোভা এলেন। ভালোই লাগল। ইণ্ট্যারভ্যালে বক্সে গেলুম।

সীতা অনর্গল বকতে লাগলেন। মধ্যপথে থামিয়ে বললুম, আজ কি ওঁর debut?

লক্ষ্মণ মাণ্ডবীর সঙ্গে আলাপ করে দিলে। অত্যন্ত লাজুক, অত্যন্ত সুকুমার, অত্যন্ত সুশ্রী। কিন্তু কথা বলতে পারেন! এই শুনেছি যে অত্যন্ত সেকেলে!

উর্ম্মিলা বললেন, মাণ্ডবী, বাংলাদেশে একদল blackmailer হয়েছে তাদের সঙ্গে আলাপ করাও নিরাপদ নয়। তোমার—

মাণ্ডবী বেশ। তিনি বললেন, আমার কিন্তু গোপন রাখবার মতো কিছু নেই। সূর্য্যের আলো সইতে পারি।

সীতা বললেন, ভরতের কিন্তু আছে। কাজেই এই সব blackmailerদের বাস্তবিকই দূরে রাখা উচিৎ। দেখেছ—রবীন্দ্রনাথও এদের দলে ঢুকেছেন—

বললুম, তার মানে?

সীতা বললেন, এই ধরুন না, আমাদের অমিতকে নিয়ে যা করলেন! ছি! ছি! কেটি তাই বলছিল।

উর্ম্মিলা বললেন, সেদিন তাই বলছিলুম, আপনারও এরকম ভাবে লেখাটা যেন কেমন লাগে।' 'কেন, তোমার কি ভালো লাগেনি?' বলে একটু হাসলেন।

থামিয়ে বললুম, পাভ্‌লোভার সঙ্গে কি আলাপ হল?

সীতা বললেন কি আর? আনা ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল কিনা—

উর্ম্মিলা বললেন, একটু আহ্লাদেও—

রাম অকস্মাৎ খুব জোর গলায় বলে উঠলেন, আহ্লাদে? সেন্টিমেণ্টাল? সিন্‌সিরিয়াটি, ফিলিঙের ইনটেনসিটি হয়ে গেল আহ্লাদে-নাঃ—তোমরা এত mean; পাভ্‌লোভা, যে পাভ্‌লোভা, যে অপরূপ আশ্চর্য্য পাভ্‌লোভা, যে—

সীতা বললেন, আঃ রাম, চুপ করো।

বুঝলুম রামের মাত্রাটা সেদিন বেশী হয়েছিল।

রাম গুম হয়ে বসে 'from ninteen hundred nlne or ten Pavlova's had the cry' করুণকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল।

সীতার ব্যাজহাস্য ও কৃত্রিম কথা পাভ্‌লোভার স্বপ্নমূর্ত্ত নৃত্যকে ঝাপসা করে দিতে পারল না। বরঞ্চ মাণ্ডবীর কমনীয় তৃপ্ত রূপ ছবির মতো চোখে ভাসে।

(৪)

ভরতের চিঠি থেকে

পরশু প্যারিসে এসেছি। আমার ফরাসী যদিও ভুল, তাহলেও অসুবিধে হয় নি। আমার সে প্রিভিকাউন্সিলের কেসের দেরী আছে, তাই ভাবছি একমাস থাকব। যেখানে আছি, সেখানে লক্ষ্মণরাও ছিল। কাজেই সুবিধা হয়েছে। জানাশুনো লোক পেয়েছি কয়েকজন। তার মধ্যে একজন ইণ্ট্যারেষ্টিং—চেনো? Pierre Wolff—নাটক-লেখক…।

ইতিমধ্যে কি হয়েছে জানো? মন কেমন করছে।—না, তোমাদের জন্যেও। আজ আবার মাওবীর জন্মদিন। আটাশ বছর হল। কি করব বলো? নিতান্তই সেকেলে দিশি ভাবে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কি জানো; এতদিন বিয়ে হয়ে গেলেও মাওবীর রহস্য পুরোণো নয়। নাই হল সে অর্কিড্, তবু তার মধ্যে যে রহস্য আছে তা ত মানো?

মাওবীর শান্ত স্নিগ্ধ রহস্য আমায় মুগ্ধ করেছে। হোক না সে স্ত্রী, আমি ত তাকে নিতান্তই স্ত্রী বলে দেখিনি,—liaisonর আস্বাদ ওর প্রেমে পাই। মাওবী হয়ত আসলে নিতান্তই সাধারণ মেয়ে একটি। কিন্তু আমি ত কবি নই, তার রহস্যময়তা নিছক কল্পনাই নাও হতে পারে। মাওবীর সঙ্গে মোনালিসার আদল নেই, সেই বলে কি সে চিরকালের সৌন্দর্যদূতী নয়, সৃষ্টির রহস্যের রূপক নয়?

মাওবীকে মোনালিসার চেয়ে দেখতেও ঢের ভালো। এপষ্টিনের গড়া সে মূর্ত্তিটার বিশ্রীতা ভুলে যাও তাতে ওর রহস্যকে ফোটানো হয়েছে তার মাধুর্য্যকে বাদ দিয়ে। মনে করো পাতলা, একটু রোগাই বলতে হবে শরীর, তার অত্যন্ত পাতলা ও হাল্কা চুল তার সরু টানা ভুরু তার সরু নাক—হাসলে ওর নাক কিরকম কাঁপে দেখছ? ওর অত্যন্ত পাতলা ঠোঁঠ, ওর সাদা মেঘের মতো পাণ্ডু রং, ওর নিটোল সরু হাত, আর ওর আশ্চর্য নরম আঙুল আর ওর গলা! আ! বিধুর হয়ে পড়ছি! ওর গলার জন্যে। ওর গানের জন্যে শুধু চিত্ত নয়, আমার স্নায়ুগুলোও গরম কালের মাটির মতো পিপাসিত···।

আসবার আগের দিনে ছাতে বসেছিলুম তখন সন্ধ্যা, ইয়েট্সের কবিতার মতো মনোরম উদাস বিষণ্ণ সন্ধ্যা। হাওয়া মৃদুগতি। চাঁদ নেই। শুধু তারা। মাওবী এসরাজটা আমায় দিয়ে একটা উর্দু গান সুরু করল। মিশ্রসুর। সেই মামুলি যমুনা ও রাধাকৃষ্ণ। আজ তার মাধুর্য্য ও আনন্দ poignantly বুঝছি সেই সামান্য তিন লাইন ত গান, তার মধ্যে স্বরের ও সুরের কত বৈচিত্র্য ও লীলা!

কাণ দুটো ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। এই এম্পায়ার আমলের আসবাবের মাঝখানে বসে দেখতে পাচ্ছি—সেই অস্পষ্ট আলোয় মাওবীর অর্দ্ধনিমীলিত চোখ সেই সাদা শাড়ী আর কালো চুল।

মাওবী বলেছিল, বড্ড খারাপ লাগছে। Jealous হয়ে পড়ছি। ওথেলো খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তুমি সেখানে একলা যাবে ভাবতে ভালো লাগছে না।

মাওবীর গলায় হাতটা রেখে বললুম, বেশত তুমিও চলো। তাহলে ত আর জেলাসির কারণ থাকবে না।

মাওবী বলেছিল, সে আর হয় না। আর মা কষ্ট পাবেন। বউয়েরও বিলেত

যাওয়াটা তাঁর ভালো লাগবে না।

মাণ্ডবী আমার দিকে এমন ভাবে কদিন তাকাত! একটা কথা তোমরা কেউ জানো না, আমাদের বিয়ের পরে কোথাকার কে একটা সন্ন্যাসী এসে বললে, চোদ্দ বছর ধরে, আমার কি একটা আছে ; মাণ্ডবী আমার সঙ্গে থাকলে আমার আয়ুক্ষয় হবে।

আমার সেকেলে মায়ের উদ্বেগ ত কল্পনা করতে পারো। মাণ্ডবী তাই আমার কাছে নতুন। Cherchez la fem-me আমার কাছে এইরূপে স্ফুট। কাজেই বুঝছ ত আমার নৈতিকতা ঢংমাত্র নয়—আমার মেরুদণ্ড আছে। সেকেলে ভরতের অসিধারব্রত কি এর চেয়ে কঠিন ছিল? স্ত্রী এক বাড়ীতেই রইল কিন্তু এরোপ্লেন ও সবমেরিনের মতোই ব্যবধান! কাজেই সীতার নিন্দা নেহাত খারাপ লাগল না—অবশ্য বক্তা নিন্দা করেই বলেন নি। গুহক বললেন, 'আ! সীতা! চমৎকার। অর্কিডের মতো! নতুন! আনারসের মতো স্বাদ! বেশ! মুগ্ধ করেন ঠিক যেন co—'—থাক্…

জানো ত, রাবণবক্ষের পরিত্যক্তা অর্দ্ধবোন সেই মেয়েটি কি নামটা? যাক্—সেই মেয়েটির সঙ্গে রাম প্যারিসে থাকতে অদৃশ্য হয়েছিল। তার ছেলেটিকে দেখলুম—নরোয়ের ধূসরবর্ণ ছেলে, রামের মতো দেখতে।

সীতা আমার পূর্বোক্ত মাণ্ডবীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়েছিল যে, তার একটা মানে পাচ্ছি। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছিলুম। সেই ষ্ট্র্যাণ্ডে প্রিন্সেপসঘাট ছাড়িয়ে সন্ধ্যার শ্যামল অন্ধকারে Pennell এর ছবির মতো জাহাজের ধোঁয়া, মাস্তুল, আলো ও চীৎকারের মধ্যে সীতার সেই দুর্বলতা। হাতের ষ্টিয়ারিং হুইল থেমে গেল—crash—সীতা মূর্চ্ছা যায় আর কি! I was so glad: তারপর forty miles an hour—সীতার বুকের কাঁপুনি কি! ও ভেবেছিল আমার স্নায়ু বিচলিত করবে। বেচারা!

সেইদিনই আবার রামের সঙ্গে রেডরোডে দেখা! রাম অত্যন্ত আরামে সুন্দরের স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু আজ আর থাক্। আপাততঃ বোধহয় প্যারিসেই রইলুম। কিন্তু I'm homesick. কেন মনে পড়ছে বলোত?

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ—
থাক্, মেঘদূত বেজায় চলছে আজকাল। না?

(৫)

দ্বিতীয় চিঠি

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেলুম। সীতার ও উর্ম্মিলারও পেয়েছি। সীতাটি কি নির্বোধ! কলকাতা থেকে চিঠি লিখতেও তারিখ লেখে—'—mardi! 14-2-29—! সম্বোধন করে—cher ami! তবু যদি in-অন্তকথা সঠিক উচ্চারণ ও de-র সঠিক ব্যবহার করতে পারত।

বাস্তবিক! ইডিয়টিক। মেয়েরা অনেকেই তাই অবশ্য। উর্ম্মিলা বেশ।

কিন্তু মাধবী তোমার কথা লিখেছে। আশ্চর্য্য! ও তোমায় এত চেনে! না হলে উর্ম্মিলা বা সীতার মারফৎ আলাপ করো, write of her to me.

উর্ম্মিলা কি বলছে জানো? তোমার প্যারিসে যাওয়ার পুরোনো কথা মনে পড়েছে। তাই একটু হাসছি। জীবনের অর্দ্ধেক ত প্রায় কাটল। ভাবছি সে কি জ্বরের মতো বুদ্ধির বিকার আরম্ভ হয়েছিল! লক্ষণকে নমস্কার দিই—সে বিকার গেছে।

কে যেন বলেছেন, Who plants a seed begets a bud
Extarct of that same root;
Why marvel at this hectic blood
That flushes this wild fruit?

সে কথা দিদির সম্বন্ধে খাটে। ও ওকেই মানায়। আমার চাই শান্তি, তৃপ্তি, নির্ভরের আশ্রয়, স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেম। আমি চাই বাংলা দেশেরই মেয়ে হতে।—এমন কি তোমায় দিশিভাবে ডাকতে ইচ্ছে করে···।

মাধবীকে তাই ভালো লাগে! কি স্বাভাবিক বিকাশ ওর! ওর সঙ্গত জীবনের সহজ কি প্রকাশ! ঈর্ষা হয় না। ছোট বোনের মতো আদর করতে ইচ্ছে হয়'···।

আর সীতা লিখছেন 'ইংল্যাণ্ডে গেলে ইডিথ, সি, ওয়েল্, জেম্‌স্ জয়স্, ডোরা রিচার্ডসন, প্রভৃতির সঙ্গে দেখা কোরো—পরে পরিচয়-পত্র দেব···'। তারপর sport', 'thrill', 'life' সম্বন্ধে উপদেশ।

দেখি, ঠিক নেই,—কে লিখেছি। বাড়ীর ব্যবস্থা হলে সে লিখবে। তারপর যাব।

উপস্থিত পাশের ঘরে পিয়ানো বাজছে—অদ্ভুত সুর, স্মৃতির মতো স্বপ্নময়, স্বপ্নের মতো বিধুর। শোপ্যার। সুতরাং উঠি।···ফিরলুম। খেয়ে এলুম—সামাজিক·

ডিনার ছিল। লক্ষ্মণের নবযৌবনের মন্ত্রটা মনে পড়েছিল—

Lest we do our youth wrong,
Gather them while we may,
Wine and woman and song.

একটা কথা লিখি। সার্জেন্টের আঁকা সেই যে সীতার ছবিটা—ফ্রেম মেরামতের জন্যে এনেচি? সেইটে কাল এক রসিক দেখতে আসবেন। তিনি বললেন, সার্জেন্ট ভিতরের রূপ ক্যানভাসে ফোটাত—অপ্রিয় সন্দেহ নেই। সীতাকে বলো—বেচারা! কিন্তু উর্মিলার কি আশ্চর্য্য ছবি দেখেছ? যদিও ছবির চেয়ে দেখতে ভালো, কিন্তু মাধুর্য্য, শান্তি কি চমৎকার ফুটেছে! চিঠি পরে আবার লিখব।

(৬)

প্রিয়বরেষু

চিঠি লেখো না কেন? প্রতিমেলেই লিখো। ইতিমধ্যে মুস্কিলে পড়েছি। 'তিনি', বলছেন, Be a sport. বেচারা মাওবী! sport না হলে মান থাকে না আবার। তিনি অবশ্য pure নন। তাঁর বাপ আইরিশ। দুর্দান্ত রসিক, খেয়ালী, ভোগলোভী মন ও শরীরও। লেখেন—উপন্যাস। মার্জ্জিত, শিক্ষিত। আমার সম্বন্ধে কী কৌতূহল। বাঙালী কি Fashion হবে? ঐ আসছেন। সুতরাং ইতি—।

আমার ঠিকানা—5, Southandlley Str—

বেচারা ভরত কথাটা শেষ না করেই খাম মুড়েছে। কাগজটাও ছেঁড়া ও বাজে।

খ

স্বপ্নের সূত্র বেজায় জটিল হয়ে' উঠেছে।

তাই স্বপ্নের জল্পনা এইখানেই শেষ করা যাক্।

তৃষিত

—দেখ, সোমনাথ, তুমি আজকাল সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আজও আবার—

—সত্যি বলছি অলকা, হুইস্কি খাই নি।

—খাওনি, আবার মিথ্যা বল্‌ছ—

—একটি পাপ করিয়া আবার একটি পাপ করিতেছ, স্বর্গ স্থিত পিতা ইহাতে—তারপর ?

সোমনাথ অত্যন্ত আলস্য ভাবে সোফায় বসে' অত্যন্ত বিকৃত উচ্চারণে অলকাকে ঠাট্টা করলে। সোমনাথের ঈষৎ লাল চোখ স্তিমিত, পরনে ট্রাউজারস, ওয়েষ্টকোট, অবধি পোষাক পরা হয়েছে। হাতে সিগারেট।

অলকা তার কটা চোখ খানিক বুজে রইল। তারপরে কৌচটায় নড়ে ভালো করে বসে শাড়ী কুঞ্চন টেনে দিয়ে, বুকে যাতে টান না পড়ে, জামাটা তেমনি ভাবে টেনে বললে, তুমি এমনি বাজে আর সস্তা, সোমনাথ। নিজের ওপর ভক্তি হচ্ছে।

হচ্ছে মাত্র ? আমি ত জানি—

বাজে বোকো না আর, সোমনাথ। আমার মাথা ধরেছে—অবশ্য তাতে তোমার কি ?

ও রকম বাঁকা কথার মানে ?

বুঝতে পারলে না ? সো ইনটেলেক—চেয়ে আছ যে ?

ভাবছি, তোমায় বিয়ে করে কি লাভ ? পাঁচশতে নিজের হয় না, সলিসিটরগুলো নিষ্ঠুর—

বলে যাও। বলে যাও—শ্বশুরেব পয়সায় আছি—

সোমনাথ, বাজে বোকো না আর। আমার মাথা ধরেছে—অবশ্য তাতে তোমার কি ?

ও রকম বাঁকা কথার মানে ?

মানে বুঝতে পারলে না ? so intel—চেয়ে আছ যে ?

ভাবছি, যে তোমায় বিয়ে করে' কি লাভ? এক পয়সা নিজের হয় না। সলিসিটরগুলো hardhearted—

বলে যাও, বলে যাও—স্ত্রীর পয়সায় আছি—বলো—

আর স্ত্রী সেটা প্রায়ই মনে করিয়ে' দেয়—

আচ্ছা, সোমনাথ, আমায় ও রকম অপমান করতে একটু বাধেও না তোমার? এদিকে এত দিন য়ুরোপে ছিলে স্ত্রীর পয়সা এখনও নিজের ভারতে পারো না? আমাদের love marriage না?

বাঁচালে অলকা, ভয় ছিল এতকাল, যাক্, তাহ'লে তুমি আর আমায় ছাড়ছ না।

ছাড়ছি না—কি বলছ?

মানে তুমি ভারতীয় স্ত্রী আরকি—

নিশ্চয়ই? আমি ভারতীয় স্ত্রীই-ত—তোমায় আমি বরাবর ভালোবাসব।

জানো ত Schopenhauer কি বলেছে তোমাদের সম্বন্ধে?

তুমি ত পড়ো নি সোমনাথ।

Nietsche—

Clever হবার চেষ্টা কোরো না সোমনাথ। ধরা পড়ে যাবে। আমার সে বই-গুলোর অর্ডার দিয়েছ?

মেয়েরা হচ্ছে

আঃ! সোমনাথ। বাজে বোকো না।

বেশ। কিন্তু তুমি আমার কে বলো ত? বলো

ন্যাকামি কোরো না।

আর কি কি করব না বলে যাও। বলে যাও।

নিশ্চয়ই তুমি হুইস্কি খেয়েছ।

না! তুমি আজকাল সত্যিই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। মনে রেখো আমিই তোমার স্বামী।

অলকা চুপ করে পাতলা ঠোঁট কুঁচকে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টি, যাকে বলে, quizzical.

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ উদাস চোখে বসে রইল আর নতুন শেখা একটা আধুনিক নাচের সুর গুনগুন করতে লাগল।

হঠাৎ অলকা বলল, আচ্ছা, সোম। ঐ সুর গুনগুন করতে লজ্জা করে না? ঐ সস্তা অ্যামেরিকান নাচ—

—মোটেই নয়। —'—love and all his pleasures are but toys.

They shorten tedious nights.' নাচের সুর নয়।

অলকা মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

সোমনাথ উঠে অলকার পাশে গিয়ে বললে, অলকা, কিছু মনে কোরো না। বুঝলে?

বলে মুখ নামালে। অলকা মাথা সরিয়ে বললে, থাক্, থাক্, কালকের ব্যাপার আবার সহ্য করতে পারব না।—যাও।—ছি। ছি!—সোমনাথ, চাইতে পারছ। নিজের স্ত্রীকে কিনা! কি বলে আমায় Molly বলে আদর করতে এলে!—তোমায় ছুঁতেও ঘৃণা হচ্ছে। কাল ত Molly র কাছে গিয়ে মদ খেয়েছিলে?

—অলকা, সত্যি বলছি। কাল Molly র সঙ্গে দেখা করেছিলুম মাত্র আর সামান্য হুইস্কি খেয়েছিলুম। সত্যি বলছি—ভগবানের নাম

—সোমনাথ, বেচারা ভগবানকে আর টেনো না। ছি ছি—with a cheap Anglo-Indian girl! and yon're going to be a father!

সোমনাথ বলে' উঠল, তার মানে? তুমি কি পাগল হলে' অলকা?

অলকা অত্যন্ত রেগে ঝুঁকে' বসল—শাড়ীটা আবার কুঁচকে গেল। পাতলা ঠোঁট বেঁকিয়ে' বললে, তোমার কাছে ত তা পাগলামিই হবে। you're a brute.

—তুমি এই সাত বছর কিন্তু আমাকেই—সত্যি অলকা? আমি কিন্তু জানতুম না ত।

—কোথা থেকে জানবে? আমি ত Molly নই।

সোমনাথ মুখটা খুব স্নিগ্ধ করে সিগারেটটা ফেলে উঠে এসে অলকার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে বললে অলকা, forgive me. তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

—কষ্ট হচ্ছে মানে?

—একটা burden—

—burden?

—না, না, মানে এই আমি তোমার প্রেমের অপমান করেছি, মদ খাই, তাই আর কি?

—সে কষ্ট ত হচ্ছেই। বলো, হুইস্কি খাবে না?

—খাবো না, আজও ত খাই নি। তোমার জন্যে কি না পারি অলকা?

অলকা তার মাথাটা সোমনাথের কাঁধে রাখলে। স্নিগ্ধ স্বরে বললে, আচ্ছা, সোমনাথ—

স্বপ্ন দেখবে না ?

সোমনাথ গলাটা খুব কোমল করে মামুলিসুরে Let us dream together, darling বলে, অলকার মুখে চুমো খেতে গেল।

অকস্মাৎ অলকা মাথা তুলে বলে' উঠল, Don't you touch me—'আজও ত খাই নি !'

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বললে, you're really to much ! and you're going to be a mother ! বোসো।

অলকা কি জানি কি ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সোমনাথও উঠে, ফোন ধরল। ডাক্তারকে ডাকলে। ফিরে এসে ক্ষণকাল বসে সিগারেট খেলে। তারপর পাশে শোবার ঘরে গেল। আস্তে আস্তে খাটে অলকার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, অলকা, ওঠো।

কে আসবে—কাঁদবার হয়েছে কি বলো ?

অলকা মুখ বালিসে চেপেই বললে, আমার কি কাঁদবার হাসবার হয়েছে। সে আমিই বুঝব।

সোমনাথ যেন একটু ভেবে বললে, কিন্তু the child—সে যে আমারও হবে অলকা।

সোমনাথ অলকার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

অলকা মুখ তুলে' বললে, বলো আর হুইস্কি খাবে না, আর সবসময় আমার কাছে থাকবে ?

সোমনাথ খাটে বসে' অলকার চুলে মুখ রেখে বললে, হ্যাঁ বলছি। এবার ওঠো।

অলকা উঠে' বসল, আমি হিষ্টিরিক্যাল্ নই কিনা, তাই তুমি ভাবো—কি দেখছ ?

সোমনাথ অলকার পাউডার-ধোয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সোমনাথ বললে, এবার পারি ত ? বলেই অলকার সাদা গালে চুমো খেলে। অলকা সোমনাথের কাঁধে মাথা রেখে মৃদুকণ্ঠে বললে, আবার পারো।

তারপর ভবিষ্যৎ আলোচনা আরম্ভ হল। অত্যন্ত মধুর, স্নিগ্ধ, লোভনীয় সে ভবিষ্যৎ—বর্তমান কালের নভেলের idyll যেন।

ডাক্তার এল। এই অবস্থায় স্বাভাবিক, স্নায়বিক, humour করা চাই।

অলকা বলে, ডাক্তার ডেকেছ এদিকে ; আর আমি ও দিকে—সোমনাথ, ক্ষমা চাইছি—তোমার এ যত্ন—

সোমনাথ অলকার কোমল চোখে মুখ রাখলো। অলকা বলে, সোমনাথ, জানি এটা অন্যায় আবদার।

—সবাই খায়—তবু তোমায় হুইস্কি খেতে বারণ করি।

—রাগ কোরো না সোমনাথ। ওটা যে কেন এত অসহ্য লাগে! একটা দুর্বলতা। —বিশেষ তার সঙ্গে—

সোমনাথ বললে, ভালো দুর্বলতা অলকা। তুমি কি শোবে? আমি ভাবছি বেবোর।

অলকা ছেলে মানুষের মতো সোমনাথের হাত ধরে' বললে, কোথায় যাবে তুমি? আমি যাব?

সোমনাথ বিপদে পড়ে বললে, আমি ভাবছি একটু কাজেও যাব—

—গাড়ীতে বসে থাকব আমি?

—আচ্ছা। চলো তাহ'লে—না হয় কাজে আর যাব না। মাঠে যাবে?

—আমি কিন্তু ড্রাইভ করব সোমনাথ।

পারবে? বেশ।

—পারব না? তুমি কি ভাবো বলোত, এরি মধ্যে কি—now kiss me here—here, না, না ঘাড়ের তলায়, আমি আসছি—একমিনিটে—এ কাপড়টা বড় ক্রীদড্ হয়ে গেছে।

সোমনাথ মোটারে বসে বললে, আঃ! তারপর উদাস ভাবে বললে, I'm thirsty.

[টীকা: পাণ্ডুলিপিতে নামহীন এই গল্পের নাম সম্পাদকের দেওয়া]

নির্বাহ

সেই দিনই, আমরা, বাইকে চেপে চলেছি, লিএজ থেকে সের্‌যাঁয়, ম্যাকাডামে, ডান দিক ঘেঁষে। এর্নস্ট আর জাঁ-পিএর গাইড হিসাবে, আর প্রায় পঞ্চাশ মিটার পিছনে পিছনে আরসেন আর আমি, দুটো জি, পি, নয় নম্বর পকেটে। আমার সের্‌যাঁয় যাচ্ছিলুম এক বেইমানের ওপর চড়াও করতে, সে আমাদের চারজন কমরেডকে বেচে দিয়েছে। কিন্তু সে আরেকটা ইতিহাস। এখন তোমাকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আরসেন কি রকমে কমিশের জোবাকে ঘায়েল করেছিল। পেডল করতে করতে সে-ই আমাকে বলেছিল।

আরসেন ছেলেটা শান্ত প্রকৃতির, সহজে রক্ত গরম করে না। তার মাথাটা সুন্দর বলব না জোরাল বলব, জানি না। বেঁটেই বলা চলে, ঘন লম্বা বাদামী চুল। আমার বেশ মনে আছে তার ধূসর চোখের দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি এক গোছা হালকা ভুরুর তলায়। চোয়াল উঁচু আর তখন (সে দুঃসময়ে প্রায়ই চেহারা বদলাতে হত তো) খুব হালকা সরু গোঁফ ছিল তার।

সে জনগণেরই সন্তান ছিল। কিন্তু বেআইনী যুগের আগে তার কি পেশা ছিল তা ঠিক আমার জানা নেই। সে আমাদের "স্পেশ্যাল ব্রিগেড"-এ ছিল! গুটি বারো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলে ছিল আমাদের দলে। তাদের ওপর একান্ত প্রয়োজনভার ছিল বিশ্বাসঘাতক, খয়ের খাঁ গেস্টাপিস্ট বা যেসব বেলজীয়ান্ শত্রুপক্ষে চলে গেছে, তাদের শেষ শাস্তি দেওয়া। চুয়াল্লিশের যে মাসে একটা বিশ্বাসঘাতকতায় তারা সবাই ধরা পড়ে, লিএজে তাদের বিচার হবার কথা এবং কেল্লায় গুলিতে শেষ করা হবে ঠিক ছিল, আরসেন্ ও বাকি সবাই।

সেদিনই তো এইভাবে সের্‌যাঁয় দিকে চললুম। আমাদের আলাপ হচ্ছিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম ও ৭·৬৫ এম. এম.-এর চেয়ে ৯ এম. এম. বেশি পছন্দ করে কি না।

"ওঃ, ওসব প্রায় একই জানো! অবশ্য নয় নম্বরে একটু সুবিধা আছে। তবে আমার পক্ষে ও একই ব্যাপার। আজকাল যেসব অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে, তার মুস্কিল হল

যে ঠিক চলবে কিনা বোঝা যায় না। যদি কিছু বিলেতী মাল প্যারাশুট করা যেত, তাহলে হত ভালো। গত বছরে যে কোন্টে ৯টা পেয়েছিলুম, সেইরকম। সেটা একেবারে খাঁটি জিনিস ছিল। কি বিশ্রীই লাগে যদি সব হারিয়ে যায়, তোমার মনে থাকতে পারে সেবারের লোকসানটা, জার্মানরা যখন উবেরের গ্রেপ্তারের পরে ডিপার সন্ধান পেয়ে গেল। সেখানে আমাদের ছোটো যে বিলেতী মেশিনগান ছিল, সেগুলোও নামকরা জিনিস, কিন্তু আজকাল কি জিনিসই পাই আমরা।"

আমি বললুম—"তা বটে। ঐ বিলেতী চিজ সব পাওয়া যায় শুধু উত্তরাধিকারে। জানি না কিভাবে রবেরের মারফৎ পাওয়া যেত। তার এক সংগঠনের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, যারা লণ্ডনের সাহায্য পেত। হ্যাঁ, রবেরের কৃপায় আমরা বিলেতী অস্ত্র, বিলেতী বোমা পটকা পেতুম। বলছ ভালো কিনা? সে সব ভারি সৌখীন বস্তু। গাদবার দরকার নেই, চর্বির মত নমনীয় আর এমনি জোর—ঐটুকু তোমায় বলতে পারি। আর তেলও পাওয়া যেত, যেটা র‍্যামারের জন্যে লাগে। এর্নেস্ট একবার তিনদিনের এক অভিযানে গেল তার খোঁজে ক্লাওার্সে মৃক্রেঁ। অঞ্চলে কোথায়। ব্যাপারটা বুঝছ তো : সারা বেলজিয়ম পার হয়ে ক্রুসেলের মধ্যে দিয়ে, ঘাড়ে দুটো বিরাট থলে, নমনীয় বস্তুতে, পাইপে আর গুলি বারুদে ভর্তি? রসিকতা নয়। কিন্তু ওদের ওসব আমাদের দেবার ইচ্ছা হয় না। আমি তো ভাবি কেমন করে ঐসব লোকই ঐ সব জিনিস পায়। তবু যদি ওরা এসবের আরেকটু সদ্ব্যবহার করত, তো ভাগাভাগি না করার জন্যে না হয় ক্ষমা করা যেত।"

"ঐ—"আরসেন বললে—"ঐ তো হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টদের রীতি। আমার সন্দেহই হয় ঐ সব যন্ত্রধারীদের বিষয়ে, যারা আর্দেনে গান করে' বেড়ায় মেশিনগান আর পাইপ (রিভলভার) হাতে। ওরা সব যায় গাঁয়ের পথে ওড়াতে ওদের মে··· কিন্তু তাছাড়া···"

নীরবতার মধ্যে আমরা চললুম চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আরসেন্ আবার তার চিন্তায় ফিরে এল।

—"এইসব অস্ত্রশস্ত্র, যা জাতীয় (ফাব্রিক নাশিওনাল) কারখানা থেকে পাই অতি নিরেশ মাল। নড়বড়ে বুড়োর হাতের কাজ নিশ্চয়ই, মাথা খেয়ে রাখে। কিন্তু তবু কি জোর, যখন ব্যবহারে লাগে আমাদেরই হাতে।"

"শোন, মাসখানেক আগের ব্যাপার। আমাকে পাড়তে হল ঐ বোবা কোটালকে। জানিস্ তো, এই রেক্সিস্ট হতভাগাটা অনেক লোক ধরে রেখেছিল। খুব সহজ ছিল না, কারণ উল্লুকটা আমায় সন্দেহ করত, শালা! সর্বদাই এক চাকা

গাড়ীতে ঘুরত আর সময়ের কিছু ঠিক থাকত না। যে সময়টা খরচ হল শুধু বেটাকে চোখে চোখে রাখতে, হালচাল একটু আঁচ করবার জন্যে। আমাদের ছুটোছুটিও করিয়েছে ; সে দেমাক বেটা করতে পারে।

"যে রাস্তায় ও থাকত, প্রত্যেক কোণে কোণে কালোকুর্তি পাহারা বসানো—আফিস ঘাঁটি অবধি। দাঁড়াবার জো ছিল না বেশিক্ষণ ওর অপেক্ষায়, তাহলেই কালোকুর্তিরা রগুন ছাড়ত। তবু যদি খুব চালাক হত—শয়তান শালারা।

"যা হোক্ ওর বাড়ী থেকে বাইরে আনাগোনার ছক সব জানা গেল, চালাকি সত্ত্বেও—ঐ রাস্তাতেই এক বুড়োর বাড়ী থেকে। কিন্তু জানলা দিয়ে তাকানোটা খুব সোজা ছিল না, কারণ বুড়োর বাড়ীটা জোবার বাড়ী থেকে একশো মিটার টাক, জানালা খোলাটা নিরাপদ ছিল না ঐ কালোকুর্তির জন্যে। তেরছাভাবে দেখতে হত, আর্শির ভেতর দিয়ে। আর ও বেরোলেই—টেলিফোন আসত। আমি ওর ঘাঁটি থেকে বেশি দূরে থাকতুম না। বাইরে লাফ দিয়ে ছুটতুম কমিশরিয়েটের দিকে। জোবা সেখানে যদি যায়, তো আমার কপাল খোলে। সাত সাতবার আমি সেখানে গিয়ে দেখি লবডঙ্কা : ও আর কোথায় গেছে। চারবার গুলি করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বেটা যা লাফিয়ে গাড়ী থেকে নামত আর যা ঝাঁপিয়ে পড়া আফিসের ভেতর। আরেকবার গুলির পক্ষে আমি বড়ো দূরে ছিলুম। আবার আরেকবার হল কি, সামনে দিয়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ী গেল পথটা আটকে। শেষটা তো তুমি জানো ! ইস্, দিনের পর দিন কি রকম নষ্ট করেছি···তেরোবার সেখানে গেছি জানি না এ যে মনটা কতো বিষিয়ে দেয় তা তুমি বোঝো কিনা। তারপরে, সেদিন সকালে, কমরেডটি আবার টেলিফোন করলে। তোবা, তোবা, আমি ভাবলুম, যাই আরেকবার হাওয়া খেয়ে আসি।

"বাইকে বেরোলুম সেই পথে। শেষটায় আমি হিসেব করতে পারতুম কতক্ষণ ওর গাড়ীতে লাগবে ওর বাসা থেকে আপিসে আসতে। তখন আমি নিজের গতি ঠিক করতে শিখে গেছি। আমি তখন স্পেশ্যালিস্ট হয়ে উঠেছি।

"দেখলুম গাড়ীটা থামল, আমার থেকে এই পঁচিশ মিটার-টাক্ তফাৎ। অভ্যাস মতো তাড়াতাড়ি নামল। আমি বাইক থেকে তাগ করলুম আমার ন নম্বর ফব্রিক নাশিওনাল। ধুত্তোর ! প্রথম কার্তুজের পরেই খট ! মুণ্ডপাত ! থাক, কপাল-জোরে সরে পড়লুম খুব। বোধ হয় আমার পিছু পিছু গুলি করল, ঠিক মনে নেই ; এতো জোরে পা চালালুম যে আর ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা ছিল না। গাড়ীটা ঘুরিয়ে নেবার আগেই আমি দুটো মোড় ঘুরে সটান বাড়ীতে হাজির।

"আমার আক্ষেপটা, উঃ তুমি বুঝবে না! আমি ভাবলুম ঐ লোকটা আর তো ওর বাড়ী থেকে ঐ পথে আসবে না, আরো অনেক হুঁশিয়ার থাকবে! আর এতোদিন এতো নজর দিয়ে শেষটা গুলি ফেঁসে গেল।···আর সব কিনা একটা রদ্দি পটকার জন্যে, যেটায় দুটো গুলিও চলে না!

"বাড়ীতে তো পৌছলুম। আমার পিছনে কেউ ছিল না। সেটারা সময় পায় নি। আমার ঘরে উঠলুম, দুশমন পাইপটায় কি আটকেছে দেখতে।

"আরে দাদা, বন্দুকটা একটা কলার মতো বাঁকা তলতলে। তুমি যদি জানো কি করে তৈরী হয়, একটা কলা····ফাব্রিক নাশিওনালের গোঁজালি কিনা জানতে হয় নাকি! কিন্তু আমার তো কাজ হাসিল হল না।

"যাক্, ব্যাপারটা বড়োই খারাপ হল। একটু ঝোল রুটি খেয়ে নিলুম। মনে হল ফুটো হয়ে গেছি। তারপর এলুম আরমাঁর বাড়ী, জানো তো, আমার দলের কমাণ্ডাণ্ট। মাগো, তাকেও তো সব বলতে হবে। তারপরেই বা কি করতে হবে তাও জানা তো দরকার।

"তাঁর বাড়ীতে এলুম। সে তখন ছিল না। তোমায় বলা দরকার যে বেআইনীর আগে থেকেই তার সঙ্গে আমার চেনা ছিল। তাই তার স্ত্রী আমায় ভেতরে ডাকল। আবার সে আমায় ঝোল খেতে দিলে। আমার তখনও গলা ঘড়ঘড় করছে। কিন্তু তাকে তো আর সে কথা বলতে পারি না, বুঝছই তো। এক একবার মনে হচ্ছিল সব বলে ফেলি নাম করে করে।

"শেষে আরমাঁ এসে পড়ল। ওর বউ বেরিয়ে গেল।

" 'ভালো কাজ করেছ আরসেন্!'—আমায় সে বললে।

"আমি তার দিকে তাকালুম।

"তুমি আমার দিকে নল চালাতে পারো—আমি বললুম—এই তো পাইপ;

" 'তোমার নল দিয়ে আমি কি করব'—সে বললে—'একবার তো গুলি চলে' মোটে।'

"হ্যাঁ—আমি বললুম—কিন্তু আবার চালাবার দরকার হলেও যে চলে না।

"সে বললে, 'কি, আবার চালাবার?'

"বেন্—, আমি বললুম—হ্যাঁ যদি আরেকবার ছুঁড়তে না পেরে থাকি, সে শুধু এই পাইপটার জন্যে, আটকে গেল বলে।

" 'কি রকম, আরেকবার ছুঁড়বে,—সে বললে।

"হ্যাঁ—আমি বললুম।

" 'হে ভগবান !'—সে বলে উঠল। আর ব্যাঙের মতো চোখ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি বললুম —কেন, বেন্ কি হল ?

" 'হে ভগবান ! সে আবার বললে আর আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইল—"তুমি একটা গুলিই ছুঁড়েছ ?'

"আহাম্মক !—আমি বললুম।

"বেন্ বললে—'ওর বুকে ঢুকে গিয়েছিল।'

"আহা তাই বল জিম্। আমিই দেখছি কুপোকাৎ হয়েছি।

"ঐ পাইপটা, ওটা খারাপ ইস্পাতে তৈরী বটে, কিন্তু কলটা ভালো।

"যাই হোক্, পাইপটা দেখছি এমন কিছু খারাপ নয়।"

হারুণ তাজিয়েফ কুর্দিশ যুবক। বেলজিয়াম-ফ্রান্সে নাৎসী বিরোধী প্রতিরোধে বীরত্ব প্রমাণ করেন। তাঁর এই ফরাসী গল্পটির জন্য অনুবাদক শ্রীযুক্ত পাঁর-র নিকট কৃতজ্ঞ। গল্পটি নাৎসি বিশ্ব যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ফ্রান্সের।

শৈবাল মিত্র

বিষ্ণু দে'র গল্প

কম বয়সে, আঠারো থেকে কুড়ি, একুশে কিছু গল্প লিখেছিলেন বিষ্ণু দে। তেরো শো চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ সালে প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল গল্পগুলি। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্ত-র সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো প্রগতি। ধূপছায়া বের হতো কলকাতা থেকে। সম্পাদক ছিলেন রেণুভূষণ গাঙ্গুলী এবং অরিন্দম বসু। গোকুল নাগ সম্পাদিত কল্লোল যে কলকাতার কাগজ ছিল, এ খবর সকলের জানা।

বিষ্ণু দে'র কবিতা চর্চার শুরু আরও আগে। তেরো, চোদ্দ বছর বয়স থেকেই পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা শুরু হয়েছিল। এ সময়ের গুটিকয় কবিতা 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি' কাব্য গ্রন্থদুটির অন্তর্ভুক্ত হলেও বেশির ভাগ কবিতা বর্জন করেছিলেন তিনি। গল্পগুলিও গ্রন্থবদ্ধ করেননি, সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন। একটি গল্প, নাম, সৌরট্রাজিডি, লিখেছিলেন শ্রী শ্যামল রায় ছদ্মনামে। নিজের লেখা গল্পগুলি সম্পর্কে কেন তাঁর এই উদাসীনতা, কেনই বা আত্মগোপন? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব না হলেও বোঝা যায় যে বিষ্ণু দে'র শিল্প চেতনা, সাহিত্যাদর্শ গল্প লিখে পরিতৃপ্ত হয় নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কেন তিনি গল্প লিখলেন? সদুত্তর পাওয়া অসম্ভব হলেও বোঝা যায় যে তরুণবয়সে বিষ্ণু দে তরুণই ছিলেন, এবং বয়সের আবেগ ও প্ররোচনা প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। পরবর্তী কালে পরিণত, বিদগ্ধ শিল্প-চেতনা, সাহিত্যাদর্শের কষ্টিপাথরে গল্পগুলি যাচাই করেছিলেন তিনি। গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় খারিজ করেছেন। পরিণত, প্রাজ্ঞ বিষ্ণুদে'র শিল্পচেতনা এবং সাহিত্যাদর্শ কী ছিল? এ প্রশ্নের জবাবের আলোয় বিচার্য তাঁর গল্পগুলি।

বিশ শতকের প্রথম দশক, উনিশ শো নয় সালে বিষ্ণু দে'র জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নিতান্ত শিশু ছিলেন তিনি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সংকট দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত তখন সুসংগঠিত। সংগঠিত নাগরিক

মধ্যবিত্তের চাপে ভেঙে পড়ছিল গ্রামীন যৌথ পরিবার। অর্থনৈতিক কারণও ছিল। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ প্রলুব্ধ করেছিল গ্রামীন মধ্যবিত্ত যৌথ জীবনকে। শহরেও ভাঙচুর চলছিল। একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে বিষ্ণু দে'র পিতা আলাদা বাসা করলেন। ব্যক্তিত্ববোধের তাড়নায় যেমন ছোট পরিবার আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই ছোট পরিবারের একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্যে সমষ্টির শরণাপন্ন হয় ব্যক্তি। সমষ্টি প্রতিফলিত হয় ইতিহাসে, সমাজে। শিল্প সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন হলো ইতিহাসের গূঢ় উপাদান। জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে সমাজ। সুতরাং প্রখর ব্যক্তিত্ব বোধে একদিকে যেমন একজন মানুষ নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে, পাশাপাশি সে হতে পারে প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ, দেশকাল, ইতিহাস সম্পর্কে দায়বদ্ধ।

দ্বিতীয় পথের যাত্রী ছিলেন বিষ্ণু দে। ছোট পরিবারের একাকীত্ব কাটাতে শিল্পসাহিত্য, শিক্ষা সংস্কৃতি, দর্শনের আশ্রয় নিলেন তিনি। জ্ঞান এবং বুদ্ধিচর্চায় অনিবার্য ভাবে আকৃষ্ট হলেন। সেই সঙ্গে কাজ করছিল কবিতা রচনার প্রচ্ছন্ন প্যাশন্। বৌদ্ধিক বিকাশের ফলে দেশ, কাল ইতিহাস সম্পর্কে বাড়ছিল সচেতনতা। কোথাও কিছু এক দায়, অঙ্গীকার আছে, অনুভবে পাচ্ছিলেন তিনি। সোচ্চার, উচ্চকণ্ঠ না হলেও এ দায়বদ্ধতা একজন সৎ শিল্পীর থেকেই যায়। সততা অর্থে এখানে বিমূর্ত কোনো ধারণা নয়, নিজের মাধ্যমের সঙ্গে একাত্মতা। এই শতকের প্রথম তিন দশকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী তরুণ চরিত্রে এটি ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও তারা ছিলেন সমাজসচেতন, দায়বদ্ধ। ম্যাক্সিম্ গোর্কির সঙ্গে নুট হামসুন, ফ্রয়েডের সঙ্গে পাভলভ্, এলিঅট্ এবং আরাগঁ, পাশাপাশি পড়তে তাঁদের অসুবিধে হতো না। সামাজিক অঙ্গীকার যাই থাকুক, মাধ্যমের প্রতি অঙ্গীকারে তাঁরা অনায়াসে প্রশ্ন করতে পারতেন, "অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?" (ঘোড়সওয়ার, বিষ্ণু দে) কিন্তু শত অঙ্গীকারেও শিল্পী একা, 'ভিড়েও নিঃসঙ্গ শিশু।' এই একাকীত্ব শিল্পীর অহমিকা নয়, অমোঘ সৃজনপ্রক্রিয়া। অনেক সময়ে এ প্রক্রিয়াকে না বুঝে শিল্পীকে বিরূপ সমালোচনা করা হয়। এ সমালোচনা অর্থহীন।

নিজের সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠায় বারবার বিষ্ণু দে-ও সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর দেশী বিদেশী সাহিত্যজ্ঞান, সংগীতজিজ্ঞাসা, ছবি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ, যে, তাঁর মূল কবিসত্তার অংশ, অনেকেই বুঝতে চান নি একথা। সব রকমের পঠন পাঠন, অভিজ্ঞতা; একজন শিল্পীর জীবনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। কিছুই ফেলা যায় না। বিষ্ণু দে'র ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। প্রথম জীবনে তাঁকে কবিতা রচনায় যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দবৈচিত্র প্রভাবিত করেছিল, তেমনই গদ্যে প্রভাবিত করেছিলেন প্রমথ

চৌধুরী। বিষ্ণু দে'র প্রথম জীবনের কবিতায়ও ছিল প্রমথ চৌধুরী-র প্রভাব। প্রমথ চৌধুরী-র মননশীল, ব্যাঙ্গাত্মক শৈলী সমকালীন আত্মসচেতন তরুণদের আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে তাঁর গদ্যরীতি, চাপা পাণ্ডিত্য, সরসতা, মজলিশী পরিবেশন-ভঙ্গি মেনে নিয়েছিলেন বিষ্ণু দে।

প্রমথ চৌধুরীর চারইয়ারি কথা, নীললোহিত যেমন বিষ্ণু দে'র গল্পের প্রেরণা, তেমন হেলেন অব ট্রয় নিয়ে জন্ এরাস্কিনের গল্পও প্রভাবিত করেছে তাঁকে। হিন্দুধর্ম, পুরাণ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য নিয়ে মৃদু হাসি ঠাট্টা শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে তখন চালু ছিল। মহাকাব্য, পুরাণের ঘটনা চরিত্রকে আধুনিক পটভূমিতে হাজির করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সাহিত্যপত্রগুলি এ প্রচেষ্টায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। রামায়ণের লক্ষ্মন এবং ভরতকে নিয়ে প্রগতি পত্রিকায় 'পুরাণের পুনর্জন্ম' এবং কল্লোলে 'পৌরানিক প্রশাখা' নামে দু'টি গল্প লিখেছিলেন বিষ্ণু দে। 'পুরাণের পুনর্জন্ম' লেখা হয়েছিল প্রগতি পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর গল্প, 'পুরাণের পুনর্জন্ম, উর্মিলা' প্রকাশের পরে। বুদ্ধদেবও বিপ্রদাস মিত্র, ছদ্মনামে গল্পটি লিখেছিলেন। উর্মিলার জীবনের ব্যর্থতা ছিল গল্পটি-র বিষয়। বুদ্ধদেবের গল্প মুগ্ধ করেছিল বিষ্ণু দে-কে। সে মুগ্ধতায় লক্ষ্মনের পুনর্জন্ম ঘটালেন তিনি। বার্নার্ড শ, গোর্কি, আনাতোল ফ্রান্স, নুট হামসুন পড়া বিষ্ণু দে'র লক্ষ্মণ কেতাদুরস্ত, আধুনিক। উর্মিলার নানা দোষ দুর্বলতা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ বলে, "কিন্তু উর্মিলাকে আমি ভালোবাসি। আমি তৃপ্ত। শেহভের সেই গল্পের মতোই ওকে ভালোবাসি।" প্রকাশের আগে গল্পটি পড়ে মোহিতলাল মজুমদার সন্দেহ করেছিলেন, গল্পটির লেখক প্রমথ চৌধুরী।

'পৌরানিক প্রশাখা' গল্পের কেন্দ্র চরিত্র রামায়ণের ভরত। নামটুকু শুধু রামায়ণের, বাদবাকী ভরত ষোলআনা আধুনিক। গল্পের শুরুতে ভরত সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন, "অনেক মানুষ আছে, উদ্ভিদের কোঠায় ফেললে যাদের পরগাছা আখ্যা দিতে হয়। ভরত সেই দলের।…মোটামুটি ভরত ছেলে ভালো, চেহারায় ও চামড়ার purse ব্যবহার, দুয়েই।"

পুরাণের পুনর্জন্ম যেমন দিনপঞ্জীর ঢং-এ লেখা 'পৌরানিক প্রশাখা' তেমন নয়। চিঠি এবং দিনপঞ্জী দুধরনের উপাদানে তৈরি হয়েছে এ গল্পের আঙ্গিক। বাল্মীকির খসড়া খাতার টুকরোও ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্মণের দেওয়া সীতার ডায়েরি পড়ে ভরত জানলো, "ডায়েরি লেখার মতো শ্রান্তিকর ব্যাপার আর নেই—প্রেম ছাড়া।"

সীতার দিনপঞ্জীর আর এক অংশ, "আমাদের এই তিন মাস হবে বিয়ে হয়েছে। ভেবেছিলুম অন্তত কিছুকাল—বেশ লাগবে। রামের অবশ্য বেশি ত্রুটি দেখিনি এখনও।

বরফ ও অতিরিক্ত শ্লেন।...শোবার ঘরটা আলাদা করতে হবে।"

এ সীতা মহাকাব্যের নায়িকা নয়, আধুনিক নারী। তিন মাসেই দাম্পত্য জীবনে মোহমুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বাঙ্গালী মেয়েরা এরকম চড়া আধুনিক হয়ে না উঠলেও দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত মহিলারা পান থেকে চুন খসলেই স্বামীকে তালাক দিচ্ছিল।

প্যারিস্‌বাসী ভরতের চোখে মোনালিসার চেয়ে স্ত্রী মাওসী বেশি রূপবতী। অথচ এক বিদেশিনীর সঙ্গে তেড়ে প্রেম করছে ভরত।

আধুনিকা, ঠুনকো নারীচরিত্র রচনার সঙ্গে পুরুষের বিশ্বাসভঙ্গ, বহুগামিতা বিষ্ণু দে'র বেশিরভাগ গল্পের মূল বিষয়। তরুণ লেখকের চোখে নারীপুরুষের যাবতীয় সম্পর্ক, এমনকি দাম্পত্য সম্পর্কও সাজানো, মেকী মনে হয়েছিল। জ্ঞানের বিভ্রম, এবং বিদেশী সাহিত্যের সিনিসিজম্‌ আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে। 'সৌর ট্রাজিডি,' 'ফিরে ফিরতি,' 'তৃষিত,' 'স্বররসিক' গল্পের ধুয়ো হলো এই সিনিসিজম্‌। 'স্বররসিক' গল্পের আর্টিস্ট তাই বলে, "দাম্পত্য জীবনকে আমরা জীবনের একমাত্র সার্থকতা করে তুলেছি। তাই দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হলে—ইত্যাদি।"

বিষ্ণু দে'র বেশির ভাগ গল্প অ্যান্টিস্টোরি, ভাঙাগল্প, কল্পকাহিনী এবং রূঢ় বাস্তবের মিশ্রণে তৈরি। গল্প থেকে বাস্তবে তিনি যেমন হঠাৎ চলে আসেন, তেমনই অবলীলায় বাস্তবকে ধূসর কল্পলোকে তুলে নিয়ে যান। 'সৌর ট্রাজিডি' গল্পের শেষাংশ স্মরণীয়। গল্পের একটি চরিত্র বলছে, "এটা ঠিক একটা গপ্‌প হয় নি। কি রকম যেন খাপছাড়া গোছ হয়েছে। Organic whole হয় নি। মুখে বলা কিনা, তায় আবার তোমারই বলা।"

বিষ্ণু দে'র গল্পের গঠনশৈলীর স্বাতন্ত্রও লক্ষণীয়। বিদেশী কবি ঔপন্যাসিক, চিত্রকরের নাম যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন তিনি। ইংরেজি এবং ফরাসী উদ্ধৃতি, ইংরিজি বর্ণমালাতেই অধিকাংশ গল্পে স্থান পেয়েছে। গল্পের কুশীলব করেছেন স্বচ্ছল, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত নারীপুরুষদের। তাদের মূল সমস্যা জীবনের একঘেয়েমি এবং যৌনতা।

প্রায় প্রতিটি চরিত্র নিজেকে এবং অপরকে ঠকাচ্ছে। পরিশীলিত, সূক্ষ্ম এই প্রতারণা। ফলে গল্পের চরিত্রগুলি ওয়ান্‌ ডাইমেনশণাল্‌ এককৌনিক হলেও স্বচ্ছল, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'সমাজমানসের শূন্যতার প্রতিমূর্তি। কবিত্ব মেশা একজাতের হালকা দার্শনিকতায় তারা মশগুল। ভিক্টোরিয়া রুচি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সে যুগে ইংল্যাণ্ড ছাড়িয়ে উপনিবেশগুলোতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের

কবিতা' তার চরম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রানুসারী এবং রবীন্দ্রবিরোধীরাও ছিলেন অন্নবিস্তর একই পথের যাত্রী।

দৃষ্টিকোনের সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটালো কল্লোল, কালিকলম গোষ্ঠী। ভিক্টোরিয় রুচি, জীবনবোধ ঝেড়ে ফেলে আত্মপ্রকাশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল এবং কিছু পরে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক। বাংলা উপন্যাসে, গল্পে পুঁজিবাদী যুগের যন্ত্রণা, সুখ শোক যখন বিস্ফোরণ, বিষ্ণু দে তখন গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। স্বধর্মে ফিরে তিনি পুরোদস্তুর কবি তখন।

বিষ্ণু দে'র মনন, সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে গদ্যচর্চা, গল্প রচনা খাপ খায়নি। গল্প লিখতে বশেই সম্ভবত নিজের স্বভাবধর্ম টের পেয়েছিলেন তিনি। পুঁজিবাদী সভ্যতার জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে যে, গদ্যের নাড়ির সম্পর্ক, গদ্যের দায় অনেক, যান্ত্রিক, ক্লান্তিকর সে দায়বদ্ধতার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। বস্তুজীবন থেকে গড়ে ওঠে গদ্যের মানুষের ভাবজীবন। কবিতায় প্রক্রিয়াটা একদম বিপরীত। কবিতায় ভাবজীবন মুখ্য, বস্তুজীবন গৌণ। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা দরকার। বস্তুজগতের প্রয়োজনেই আদিম মানুষ কবিতা রচনা করেছিল। সে কবিতা ছিল যাদু, মন্ত্র, সংগীত, শ্রম এবং উৎপাদনের অঙ্গ। বহু শতাব্দীর চর্চায় কাজের পদ্য হয়েছে কবিতার শিল্পপ্রতিমা। আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রয়োজনে গদ্যের জন্ম। গদ্যের উদ্ভব এবং দ্রুত সাবালকত্ব পাওয়ায় কাজের জগৎ থেকে ষোল আনা মুক্তি পেল কবিতা। পুরোপুরি ভাবলোকের সম্পত্তি হলো। কেজো লোক তাই আধুনিক কবিতা পড়ে আরাম পায় না। পাশাপাশি বৈষয়িক, ব্যবসায়িক তাগিদে গদ্যের জন্ম হলেও শুধু লেনদেন, হিসেবের বৃত্তে আধুনিক গদ্যকে বন্দী করা গেল না। শিল্পশ্রী লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগলো গদ্যের অবয়বে। কিন্তু গদ্য যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের শ্রম, উৎপাদন, বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, তাই যতো শিল্পিত, পরিশীলিত হোক, গদ্যের মূল বাস্তবজগতে থেকে গেল। গদ্যচর্চা, তাই যে কোনো আঙ্গিকে করা হোক, ভাবজগতের চেয়ে বস্তুজগৎ প্রাধান্য পাবে। গদ্যের এই বিশিষ্ট বস্তুবদ্ধতা বিষ্ণু দে'র শিল্পীস্বভাব গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিহাস, সমাজসচেতন হলেও শিল্পীমনের মুক্তির দিকটি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। বাস্তবলগ্ন হয়েও স্বাধীন থাকতে চেয়েছেন তিনি। মাধ্যমের বশ হতে চাননি। করায়ত্ত করতে চেয়েছেন মাধ্যম। শব্দচয়ন, বাক্য গঠনে যে গদ্যশৈলী তিনি গড়ে তুলেছেন, চেনা গদ্যরীতি ও রুচিকে তা তৃপ্ত করে না।

"আমি ভারতীয় খ্রীষ্ট-ত—তোমায় আমি বরাবর ভালোবাসব।

জানো ত Schopenhamer কি বলেছে তোমাদের সম্বন্ধে ?

তুমি ত পড়ো নি সোমনাথ।

Nietsche

Clever হবার চেষ্টা কোরো না সোমনাথ।" (তৃষিত)

এই গল্পের আর এক অংশ।

"কোথা থেকে জানবে? আমি ত Molly নই। সোমনাথ মুখটা খুব স্নিগ্ধ করে সিগারেটটা ফেলে উঠে এসে অলকার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে বললে অলকা, forgive me. তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট হচ্ছে মানে?

একটা burden.

burden ?

কথ্য বাংলায় ইঙ্গবঙ্গ গদ্যরীতি সমাজে চালু থাকলেও শুরু থেকে লিখিত বাংলা গদ্যরীতি নিখুঁত বাঙালীত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এমন কি সাহেব প্রমথ চৌধুরীও বিস্তর বিদেশি লেখক, সাহিত্য, দর্শন আলোচনায় যথেচ্ছ ইংরিজি বর্ণমালা ব্যবহার করেন নি। মলি নামের মেয়েটিকে কেন ইংরিজি বানানে হাজির করা হলো, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে এক পংক্তির বর্ণনায় দু'বার 'টা' এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায় পাঁচবার পৌনপৌনিক প্রয়োগ দুর্বল গদ্যের নমুনা। রচনাশৈলীর এ দুর্বলতা আরও আছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নিজের গল্পগুলির ময়নাতদন্ত বিষ্ণু দে নিজেই করেছিলেন। বাজে গল্প বলে বাতিল করেছিলেন।

পরিণত বয়সে কুর্দিশ লেখক হারুণ তাজিয়েকের একটি গল্প অনুবাদ করেন তিনি। সংলাপবহুল গল্পটিতে বিন্যাসের জটিলতা থাকলেও ভাষারীতি প্রাঞ্জল। গল্পের টেন্‌শন্ আগাগোড়া বজায় আছে। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায়, ১৯৭৩ সালে। চৌষট্টি বছরের অনুবাদকের মেধা, মনন, গল্প নির্বাচন এবং অনুবাদে পাওয়া যায়। বাংলা গল্পের ইতিহাসে বিষ্ণু দে'র বিশিষ্ট ভূমিকা না থাকলেও একজন ক্ষমতাবান কবির তরুণ বয়সের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, স্বপ্ন হিসেবে গল্পগুলি পাঠযোগ্য।

কবিতার অন্তর্বয়ন

সুমিতা চক্রবর্তী

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত-এর দুটি কবিতা

শিল্পকর্মের স্বরূপ সন্ধানে কোনো একটি সূত্র কখনোই যথেষ্ট নয়। শিল্পীর দেশ-কাল ; সমাজ-পরিবার ; ব্যক্তিত্বের গঠন ; প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য, সৃষ্টিপ্রবাহের ধারাবাহিকতা —সব কিছু নিয়ে দেখলে তবেই তাঁর রচনার তাৎপর্য ধরা দিতে পারে একটি সমগ্রতায়। নির্দিষ্ট একটি কবিতাকে কবি কিভাবে গড়ে দেন—তার শব্দ-নির্বাচন ও বাক্য যোজনায়, চিত্রকল্পের চয়নে ও ছন্দ-নির্মাণে, পুরাণ-প্রসঙ্গ-পরিগ্রহণ ও সমকালীনের মিশ্রণে—তা অনুধাবন করার মধ্যেও আছে পৃথক এক শিল্পস্বাদ—কবির করণ-কৌশল উপলব্ধির আনন্দ।

একালের সাহিত্য সমালোচনায় এই রীতিটি অপরিচিত নয়। ইংরেজি কাব্য সমালোচনায় কোলরিজ-এর কলমে এ রীতির আত্ম-অসচেতন সূত্রপাতের পর আই. এ. রিচার্ডস্‌-এর সচেতন প্রয়াসে এই রীতিটির তাত্ত্বিকতা বেশ দৃঢ় ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তারপরে আরো অনেকেই এই রীতির সূক্ষ্মতর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কবিতাটির প্রাপ্ত শরীর-সংগঠনের বাইরে আর কোনো পূর্বার্জিত ধারণা কবিতাপাঠে ব্যবহৃত হবে না— এমন ধারণা ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে কবিতা—রসাস্বাদের জন্যে কবিজীবন, কবিব্যক্তিত্ব বা দেশ-কালের জ্ঞান অপ্রয়োজন। কারো মতে কবিতাটির অবয়ব-সংস্থান নির্দেশ করা ছাড়া সমালোচকের অধিকার নেই কোনো মত প্রকাশ করার। এমনকি ভালো-মন্দের বিচারও নয়। সে বিচার করে নেবেন পাঠক।

কোনো সংশয় নেই যে, এই রীতিতে বহু কবিতার ভিতরকার সৌন্দর্য বেরিয়ে এসেছে আশ্চর্যভাবে। এই রীতিটি পাঠককে একটি চ্যালেঞ্জের সামনেও দাঁড় করায়। কোনো শব্দ বা চিত্রকল্প অবোধ্য বা অস্পষ্ট রেখে পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ নেই পাঠকের। তবে এই রীতির কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। কখনো কখনো মনে হয় —পদ্ধতিই যেন লক্ষ্য ; বহু বিশ্লেষণের পরেও দু'একটি ব্যাখ্যাসূত্র না পেলে রসাস্বাদন যেন হয় না। তাছাড়া ব্যাখ্যাতা যখন কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে চান তখন সেই বোঝার মধ্যে এসে পড়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, নিজস্ব কাব্য-ধারণা। কিছু কিছু

থিয়োরির আভাস, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড একেবারে বর্জন করা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না।

বাংলা সাহিত্যে কবিতা-শরীর-ভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতির অস্তিত্ব কিছুটা স্বীকৃত হয়েছে এবং সেখানে দেখা গেছে শব্দ-বাক্য-চিত্রকল্পের বিশেষীকৃত প্রয়োগের ভিত্তি রূপে থেকে যায় কবিমানসের গভীরতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি-সমূহ। বস্তুত কোনো একটি পদ্ধতির একান্ততায় নয়—একাধিক পদ্ধতির অনেকান্ততার মিশ্রণেই একটি কবিতা শরীরে রসাস্বাদের সেই অনন্ততার অনুভব জাগা সম্ভব।

বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ১৯৬৩তে। সংকলিত কবিতা-গুলির রচনাকাল ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১। অনেকেরই মতে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত এই "পঞ্চাশের দশকই বোধহয় বিষ্ণু দে-র সৃজনশীলতার উজ্জ্বলতম সময়।"[১] তার আগে তিনি অতিক্রম করে এসেছেন অভিজ্ঞতা অর্জনের বেশ কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ পর্যায়। কৈশোরের সুশীলিত, শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঋদ্ধ পরিবেশ, যৌবনের গরুড় তৃষ্ণায় আকণ্ঠ পান করে নেওয়া একদিকে বিশ্বে ছড়ানো সাম্যবাদী চিন্তার স্রোত; অন্যদিকে বুঝে নেওয়া ভারতের পটভূমিতে এই আন্দোলনের জটিল বিমিশ্রণের নকশা। তিনি পেয়েছেন প্রগতি-লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ ও গণনাট্যসঙ্ঘের সাহচর্য; দেখেছেন দুর্ভিক্ষ, তেভাগা, দাঙ্গা, দেশবিভাগ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে; রিখিয়ার প্রকৃতি ও আদিবাসীদের কাছ থেকে দেখেছেন, যামিনী রায় ও ক্যালকাটা গ্রুপ-এর চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে হয়েছেন ঘনিষ্ঠ; উইলিয়ম্ আর্চর ও ভেরিয়ের এল্‌উইন্-এর সঙ্গে পরিচয়সূত্রে অনুভব করেছেন সাঁওতাল-উরাওঁ-ছত্তিশগড়ি গান, দেশজ শিল্প-সংকৃতির নিবিড় টান। বিষ্ণু দে-র কবিমানস ও শিল্প জগৎ গড়ে উঠেছে এই সম্পন্ন মিশ্রণের ফলে। তাঁর বহু কবিতা-অভিব্যক্তির আপাত-দুরূহতা এখানেই যে একটি অনুভূতিকে ছুঁতে চাইলে সেখানে এসে মিশে যায় অন্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রান্তগুলি।

তারপর এলো স্বাধীনতা। বহু বেদনার ও ক্ষয়ক্ষতির আঘাতে রক্ত রেখাঙ্কিত—তবু স্বাধীনতা। কবির মন যেন পক্ষবিস্তার করে দিলো সমস্ত দেশ জুড়ে। লেখা হলো: 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' বা 'ত্রিপদী'-র মতো স্বদেশের আলো-হাওয়া-জল থেকে টেনে নেওয়া কবিতা; 'যমও নেয় না' বা 'শান্তির শরতে এসো'-র মতো মানুষের প্রতি বিশ্বাসে বুক ভরে নেওয়া কবিতা; 'ভিলানেল' বা 'ক্লান্তি নেই'-এর মতো আশ্চর্য্য প্রেমের কবিতা। আবার কখনো 'রথযাত্রা ঈদ মুবারকে'-র মতো সংশয়-বিষণ্ণ কবিতা। পূর্বোক্ত কবিতাগুলি সবই 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকে। এই সময় থেকেই

যে তাঁর কবিতার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল সবলতায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে তা-ও লক্ষ করেছেন অনেকে। এক কথায় 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর আগে পর্যন্ত যেন বিষ্ণু দে-র সন্ধানের, আকুলতার, অর্জনের কাল। এখান থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত যেন উত্তরণের তৃপ্তি।

কথাটির কিছুটা সত্যতা আছে। প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৬/৪৭-এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তাঁর কবিতায় প্রধানত উদ্দীপনা, আশা ও সংশয় মেশানো সৃষ্টিসুখের উল্লাস। তার পর থেকে ১৯৬০/৬১ পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় হলেও একধরনের স্থিতিবোধ—মনীষার স্পর্শে উজ্জ্বল। ১৯৬০-এর পর থেকে একটু অন্যরকম। স্বাধীনতার এক যুগ পরেও দেশের রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় ন্যায়বোধ, মঙ্গলবোধ ও যুক্তিবোধের সূত্রগুলিকে তিনি শিথিল দেখলেন। দেখলেন, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা চলে গেছে নেতৃবৃন্দের ও দেশবাসীর। ষাটের দশকে বিশ্বের সাম্যবাদী শক্তিসমূহও বহুবিভক্ত। ১৯৬৬-র পর থেকে রচিত কবিতায় দেখা দিয়েছিলো নৈরাশ্য-খানিকটা তিক্ততাও—যা আগে কখনো দেখা যায়নি বিষ্ণুদে র কবিতায়।—এই পর্বে কবি লিখেছেন 'বিশ্বে ধূলিসাৎ একাকার/ব্যক্তিত্বের মনস্বী প্রাকার॥' (ছিন্নসত্তা, ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে) বা 'শিকার সে ব্যাপক হন্তের' (চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর) নামের কবিতা।

এই দুই পর্বের মাঝখানে আছে ১৯৬৫-তে প্রকাশিত 'সেই অন্ধকার চাই'—যেখান থেকে কবি শুরু করেছেন সমাজ-পরিবেশের অবনমনে ক্ষুব্ধ চিত্তের পথ খোঁজা। সব গ্লানি মুছে নেওয়া শুদ্ধ অন্ধকার—কবির ভাষায় 'দিব্য অন্ধকার'-এর জন্য কবির প্রার্থনা।

কিন্তু কবির 'শুরু' কখনোই শুরু হয় না কোনো রেখাঙ্কিত আরম্ভ-বিন্দু থেকে। আশার গান কোনো এক আকস্মিক সকাল থেকে পরিণত হয় না দুঃখবিলাপে। নানা পর্বের প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থগুলিতে মিশে থাকে নানা ভাবের খেলা। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'কে যদি বলা যায় বিষ্ণু দে-র চিৎ-পূর্ণতা-পর্বেরই শেষ কাব্যগ্রন্থ তাহলে এ-ও বলতে হবে যে এই সংকলনের কোনো কোনো কবিতা থেকেও পাঠকচিত্তে বিদ্ধ হয় সংশয় ও হতাশার কণ্টকমুখ—আবার হয়তো সেই নৈরাশ্যকে জয় করবার আবেগ সেই কবিতাতেই।

বিচিত্র-সুন্দর সুর-বর্ণময়তায় ভরা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর কবিতাগুলি। বহুধা স্বরের এক ঐকতান যেন। দুটি কবিতার পাঠভিত্তিক আলোচনায় হয়তো ধরা পড়বে দু' একটি সুরের বৈশিষ্ট্য এবং চেনা যাবে কবির স্বাতন্ত্র্য। শিল্পিত ভাষার নিজস্বতাতেই শেষ পর্যন্ত এক কবি অপর কবি থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠেন।

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

কবিতার নাম থেকেই মুখোমুখি হতে হয় সেই বহুদিন সঞ্চিত প্রশ্নটির। 'ভবিষ্যত'—কেন 'ভবিষ্যৎ' নয়? একাধিক সূত্রে শোনা যায় একাধিক ব্যাখ্যা। কেউ বলেছেন—প্রচ্ছদ আঁকার সময়ে ভুলটা করে ফেলেছিলেন যামিনী রায়। মহৎ শিল্পীর সেই ভ্রান্তিকে সম্মান দিতেই বিষ্ণু দে-র হাতে 'ভবিষ্যৎ' হলো 'ভবিষ্যত'। একথা ঠিক নয়। ১৩৬৫-র বৈশাখ সংখ্যা "সাহিত্যপত্র'তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিলো এই শিরোনামেই—'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'। যামিনী রায়ের প্রচ্ছদ আঁকার সময় আসতে তখনো প্রায় পাঁচ বছর দেরি। আর, সেই যুগের পাঠশালায় পড়া সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও এধরনের বানান ভুল প্রায় হতোই না। অধিকাংশের মতে বিষ্ণু দে-ই ভুল করেছিলেন ওটা। এই সিদ্ধান্তেও থাকে সংশয়। এর আগে বিষ্ণু দে লিখেছেন 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ (১৯৪৬), প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ সংকলন (১৯৫২)। সেখানে অনেকবারই ব্যবহৃত 'ভবিষ্যৎ' শব্দটি। আর, ভুলই যদি হয়ে থাকে একবার—১৯৫৮ সালে করা সেই ভুলটি আর সংশোধিত হলো না? 'সাহিত্যপত্র'-এর পৃষ্ঠার পর অপরিবর্তিত রইলো গ্রন্থভুক্ত কবিতায়, গ্রন্থনামে, প্রচ্ছদে, তারও পরে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-এর সূচিপত্রে ধৃত গ্রন্থনামের বানানে? কেউ কি তাঁকে এবিষয়ে প্রশ্ন করেননি কখনো? কবিপত্নী প্রণতি দে অন্তত করেছিলেন। উত্তরে বলেছিলেন—সংস্কৃত ভাষায় খণ্ড-ত-(ৎ) নেই? সেখানে 'ত'-ই লেখা হয়। সেটাই শুদ্ধ।[২] কিন্তু এর আগে 'ভবিষ্যৎ' শব্দে 'খণ্ড ত' ব্যবহার করেছেন বিষ্ণু দে। হয়তো ১৯৫৮-র আগে এবিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবেননি। কিন্তু সংস্কৃতের মতোই 'ভবিষ্যত'-এর শেষ রুদ্ধ দলটিতে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে বিষ্ণু দে কেন লিখলেন না ভবিষ্যত্। হয়তো এ-কারণে যে বাংলা লিপিতে সাধারণভাবে রুদ্ধ দলের উচ্চারণ বোঝাবার জন্য হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থাকে—'ধূলিসাৎ' শব্দটি তো 'খণ্ড ত' দিয়েই লিখেছিলেন তিনি 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে'-তে। এর জবাবে এটুকুই অনুমান করা চলে যে—কখনো কখনো যুক্তি মনে এলেও আশৈশব শিক্ষার শব্দ, ভাষা, লিপি-সংস্কার ত্যাগ করা সহজে সম্ভব হয় না।

॥ স্তবক ১ ॥

নবীন প্রজন্মকে সামনে রেখে কবিতাটি শুরু হয়। কবির মধ্যবয়স (জন্ম ১৯০৯ : ১৯৫৮-তে উনপঞ্চাশ) যেন স্বাধীনতার এগারো বছর পরে দেশের পরিস্থিতিতে বিষণ্ণ, সংশয়ী। প্রশ্ন করেন নবীনকে—

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা ?

কবির মনে পড়ে পুরোনো ভারতবর্ষ—ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাঁধা পরাধীন, সামন্ততান্ত্রিক দেশ। 'মহীদাস' ও 'ভূমিদাস' শব্দদুটির পরপর প্রয়োগ সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় আবদ্ধ অসহায় মানুষকেই বোঝায়। পত্রিকাধৃত পাঠে দেখি 'আদি মহীদাস'-এর জায়গায় ছিলো 'আদিম সুদাস'। সংকলনধৃত পাঠের পরিবর্তন অনেক স্পষ্ট করেছে অর্থটি। কেউ কেউ মনে করেছেন—"ইতরার পুত্র ঐতরেয় মহিদাসের ব্রাহ্মণ্যলাভের"[৩] কিংবদন্তি এখানে ব্যবহৃত! কিন্তু এ কবিতায় ব্রাহ্মণত্ব অর্জন-প্রসঙ্গের যাথার্থ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আমার সোজাসুজি 'মহীদাস' ও ভূমিদাস' শব্দদুটিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ইঙ্গিতবাহী মনে হয়েছে। সেই পরিস্থিতির মধ্যেও চৈতন্যে ব্যাপ্ত হয়েছিলো সাম্যবাদের মুক্তিপথ শোষিত মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন—'আমাদের চৈতন্যে আকাশ'। পাঁচ পঙক্তির এই প্রথম স্তবকে দশ মাত্রা বিশিষ্ট ঈষৎ দীর্ঘ মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির পঙক্তিগুলিতে কবি যেন ধীর ভাবে নিজের অবস্থানটি স্পষ্ট করেছেন। ভাবের প্রবহমানতায় নির্দেশিত হয়—অর্থেরই গুরুত্ব এই স্তবকে—অর্থ অনুসারেই পাঠ করতে হবে এই মননঋদ্ধ কবিতা—ছন্দের মাত্রা গুণে নয়।

॥ স্তবক ২ ॥

তোমারা নবীন, আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা ?
বিশ-বাইশের ইতিহাস
করেছে কি কালের গণনা
তোমাদের সন্ত সুখে মানা ?

নবীন প্রজন্ম (বিশ-বাইশ) কি দেখতে পায় ভবিষ্যৎ, অনুভব করে কী আছে সামনে ? অতীত বেদনার স্মৃতি বা ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি কখনো কি সংশয়ী করে তুলেছে তাদের ? থমকে গেছে তাদের সুখের স্রোত ? দেশের পরিস্থিতিতে কবির মনে যে সংশয় এখান থেকেই কবিতাটিতে তার ছায়া পড়তে থাকে। দুটি স্তবকে তিনটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ও সেই সংশয়ের সূচক।

॥ স্তবক ৩ ॥

তোমরা নবীন, জানাশোনা
তাই বুঝি হয়নি প্রবাস ?

প্রবাস শব্দটির দ্বারা কবি নির্দেশ করেছেন স্বাধীনতার এক দশক পরের ভারতকেই। স্বাধীনতার উত্তরকালে দেশের যে-রূপ তিনি দেখছিলেন তাতে তাকে তাঁর প্রিয় স্বভূমি বলে মনে হচ্ছিলো না বলেই সম্ভবত প্রবাস বলে উল্লেখ করা। তাঁর সংশয় —সমকালীন স্বদেশ তরুণ নাগরিকদের কাছেও মনে হচ্ছে না আপন। কবির মতো মধ্যবয়সীরা একদা যে প্রিয় বাসভূমির আবহ অনুভব করেছিলেন আজকের (আজকের অর্থে কবিতাটির রচনাকাল) তরুণেরা সেই অনুভূতির সঙ্গেও মেলাতে পারছেন না নিজেদের।

নিজবাস একান্ত অজানা,
আজন্ম প্রবাসী,…

অতএব স্বদেশীয় স্মৃতি—অতীতের প্রিয় স্মৃতিই হয়ে ওঠে দিনযাপনের অবলম্বন—

….তাই নানা
স্বদেশীয় স্মৃতিই বিলাস ?

প্রশ্ন থাকে—তরুণ প্রজন্ম কোথায় পাবে সেই স্মৃতি? হয়তো কবি স্মৃতি অর্থে ঐতিহ্যের লালনকেই বুঝিয়েছেন এখানে। এই পঙক্তিতে এসে লুপ্ত হয়ে যায় কবি ও কবির উদ্দিষ্ট নবীন নাগরিকদের প্রভেদ। 'স্বদেশীয় স্মৃতির বিলাস' আসলে কবির নিজেরই। রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় অনেক সময়ে আবেগের প্রত্যক্ষতা ও অন্তর্ভাষণের মগ্নতার বদলে উচ্ছ্বাসকে সংবৃত ও সচেতনতাকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করা হয়।

সেই নৈর্ব্যক্তিকতার শৈলী বজায় রাখায় জন্য কবি যেন সামনে এক শ্রোতাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলেন। কিন্তু রীতি রীতিমাত্র। যে-ভাবেই বলা হোক বা যাকেই বলা হোক—আসলে তা কবিব নিজেরই কথা। ভঙ্গিটি ভেদ করে কবিমানসের উন্মোচন ঘটে সহজেই।

॥ স্তবক ৪ ॥

প্রথম তিনটি স্তবক একই মাপের। প্রতি স্তবকে পাঁচ পঙক্তি। প্রতিটি পঙক্তি দশমাত্রার এক একটি পর্বে গঠিত। এবং এই মোট পনেরো পঙক্তিতে মাত্র দুটি মিলের প্রয়োগ ঘটেছে। একটি মুক্তদল যেখানে 'না' ধ্বনিটি বারবার বাজে —চেনা, আনাগোনা, চেতনা, গণনা, জানা, শোনা, অজানা, নানা; অপরটি রুদ্ধদল কিন্তু সেখানেও 'আ' স্বরের বিস্তার ও 'স' ধ্বনির অনতিরুদ্ধতা একটি সমতাময় সুরেলা ভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু এই চতুর্থ স্তবকে পঙক্তির মাপ হয়ে যায় অসমান। এক একটি দশ মাত্রার পর্ব থাকলেও মাঝে মাঝে আট, ষোলো (১০+৬), কুড়ি (১০+১০)

মাত্রার পঙক্তি আছে! বারো পঙক্তির স্তবকে কিছু অন্ত্যমিল থাকলেও সেগুলি বেশ দূরে দূরে বিন্যস্ত। প্রথম ও চতুর্থ, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ, দ্বিতীয়-তৃতীয় পঙক্তির সঙ্গে সপ্তম, অষ্টম, দশম পঙক্তির মিল দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম, নবম ও একাদশ পঙক্তি সম্পূর্ণই মিল-ছাড়া। আগের তিন স্তবকের তুলনায় যুক্তব্যঞ্জনের সংহতি এই স্তবকে বেশি। এই স্তবকে কবি যেন ভাবনাবর্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। সহজ কাব্যময়তার জায়গা নেয় কিছু সংশয়, কিছু বিরাগ।

দুনিয়ার হাটে হাটে কেনা
আধোচেনা প্রবল উচ্ছ্বাস,
অনাত্মীয় নব্য প্রতিভাস—

বিদেশি রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি দেশের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেই নির্ভরতা সাঙ্গীকৃত হয়নি—তাই 'আধোচেনা' এবং 'অনাত্মীয়'। তরুণ প্রজন্মকে কবি এখানে সচেতন করে দিচ্ছেন—হয়তো এই তথাকথিত নব-সংস্কৃতির তুলনায় দেশীয় অগ্রজ প্রজন্মের আশ্রয়ই তাদের কাছে হবে বেশি আপন।—

তবু জেনো আমরাই চেনা।

তারপরেই কবি চলে আসেন সৃজ্যমান নাগরিক সভ্যতার প্রসঙ্গে। স্বাধীন দেশে যার সহায় হয়েছে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন—গড়ে উঠছে পনেরো/ষোলো/সতেরো তলা বাড়ি। 'হঠাৎ' শব্দটির আকস্মিকতায় কবি বুঝিয়ে দেন—ভারতের মতো দরিদ্র দেশের স্বাভাবিক বিকাশ এই নাগরিক বহুতলতায় নয়। এই কৃত্রিম বিকাশ যেন দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি বিদ্রূপ—

আকাশকে মাটিকে তামাসা।

যারা এই নব্য নাগরিকতা ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ করছে তাদের মধ্যে কবি দেখেছেন জান্তব হিংস্রতা—কুমীর, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল। জিরাফের গলা বা অতিকায় আদিম টিরোনোসরাসের মতোই অসমঞ্জস এই শ্রীহীন বিস্তার। অংশটি লিখতে লিখতেই কবি যেন কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। রীতির আবরণ বা উপমার আড়াল সরিয়ে দিয়ে সরাসরি বলে ওঠেন—'বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী'।

॥ স্তবক ৫ ॥

পরের স্তবকে কবি চলে আসেন ইংরেজ অধিকৃত উনিশ শতকের কলকাতায়। নগর-নির্মাণে তখন বিদেশিয়ানার আরোপ কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্যকলার প্রকৃতি মহিমা থেকে তা বিচ্ছিন্ন—তাই 'নকল' শব্দটির প্রয়োগ।

এই দিকে নকল গথিক ঐদিকে করিন্থী আয়ন ডোরীয় কেলসনের ইংরেজি খেয়াল।

'কেলসন' বলতে কী বোঝায় তা নিঃসংশয়ে কোথাও পাইনি। প্রণতি দে জানিয়েছেন—'কেলসন' শব্দে লর্ড কার্জন নির্দেশিত কারণ—স্বদেশের বাসভবনের নামানুসারে তাঁকে বলা হয় 'Lord Curzon of Kedleston' এবং Kedleston শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'কেলসন'। কিন্তু এবিষয়ে আমি যেটুকু সন্ধান করতে পেরেছি—কেউই জানাননি যে শব্দটির উচ্চারণ 'কেলসন'। সকলেই 'কেড্‌ল্‌স্টন্' বা 'কেড্‌ল্‌স্টোন'-ই বলেছেন। তবে বিষ্ণু দে যে 'কেড্‌ল্‌স্টন্'-এর উচ্চারণ হিসেবেই 'কেলসন' লিখেছেন তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। কারণ প্রথমত 'কেলসন্'-এর ঐ ঊর্ধ্বকমাটিতে মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের বিলুপ্তি বোঝায়। দ্বিতীয়ত, তিন পঙক্তি পরে—কলকাতায় বিদেশি স্থাপত্যের অনুসরণ প্রসঙ্গে তিনি 'লাটনী-প্রাসাদ'-এর উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি যে, লাটভবন বা বর্তমান রাজভবন ক্যাপ্টেন ওয়াট্ নামের এক বাস্তুকলাবিদের দ্বারা নির্মাণ করিয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি—যা সমাপ্ত হয় ১৮০৩-এ এবং সেই প্রাসাদের স্থাপত্য সম্পর্কে লর্ড কার্জন নিজে লিখেছেন—"Captain Wyatt's design was adopted from the plan of my own home, Kedleston Hall in Derbyshire…"[৪] হয়তো বিষ্ণু দে কারো কাছে কেলসন উচ্চারণ শুনে থাকবেন, হয়তো বা ভুলই শুনেছিলেন। এই স্তবকে যে স্থাপত্য-রীতিগুলির উল্লেখ করেছেন বিষ্ণু দে এবং যে প্রাসাদগুলির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যেও একটি যোগসূত্র আছে। হাইকোর্টের বাড়িটিতে গথিক রীতির তোরণশোভিত সেতু, যাদুঘরে কোরিন্থীয় স্তম্ভমালা এবং যাদুঘর ও রাজভবন—দুটিতেই আয়োনিক স্তম্ভ আছে। ডোরিক স্তম্ভ ও দেখা যায় রাজভবনে।[৫]

এই স্তবকটিতে কবি বলেছেন—আঠোরো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার নাগরিক জীবনে ছিলো আরোপিত আড়ম্বর। নতুন ও পুরনো ধনীদের এবং তাদের বিলাসী বংশধরদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাবু কালচারের জাঁকজমকময় আবিলতা। তবু কোথাও ছিলো দেশবাসীর সঙ্গে দেশের একটি অন্তরঙ্গ হৃদয় সংযোগ। সাহিত্যিক ইমেজ ব্যবহার করে সেই সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মধুসূদনের এইসব কাহিনী নকশা প্রহসন থেকেই সেযুগের ছবিটি আমরা পাই। পক্ষীবাবুদের উল্লেখে সূচিত হয় ধনবিকারের উন্মার্গগামিতা। তবু কবির মনে হয়েছে সেই যুগে কোথাও নিহিত ছিলো

দেশব্রতের সুস্থ সংকল্প। পরবর্তী স্তবকে সেই কথারই অসংশয় ঘোষণা।

॥ স্তবক ৬ ॥

পরাধীন ভারত। বিদেশি অধ্যুষিত শহর কলকাতা। তবু সর্বাংশে অসাড় হয়ে যায়নি দেশবাসীর মন। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই যুবশক্তির একাংশে জেগেছিলো আত্মস্থতা, প্রকৃত পথ সন্ধানের বাসনা। নকল করা নগরের চাকচিক্য নয়, প্রকৃত নাগরিক মনন। তারুণ্যশক্তির প্রতীক হিসেবে কবি এখানে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্র-উপন্যাসের চিৎশক্তি সমুজ্জ্বল যুবকদের নাম—শচীশ, বিনয়—সর্বোপরি গোরা। এখানে উল্লেখ্য এই——সাহিত্যকে কাব্য-প্রতীক-উৎসে পরিণত হতে আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু সে সাহিত্যে মূলত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ। আধুনিক সাহিত্যে ও রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে প্রতীক উৎসে পরিণত করেছেন বিষ্ণু দে তা তাঁর একটি প্রধান কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। দেশবাসীর সেই দেশভাবনা সংগঠিত হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে, আনলো স্বাধীনতা। কিন্তু তারপর যখন কবি দেখেছেন স্বাধীন দেশের রাজনীতির গতি ততটা সুস্থ গঠনমূলকতার দিকে নয়, অনেকটাই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা অথবা দলকেন্দ্রিকতার দিকে ; অর্থনৈতিক অসাম্য যখন ক্রমবর্ধমান—তখন বিক্ষুব্ধ কবিচিত্ত বেজে উঠেছে ধিক্কারে। পরবর্তী স্তবকে সেই সংক্ষোভের সুর।

॥ স্তবক ৭ ॥

ভাষা এখানে সরল, প্রত্যক্ষ, জোরালো। ব্যবহৃত হয়েছে—নির্বোধ, নিষ্ঠুর, অমানুষিক, অভদ্র, মুমূর্ষু, বিকার—ইত্যাদি শব্দ। মানুষে মানুষে হৃদয়ের সংযোগ ছিন্ন। এই আত্ম-অবক্ষয়ী পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী তাও যেন স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে—

কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়। এই স্তবকেই নিশ্ছিদ্রতম হয়েছে অন্ধকারের আবহ।

কিন্তু সংকটের সংঘর্ষেই ছিটকে ওঠে চেতনার স্ফুলিঙ্গ, আলোর প্রার্থনা-গান জাগে অন্ধকারের ঘোরতম মুহূর্তেই। বিষ্ণু দে-কে—কবিজীবনের দীর্ঘ পর্বে হতাশা অনেকবারই আক্রমণ করেছে। মানুষের শুভবোধে আস্থা রেখে তা উত্তীর্ণও হয়েছেন তিনি অনেকবারই। তবু জীবনানন্দের মতো বিষ্ণু দে-ও যেন পরিণত-পর্বে এসে পৌঁছবার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন আশা বা হতাশা কোনোটিতেই স্থিত হননি। জীবন

যেমন গাঁথা হয় আশা-নৈরাশ্যের যুগ্ম বন্ধনে, তেমনিই গড়ে উঠেছে তাঁদের জীবন-সম্ভব শিল্প। যদিও জীবনানন্দের রচনায় নৈরাশ্যের ঝোঁক বেশি; বিষ্ণু দে র কবিমানসে মানুষের উত্তরণশক্তিতে আস্থা কিছু বেশি। এই স্তবকটিতেও হতাশার তীব্র মুহূর্তেই জাগে আলোর প্রার্থনা—'রৌদ্র হানো, বান দাও,…'। কার কাছে প্রার্থনা?—'হে সূর্য হে, চৈতন্য আকাশ'। সূর্য বা আকাশ যার প্রতীক সেই 'চৈতন্য' শব্দটিও রয়েছে এখানে। এরপর কবিতাটিতে আরো অনেকবারই শব্দটি আছে। এই শব্দটির মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে হৃদয়ের জাগরণ, প্রতিরোধের সংকল্প, সংগ্রামের মন্ত্র। স্তবকের শেষ পঙক্তিতে কবি বলেন—এই বিকার-গ্রস্ত জীবন-নির্বাহের চেয়ে ভালো সব কিছু গ্রাস করা বিশুদ্ধ অনস্তিত্ব। সেই শূন্যতা থেকেও জাগতে পারে প্রাণ কিন্তু কৃত্রিম, প্রলাপী বিলাসকলার জীবন থেকে নয়। বিশুদ্ধ অনস্তিত্বের প্রতীক রূপে কবি এখানে আনেন একটি ব্যক্তিগত ইমেজ। আসানসোলের কাছে রূপনারায়ণপুরের পথে সালানপুর। কবি একবার গিয়েছিলেন সেখানে। বৃক্ষহীন, ধূ ধূ করা সালানপুরের মাঠের কথাই মনে পড়েছিলো তাঁর শূন্যতার ছবি হিসেবে। তার সঙ্গে 'ভূশণ্ডী' শব্দটি যুক্ত হয়েছে রাজশেখর বসুর বিখ্যাত 'ভূশণ্ডীর মাঠ' গল্প থেকেই। ভূতেদের বিচরণক্ষেত্রে সেই মাঠটির অদ্ভুতত্বই যেন ছেঁকে নিতে চেয়েছেন তিনি এখানে।

॥ স্তবক ৮ ॥

চৈতন্যের জাগরণ প্রার্থনার পরেই কবি যেন খোঁজেন সংগ্রামের সুনিশ্চিত পথ। সমাজের এই মুমূর্ষুতার জন্য যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করেন। তাদের অমানবিকতা, বন্যতা, জান্তবতা প্রত্যক্ষ করে তাদের ঘৃণার সম্মান দেবারও অযোগ্য বলে মনে করেন। যারা 'চোরা গলিতে' ঘোরে, যাদের 'অমানুষিক চোখ' ও নখরে মৃত্যু—তারা আসলে পশুশক্তিরই রূপ—তাদের বিনাশ করবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন কবি এখানে—

> জয়ের ছবি তাই তো মনে, জয়ের গান তাই তো রটে,
> ঘোচাতে চাই আকস্মিকের পাপ।

'আকস্মিক' শব্দটি তাৎপর্যময়। উদ্বুদ্ধ চিৎশক্তির অনুপ্রেরণায় অন্যায়ের পরাক্রমকে তাঁর মনে হয়েছে 'আকস্মিক'। মনে হয়েছে—স্থায়ী হবেনা সময় ও পরিস্থিতির এই নাটুকে প্রলাপময় নির্বোধ চেহারা। অনুপ্রেরণার সেই উদ্দীপনাতেই এই স্তবকে ছন্দ বদলে যেতে দেখি। এতক্ষণের মিশ্রবৃত্ত ছন্দ পরিণত হয় দলবৃত্তে। যদিও 'চোরাগলিতে' বা 'মৃত্যু তার' ইত্যাদি পর্বে হিসেব করা চারমাত্রার আকাঙ্ক্ষায়

জায়গায় যথাক্রমে পাঁচ ও তিন হয়ে যায় তবু পড়বার সময়ে কান সহজেই মিলিয়ে নেয় স্বাভাবিক যোগ-বিয়োগের স্বাভাবিক বিন্যাসটুকু। দলবৃত্তের তালে পড়া ঝংকার যেন অনেকের একযোগে একতালে চলার মতোই। নিয়মিত মিলের বিন্যাসেও এ ঐক্যবদ্ধতার ইঙ্গিত।

॥ স্তবক ৯ ॥

নবম স্তবকটি অষ্টম স্তবকেরই দীর্ঘায়ন। দুই স্তবকের মধ্যে একটু 'স্পেস' থাকলেও স্তবকদুটি যেন আলাদা নয়। এই ছন্দ দুটি স্তবকে, মিল-বিন্যাসও একজাতীয়। অষ্টম স্তবকের চতুর্দশ পঙক্তির শেষ শব্দ 'পাপ' মিল খুঁজে পায় এই স্তবকের প্রথম পঙক্তির 'সাপ', পঞ্চম পঙক্তির 'চাপ' ও শেষ পঙক্তির অভিশাপ'-এ। আবার, পূর্ব স্তবকের ,চোখ' (পঞ্চম পঙক্তি) ও 'রোখ' (নবম পঙক্তি) প্রতিধ্বনিত হয় এই স্তবকের দ্বিতীয় পঙক্তির 'জোঁক'-এ। দুটি স্তবকের বলার কথাটিও প্রায় একই। সাপ, বিছে, জোঁক জাতীয় হীন অনাচারের শক্তিগুলিকে ঘৃণার সম্মানও দেওয়া হবে না কারণ—

ঘৃণার মাটি প্রখর ভালোবাসা

তাই —

দেবনা ওকে ঘৃণারও অভিশাপ।

ঠাণ্ডারক্তের সরীসৃপদের উপমা এখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যবহৃত। কবি স্পষ্টই বলেছেন—

মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মানব কাকে, শিরদাঁড়া নেই,

সিংহ উপমাটি আমাদের কাছে সহসা একটু অসমঞ্জস মনে হতে পারে। কারণ আমরা পশুরাজ সিংহ-কে প্রকৃত বীরত্বের উপমা রূপেই ভাবতে অভ্যস্ত—পাপাচারী শক্তির প্রসঙ্গে নয়। কিন্তু বিষ্ণু দে, মনে হয়, পাপের অনুষঙ্গে সিংহকে নিয়েছেন দান্তের নরক কল্পনা থেকে। ডিভাইন কমেডি-তে দান্তের নরকের দ্বিতীয় অংশে হিংসা, হিংস্রতা ইত্যাদি পাপের প্রতীক রূপে সিংহকে ভেবেছেন। পরে এই কবিতাটিতে নরক-কল্পনাকে বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেছেন বিষ্ণু দে। আমরা জানি তাঁর মনে এই কল্পনার মূল উৎস ছিলো দান্তের কাব্য।

॥ স্তবক ১০ ॥

এই স্তবকে কিন্তু আগের স্তবকদুটির জেদি প্রতিরোধের সুর শোনা যায় না।

আশা নৈরাশ্যের দ্বান্দ্বিকতার এখানে ব্যাপ্ত দেখি নৈরাশ্যকেই। স্বদেশ ও স্বকালকে 'নরক' বলে উল্লেখ করে স্তবকটি আরম্ভ করেন কবি! সেই নরক যেখানে—

আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,

কবি যেখানে রয়েছেন—তার কাছে—

সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিকল্পনাহীনভাবে যে সমাজ উন্নয়ন-ভাবনা—এখানে যেন তারই ইঙ্গিত। যেখানে শহরের আবরণের তলায় তলায় —কখনো আবৃতভাবেই ক্ষয়ের মুখে দাঁড়ানো গ্রাম। এই আশাহত পরিস্থিতি আবার ফিরিয়ে এনেছে মিশ্র কলাবৃত্তের গাম্ভীর্য। লক্ষণীয়, অন্ত্যমিল রচিত হয়েছে প্রধানত 'নেই' শব্দটির সাহায্যে। তেরো পঙক্তির এই স্তবকে ছয়টি পঙক্তির শেষ শব্দ 'নেই' ; একটি পঙক্তির শেষে আছে 'নয়'। তাছাড়াও আরো তিনবার 'নেই', তিনবার 'নয়' এবং একবার 'না' শব্দের প্রয়োগে মনে হয় সমস্ত স্তবকটি জুড়ে আর্ত একটি 'না'-এর সুর বাজতে থাকে। প্রথম পঙক্তির দুটি শব্দ 'এ নরকে' এবং শেষ পঙক্তির দুটি শব্দ 'চৈতন্যে মড়ক'। নরক মড়ক-এর শ্রুতিসাম্য ছাড়াও ভাবসাম্য, মড়ক শব্দের ঈষৎ কর্কশতা—সব মিলে স্তবকটিতে শুধু হতাশা নয়, যেন একটি অসাড়তার ভাব। একাদশ ও দ্বাদশ পঙক্তিতে স্পষ্টই লেখা হয়েছে—

কারোই কোনো আশা নেই।

অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।' আশা-নৈরাশ্যহীন এক জড়ত্ব যেন গ্রাস করে ফেলেছে মানবজীবন, সমাজজীবন।

। স্তবক ১১ ।

পূর্ব স্তবকের জের চলে। প্রায় অন্ত্যমিলহীন মিশ্রবৃত্তের টানা পঙক্তি। 'মারীর চড়ক' বাক্যবন্ধে পুনরাবৃত্ত মৃত্যুমুখী পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য চড়কের ঘূর্ণন-প্রসঙ্গ। এই স্তবকেও 'নেই' শব্দটির প্রয়োগ ছয়বার।

অরণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ ইত্যাদি উক্তিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নীলকণ্ঠ' কবিতার 'ফ্যাকাশে রুগ্ন সভ্যতার ছবি'। তিনিও খঞ্জ সভ্যতার পরিবর্তে চেয়েছিলেন—'আদিম অরণ্য উল্লাস'। তবে তা ছিলো স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মনোভঙ্গি। ষষ্ঠ পঙক্তি—

চোখ কান সব বোধ চোরাই মালের চেয়ে বাসি—'চোরাই মাল' উপমাটির বস্তুত্ব ও একান্ত একালত্ব আমাদের স্পর্শ করে। কিন্তু চকিত করে সপ্তম চরণটি—

এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক। অনুভব করি এই পঙক্তিতে নরক শব্দের ব্যঞ্জনা গেছে বদলে। দশম স্তবকের প্রারম্ভে দেশীয় পরিস্থিতিকে নরক বলা হয়েছিলো তার বীভৎসতা, অনুর্বরতা, ক্লিন্নতার কারণে। কিন্তু এই স্তবকে যে নরক 'নেই' বলেছেন কবি সে ভিন্ন নরক। সে-নরকে পাপ শাস্তি পায়, তীব্র দহনে শোধিত হয় অন্যায়-জর্জর অস্তিত্ব। সে-নরকে থেকে যায় উজ্জীবনের আশ্বাস। বিষ্ণু দে-র নরক-কল্পনায় দান্তের কাব্যের উৎস-সূত্রের কথা বলা হয়েছে। দান্তের ইনফার্নোতে শাস্তির অসহনীয় কষ্টও তীব্রতম—তবু আছে শুদ্ধি পথের আশাও। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শুদ্ধির তাণ্ডব'। ক্লাসিকাল কল্পনায় কোথাও-ই নরক কোনো নিষ্প্রাণ দেশ নয় বরং প্রাণলোকেরই একটি পর্যায় যেন। কিন্তু এই স্তবকে সেই নরক কবি যেন প্রত্যক্ষ করছেন না যার অভ্যন্তর থেকে জাগবে প্রাণ। তাঁর চারিদিকের নারকীয়তা যেন—

নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।

এর আগে অষ্টম পঙক্তিতে—

কেউ বা হিন্দির জন্যে, কেউ ইংরেজির হাঙর

এই কথা বলে কবি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে কোনো অনির্দেশ্য বিষাদ-নগরীর কথা বলছেন না তিনি—ঠিক ১৯৫৮-র ভারতের কথাই বলছেন। একদিকে প্রশাসনের পক্ষপাত, অন্যদিকে উচ্চমধ্যবিত্তের ভোগলুব্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় গড়ে ওঠা ইংরেজি-প্রধান শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমপ্রতিষ্ঠা—এ পরিস্থিতি বিশেষভাবে ভারতেরই।

॥ স্তবক ১২ ॥

এই স্তবকে নরক-প্রসঙ্গে কবির বক্তব্যটি স্পষ্টতা পায়। নরকের দাহ, নরকের আত্মগ্লানি কবি প্রার্থনা করেন; 'চৈতন্য' শব্দটি ফিরে আসে। ক্ষুরধার, ক্ষিপ্র, প্রতিবাদ—ইত্যাদি শব্দের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনে আপনা থেকেই এক জোরালো ভাব এসে যায়। র-ধ্বনিতে এক ধারালো ভাব তৈরি হয়। স্পষ্ট, আলোকিত 'বৈশাখী ঝড়কে কবি আহ্বান করেন জীর্ণতা উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কালবৈশাখী ইমেজটি অবশ্য গতানুগতিক, তবে আধুনিক কবির কাছে যাথার্থ্যই একমাত্র লক্ষ্য—সেখানে আর কোনো সংস্কার নেই! বর্জনীয় নয় গতানুগতিকও।

॥ স্তবক ১৩ ॥

ছন্দ-ললিত কলাবৃত্তে লেখা হয় এই স্তবক। এখানে এতক্ষণের বর্ণিত কঠিন

পরিবেশের মধ্যে যেন 'বৈশাখী রৌদ্রের' আশ্বাস নিয়েই দেখা দেয় রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে—বিষ্ণু দে-র নায়ক-নায়িকা। রূপকথা-উৎস ব্যবহারে বিষ্ণু দে ক্লান্তি-হীন। কিন্তু রূপকথাকে তিনি একালে স্থাপন করেন তা-ও আমরা জানি সবাই। কিন্তু রূপকথার রাজপ্রাসাদ থেকে নামিয়ে এনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দাঁড় করিয়েছিলেন সাধারণের মাঝখানে। 'সোনার তরী'-র 'রূপকথা' কবিতার (রচনা ১২৯৮, চৈত্র) 'প্রভাতে' অংশে তিনি লিখেছিলেন—

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়
রাজার মেয়ে যেত তথা।

'সায়াহ্নে' আবার তারা ঘরে ফিরে আসত আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ের মতোই। বিষ্ণু দে-র মনে যে রবীন্দ্র-কবিতাটির অনুরণন ছিলো তা বোঝা যায় তাঁর এই স্তবকের ছন্দেও রাবীন্দ্রিক ছন্দেরই প্রয়োগে—

রাজার মেয়ে আজ আপিসে ঘাটে
রাজার ছেলে খোঁজে কাজ,

এই দুটি তরুণ-তরুণীকে অবলম্বন করে কবি নরকদাহের শেষে প্রত্যাশা করেছেন প্রাণ-প্রবাহ। ফেলে আসা রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র বা ধনতন্ত্রের সামাজিক বিন্যাসে নয়, নতুন কালের সমাজে—যেখানে রাজসন্তান ও সাধারণ নাগরিকের নেই কোনো পার্থক্য। কবিতার প্রথমেই যে নবীনদের সম্বোধন করেছিলেন কবি—অতীত-পরিক্রমা শেষ করে বর্তমানে এসে তাদেরই উপর তিনি আস্থা স্থাপন করেছেন। তাদের শুরু করতে হবে নতুন সৃষ্টির কাজ পারস্পরিক প্রেমে ও সুকঠিন শ্রমে।

॥ স্তবক ১৪ ॥

প্রতীকিত সেই রাজকন্যা ও রাজপুত্র মিলিত হয়—
পার্কে বেঞ্চিতে অথবা পথে শানে।

কারণ রাজপ্রাসাদ তাদের নেই। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার প্রয়োজনে তাদের 'ধর্মঘট' ও 'মিছিলে' যোগদান। 'ধর্মঘট' শব্দের সঙ্গে 'গৌরব' ও 'হৃদয় মেলে দেয়' ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যাংশের সংযোগে মিছিল-ধর্মঘটের পন্থায় কবির বিশ্বাসই দেখা যায়। অষ্টম ও নবম স্তবকের 'ঘৃণা' শব্দটি ফিরে এসেছে এই স্তবকে। এখানে 'ঘৃণা' কিছুটা সদর্থক—

এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহমন।

জীবনকে ভালোবাসে বলেই এই তরুণ নাগরিকেরা অর্জন করেছে কলুষকে ঘৃণা করার শক্তি।

॥ স্তবক ১৫ ॥

এই স্তবকে কবির ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে দেখা দেয় এক কর্মময়, পূর্ণতৃপ্ত জীবন, এক শ্রম-সুন্দর পৃথিবী। ক্লান্তির অর্থ যেখানে অবসাদ বা বিষাদ নয়—দুশ্চিন্তাহীন, গঠনময় শ্রমের আনন্দিত ক্লান্তি। সাম্যবাদী সমাজের যে-ছবিটি বিষ্ণু দে-র মনে ছিলো তাই প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। মাঠের ট্র্যাকটর, আসন্ন ফসল, শোষণহীন জীবন। চল্লিশের দশকে এই বিশ্বাস সত্য ছিলো অনেকেরই মনে। বিষ্ণু দে-ও সেই বিশ্বাস ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন এখানে, এঁকেছেন পরিপূর্ণ, সুখী সাম্যবাদী সমাজের ছবি। সূর্যের আত্মীয়ের মতো ঘরে ফেরে শ্রমিক। দৈনন্দিন সূর্যাস্তের মতোই সহজ ও প্রাকৃতিক সেই ঘরে ফেরা। তার ফেরার পথে পড়ে হাসপাতাল, ঝরা ফুল ও পাতা। ঘরে ফিরে সে গায় গান শোনার, আমোদ-প্রমোদের, চাঁদ দেখার অথবা বিদ্যুতের আলোয় কিছু পড়ার অবসর। বোঝাই যায়, ছবিটির আদ্যন্ত কল্পিত। ভারতের কতভাগ কৃষক-শ্রমিক হাসপাতাল বা বিদ্যুৎ পায় তার একটা ধারণা আছে আমাদের সকলেরই। ১৯৫৮ তে অবস্থাটি এর চেয়ে ভালো ছিলো এমন নয়। কবিও স্বীকার করেছেন—ছবিটি কল্পনার। ষষ্ঠ পঙক্তিতে আছে—

ধ্যান আর বাস্তবের খেয়া পারাপার

স্তবকের শেষ তিন পঙক্তিতে তিনি ফিরে এসেছেন বাস্তবে—

ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রাম শহরের ক্লান্তি বড়ো ক্লান্তিকর ;

এই স্তবকের মিশ্রবৃত্তের দীর্ঘ পঙক্তিগুলিতে মৃদু উচ্চারিত টানা সুরে যেন আত্ম-কথনের ভঙ্গি। মহাশয়—বলে মাঝে মাঝে সম্বোধন করা যেন নিজেকেই বা একান্ত সহমর্মী কাউকে।

॥ স্তবক ১৬ ॥

এই স্তবকের প্রারম্ভিক পঙক্তিটি একটু সমস্যার। কারণ 'রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন' বলে সজ্জিত ও মুখরিত, বরযাত্রী শোভিত একটি বিয়েবাড়ির ছবি কবি এঁকেছেন যেখানে বর আসেনি। এই ছবিটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পেই যথাযথভাবে দেখা যায়নি। কেউ কেউ কবিকে প্রশ্ন করেও উত্তর পাননি—কোনো

যায়। প্রণতি দে জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পে এরকম বিবরণ নেই তা বিষ্ণু দে নিজেই পরে জানিয়েছিলেন। প্রণতি দে-র মতে (হয়তো বিষ্ণু দে তাঁকে এরকম বলেছিলেন) ১৩২৯-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটকে রাজা ও কবির কথোপকথন থেকে এসেছিলো এই অংশের কল্পনা। রাজা বলেছিলেন—

"ওহে কবি, তোমার পালাটা কীরকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।"

এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় উপমা ছিলো। একাধিক প্রবন্ধে ও চিঠিতে —বরযাত্রীর ভিড়, কিন্তু বর নেই—এই ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন। বহিরায়োজনের আড়ম্বর কিন্তু প্রাণকেন্দ্রটি থেকে গেছে অপূর্ণ—এই অর্থেই উপমাটি ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথ। বিষ্ণু দে-ও তাই করেছেন। এই স্তবকেও মিশ্রবৃত্ত ছন্দেরই প্রয়োগ কিন্তু আগের স্তবকগুলির তুলনায় রুদ্ধ দলের বিন্যাস বেশি থাকায় তুলনামূলকভাবে খানিকটা দ্রুতি আসে উচ্চারণে—বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততার সুর বাজে তাতে। মেরাপ, উঠান, ভিয়েন, দেউড়ি, ভাঁড়ার, বোঝাই, অন্দর, যৌতুক, পড়শী, জমাট, হুলুধ্বনি, এয়ো, পান—ইত্যাদি শব্দ-সমন্বয়ে সাংসারিক আয়োজনের ছবিটি সম্পূর্ণ। আর, তারই মধ্যে—যেখানে বারো মাত্রার কমে কোনো পঙক্তি নেই সেখানে শেষ চরণের— 'শুধু বর নেই'—এই পূর্ণচ্ছেদহীন ছোটো পঙক্তিটিতে যেন অপূর্ণতার রেশ, শূন্যতার বোধ পঙক্তিটির পাত্র থেকে উপচে পড়ে। বিবাহ-সভায় বর ও কনে নেই—অর্থাৎ নিরর্থক বিলাস আছে, প্রকৃত কল্যাণময় চরিতার্থতাবোধ নেই— এই ছবিটি বিষ্ণু দে-ও ব্যবহার করেছেন একাধিক কবিতায় 'রথযাত্রা ঈদ মুবারকে' (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) স্মরণীয়।

॥ স্তবক ১৭ ॥

পূর্ব স্তবকের চিত্রকল্পটিই প্রবাহিত হয়েছে এ স্তবকেও। রবীন্দ্রনাথের শোভন উচ্চারণ ছেড়ে এসে কুৎসিত বাস্তবের ছবি ফোটাতে গিয়ে বিষ্ণু দে এই স্তবকে রাবীন্দ্রিক প্রতীক-চিত্রটিতে এনেছেন কিছু পরিবর্তন। তিনি দেখিয়েছেন—আপাত দৃষ্টিতে যাদের মনে হচ্ছে বরযাত্রী—উৎসবের মানুষ—তারা অনেকেই ছদ্মবেশী সমাজ-বিরোধী। তারা চোর ও ভিক্ষুক। অর্থের অভাব তাদের নেই—

কেউ বাবু, কেউ বা সাহেব—

কেউই 'বস্তিবাসী নয়', তবু তারা 'দুস্থ', 'সত্তার ভিখারী'—হৃদয়ের দারিদ্র্য তাদের প্রকট।

॥ স্তবক ১৮ ॥

'বর'—প্রতীকটির ব্যবহার এ স্তবকেও। আমাদের চিত্ত প্রাণধর্মের সেই কল্যাণস্থিতি অন্বেষণ করে প্রতিনিয়ত।

বর খুঁজে ফেরে সত্তা, আত্মপরিচয় সেই আলোকসত্তার প্রতীক রূপে কবি এখানে ফুলকেও গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সুস্থ প্রাণধর্মের বিকাশ ফুলের মধ্যে। প্রাকৃতিক বিন্যাসের সুসমঞ্জস অভিব্যক্তি। এর আগেও চম্পা প্রতীক ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র সাফল্য মনে আসে। এই অংশের একটি বাক্যে কবি বিষ্ণু দে-র মনের বিশিষ্ট একটি দিক স্পর্শ করা যায়। ফুলকে তিনি সুন্দর দেখেছেন—এমনকি ফুলদানিতে সাজানো হলেও? প্রকৃতির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফুলের কৃত্রিম-বিন্যাসেও সত্তা-সৌন্দর্যের বিনাশ কবি দেখেননি। কারণ মানুষের হাতের পুষ্পসজ্জার মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন মানুষের মননেরই বিকাশ। বিষ্ণু দে-র কবিমানসের যে সৌন্দর্যবোধ ও মানবপ্রীতি তা মানব-মননের ফসল—প্রকৃতির জৈব সর্বস্বতায় তা শেষ হয়ে যায় না। কবির এই মননোৎসারিত সৌন্দর্য-কল্যাণ-চেতনার দিকটা মনে না রাখলে স্তবক-শেষের 'ফুলদানির মননেও' শব্দদুটির নিকট-বিন্যাস বোঝা যাবে না।

॥ স্তবক ১৯ ॥

তেরো পঙক্তির এই স্তবকটিতে

ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে।

এই আট মাত্রার দ্বিতীয় পঙক্তিটিই সবচেয়ে ছোটো। বাকি পঙক্তিগুলির একটিতে ষোলো মাত্রা এবং অবশিষ্টগুলি সবই আঠারো মাত্রার বা তার বেশি সংখ্যক মাত্রায় গাঁথা। বিস্তৃত এই স্তবকটিতে প্রতীকাবরণ ছেড়ে সরাসরি বর্ণনা। মাঝে মাঝে মনে হয়—এত কথার কি দরকার ছিলো? অতীত দিনের চৈতন্য-সমৃদ্ধ এই দেশকে কবিতাটির রচনাকালে কবির মনে হয়েছে পঙ্গু ও কবন্ধবৎ—এসব কথা তো বলা হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু বলা হয়ে গেলেও কবিচিত্তের বিরাগের ব্যাপ্তি অনুভব করা হয়তো সম্ভব হতো না এই বিস্তার ছাড়া। এর আগে পশু-প্রতীক ও সমাজ বিরোধীদের কথা বলা হয়েছে। এখানে বিচ্ছিন্ন দেহ ও কবন্ধের উপমায় কবি দেখেছেন দেশকে। স্তবকশেষে কবি আবার তাঁর প্রিয় বর-প্রতীকটির উল্লেখ করেছেন অপর একটি রূপকথা-অনুষঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে—

লালনীল কমলের দেশে আজ বর নেই,

অতঃপর সমস্ত দেশ মূর্ত হয়ে বিধবা অরক্ষণীয়ার রূপ পরিগ্রহ ক'রে—যেখানে কোথাও 'বর নেই, সত্তা নেই।'

॥ স্তবক ২০ ॥

'সত্তা' শব্দটিকে ঘিরে রচিত হয়েছে এই বিংশ স্তবক। সমস্ত দেশ জুড়ে শুভ-বোধসম্পন্ন মননী সত্তার উন্মীলন দেখতে চেয়েছিলেন কবি। দেখতে পাননি বলেই তাঁর এই ব্যাকুলতা। মানুষের এই সত্তা-সন্ধান চিরকালের।

আদিম গোষ্ঠীর যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি।

সত্তার প্রকৃত অনুভবের অভাবেই জাগে ভ্রান্ত অনুভবসমূহ—"...মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান"। বিংশ শতকের পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা গেছে এই ভুল চাওয়া—ক্ষমতালোভ ও অহংকারের মিশ্রণ। হিটলারের মানসিকতা ও ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানের মধ্যে ছিলো এই বিভ্রান্ত বোধ। 'সাম্রাজ্য মরিয়া জার্মানি' বাক্যবন্ধে সেই হিংস্র ভ্রান্তির প্রসঙ্গ এনেছেন কবি। অথচ প্রকৃত বর-সত্তার উপাসক কবি-দার্শনিক-সুরশিল্পীদের মনে এই ভ্রান্তি জাগিয়েছিলো তীব্র যন্ত্রণা। বিষ্ণু দে উল্লেখ করেছেন কবি রিলকে ও হোয়লতারলিন, দার্শনিক নীট্‌শে, সুরস্রষ্টা বেঠোফেন ও বাখনার-এর নাম। বাখনার সম্ভবত তিনি Wagner-কেই বলেছেন। বিষ্ণু দে-র লিখিত উচ্চারণ অনেকসময়েই আমাদের পরিচিত উচ্চারণের সঙ্গে মেলে না। আবার, আর এক সুরকার 'বাখ্'-এর নামের ধ্বনিটি হয়তো ইচ্ছে করেই Wagner-এর নামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। 'আর্ত নাট্যনাদে' বাক্যাংশটি Wagner-এর রচিত অপেরা বা গীতিনাট্য গুলিকেই নির্দেশ করে—হয়তো বা বোঝায় এই নাটকীয় আয়রনি—যে, হিটলার ভালবাসতেন Wagner।

॥ স্তবক ২১ ॥

এই স্তবকে আরো বিস্তৃত হয়েছে কবির সত্তার অনুসন্ধান—তীব্র হয়েছে প্রকৃত সত্তাবোধের অভাবে তাঁর ব্যাকুলতা। আরো স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছেন তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দম্ভ ও বিনাশের সম্ভাবনাকে। অর্ধ-পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একদিন অনেকের কাছেই ছিলো কল্পতরু সমান। উনিশ শতকের বাঙালি কবি ব্রিটেন-অধীশ্বরীকে 'কল্পতরু' বলে সম্বোধনও করেছিলেন একদা! কিন্তু বিংশ শতকের মধ্যভাগে বিশ্বজুড়েই সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন।

...ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্ত শাসন চায়, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড

একালে অভ্যন্তরীণ সংকটে বিপন্ন। কবির মনে হয়েছে—সারা পৃথিবীতেই সত্তার এই সংকট উপলব্ধি করা যায় এমনকি—

…সাম্যের সখ্যের মহাদেশে

এই উক্তিতে সোভিয়েত রাশিয়াই নির্দেশিত হয়েছে। স্ট্যালিন সম্পর্কে অবনমনের ধারণা ১৯৫৮-তে বেশ প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কেও নানা দেশের সাম্যবাদীদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিলো—সেটাই স্বাভাবিক।

॥ স্তবক ২২ ॥

এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন স্বদেশের দিকে। ভারত শাসকের দেশ নয়। ভারত দীর্ঘদিনের পরশাসিত দেশ। তাই তার তুলনা চলতে পারে অন্যান্য পরাধীন উপনিবেশগুলির সঙ্গেই। সেই সূত্রেই কবি 'ফরাসীস মান্দারিন-মন্দ সুখ' এবং 'আলজীরীয় অবসাদ'-এর কথা বলেছেন। চৈনিক রাজসভার সামন্ত-প্রভুদের বলা হতো মান্দারিন। মান্দারিন বলতে রাজপুরুষদের পোষাক ও মূল্যবান ফরাসী মদ ও বোঝায়! আর আলজীরীয় অবসাদ—দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি উপনিবেশ হয়ে থাকা আলজীরীয়ার শোষিত পরিস্থিতির সঙ্গে কবি ভারতের পরিবেশের সাদৃশ্য দেখেছেন। তবু, শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা—অসাড়তার দিক থেকে এদেশের সঙ্গে তুলনা হয় না অন্য কোনো পরিবেশেরই।

॥ স্তবক ২৩ ॥

অন্তিম স্তবকটি শুরু হয় 'আমরা নরকে আছি' দিয়ে। আবার সেই নরক—যা দহনময় ও ক্লেশকর। তবু সেখানেই আছে বীত-কলুষ হবার সম্ভাবনা। তাই—

বিবাহসভার প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই

বলে তিনি আড়ম্বরক্লিষ্ট ভারতে সত্তার দুঃসময়ের কথা বলেও আবার ফিরিয়ে এনেছেন নবীন যুগের নবীন আশার প্রতিশ্রুতিকে। নরক-দুয়ারে অপেক্ষমান সেই রাজার মেয়ে ও রাজার ছেলে—তারা 'রাস্তায় প্রস্তুত'—তারা প্রতীক্ষা করে দহনশেষের নবজাত দিনের—তারা অন্যায়ের মূর্ত প্রতিবাদ—ভবিষ্যতের স্বপ্ন—"তারাই যে বরকনে"। জীবনের সহজ-মধুর মানবিক প্রেমের সঙ্গে এসে মিলেছে এখানে সত্তার পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা ও বোধ।

বিস্তৃত এই কবিতাটিকে বলা যেতে পারে আধুনিক কালের সমুজ্জ্বল এক স্বদেশ-প্রেমের কবিতা। ভারতের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু করে, ঔপনিবেশিক শাসন

ও বহুভাবময় উনিশ শতকের পথ-পরিক্রমা-শেষে এযুগে এসে দাঁড়ান কবি। শেষ করেন যৌবন-শক্তিতে আস্থা রেখে। স্মৃতির ভার বহন করে, সত্তার আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত এই বর্তমান যেন এ-কবিতায় মুখ তুলে চায় এক কঠিন কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে—স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত। দীর্ঘ কবিতাটিতে বিভিন্ন ছন্দোময় স্তবকের কুশল বিন্যাসে, আবেগের সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশে কিভাবে এক দীর্ঘ সাঙ্গীতিক গড়ন সৃষ্ট হয় তার আলোচনা করেছেন এক সমালোচক।[৬] সেই ঐকতান-বাদনের নানাস্বর মিশ্রিত একস্বরের দিকে আমাদের মুগ্ধতা অবশ্যই ধাবিত হয় কিন্তু এই সুরধর্ম কবিতাটির মননধর্মকে ক্ষুণ্ন না করে উজ্জ্বলতর করে। এই বিরল মিশ্রণ বিষ্ণু দে স্বচ্ছন্দভাবে সম্ভব করেন—কবিতাটি তাঁর একটা সময়ের দেশভাবনার সম্পূর্ণ প্রতিমা হয়ে থাকে। এখানেই কবিতাটির অন্য সার্থকতা।

অয়রিডিকে

(সত্যজিৎ রায় কে)

Triumph sei Amor, und alles, was da lebet

এ কোন কবির নরক জীবনযাত্রায় ?
পর্বে পর্বে পথে পথে ঘরে বাইরে চলেছে নাট্য,
মরণ-রঙ্গে এবং নিজেব মনে তো চলে না শাঠ্য,
নানারূপে তাই নরকের দিনরাত্রি
পদে পদে দেখি কবির ছন্দে, দৈনন্দিন যাত্রী
নরকের পথে গান ক'রে চলি মৃত্যুঞ্জয় যাত্রায়।

তুমিও বন্ধু নরকেই করো হৃদয়ের অভিযান ?
অধিষ্ঠাত্রী প্রেয়সী কি তবে রইবে আঁধারে লীন ?
পাখিদের সুরে পল্লবতানে প্রকৃতির সম্মান
তুমিও খোয়াবে, হে সুরস্রষ্টা পরাজিত ম্রিয়মাণ ?
মৌন মুরলী, থেকে যাবে মূক তোমারই রুদ্রবীণ ?

নরকে কি শেষে রেখে যাবে একা জীবনের সঙ্গীকে ?
দুর্গম পথে ক্ষুরধার প্রেম কাঁদবে চতুর্দিকে
সারা জীবনের প্রেমের কবরে অগোচর নিঃসীমে ?
কালের আদেশে বিদেহী অন্ধ হিমে
বাঁচবে না বুঝি আবেগে অধীর তোমার অয়রিডিকে ?

তোমার দু'পাশে কারা তোলে হাতছানি ?
কাদের কান্না তোমার এ পরাজয়ে ?
মানব-প্রেয়সী মাত্রেই ইন্দ্রাণী,
মনসিজ ঐ বলে নাকি বরাভয়ে ?
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হে সখা সত্যবান,
নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি ।

কঠিন পণের আঁধারে তোমার অভিযান,
মধ্যদিনেও দেখবে না তুমি আপন সাবিত্রীকে,
সদ্যোত্থিত প্রিয়াকে দেবে না বাহুডোর,
দেখবে না চেয়ে সে প্রিয় মুখের সুখঘোর ?

অসিধার প্রেমে কঠিন শপথে চলো বীর,
নরকের বিধিনিষেধ স্নায়ুতে অস্থির.
অথচ হৃদয় আকুল আদরে আবেশে,
তবুও যাত্রা প্রেমের অমোঘ আদেশে ।
অভিমানে ব্রত ভাঙবে কি শেষে তোমারই অয়রিডিকে ?

তুমি যে প্রতীক, তোমার প্রেয়সী প্রতিমা
আমাদের মনে মন্দির দিকে দিকে,
মূর্ছিত নত আঁধারে আপাত-গত-প্রাণ
অথচ অমর সহিষ্ণু সেই পাতালতীর্ণ মহিমা
আমাদেরই জেনো জীবনমরণে প্রতীকে ।

আশেপাশে একি নানা বেশে নানা কঙ্কাল !
ভাগ্যহতের পরীক্ষা কতকাল ?
কোথায় লুকাল তোমার অয়রিডিকে ?
ছিঁড়ে দাও ভাঙো নরকের মায়াজাল,
তোমার মাথুর সঙ্গীতে দেব সবাই দোহারে তাল
তোমার প্রেমের উজ্জীবনেই প্রাণ পাই ঠেকে শিখে
যার চোখে আহা আমাদের প্রাণ পায় প্রাণ
তাকাবে না সেই প্রেয়সীরও চোখে প্রেমিকে !

আমাদের মর অলকায় আজ বাঁচুক অয়রিডিকে ॥
১৩।১।৬০

অয়রিডিকে

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা অয়রিডিকে। বেশি বড় নয়, কিন্তু পুরাণ-প্রতীকের সমৃদ্ধ ব্যবহারে, স্বদেশের আবহ-সংযোগে, শিল্পের শক্তির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা-নিবেদনে এবং প্রেমের উজ্জীবনশক্তিতে একান্ত আস্থায় কবিতাটি দ্যুতিময় ও রূপময়।

অয়রিডিকে। পাশ্চাত্য পুরাণ কথা ও মধ্যযুগীয় প্রেম-উপাখ্যানগুলিতে যে-রমণীর নাম ইংরেজিতে উচ্চারিত হয় ইউরিডাইস অথবা ইউরিডিস রূপে—রোমান হরফে যাকে লেখা হয় Eurydice তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ (যেহেতু মূল কাহিনীটি গ্রীক পুরাণ থেকেই নেওয়া) নির্দেশ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু —ইউরিদিকে।[৭] শিশিরকুমার দাশ অবশ্য জানিয়েছেন—প্রকৃত উচ্চারণটি হবে এউরুদিকে।[৮] কিন্তু অয়রিডিকে হলো জার্মান উচ্চারণ। বিষ্ণু দে জার্মান উচ্চারণটি ব্যবহার করলেন কেন ? এর উত্তর পেতে সাহায্য করে জার্মান কবিতার একটি অসম্পূর্ণ পঙক্তি—যেটি লেখা আছে কবিতাটির শিরোনাম ও উৎসর্গীকরণের ঠিক পরেই। এখানে এ তথ্যও জানানো দরকার যে কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছে সত্যজিৎ রায়কে। জার্মান কবিতা-পঙক্তিটি হলো—**Triumph sei Amor, und alles, was da lebet,….**

Christoph Willibald Gluck (১৭১৪-১৭৮৭) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দের জার্মান সুরশিল্পী। তাঁর রচিত একটি অপেরার নাম Orfeo ed Euridice অর্থাৎ অর্ফিয়ুস ও ইউরিডাইস। গ্রীক পুরাণের এই দুটি নারী-পুরুষের মনোহারী প্রেমকথাটি এই অপেরার উপজীব্য। সত্যজিৎ রায়ের সংগ্রহে ছিলো এই রেকর্ডটি যেটি এককালে বারবার শুনেছিলেন বিষ্ণু দে ও সত্যজিৎ রায় উভয়েই। সেই বন্ধুত্ব ও সহিতত্বের স্মৃতি এই উৎসর্গে আর সেই রেকর্ডধৃত অপেরাটির অনুভাবনা ঐ জার্মান উচ্চারণ—অয়রিডিকে, এবং ঐ অসম্পূর্ণ জার্মান পঙক্তিটিতে। গ্লুক-এর রচিত অপেরাটির তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য—স্থান: ভালোবাসার দেবতার মন্দির। সেখানে অর্ফিয়ুস-এর উক্তি—Triumph Sei Amor, und alles, was da lebet, Schmück der Schönheit Götteraltar. বাক্যটির যথাযথ ইংরেজি অনুবাদ—Triumph be Amor (God of Love), and everything that there lives adorn the divine altar of beauty.[১]

বিষ্ণু দে গ্রীক সূত্র-নির্ভর মধ্যযুগীয় আখ্যান অবলম্বন করে অন্তত দুটি কবিতা লিখেছিলেন। তার একটি ক্রেসিডা, অপরটি এই অয়রিডিকে। অয়রিডিকে-র কাহিনী এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হলো যেহেতু সেই কাহিনীটিই এ-কবিতার আধার।

থ্রেস-এর রাজপুত্র অর্ধদেবতা অর্ফিয়ুস। তার মা মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিওপ্পি বা অন্য কোনো কলা-দেবী (muse)। সাধারণত গ্রীক দেবতা ও অর্ধদেবতারা বীর, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, কামুক, চতুর, ঈর্ষাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর। কিন্তু অর্ফিয়ুসের প্রধান পরিচয়—সে শিল্পী, সুরসাধক। তার বীনার (lyre) সুরে মুগ্ধ হয় বনের পশুপাখি, বৃক্ষ-লতা, নদী-পাথর। অর্ফিয়ুসের আর এক পরিচয়— স প্রেমিক। ইউরিডাইস (এউরুদিকে বা এখানে অয়রিডিকে) নামে এক তরুণীকে বিবাহ করবার পরেই ইউরিডাইস সর্পাঘাতে প্রাণ হারায়। পত্নীর সন্ধানে ও তার পুনর্জীবন-প্রাপ্তির প্রার্থনা নিয়ে অর্ফিয়ুস চলে আসে পাতালে প্রেতলোকের (নরক) অধীশ্বর হেডিস ও তাঁর রাণী পের্সেফোনির কাছে। অর্ফিয়ুসের বীনাধ্বনি শুনে মুগ্ধ হেডিস ইউরিডাইসের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শর্ত হলো যে পাতালের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত অর্ফিয়ুস পিছন ফিরে তাকে দেখতে পাবে না। শেষ মুহূর্তে ধৈর্য হারিয়ে অর্ফিয়ুস ফিরে তাকায় ও দ্বিতীয়বার হারিয়ে যায় ইউরিডাইস চিরকালের জন্য। এরপর যে-পথ দিয়ে অর্ফিয়ুস ফিরে আসছিলো সে-পথের দুধারের বনদেবীরা হিংস্র হয়ে উঠে খণ্ড খণ্ড করে ফেললো অর্ফিয়ুসকে। এই হিংস্রতার কারণ সম্ভবত এই যে, অর্ফিয়ুসের চপলতার ফলে একটি প্রেম সফল হতে পারলো না—হয়তো গোপনে

তারা কামনা করেছিলো অর্ফিয়ুসকে—সেই কামনার অতৃপ্তি মিশেছিলো এই ক্ষোভে। মৃত্যুর পর অর্ফিয়ুসের মাথাটি গান গাইতে গাইতে নদীস্রোতে ভেসে চলে যায়। মতান্তরে ইউরিডাইসের দ্বিতীয় অন্তর্ধানের পর অর্ফিয়ুস আত্মহত্যা করে। এই কাহিনীটি বহু দেশের বহু কবি, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীর অবলম্বন হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণের সাবিত্রী-সত্যবান কথার সঙ্গে এ-কাহিনীর মিল দেখা যায়। সাবিত্রী তপোবনে মৃত্যুলোক থেকে তার স্বামী সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিলো। বিষ্ণু দে কবিতাটিতে একাধিকবার সত্যবান শব্দের উল্লেখে সেই স্মৃতির জাগরণ ঘটিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক গল্পটির আশ্চর্য মিল আছে। সেখানেও সর্পদষ্ট লখিন্দরকে বাঁচাবার জন্য বেহুলার স্বর্গযাত্রা ও অর্ফিয়ুসের মতোই শিল্পদক্ষতার বিনিময়ে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া। বিষ্ণু দে কিন্তু লখিন্দর-বেহুলা-কাহিনী অন্য কবিতায় ব্যবহার করলেও এখানে করেননি।

এই কবিতাটিতে প্রথম থেকেই প্রেমের উজ্জীবনের সুর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কবিতাটির নামে ও শিরঃ-বাক্যাংশে ভালোবাসারই জয়-ঘোষণা। কবিতাটিতে বারবার যে নরকের কথা বলা হয়েছে তা নিষ্প্রেম জীবনেরই দ্যোতক। প্রেমহীন জগতে অর্ফিয়ুসের প্রেমের সাধনার প্রতি কবির শ্রদ্ধা অর্পিত এখানে। অর্ফিয়ুসের প্রার্থনার সঙ্গে কবি এখানে নিষ্প্রেম স্বদেশে প্রেমের উজ্জীবন প্রার্থনায় নিজের কণ্ঠও মিলিয়েছেন। সুরশিল্পী অর্ফিয়ুসের প্রতি কাব্য-শিল্পীর এক সহমর্মের সংযোগও যেন স্থাপিত হয়েছে এ কবিতায়। প্রেমের উল্লাস ও শিল্পসূক্ষ্মতাময় সৌন্দর্যজগতের নিকট সম্পর্ক—তারই ভিতর দিয়ে পূর্ণ সত্তার প্রতিষ্ঠা—এই যেন কবির গতিপথ।

কবিতাটির নাম অয়রিডিকে হলেও অর্ফিয়ুস-ই নিয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। কবি নিজের ব্যক্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়েছেন অর্ফিয়ুসের সঙ্গেই। প্রায় একই বিন্যাস ক্রেসিডাতেও। নাম ক্রেসিডা-র কিন্তু কথা ট্রয়লাসের। ওখানে জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতীক ক্রেসিডা, এখানে মৃত্যুজয়ী প্রেমের প্রতীক অয়রিডিকে। কিন্তু সেই জীবনাকাঙ্ক্ষা ও প্রেমসাধনা—দুইই মানুষের। তাই মানুষেরই প্রতিনিধি হয়ে ওঠে ট্রয়লাস, অর্ফিয়ুস—দুজনেই। সে প্রতিনিধিত্বে মিলে যায় কবিরও কণ্ঠ। এই ভিত্তি-কাঠামোটি বুঝে নিলে কবিতাটির উপরিগঠনে আর কোনো দুর্বোধ্যতাই থাকে না।

॥ স্তবক ১ ॥

সমকালের জীবনযাত্রায় বিষ্ণু দে নরকের প্রতিরূপ দেখেছেন। যেমন

দেখেছেন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতাটিতে বা আরো অনেক কবিতাতেই। কিন্তু বিষ্ণু দে বলেছেন 'কবির নরক'। বিষ্ণু দে প্রায়ই জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করেন শিল্পে—সাহিত্যে। এখানে তাঁর কল্পনায় যে-নরকের ছবি তা উঠে এসেছে কবিদের বর্ণনা থেকে। বিশেষ করে ওভিদ, ভার্জিল—কারণ তাঁরা অর্ফিয়ুস কাহিনীকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। এবং দান্তে—তাঁর প্রিয় কবির নরক-কল্পনা। আর গ্লুক—যাঁর রচনা থেকে প্রত্যক্ষ উঠে এসেছে এই কবিতাটি। এবং হয়তো আরো অনেক কবিই। প্রথম স্তবকটিতে বিষ্ণু দে-র নিজেরই কথা। জীবন যাত্রায় নরক বিস্তৃত, কবির ভাষাতেও সেই নরকেরই অভিজ্ঞতা। কিন্তু স্তবকের শেষ পঙক্তিতে কবি ধরে রাখেন অমরত্বের আশ্বাস—

নরকের পথে গান করে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায়।

॥ স্তবক ২ ॥

দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতেই কবি 'বন্ধু' বলে স্মরণ করেন অর্ফিয়ুসকে। অয়রিডিকের দ্বিতীয় অন্তর্ধানের পরবর্তী সময়টি ধরা হয়েছে এ-কবিতায়। অর্ফিয়ুসের মনে যখন বিষাদ ও হতাশার বোধ। পাখিদের সুর আর পল্লবতানের উল্লেখ করে কবি অর্ফিয়ুসকে উদ্দীপিত করতে চাইছেন। শেষ পঙক্তির 'মৌন মুরলী' শব্দ দুটির সাহায্যে ভারতীয় সাহিত্য ও লোকজীবনের ঐতিহ্যে প্রেমের সঙ্গে বাঁশরীধ্বনির অচ্ছেদ্যতার অনুভূতি এসে যায়। মনে পড়ে 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল ইসলামও লিখেছিলেন—

'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী'। কিন্তু বীনাই অর্ফিয়ুসের সুর-যন্ত্র। তাকে 'রুদ্রবীন' বলার মধ্যে মিশে যায় নরক জয় করবার শক্তির দ্যোতনা।

॥ স্তবক ৩ ॥

অয়রিডিকে অদৃশ্য। কবি বারবার অর্ফিয়ুসকে প্রশ্ন করেন—সে প্রশ্ন নিজেকেও—তাহলে কি নরকেরই জয় হবে, প্রেম হবে পরাস্ত? এই সংশয়টির প্রগাঢ়তাও অস্বীকার করা যায় না তাই এই কবিতাতেও প্রথম তিনটি স্তবকের ষোলো পঙক্তিতে (৬+৫+৫) আটটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন চোখে পড়ে।

॥ স্তবক ৪ ॥

তোমার দুপাশে কারা তোলে হাতছানি?
কাদের কান্না তোমার এ পরাজয়ে?

এখানে ইঙ্গিত মূল-কাহিনীর সেই অরণ্য-অপ্সরাদের প্রতি যারা অর্ফিয়ুস ফিরে চাওয়াতে প্রেমের পরাজয় দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। এ স্তবকে কবি অর্ফিয়ুসকে আবারও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। অর্ফিয়ুস-কে 'সত্যবান' সম্বোধনে পুনর্জীবন-প্রাপ্তির আশ্বাস মিশে থাকে।

নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্ত পানি। এই শেষ পঙক্তিতেও অর্ফিয়ুসের প্রেমসাধনার সাফল্যের স্মৃতি যখন অয়রিডিকে-র প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে মৃত্যুদেবতা হেডিস।

॥ স্তবক ৫ ॥

কঠিন পণের আঁধারে তোমার অভিযান, অয়রিডিকে-কে সঙ্গে নিয়ে ফেরার পথের শর্তটি প্রেমের দিক থেকে অতীব কঠিন। মৃত্যুলোক থেকে ফিরে আসা প্রেয়সীকে 'বাহু-ডোর' দান করবে না—এমনকি ফিরেও দেখবে না। এ শর্তের মধ্যে কবি যেন নারকী শাসনের পীড়নই লক্ষ করেছেন।

॥ স্তবক ৬ ॥

কবি কিন্তু প্রেমের সেই হারিয়ে যাওয়াকে চিরন্তন বলে মানতে প্রস্তুত নন। অর্ফিয়ুসকে তিনি আবার সাধনায় ব্রতী হবার আহ্বান জানাচ্ছেন—

অসিধার প্রেমে কঠিন শপথে চলো বীর,

নরকের নিষেধ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে কারণ প্রেমের উজ্জীবন চাই। প্রেমিকের জীবনের কথা এখানে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষত। তার সঙ্গে মিশে আছে জাতীয় জীবনে প্রেমের উজ্জীবন-ভাবনাও।

॥ স্তবক ৭ ॥

অর্ফিয়ুস ও অয়রিডিকে-র প্রতীক দুটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন কবি এখানে।—

তুমি যে প্রতীক, তোমার প্রেয়সী প্রতিমা

আমাদের মনে মন্দির দিকে দিকে,

আর অয়রিডিকে-কে কবি বলেছেন—'পাতাল-তীর্ণ মহিমা'র প্রতীক। প্রতীক ব্যাখ্যা করে দেওয়াতে কবিতাটির কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং প্রত্যক্ষ সংবেদনার সৃষ্টি হয়েছে। এই কবিতায় অর্থের কোনো গ্রন্থিলতা সৃষ্টি নয়—ভালোবাসার জয়স্রোতের সুর বাজিয়ে তোলাই কবির উদ্দেশ্য—

Triumph sei Amor, and alles, was da lebet,

॥ স্তবক ৮ ॥

অষ্টম স্তবকে অয়রিডিকে-র অন্তর্ধানের পর—প্রেমের শক্তির অভাবে উজ্জীবন ঘটে হিংস্রতার—ভয়াবহতার।

আশেপাশে একি নানা বেশে কঙ্কাল! পুরাণ-ছবির সঙ্গেই যেন কবির স্বদেশ ও স্বকালের কঙ্কালময় সমাজচিত্র। কিন্তু হতাশা গ্রাস করেনি তাঁকে। তিনি বিশ্বাস রেখেছেন যে আবার সফল হবে অর্ফিয়ুস। ছিন্ন হবে নরকের অপশাসন। অর্ফিয়ুসের বিরহ-গান—যা আসলে প্রেম উজ্জীবনের প্রার্থনা—তা ছড়িয়ে যাবে সম্মেলক স্বরে—

তোমার মাথুর সঙ্গীতে দেব সবাই দোহারে তাল 'মাথুর সঙ্গীত' বলে আর একবার বাংলার কৃষ্ণবিরহ গানের স্মৃতি কবি মিশিয়ে দিয়েছেন এখানে।

॥ শেষ পঙক্তি ॥ সবশেষে আলাদা একটি পঙক্তি রেখেছেন কবি। বাইরের চেহারায় আলাদা হলেও পঙক্তিটি কবিতার সামগ্রিকতারই সুপরিণতি যেন। এখানে এসে কবির মনে ভয়, দ্বিধা বা হতাশা নেই। বিশ্বাসে জায়মান শেষ প্রার্থনা—

আমাদের মর অলকায় আজ বাঁচুক অয়রিডিকে। 'মর অলকা'—এই সমবায়িত শব্দটি আমাদের মুগ্ধ করে। পৃথিবী মরণশীল—তবু তার মনে অমৃতের পিপাসা। 'মরঅলকা' আসলে মৃত্যুস্পৃষ্ট কিন্তু মৃত্যুজয়ী এই মানবলোক।

এ কবিতার কলাবৃত্ত ছন্দটি বিকল্পহীন। প্রেমের মাধুর্য ও লাবণ্যময় সবলতা, অর্ফিয়ুসের বীনাঝংকার, তার পথচলার ছন্দিত আবেগ—এসবই ধরা সম্ভব কেবল এই ছন্দেই। কবিতাটির স্তবকগুলি প্রায় সবই পাঁচ ও ছয় পঙক্তির। তার ফলে একটি সুর সৌষম্য জাগে। শেষ স্তবকের আট পঙক্তি একটু বিস্তৃত—সেখানে কবির কথাটি পেয়েছে খানিকটা প্রগাঢ়তাও। একটু সরিয়ে রাখা শেষ পঙক্তিটিতে কবিতাটির মর্মবানী—কেন্দ্র-অনুভবের আশ্বাস-মূর্ছনা। যদিও পঙক্তিটি একবারই ব্যবহৃত—তবু সঙ্গীতের ধ্রুবপদ যেন। অয়রিডিকে শব্দটির বারবার ঘুরে আসার মধ্যে সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্য গ্রন্থে নানাভাবের কবিতা আছে। অনেক কবিতারই অবলম্বন—স্বদেশ-পরিবেশ ও প্রেম—ব্যাপক অর্থে।—যেমন আলোচ্য দুটি কবিতার। কেন্দ্রীয় অনুভবটিকে ধরে রেখেও বহু মাত্রার সংযোজনে কিভাবে সমৃদ্ধ হয় বিষ্ণু দে-র রচনা তা হয়তো বোঝা যাবে এই দুটি কবিতার আলোচনায়।

নির্দেশিকা

১। রচনা পঞ্জির সূত্রে কয়েকটি কথা, বিষ্ণু দে-র রচনা পঞ্জি, অরুণ সেন, পৃ. ঝ, অয়ন, ১৯৮০।

২। ১২ এপ্রিল ১৯৮৯ শ্রীমতী প্রণতি দে-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৩। প্রবন্ধ: বিষ্ণু দে ও সময়; সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু দেঃ কালে, কালোত্তরে; সং ১৯৮২, পৃ, ৩১।

৪। British Government in India, Marquis Curzon of Kedleston Cassel's & Company Ltd. vol 1 chapter 3, P. 40.

৫। শাশ্বত কলকাতা: ইংরেজ আমলের স্থাপত্য, নিশীথরঞ্জন রায় ও রথীন মিত্র, প্রতিক্ষণ, ১৯৮৮।

৬। প্রবন্ধঃ বিষ্ণু দে ও সময়; সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু; দেঃ কালে কালোত্তরে; সং ১৯৮২।

৭। রাইনার মারিয়া রিলকে-র কবিতা, অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু, ১৯৭০।

৮। ব্যক্তিগত পত্র।

৯। Gluck-এর রেকর্ড এবং অপেরাটির সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ ম্যাক্সমুলার ভবনে—সেখানকার গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ক্রস্ট্যাল দাশের সৌজন্যে দেখা সম্ভব হয়েছে।

মহাশ্বেতা : অবহিত কলাকৌশল

১.০০ বিষ্ণুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ চোরাবালি (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পর 'পরিচয়' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন অংশে একটি বিজ্ঞাপন লক্ষ করা যায়।

> "শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বৈশাখের
> পরিচয়-এ বলেছেন বটে : কি করে' ওফেলিয়া
> ও ক্রেসিডা আমার প্রাণের বস্তু হতে পারে ?...
> যাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে ডাইন্যামিক বলি
> তা নয়।
> কিন্তু মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্নকথাই
> বলেছেন এবং বৈশাখের বিশেষ কবিতা পত্রে শ্রীযুক্ত
> আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন : যেখানে তাঁর
> অবহিত কলাকৌশল ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে,
> সেখানে তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করেছেন, যথা
> ওফেলিয়া বা ক্রেসিডায়।
> অবশ্য ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা ছাড়াও এ বইএ
> বহুরকমের বহু কবিতা আছে।"[১]

মূল বিতর্ক ওফেলিয়া এবং ক্রেসিডা এই দুটি কবিতা নিয়ে তা মনে করার পেছনে সঙ্গত কারণ থাকলেও এর থেকে অন্য একটি প্রেক্ষিত আমাদের সামনে তৈরি হতে পারে —এমন কথাও ভাবা যায়। একদিকে অবহিত কলাকৌশল-এর ভারসাম্য অন্যদিকে ডাইন্যামিক ভাববস্তু—এই দু'জাতের কবিতা বিষ্ণুদের হাতে কিরূপ নিচ্ছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব দেখেছেন কলাকৌশল-এর দিক। পাশাপাশি ধূর্জটিপ্রসাদ দেখেছেন

> "ব্যক্তিসম্পর্ক হীনতার চিহ্ন কবিতায় ছড়ান, তবু মনকে
> নাকোচ করনি। এই দ্বৈতবোধের ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর
> সাক্ষাৎ পেয়েছি যেটা আর একটু অতিরিক্ত হলেই
> Pose হত।"[২]

চোরাবালি কাব্যগ্রন্থের এবং বিষ্ণু দের অন্যান্য গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় এই দ্বৈতবোধের চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। আর সেই ধরণের কবিতার অন্যতম একটি কবিতা 'মহাশ্বেতা'।

১.১০ পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটির নাম ছিল 'জিজীবিষা'[৩]। এই নামকরণের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির যে স্পর্শ ছিল, তাকে মুছে ফেলতে চাইছিলেন সম্ভবত। তাই কবিতাটির নাম হল 'মহাশ্বেতা'। অবশ্য, এর সঙ্গে আরও কিছু ভাবনাচিন্তা কবির মনে ক্রিয়াশীল ছিলো তা পরে আমরা লক্ষ করব।

'জিজীবিষা-র মধ্যে কবি যেভাবে অন্ধকারকে সরিয়ে প্রাণবায়ুর কাছে আসতে চাইছেন তার ব্যক্তিগত প্রতিফলন যত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, 'মহাশ্বেতা'-র মধ্যে সেই ব্যক্তিক স্পর্শটুকু আড়াল করতে চাইছেন। অবশ্য, কবিতার শরীর থেকে তা মুছে ফেলতে পারলেন কই? একদিকে নৈর্ব্যক্তিক হবার প্রচেষ্টা অন্যদিকে ব্যক্তিক স্পর্শ, একদিকে সরল কলাবৃত্ত ছন্দের (Simple Movie) রবীন্দ্রনাথ কৃত অতি ব্যবহৃত ছ'মাত্রার পর্ববন্ধ এবং মিতবাক হবার প্রচেষ্টা অন্যদিকে তার মধ্য থেকে প্রকাশিত অনির্ণিত আবেগ এই দুয়ের টানাপোড়েনে 'মহাশ্বেতা' রূপমূর্তিটি আমাদের কাছে প্রাণসূর্যের মতো উদ্ভাসিত হয়েছে।

১.১১ 'জিজীবিষা' এবং 'মহাশ্বেতা' এই দুই রূপান্তর পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা যাক, কবি যে পরিবর্তনগুলি এনেছেন তা কোন বিশেষ অভিপ্রায়টুকু পালন করছে।

জিজীবিষা[৩]	মহাশ্বেতা[৪]
১। ক্রান্তিবলয় শ্রান্ত সুমেরুলোকে [১ম স্তবক, ৫ম পংক্তি]	১। ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে
২। আজকি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা? [১মস্তবক, ৬ষ্ঠ পংক্তি ২য় স্তবক, ৩য় পংক্তি]	২। আজকি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
৩। তোমার শরীর অলকানন্দা গান [২য় স্তবক; ৪র্থ পংক্তি]	৩। শরীরে তোমার হিমগিরি করে গান।
৪। হে বীর মদন, জীবনের ধনুটানো, [৪র্থ স্তবক, ৪র্থ পংক্তি]	৪। হে বীর অতনু. নাচিকেত ধনু টানো।
৫। স্বপ্ন সারথি, তোরণ কি যায় দেখা? [৪র্থ স্তবক, ৩য় পংক্তি]	৫। বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা?

জিজীবিষা	মহাশ্বেতা
৬। অচ্ছোদনীরে করেছিলে যবে স্নান [২য় স্তবক, ৫ম পংক্তি]	৬। অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
৭। স্বপ্নবাণীতে শিহরিল ক্রন্দসী [২য় স্তবক, ৬ষ্ঠ পংক্তি]	৭। স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।
৮। ক্লান্তিবলয়ে শিহরিল ক্রন্দসী' [৩য় স্তবক, ৩য় পংক্তি]	৮। ক্লান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।

সংগঠন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই রূপান্তর কতকগুলি বিশেষ সংবর্তন (Transformation) এর ফলেই ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের সংবর্তন-এ কবিতাটির প্রথম রূপ বিধৃত হয়েছিল। আর 'জিজীবিষা' থেকে 'মহাশ্বেতা,-র রূপভেদ পরবর্তী পর্যায়ের সংবর্তন-এর ফলে সঞ্জাত। পরবর্তী পর্যায়ে কবি যে সংবর্তনগুলি ঘটালেন, তার থেকে কবির বিশেষ বক্তব্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. ১২ বিভক্তি, পদ, বাক্যখণ্ড (Phrase) এবং—বাক্য—এই সব কটি ক্ষেত্রেই এই কবিতায় সংবর্তন ঘটেছে। প্রথমে লক্ষ করব বিশ্লেষণ পদকে বদলে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। 'শ্রান্ত সুমেরুলোকে'—'শ্রান্ত' বিশেষণ হলেও সম্পাদনশীলতার ক্ষেত্রে তা ক্রিয়ার ভূমিকা নিয়েছে। 'মিলায় সুমেরুলোকে' বলার সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন একদিকে স্পষ্ট ক্রিয়া হয়ে যায় অন্যদিকে অর্থগত বদলও ঘটতে থাকে। ক্লান্তিবলয়ের আবর্তনজনিত, পথপরিক্রমাজনিত যে শ্রান্তি ফুটে উঠেছিল তা 'মহাশ্বেতা',-য় মিলিয়ে যায়। ক্লান্তিবলয় এবং সুমেরুলোককে কবি একটি রেখার মধ্যে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। ফলে প্রথমে যা ছিল শারীরিক ক্রিয়া তা একটি চিত্রে পরিণত হয়। এরই পাশাপাশি কবিমনের একটি গূঢ় অভিপ্রায় কি ধরা পড়ে না ? কবি কি স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিতে চাইছেন না কাব্যিক অনুরণন সৃজনের ক্ষেত্র থেকে! 'ক্লান্তি'—'শ্রান্ত'-র যে ধ্বনিগত আবর্তত ফুটে উঠেছে" কবি তা পরিহার করতে চাইছেন। এই কবিতারই অন্যত্র আমরা কবির সেই গোপন প্রচেষ্টাটুকু লক্ষ করব কাব্যিক শব্দ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ধ্বনিগত সংবর্তন করা হয়েছে এইভাবে এই একই কথা স্মরণ রেখে।

আমারে>আমাকে [re→ke]

একই বিভক্তিতে (২য়া বিভক্তি) রূপগত (morphological) এই বদল কাব্যিক শব্দ পরিহারের ঈপ্সাকেই আমাদের কাছে প্রমাণিত করে। বোঝা যায় কবি অনির্ণিত আবেগকে নির্ণিত আবেগে পরিণত করতে চাইছেন। তরল (liquid) ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনিকে বদলে দিলেন ধ্বনিগত রণন নষ্ট করবার অভিপ্রায়ে।

১.১৩ বাক্যখণ্ডগত সংবর্তন নানা জটিল সংবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো কখনো এই ধরণের সংবর্তন সামান্য শব্দার্থগত বদল ঘটিয়েছে, কখনো কবিতার বক্তব্যের পক্ষে জরুরি কিছু অর্থগত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে প্রথমেই একটি বিপর্যাস সংবর্তন (Inversion Extraposition) লক্ষ করা যাবে[৬]।

তোমার শরীর→শরীরে তোমার

বিশেষ্য [+পুরুষবাচক
+সম্পর্কবাচক
+ষষ্ঠী বিভক্তি] +বিশেষ্য [+শূন্য বিভক্তি]→বিশেষ্য [৭মী বিভক্তি]

+বিশেষ্য [+পুরুষবাচক
+সম্পর্কবাচক
+ষষ্ঠী বিভক্তি]

সম্পর্কবাচকতার ক্ষেত্রে বিপর্যাসের ফলে তেমন পরিবর্তন না হলেও এই সংবর্তনের ফলে পুরো বাক্যটির চেহারা পালটে যায়। বিশেষ্য গুচ্ছ [Noun phrase] অবস্থিত 'তোমার শরীর' [বি.+সম্পর্কবাচক+বি.] এই গঠন তৈরি করে ছিল। সংবর্তনের ফলে পাওয়া যায় এই গঠন ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত হয়েছে[৭]। অর্থাৎ বদলে গেছে বাক্যের আভ্যন্তরিক গঠন।

যেখানে শরীর ছিল অলকানন্দার সঙ্গীতের মতো কলস্বনা সেখানে শরীরের মধ্যে তুষারাবৃত পর্বতের সঙ্গীত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বর্গের দেবীরূপ যাতে না বিস্মিত হয় কবি কি তারই প্রচেষ্টা করতে চেয়েছেন? প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিষ্ণু দের পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে মহাশ্বেতার মূর্তি এঁকেছেন তা দৈবী মহিমায় আবৃত। বিষ্ণু দে চাইছেন মাটির স্পর্শ নিয়ে আসতে। তাই স্বর্গগঙ্গাকে বাদ দিলেন তিনি। নারী শরীরকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। 'হিমগিরি' শব্দ এই দেহময়—শরীরময় সত্তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১. ১৪ 'মদন শব্দটিকে বদলে যখন ব্যবহার করলেন 'অতনু' শব্দ তখন শরীরহীন এক অস্তিত্ব ব্যাপ্ত হল ভাবজগতে। সম্পর্কবাচক বিশেষ্যপদকে সরিয়ে একটি বিশেষণ পদ নিয়ে এলেন। জিজীবিষার ক্ষেত্রে 'জীবনের ধনু' তাৎপর্য কিন্তু কি 'জিজীবিষা' কি 'মহাশ্বেতা' উভয় ক্ষেত্রেই 'নাচিকেত' শব্দটি দ্যোতনাময়। যিনি

মৃত্যুলোক থেকে জ্ঞান লাভ করে ফিরে এসেছিলেন তারই সত্তায় নির্মিত ধনু আমাদের এমনই মরণ উত্তরণের কথা শোনাবে। ফলে 'ধনু' শব্দটির ব্যঞ্জনা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সংবর্তনের ফলে।

১.১৫ সম্বোধন পদ 'স্বপ্নসারথি' একেবারেই বিলোপিত (deleted) হয়েছে। 'তোরণ'-এর পরিবর্তে 'বিস্মরণীর বালুতীর' ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্নবোধক অব্যয়টিও বিলোপিত উপাদানগত সংবর্তন হল —

বিশেষ্য (স্বপ্নসারথি), প্রশ্নবোধক অব্যয় (কি) বিলোপিত

বিশেষ্য (তোরণ)→বিশেষ্য সম্বন্ধক বিশেষ্য (বিস্মরণীর বালুতীর)

'তোরণ' শব্দটির মধ্যে প্রত্যাশা—প্রাপ্তি যেমন রয়েছে তেমনি পথপরিক্রমার শেষে পৌছনর আশ্বাসবাণী ধ্বনিত। প্রশ্নবোধক অব্যয়টি এই প্রত্যাশা—আশ্বাসময় আকুলতাকে ব্যক্ত করে তোলে। কিন্তু প্রশ্নবোধক অব্যয়টি না থাকায় এই আকুলতাময় প্রত্যাশা আর থাকে না। তখন চারপাশে দেখা দেয় বিস্মরণ। দেখা যায় বালুকাময় প্রান্তর। কোথাও কোন শ্যামল ছায়া নেই—জল নেই। চোরাবালি কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে এই 'বিস্মরণীর বালুতীর' প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির তোরণ দেখানর ক্ষেত্রে 'স্বপ্নসারথি'র ডাক পড়তে পারে। কারণ, স্বপ্নময়তার সঙ্গে আমাদের আশা ও আশ্বাসের একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'স্বপ্নসারথি' 'বিস্মরণীর বালুতীর' দেখানর জন্য থাকতে পারে না। কারণ এই বালুতীর জীবনের অনেক অপ্রাপ্তিকে অনেক ক্ষত লাঞ্ছনাকে মূর্ত করে তুলছে। বোঝাযায় বিষ্ণু দে ক্রমশ : জটিল জীবন ও সমাজচেতনায় মগ্ন হচ্ছেন। এলিয়টের মতই সমাজের-জীবনের অবক্ষয়কে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন বিশেষ শব্দপ্রতীককে ব্যবহার করে। আর সেই শব্দটি 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে[৮]। এবং পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই এর প্রস্তুতি দেখা যায়[৯]।

১. ১৬ শেষ তিনটি উদ্ধৃত অংশে একই কারণে সংবর্তনগুলি ঘটেছে। সংবর্তনগুলি লক্ষ করলে কবির বিশেষ প্রচেষ্টাটি ধরা পড়বে।

করেছিলে যবে→ করো তুমি যেই

শিহরিল → শিহরায় [শেষ দুটি অংশে]

অতীত ক্রিয়াপদকে কবি নিত্য বর্তমানে নিয়ে আসতে চাইছেন। ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, ঘটনার নিত্যতাকে ধরতে চাইছেন কবি। তাই কালকে বদলে দিলেন। মহাশ্বেতা মূর্তিটি অতীতের প্রেক্ষাপট থেকে বর্তমানযুগের এমন কি ভবিষ্যৎ যুগের প্রেক্ষাপটে চলে আসে। দৈবী

ভাস্কর্য থেকে মৃন্ময়ীতে পরিণত হয়। তার অস্তিত্ব প্রতিমুহূর্তে আমাদের ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে রাখে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই আব্যাপ্ত মহাশ্বেতা মূর্তি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কথিত ডাইন্যামিক অনুভূতিকেই জাগিয়ে তোলে।

আমাদের এপর্যন্ত আলোচনায় একথাই বলা যায় যে, বিষ্ণু দে প্রকরণশিল্পের দিকে যেভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন, তা নিছক কলাকৌশল-এর যান্ত্রিক অনুবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার দিকে তিনি ক্রমশঃ এগিয়ে গেছেন। কবিতার শরীর থেকে যে ভাবমূর্তিকে তিনি সৃষ্টি করেন তা ধীরে একটি নিটোল অবয়ব পেতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে জিজীবিষা তার থেকেই ক্রমে আমাদের আকুলতা এসে পৌঁছয় কখনো ক্রেসিডার কাছে[১০] কখনো বা মহাশ্বেতার কাছে। ভারতীয় পুরাণ এবং সেই সঙ্গে বিদেশীয় পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন বিষ্ণু দে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই বুঝতে পারা গেল যে তিনি মিথ চেতনাকে তাঁর কবিতার একটি অন্যতম প্রাণশক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন।

১.২০ উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যগ্রন্থ থেকেই বিষ্ণুদের মিথ চেতনায় ভারতীয় এবং বিদেশীয় কাহিনী-চরিত্র মিলিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে'[১১] যেমন দেখা যাবে, তেমনি ডায়ানা-উর্বশী পাশাপাশি[১২]। আবার পুরূরবা, ট্রিস্টান ও ইসোলেডের পাশে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, কণ্বমুনি, ক্লিওপেট্রা, ভিনাস, আর্টেমিস[১৩] প্রভৃতি একই সঙ্গে লক্ষ করা যাবে। এছাড়াও নানা কবিতায় নানা মিথ চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যেমন, পুরূরবা-উর্বশী[১৪] দিতি[১৫], ত্রিশঙ্কু[১৬] ইত্যাদি। চোরাবালী-তেও নানা মিথ—কাহিনী ও চরিত্র উঠে এসেছে। যেমন, ওফেলিয়া, দেবযানী, প্রসার্পিনা[১৭], সাগর সন্তান, উলুপী[১৮], পঞ্চমুখ, প্রসার্পিনা, হৈমবতী, মহাশ্বেতা[১৯], উর্বশী[২০], যযাতি, প্রসার্পিনা[২১] বিচিত্রবীর্য, দশরথ[২২] উলুপী[২৩] বৃহন্নলা[২৪], শিখণ্ডী, হেলেন[২৫], গরুড়, মেনকা, ঋষ্যশৃঙ্গ[২৬], ক্রেসিডা, হেলেন, কুরুক্ষেত্র, ট্রয়, ইন্দ্রপ্রস্থ[২৭] প্রভৃতি। মহাশ্বেতা কবিতাতেও মিথ চেতনায় কবি প্রাণিত।

১.২১ বিষ্ণুদের কবিতার জগতে দেশী-বিদেশী নানা মিথ কাহিনী যে চরিত্রগুলি তুলে ধরেছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীমূর্তি। শুধু তাই নয়, নানা দেশের সৌন্দর্যের নারীরা এসে তাঁর অনুভূতিকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। ভারতীয় পুরাণের সৌন্দর্যের মূর্তিমতী প্রকাশ উর্বশী যেমন আছে তেমনি পর্বতকন্যা উমা, দৈত্যগুরু কন্যা দেবযানী, উপনিষদের হৈমবতী, মেনকা, নাগকন্যা উলুপী, দিতি, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নানা রূপের নারী চরিত্র রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছেন জুপিটার কন্যা আপোলোর যমজ বোন ডায়ানা যাঁর গ্রীক নাম আর্টেমিস যিনি আলোর দেবী এবং শিকারের উৎসাহদাত্রী।

ভালোবাসা, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য ও আনন্দের দেবী ভালকান পত্নী ভেনাস-কে এনেছেন। এনেছেন জুপিটার কন্যা প্রসার্পিনা-কে; জুপিটার কন্যা হেলেনকে।

এই মিথকাহিনীর চরিত্রগুলি তাদের সৌন্দর্যের আদিম অনুভূতিকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি একটি চিরন্তন অনুভূতিতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি, বর্তমান সমাজ সম্পর্কে অবহিত কবির চিত্ত ফুটে ওঠে কবিতার শরীরে[২৮]।

১.২২ কবিতার সঙ্গে মিথ-এর সম্পর্ক মূলত দু'ধারায় আলোচিত হতে পারে[২৯]। এক ধারায় মিথ কবিতা কিনা সেই বিষয়ে বিতর্ক এবং অন্য ধারায় কবিতায় মিথ-এর প্রয়োগ। আমাদের বক্তব্য দ্বিতীয় ধারাটির উপর নির্ভর করে উপস্থাপিত হবে।

আমরা জানি, আধুনিক যুগে একজন কবি তাঁর কবিতায় 'মিথ'-এর প্রয়োগ করেন নানাবিধ কারণে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হ'ল মিথ-এর মধ্যে যে জীবন্ত বাস্তব রূপ একসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল তাকে আধুনিক চেতনা দিয়ে অধিকার করা। মিথ ফুরিয়ে যায় না। তার বেঁচে থাকা এইভাবেই প্রতিফলিত হয় আমাদের মননে। কবি নিশ্চিত ভাবে জানেন প্রকৃতিলোকে বহমান ধারাগুলি কখনো নিঃশেষ হয় না। কিন্তু তাকে আধুনিক সচেতনা দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

বিষ্ণুদে-র 'মহাশ্বেতা' কবিতার আগে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়তে পারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'মহাসরস্বতী' কবিতা। 'শ্বেতা' 'মহাশ্বেতা' 'সরস্বতী' 'মহাসরস্বতী' সম্পর্কিত আমাদের ধারনার কথা এখন থাক। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে কোন মহাশ্বেতা মূর্তি অঙ্কিত করেছেন তা প্রথমে লক্ষ করব।

সুধীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস' ফুটিয়ে তুলতে[৩০]। আর তার ফলে কবি যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, তাতে 'তাঁর কাছে আমার প্রিয়া আর কালিদাসের কান্তা এক বটে, তবু সে-অভেদের ভিত্তি ব্যতিহার্য ছদ্মবেশে নয়, প্রেমানুভূতির নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে'[৩১]। যে মহাশ্বেতা মূর্তি সুধীন্দ্রনাথ আঁকছেন, সে মূর্তির মূলে রয়েছে এই অভেদ ভিত্তি।

কবিতাটির আবহ সৃষ্টির প্রথম দিকের মুহূর্ত সৃজন করেছে। বসুন্ধরার নিজেকে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ, সৃষ্টির স্বয়ম্ভু সামগান-এর মধ্যে অনুর্বরা প্রোষিতার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রজাপতির সন্ধান-মহাশ্বেতাকে দৈবী পটভূমিকায় স্থাপন করে। মনে হতে পারে, এই মহাশ্বেতাকে সামগানের মধ্যে যজ্ঞরূপা অগ্নি হিসাবে পাওয়া গেছে—

পাবকাঃ নঃ সরস্বতী বাভোভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ[৩২]।

কিম্বা প্রজাপতি যার অনুসন্ধান করেন সেই মহাশ্বেতা অবশ্যই পুরান সাহিত্যের উৎস থেকে উঠে এসেছে। সরস্বতী 'আস্তাম্বাক'। এবং স্বকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মা আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; ব্রহ্মার পুত্রগণ আপত্তি করায় 'প্রজাপতিপতিস্তম্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।'[৩৩]

সাধারণ-ভাবে শ্বেতা-মহাশ্বেতা সরস্বতী হলেও দুর্গা মহাভাব আশ্রয় করে এবং শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে নাম মহাশ্বেতা[৩৪]। সুধীন্দ্রনাথ যখন 'দক্ষযজ্ঞ' এবং 'সার্বভৌম মিলনপার্বনে'র কথা বলেন তখন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'পুলকি অপরিচিত নদীর পুলিন' কিম্বা 'সপ্তসিন্ধু পরপারে' প্রভৃতি বাক্যাংশ কাদম্বরীর 'মহাশ্বেতা' মূর্তি স্পষ্ট করে তোলে না।

পাশাপাশি বিষ্ণুদের কবিতায় কাদম্বরীর 'মহাশ্বেতা' মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। বোঝা যায় সুধীন্দ্রনাথের মহাশ্বেতা লৌকিক জীবনের নায়িকাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসছে না। তাই সেখানে মহিমান্বিত দৈবী নারীত্বের রূপ। সেখানে পুরাণ যুগের সঙ্গে কবির বর্তমান যুগের প্রেমের অনুভূতির এক মিশ্রণ তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেখানেও অতীন্দ্রিয় লোকের কথা। অন্যদিকে বিষ্ণুদের কবিতায় মর্তের কামনাবাসনা-জর্জরিত নারীমূর্তি প্রকাশিত হয়। অবশ্য উভয় কবিই 'প্রেমের স্মৃতি'-র অনুষঙ্গ গড়ে তুলেছেন তাঁদের কবিতায়। সুধীন্দ্রনাথ-এর কবিতার শেষদিকে কাদম্বরীর স্মৃতি তাই চমক দিয়ে ওঠে। 'ক্ষণিকা পরমা' বা 'অনিত্য প্রিয়তমা' যাকেই তিনি গড়ে তুলেছেন তার অন্তরে চিরসৌন্দর্যের আবাহন[৩৫]।

১.২৩ মহাশ্বেতা কবিতায় বিষ্ণু দে কেমন করে কাদম্বরীর ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন, তা দেখিয়েছেন অরুন সেন[৩৬]। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন কাদম্বরীর সামীপ্য 'নবযৌবনের ক্ষুধা'-র 'উন্মাদিনী পরিণতি'-র সঙ্গে চোরাবালি পর্বের লিবিডোর বাঁকা পথের মনস্তাত্বিক জটিলতার। এ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব পঞ্চমুখ কবিতায় মহাশ্বেতার প্রসঙ্গ-ই একমাত্র নয়, চোরাবালি পর্বের অধিকাংশ কবিতাতেই এই জটিল প্রেম তন্ময়তার জগৎকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। ক্রেসিডা-তে যখন 'জিজীবিষু' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হই তখন 'মহাশ্বেতা' কবিতার প্রথম নামকরণটি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আর একবার বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

'জিজীবিষা' ও 'মহাশ্বেতা'-র রূপভেদটুকু [১.১১] যদি আবার আমরা লক্ষ করি তাহলে কি দেখব না কবি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে চলেছেন ! 'অলকানন্দা'-র থেকে 'হিমগিরি'-তে রূপান্তর স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ বলে যেমন মনে হবে, তেমনি দেখা যাবে দেহকে স্বর্গ গঙ্গা বলার সঙ্গে যে রোমান্টিক মাধুর্য ক্ষরিত হয় তা শরীরে হিমগিরি-র

অস্তিত্বে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। সেখানে নারীশরীর ক্রমশ প্রাধান্য পায়। কাদম্বরীর সর্বত্রই যে অঙ্গহীন অনঙ্গ-র লীলা, তা 'অতনু' শব্দের মধ্যে বাঞ্জিত হয়েছে। 'নাচিকেত' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। কারণ, মৃত্যুলোকে গিয়েও যারা ফিরে আসে তাদের মৃত্যুলোক বিজেতা নচিকেতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রেম তার মহান স্পর্শে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলবে এই কথাই কবি বলতে চান। বেগম আক্তার কামাল 'মহাশ্বেতা' সম্পর্কে যে স্বল্পকথা বলেছেন, তার মধ্যে এই উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'মহাশ্বেতা-র প্রতীকে দৈহিক প্রেমের বন্দনা'[৩৭]। কিন্তু, সে দৈহিক প্রেম 'কাদম্বরী'-র প্রেমচেতনাকে অধিকার করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত একটি ঐক্য রচনা করতে চায়।

'আমার নয়নে সে কি স্পৃহা!'[৩৮] মিলিয়ে নেওয়া যায় 'নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া'-র সঙ্গে। কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাবে, এই মহাশ্বেতা কাদম্বরীর একমাত্র মহাশ্বেতাই নয় তার মধ্যে কাদম্বরীর ছায়াও রয়েছে। যেমন,

'কাদম্বরীর মুখ দেখতে না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কটি—
পয়োধরের উন্নতি যে অন্তরায়'
'স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া'

অন্যদিকে 'দেহজ্যোতি', 'শুভ্রতার প্রতিমূর্তি', 'শরতের মেঘ' প্রভৃতি অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে 'ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি' 'স্মৃতি বিস্মৃতি শরতে ধারা ঝরে' 'অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে' প্রভৃতির মধ্যে। বোঝা যায় কাদম্বরী গ্রন্থের নারীচরিত্রগুলি এর মধ্যে মিশে আছে।

এই প্রেমের পটভূমিকাকে আধুনিক যুগের সঙ্গে কবি মেলাতে চেয়েছেন। আর তখনই দরকার হয়েছে, 'আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?' পংক্তিবন্ধের। আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন 'স্মৃতি-বিস্মৃতি', 'ক্রান্তিবলয়', 'বিস্মরণীর বালুতীর', 'প্রাকৃত বাহু' প্রভৃতি শব্দবন্ধ।

১.২২ বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে প্রতিমাগুলি বারবার ফিরে আসে,[৪০] তার মধ্যে 'সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত', 'বাহু', 'জল', 'গান' 'বালু' এই কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

যে প্রাণ সূর্যের একান্ত সংহতি দেখা যায়, তা মরণ চাঁদের আলোকে সরিয়ে দিয়েছে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত নিরবচ্ছিন্নতার স্মারক হয়ে দেখা দেয়। এখানে 'ক্রান্তি বলয়ের' মধ্যে সেই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। 'শরতের ধারা' এসেছে কালের পরিবর্তমানতার সাক্ষ্য নিয়ে। 'প্রাকৃত বাহু' প্রেমের ধারক বা বাহক বা আশ্রয় হিসাবে এসে উপস্থিত হয়েছে। 'অচ্ছোদনীর' 'হিমগিরি করে গান' প্রভৃতি এসেছে ইন্দ্রিয়ের নানা মাত্রিক চেতনা নিয়ে। জল যেমন মানুষকে সঞ্জীবিত করে, সঙ্গীতও তেমনি

আমাদের প্রাণ শক্তিকে প্রবাহিত করে। সুতরাং বেগম আক্তার কামালের মন্তব্যটুকুর সঙ্গে আরও নানা অনুষঙ্গ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

'বিস্মরণীর বালুতীর' 'জিজীবিষা' কবিতায় ছিল না। চোরাবালি কাব্য গ্রন্থের মূলভাবটি এই শব্দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক জীবন ও সমাজ সচেতনা এখানেই পৌরাণিক যুগকে আধুনিক যুগের সঙ্গে একত্রবদ্ধ করেছে।

প্রবন্ধের শুরুতে যে কথা বলা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে আবার ফিরে যেতে চাই। ডাইন্যামিক ভাববস্তুর সঙ্গে কাব্য রচনা কৌশল বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে সংহত নির্মান নিয়ে আসছে তা আমাদের মননকে বিশেষ ভাবে টেনে রাখে ॥

॥ নির্দেশিকা ॥

১. পরিচয়-বিজ্ঞাপন, ভাদ্র-১৩৪৫

২. পরিচয় পত্রিকা, পুস্তক সমালোচনা, চোরাবালি ; ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত ; বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃ.৯৯৩-৯৯৭

৩. জিজীবিষা, বিষ্ণু দে, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ. ৬০৬

৪. মহাশ্বেতা, বিষ্ণু দে, চোরাবালি, সিগনেট প্রেস ১৩৮৮ সংস্করণ থেকে গৃহীত পাঠ। পৃ. ৬১-৬২

৫. [Kranti] [S'ranto] ; [c c v c] [c v]=[c c v c] [c v] দল (Syllable) গঠনের দিক থেকে সমানভাবে আবর্তন সৃষ্টি করেছে। ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও প্রচলিত অলঙ্কার অনুপ্রাস (alliteration) সৃষ্ট হচ্ছে r, n, t প্রভৃতি ব্যঞ্জন এবং a এই স্বরধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে।

৬. বিপ্রক্রম সূত্র (Flip Flop Rule) অনুযায়ী এই জাতীয় সংবর্তন হয়ে থাকে।

৭. এখানে বাক্যখণ্ড বিন্যাসের পদ্ধতি অনুসারে দুটি বাক্য বন্ধনী চিহ্ন দ্বারা দেখান হল

তোমার শরীর অলকানন্দা গান

[বাক্য [বি. গুচ্ছ [বি. তুমি [[সম্পর্কবাচক] •[বি. শরীর]] [ক্রি. গুচ্ছ
[বি. গুচ্ছ [বি. অলকানন্দা]•[বি, গান]] ক্রি. (হ)]
[সহায়ক [(কাল বিভক্তি) (প্রকার বিভক্তি) (সাযুজ্য বিভক্তি)]]]]

শরীরে তোমার হিমগিরি করে গান

[বাক্য [বি. গুচ্ছ [বি. হিমগিরি]] [ক্রি. গুচ্ছ [বি. গুচ্ছ [বি. তুমি] [সম্পর্কবাচক] [বি. শরীর] [বি. গান]] [ক্রি. কর] [সহায়ক [(কাল বিভক্তি) (প্রকার বিভক্তি) (সাযুজ্য বিভক্তি)]]]]

৮. 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বালুতীর, বালুচর, চোরাবালি প্রভৃতি প্রসঙ্গ চোখে পড়বে। যেমন, চোরাবালি, চড়া, চাঁচর বালির চড়া, আধির চড়া [ঘোড়সওয়ার], স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ [ওফেলিয়া], সাহারার বালি [পঙ্কমুখ], বালুকাবেলায় [গার্হস্থ্যাশ্রম, প্রকৃতি ও প্রেম], হে মেরুচারিণী [উভচর], মৃগতৃষ্ণিকায় [খোঁয়ারি], বালুকারেখা [যযাতি], মরীচিকা ফাঁকা ত্রিসীমা [অপস্মার], মরীচিকা [উন্মনা], কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায়, বালুচরচারী, তপ্তমরুর [ক্রেসিডা]

৯. উর্বশী ও আর্টেমিস গ্রন্থে 'মরু' শব্দ বালুভূমি জাতীয় শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—শুভ্র মরুভূর [প্রত্যক্ষ], মরুভূ আকাশ [অর্ধনারীশ্বর], জনহীন বালুকার কূলে [সমুদ্র], বালুকাবেলা বেলাভূমি, বৈরাগিনী বালুকার বুকে, বালিয়াড়ি, বালুকাবেলায় [সাগর-উত্থিতা], মরুভূ [পর্যাপ্তি], বালুকণা, শুষ্ক মরুভূমি [এপ্রিল], মরুভূমি [গ্রীষ্ম] !

১০. ক্রেসিডা ! আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ। [ক্রেসিডা, চোরাবালি, ১৩৮৮, পৃ. ৮৫]

১১. পলায়ন, উর্বশী ও আর্টেমিস, সিগনেট প্রেস, ১৩৮৮ সংস্করণ, পৃ. ১১

১২. সাগরউত্থিতা, ঐ, পৃ. ২৮

১৩. উর্বশী ও আর্টেমিস, ঐ ॥

১৪. উর্বশী, ঐ "

১৫. সন্ধ্যা, ঐ "

১৬. সোঽহবিভেক্তমাদেকাকী বিভেতি, ঐ "

১৭. ওফেলিয়া চোরাবালি, সিগনেট প্রেস, ১৩৮৮, পৃ. ১৪-১৮

১৮. সন্ধ্যা, ঐ, পৃ. ১৯

১৯. পঙ্কমুখ, ঐ, পৃ. ২০ ২৩

২০. খোঁয়ারি, ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬

২১. যযাতি, ঐ, পৃ. ৪৭

২২. অপস্মার, ঐ, পৃ. ৫২

২৩. দ্বিধাদম্পতী, ঐ, পৃ. ৫৩

২৪ প্রথম পার্টি ঐ, পৃ. ৫৮

২৫. শিখণ্ডীর গান, ঐ, পৃ. ৬৩-৭১

২৬. আত্মদান, ঐ, পৃ. ৭২

২৭. ক্রেসিডা, ঐ, পৃ. ৮২-৮৭

২৮. সুকুমার সেন অবশ্য জানিয়েছেন, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ রচনার ওপর কবি বিশেষভাবে 'সমাজ' সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। "'সন্দীপের চর' এর কবিতাগুলি যুদ্ধমধ্যে ও যুদ্ধোত্তর কালে রচিত। তখন বিষ্ণুবাবু পুরোপুরি মার্কস্-লেনিনবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।" সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ, ইষ্টার্ণ পাব., ১৯৭১, পৃ. ৩৭৬

২৯. মিথ্ ও কবিতা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। এখানে এবিষয়ে আমরা আর বিশেষ কিছু বলব না। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন এই বইগুলি।

বেগম আক্তার কামাল, বিষ্ণু দে-র কাব্য পুরাণপ্রসঙ্গ, মুক্তধারা, ১৯৮৭

William K. Wimsatt, Jr. & Cleanth Brooks, Literary Criticism, A Short History, Oxford & IBH Pub. Co. 1964, Myth & Archetype, pp. 699 720.

Thomas A. Sebok ed., Myth A Symposiums, Indian University Press, 1974, ইত্যাদি.

৩০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অর্কেষ্ট্রা, ভূমিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, দে'জ পাব. কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ-৫

৩১. ঐ "

৩২. ঋক্ বেদ ১।৩।১০, 'পবিত্রা, অন্নযুক্তবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের জন্য অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।' রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত। দ্রঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (৩য়), ফার্মা কে. এল. এম. প্রাই. লি. ১৯৮০, পৃ. ৭-৮

৩৩. ভাগবত ৩/১২/৩৩

শিবপুরাণে ব্রহ্মা কামপরবশ হয়ে কন্যা সরস্বতীর পশ্চাৎ ধাবিত হন। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মনে করেন, প্রজাপতির দুহিতাগমনের এই সব কাহিনীর উৎস ব্রাহ্মণেই বর্তমান। আর ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্য কর্তৃক কন্যা (বা পত্নী) ঊষার অনুগমন এই সব কাহিনীর মূল। দ্রঃ ঐ, পৃ. ৪৩

৩৪. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা ২য়, ফার্মা কে এল এম প্রাই. লি. ১৯৭৯, পৃ. ১৩৯

৩৫. মহাশ্বেতা কবিতার পাঠ ভেদ দ্র. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, দে'জ পাব. ১৯৭৬, পৃ. ৪০৬

৩৬. অরুণ সেন, বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়, অরুণা প্রকাশনী, ১৩৯০, পৃ. ৬৪-৬৬

৩৭ বেগম আক্তার কামাল, বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ, মুক্তধারা বাংলাদেশ, ১৯৭৭, পৃ. ৩২

৩৮. মহাশ্বেতা যখন পুণ্ডরীকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন। দ্র: কাদম্বরী ১ম খণ্ড, প্রবোধেন্দু ঠাকুর কৃত অনুবাদ, রঞ্জন পাব. হাউস, ১৩৪৪, পৃ. ১৫১। 'মদিরেক্ষণা মদিরা' পৃ. ১১৩, এখানে শব্দ সাদৃশ্য।

৩৯. ঐ। পৃ. ২১১

৪০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতার কালান্তর ; বিষ্ণু দে—নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক, সান্যাল প্রকাশন, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৯-১৯৪

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' একই নামের কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। এটিই কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘতম কবিতা—ব্যাপ্তি ন' পাতার। কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে আর এক অর্থেও কিছুটা স্বতন্ত্র—কবিতার নিচে তার সৃষ্টিকালের কোন উল্লেখ নেই। এই অনুল্লেখ কবি-নির্দিষ্ট চেনা পথে হাঁটার দায় থেকে পাঠককে মুক্ত করে দেয় বিশেষতঃ কবিতার বিষয়ও যেহেতু সময়েরই সুরে বাঁধা। আর কবিতার শেষে সময়কাল চিহ্নিত হয় না বলেই 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র কালকে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সামাজিক ইত্যাদি নানা অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়, পাঠকের নিজস্ব ভাবনার এবং চিন্তার নিরিখে তাকে চিহ্নিত করার সুযোগ মেলে।

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত-কে সহজেই ব্যাকরণিক সময়ের খাঁচায় অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভাগ করে ফেলা যায়, প্রবহমান সময়কে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যতের চিহ্নিত অস্তিত্বে তুলে ধরা যায়। ইংরেজদের মত সময় এবং ক্রিয়ার কালের নিত্যদিনের যে দ্বন্দ্ব তা বাংলা ভাষায় নেই, তাই এনিয়ে আমাদের মাথা ব্যথাও নেই। কাজেই মোটা দাগে শুধু ভেঙে দেওয়া। কিন্তু এই সহজ পন্থার মধ্যে অতিসরলীকরণের একটা ভয় থেকেই যায় কারণ কবির সময়গত বোধ ঐতিহাসিকের মত রাজা এবং রাজ্যপাটের উত্থানপতনের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সালতামামি নির্ভর নাও হতে পারে। আর একারণেই স্মৃতি বা সত্তাকে সহজবোধ্য এবং সহজগম্য অতীত বা বর্তমান করে তোলা যায় না। আবার স্মৃতির তো আর এক অস্তিত্বও আছে যা অতীতের মত নিরলম্ব দাঁড়িয়ে থাকেনা। সে বর্তমানকে রূপান্তরিত করে বিশেষতঃ বর্তমান যখন সত্তাসন্ধিৎসু।

কাজেই সময় জলের মতই আধারকেন্দ্রিক কিংবা আধারনির্ভর। দার্শনিকের সময় পৃথিবীর সমকালীনতাকে ছাড়িয়ে দেবতার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার সেই সময়েরও যে গতি তার পথরেখা একদর্শন থেকে অন্য দর্শনে আলাদা হয়ে যায়। হিন্দুদর্শন সময়ের রৈখিকগতির কথা বলে যেখানে খৃষ্টীয় মতবাদ বৃত্তাকার সময়ের পথানুসারী। ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক মতবাদ মেলে না, অনেকক্ষেত্রে।

আবার একই ক্যালেণ্ডারে বা ডায়েরীতে তিন তিনটি সন তারিখ একই সঙ্গে বিশ্বাসের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে একই নিরিখে সময়কে রাজনৈতিক, সামাজিক—বৃহত্তর থেকে গোষ্ঠিগত স্তর পর্যন্ত, ব্যক্তিগত, পরিবার গত ইত্যাদি নানা স্তরে এবং নানান বিন্যাসে তুলে ধরা যায়। আমাদের কবি কোন স্তরে বিচার করেছেন, কোন মানদণ্ডে সময়কে ভেঙেছেন, আদৌ ভেঙেছেন নাকি শুধুই চিহ্নিত করেছেন একই অস্তিত্বের নানান বিবর্তনকে স্বাতন্ত্র্য দিতে—এসব প্রশ্ন নিয়ে কবিতাটির কাছে যাওয়া যেতে পারে।

কবিতার প্রথম দুটি শব্দ—'তোমরা নবীন'। দুটি শব্দেই সময়কে ক্যামেরার প্রায় ক্লোজশটের মত ছোট বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলেন কবি। নবীনতাকে যদিও এখনও নির্দিষ্ট কালসীমার গণ্ডিতে চিহ্নিত করেন না কিন্তু সময় অনেকখানি নিজস্ব চেহারা পেয়ে যায়। তোমরা, প্রথম স্তবকের এই শব্দটি দুটি অন্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলে—এক, লেখকের প্রবীণত্ব; দুই, প্রশ্নটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মের প্রতি। প্রশ্ন, যে উদাসী বিষাদে, যে স্মৃতির যন্ত্রণায় প্রবীণ কবির চৈতন্যের আকাশ বিষাদিত তা নব প্রজন্মকে স্পর্শ করে কিনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আর প্রশ্ন থাকে না। নবপ্রজন্মের চেতনার কালান্তরী বিস্তৃতির প্রশ্নটি যেন জিজ্ঞাসার মধ্যেই নঞর্থক হয়ে উঠেছে হয়ত নবীন প্রজন্মের 'সদ্যসুখ' এর প্রতি দুর্বলতার কারণেই। নিজস্ব সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ বলেই হয়ত 'সদ্য' তাদের কাছে সাম্প্রতিক, আধুনিক, বর্তমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এসব কিছুই। কবির সময়কাল এখানেই নবীনদের থেকে আলাদা হয়ে ধরা পড়ে। একই সময়ের উপর দাঁড়িয়েও তাদের সময় বোধ স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র।

তৃতীয় স্তবকে 'প্রবাস' 'নিজবাস', 'স্বদেশী' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে কবি সময় থেকে সমাজে চলে আসেন। সেই সমাজ বিস্তৃত হয় সম্পূর্ণ দেশ অবধি 'স্বদেশীয়' শব্দের টানে। কিন্তু স্বদেশ হয়েও তা প্রবাস থেকে যায় জন্মগত ভূমিদাস অস্তিত্বের কারণে। নিজ বাসভূমে পরবাসী এই নব প্রজন্ম স্মৃতির বিলাসে ভোগে কারণ স্বদেশীয়তার স্বাদই সে পায়নি, স্বভূমির অভিজ্ঞতাও তার হয়নি।

আর একারণেই এক সন্ধ্যা অস্তিত্বে সে তার অবস্থান, এক নতুন অনাত্মীয় প্রতিভাসে তার আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

পরের স্তবকে কবি মুণ্ডহীন পা-হীন ধড় সর্বস্ব বহুতল বাসিন্দাদের প্রতি সোজাসুজি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এই তথাকথিত আধুনিক গগনচুম্বী সদ্য সুখ আবাস আসলে আর এক চিড়িয়াখানা। হয়ত তার চেয়েও খারাপ, তাদের হিংস্রতার এক পরিপূর্ণরূপ

যেন এই বহুতলিক অস্তিত্ব। বেখাপ্পা, বেয়াড়া, বিশ্রী কিংবা কপালের গেরো—এই আটপৌরে কিংবা অসংস্কৃত দেশী শব্দগুলো শব্দহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন এই কুৎসিত অস্তিত্বকে যেন আরো প্রকট করে তোলে।

সময়ের দিক থেকে যখন কবি আর এক ধাপ পেছিয়ে যান সত্তা থেকে স্মৃতিতে তখনই সময়টাকে স্পষ্ট মোটা দাগে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে ওঠে। 'নকল গথিক', 'করিন্থী আয়ন ডোরীয় এবং 'কেলসনের ইংরেজী খেয়ালে' কবি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং বিদেশী সাহেবের সখ কিংবা আলালদের মনোহারী খামখেয়ালিপনাও কিছুটা চোখ সয়ে এসেছিল কারণ সেটা ছিল পরাধীনতার যুগ, বিদেশী শাসনও শোষণের কাল। এত অন্ধকারের মধ্যেও সুস্থতা খুঁজেছিল শচীশ, বিনয়, গোরা এবং স্বদেশী ছেলেরা। আত্মপরিচয়ে, আত্মসম্মানে এবং আত্মঅঙ্গীকারে তারা একফালি রোদের সন্ধান করেছিল।

এখানে এসে পাঠককে আবার ফিরে যেতে হয় প্রথম স্তবকে কারণ স্বাধীনতা পূর্ব নবীন প্রজন্ম এবং স্বাধীনতা উত্তর নবীন প্রজন্ম এখানে মেরুস্তরে দাঁড়িয়ে থাকে। এক দিকে রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে সুস্থ সমাজ ও স্বদেশের স্বপ্ন এবং সংগ্রাম, অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে জন্মে প্রবাসী হয়ে ওঠ। এই ভেদরেখা এতই স্পষ্ট এবং এতই জরুরী যে কবি তিন পংক্তির এক আলাদা স্তবকে এই দুইকাল এবং দুই প্রজন্মকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেন।

ঠিক পরের স্তবকে (আজ শুধু একদিকে···বিকার) কবির একান্ত নিজস্ব যন্ত্রণার প্রকাশ। যে নবীনদের প্রথম স্তবকে প্রশ্ন করেছিলেন এ উদাস বিষাদ তাদেরও চেনা কিনা তারা সরে গেছে দূরে। আজন্ম প্রবাসী নবীনদের স্বদেশীয় স্মৃতিই বিলাস আর একারণেই এ উদাস বিষাদ কবিকে একাই বহন করতে হয়। এ যন্ত্রণার কোন শরিক নেই, কোন সমব্যথী নেই। বিপদের মুখোমুখি কবি একা। এ যন্ত্রণা আরো তীব্র হয়ে ওঠে সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে। সময়ের এগিয়ে যাওয়া স্পষ্ট হয়েছে 'আঠারো' তলায় শব্দটির প্রয়োগে। পঞ্চম স্তবকে এটা ছিল 'ষোলো তলা / হয়তো পনেরো হতে পারে কে জানে সতেরো'। একটি তলা বেড়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার সঙ্গে 'উন্মাদ বিলাসী খেলা' আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। কবি রৌদ্র, বান, সূর্যের কাছে, নিত্যদিনের অপঘাত থেকে মুক্তি দিয়ে, চিরকালীন দগ্ধ দিনের আবেদন জানিয়েছেন।

পরের স্তবকে কবি এই সর্বগ্রাসী ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক ব্যবস্থাকে ঘৃণাও করতে পারেন না তার প্রাণহীন, বদ্ধ অস্তিত্বের কারণে। সাপ, বিছা, জোঁক ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে

পশুর চেয়েও নিম্নতর তার অস্তিত্বের কথা বলেন। কবির চোখে এই সামাজিক ব্যবস্থা মেরুদণ্ডহীন এবং ঘৃণারও অযোগ্য।

দশম স্তবকটির সুরু 'এই নরকে' দিয়ে। এই ঘৃণিত সামাজিক ব্যবস্থা জীবনকে কতখানি অথর্ব এবং পঙ্গু করে ফেলেছে এ ছবি তারই। তের পংক্তির এই স্তবকে শুধুমাত্র 'নেই' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আট বার। 'নয়' শব্দটি চারবার। 'দুঃস্বপ্ন' 'মড়ক', 'কান্না' 'আকাল' 'মৃত' শব্দগুলিও ব্যবহৃত হয়েছে একই স্তবকে। নঞর্থক শব্দের এই বহুল প্রয়োগ গোটা স্তবকটিতে এক অশরীরী আত্মার বেসুরো কান্নার মত শুনিয়েছে। কিন্তু স্তবকটির দ্বিতীয় পংক্তির 'মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই' এর প্রথম দুটি শব্দ কোথায় যেন একটু ক্ষীণ আশাকে জিইয়ে রাখে।

এই আশাহীনতা আরো বীভৎস রূপ নেয় ঠিক পরের স্তবকে যেখানে অভাব, মৃত্যু, অনাহার, অপঘাত সকাল বিকাল দোরে হানা দেয়, মাসে মাসে মারীর চড়ক আসে। অনুভূতিহীন অস্তিত্বে কিছু মানুষ অচেতন বা অর্ধচেতন বিকারে স্থূল এবং গৌণ শিকারে মত্ত হয়ে ঘোরে। ঠিক আগের স্তবকের নরকও আর নরক থাকে না। সেই নরকও পরিবর্তিত হয়ে যায় নরকের ব্যঙ্গচিত্রে।

পরের স্তবকের ছত্রে ছত্রে কবির অনুভূতিশীল জীবনের আকাঙ্খা তীব্র হয়ে ওঠে এই অতি-নরক থেকে মুক্তি পেতে। অষ্টম স্তবকের মত কবি এখানে শুধু পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হননি, শুধু পরিবর্তনের নিছক আবেদন রাখেননি, অনুভূতিকে জাগ্রত করার আবেদন জানিয়েছেন, যন্ত্রণার বানী দিতে বলেছেন মজ্জায় মজ্জায়। জীবনমৃত্যুর মধ্যে যে সীমারেখা প্রায় অস্পষ্ট কিংবা অদৃশ্য হয়ে গেছে তাকে স্বচ্ছ করে তুলতে চেয়েছেন কবি বৈশাখীর 'আন্দোলিত রবে'।

হঠাৎ-ই কবি ফিরে আসেন দুই নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে। একজন পুরুষ এবং অন্যজন নারী। দুজনেই বয়সের ঊষার সঙ্কটে দাঁড়িয়ে। রাজার ছেলে এবং রাজার মেয়ে বাস্তবকে মুখোমুখি দেখতে পায় কিংবা দেখতে বাধ্য হয়। আগের নবীন এবং বর্তমান 'বয়সের উষার সঙ্কট' যেন নতুন কোন সময়ের কথা বলে, এরা যেন প্রথম স্তবকের নবীনের পরবর্তী কোন প্রজন্ম। পারস্পরিক ভালবাসা এবং এক অভাবী ব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজার ছেলে মিছিলে নেমে আসে, রাজার মেয়ে হৃদয় মেলে ধর্মঘটে। অভাব এবং ভালবাসা—এ বিপরীত টানে ভালবাসারই জয় হয়। ভালবাসা তাদের মনে ঘৃণার জন্ম দেয় সে ঘৃণা সামাজিক ব্যবস্থার ওপর।

এদের ভালবাসা যেন কবিকে স্বপ্ন দেখায় নতুন কোন ভবিষ্যতের। মিছিল এবং ধর্মঘট আগের স্তবক থেকে পরিপূর্ণ বিকশিত হয় শ্রমের এবং শ্রমজীবীর সার্বিক

চেহারায়। তুরপুন, র‍্যাঁদা, তাঁত, ট্রাকটর—চলে আসে এক নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে। দিনের শেষে সেখানে ঘুমের দেশে স্নিগ্ধ অবসরে ডুবে যাওয়া যায়। এই ক্লান্তি শ্রমের, সৃষ্টির, এই ক্লান্তি স্বপ্নেরও। এই সৃষ্টি ও শ্রমের মধ্যে কোন সামাজিক পরজীবী নেই, নেই অস্তিত্ব কোন কুঁড়ে অর্থলোভী মুখ। এই শ্রম প্রকৃতির নিত্য কর্মকাণ্ডের মত স্বতস্ফূর্ত এবং প্রকৃতিরই সুরে, ছন্দে ও লয়ে যেন বাঁধা। চারপাশের অবিন্যস্ত ভবঘুরে সমাজ জীবনের মুক্তি শুধু শ্রমের মধ্যেই, পরজীবীর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার ভেতরেই।

কিন্তু এ সবই স্বপ্ন, এক কঠিন, কঠোর, নির্মম, অমানবিক ব্যবস্থার, সামাজিক বন্দোবস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক সুদূরের পিয়াস মাত্র। আর একারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত গল্প দিয়ে হাজির করেন কবি আমাদের সেই বিবাহ নাটকে যেখানে সবাই হাজির, সবকিছু প্রস্তুত—শুধু বর নেই।

রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য রূপককে ব্যবহার করেন বিষ্ণু দে সামাজিক অবস্থা বা ব্যবস্থাকে তুলে ধরতে। একটি সাজানো গোছানো ব্যবস্থার জন্য যা দরকার ঠিক সবই হাজির। সুন্দর, ছিমছাম বাইরে থেকে কিন্তু অন্তরে, দেহমনে কোন এক গভীর অসুখের শিকার।

শুধু মাত্র বর নেই। সে খুঁজে চলে আপন সত্তা। এবং সে সত্তা ব্যক্তির ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষায় বন্দী নয়, সে সত্তা দশের দর্শনে শ্রদ্ধা। রোদ, জল, গাছ, শেকড়—প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দে তার সত্তার যোগসূত্র গড়ে ওঠে। সেই সত্তার সন্ধানে বর নিখোঁজ। সে খুঁজে ফেরে সেই পরশপাথরের যা তাকে প্রকৃতির কাছে আপন করে তুলবে, যা তাকে বিশ্বের নিজস্ব ছন্দে দোলা দেবে, যা তার ব্যক্তিসত্তাকে দশের সত্তার সঙ্গে এক গভীর আত্মিক টানে যুক্ত করবে। আর আমাদের এই সত্তা কোথায় নিরুদ্দেশ।

সত্তা ছিল ('অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী') কিন্তু আজ নেই ('দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয় শীতলা মাতা দেশ/ছিন্নভিন্ন')। আর এই সত্তার খোঁজেই কবির ভৌগোলিক সীমারেখা বিস্তৃত হয়ে যায় সংকীর্ণ কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ বাংলা দেশে। ('বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস')। কবির চেতনায় নগর সভ্যতার প্রতি নিছক কোন কীট্‌সিয় বিরাগ নেই, নেই কোন রাবীন্দ্রিক প্রকৃতি প্রেমের আধিক্য। কলকাতার যে সত্তাহীনতা দিয়ে কবি সুরু করেছিলেন তা সমস্ত বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত।

ঐ একই সত্তার সন্ধানে, তার সামগ্রিক মানব অস্তিত্বের উৎসের খোঁজে কবি নিজেকে আদিম সমাজ ও কাল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এখানেই স্মৃতি তার সম্পূর্ণ

ব্যাপ্তি পেয়ে যায়—ঐতিহাসিক সময়ের পথ ধরে, অন্য এক পথরেখায় কবি নিজেকে থামিয়ে দেন মানব সভ্যতার আদি বিকাশের স্থানিক অবস্থানে। আর এখানেই দার্শনিক কিংবা ধর্মীয় অতীত থেকে কবির অতীত আলাদা হয়ে যায়। আর এখানেই কবির 'স্মৃতি'—নির্দিষ্ট সময় কাল মানব সভ্যতার উৎস থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যান্ত একটি বিশেষ চৌহদ্দির মধ্যে চলে আসে।

তবে শুধু সত্তার অনুপস্থিতি নয়, সত্তার ব্যথাও জন্ম দেয় অন্য এক সঙ্কটের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন যে নাৎসী সত্তা যে জার্মানিকে হাজার হাজার মানুষের আত্মযন্ত্রণার কারণ করেছিল সেও সত্তার এক বিকৃত অভিব্যক্তি কিন্তু সেই যুদ্ধদামামার সঙ্গে সঙ্গে এক করুণ আত্মার স্বরও হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল। রিলকে বেঠোফেনের কিংবা হোয়লডেরলিন বা নীটসে বা হুবাখনার গেয়ে উঠেছিলেন কবিতার ছন্দে কিংবা গানের সুরে কিংবা অনুভূতির অন্যান্য বিকাশ মাধ্যমে সেই ব্যথিত সত্তারই জয়গান, বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কলুষতার হাত থেকে চৈতন্যের আকাশকে।

এই সত্তারই আর এক বিকৃত রূপে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তৃত করে। কিন্তু এরই পাশাপাশি আর এক সত্তা দাবী করে মুক্তির, যে মুক্তির আকুলতা মুকুলিত হয়েছে ব্যক্তির হৃদয়ে দেশে দেশে, দশের মধ্যে।

কিন্তু বিদেশী এই সংকট আমাদের দেশে শুধু সত্তার নয় সামগ্রিক অস্তিত্বের সংকট এনেছে। বিলেতি দুর্গতির চেহারা অন্য যেহেতু সামাজিক বিকাশের নানাস্তরকে সে অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে পেরেছে কিন্তু আমাদের সংকট আরো তীব্র।

আমাদের এই পাপপুণ্যহীন দেশে অনুভূতির মধ্যে অনুভব এতই সংকটের মুখোমুখি যে নরকের মধ্যে থেকেও এ যে নরক এই অনুভবটাও তৈরী হয় না। তৈরী হয় না বলেই মিছিলের সঙ্গী রাজার ছেলে এবং ধর্মঘটের অংশীদার রাজার মেয়েকেও চেনা হয়ে ওঠে না। তাদের স্বাগত জানানোর, তাদের বরকনে হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর মানুষও তাই চোখে পড়ে না। প্রাণ তার অভ্যস্ত ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না আর পারে না বলেই মিছিল কিংবা ধর্মঘটের আত্মপরিচয়ে চিহ্নিত সত্তাময় মানুষের কাছে যেতে পারে না। অথবা নিজেই খুঁজে নিতে পারে না জনপদে এবং জনরোষে এক নতুন সভ্যতাকে ঐ ছেলে এবং ঐ মেয়েটির সৃষ্টিশীল ভালবাসাকে রসদ করে।

ঠিক এভাবেই বিষ্ণু দে আমাদের প্রচলিত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎকে বদলে

নেন, তাদের ক্রিয়াশীল ও সাম্প্রতিক করে তোলেন। আর এ কারণেই তাঁর স্মৃতি অতীতের মত পুরনো হয়ে ওঠে না, তা বিস্তৃত হয়ে যায় সমকালীন অস্তিত্ব পর্যন্ত। ভবিষ্যতও এভাবেই যুক্ত হয় সমকালীন সত্তায়। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক একান্ত ব্যক্তিগত নিরিখে কবি কালকে জরিপ করেননি বলেই তাঁর স্মৃতি অতীত না হয়ে থেকে যায় বর্তমান-অতীত হিসেবে এবং ভবিষ্যত হয়ে ওঠে বর্তমান-ভবিষ্যত কিংবা বর্তমান অতীত এবং বর্তমান-ভবিষ্যত থেকে যায় সমকালে সত্তা-অতীত এবং সত্তা-ভবিষ্যত হিসেবে।

আর ঠিক এ ভাবেই 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পেয়ে যায় সমকালীন সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কিংবা সমগ্র ভারতীয় মানবসত্তার সবচেয়ে নিটোল আকার। সমকালীন ভারতীয় সভ্যতা এবং সমাজ সংকটের এর চেয়ে মূল্যবান কোন মহাকাব্যিক দলিল আপাততঃ আমাদের হাতে নেই।

সুজিত সরকার

বিষ্ণু দে-র একটি কবিতা

গান

ওরকম আমারও ঘটেছে,
যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর,
আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়,
আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ ;
তখন মুহূর্তে ধুয়ে যায় অসমাপ্ত বর্তমান সমস্ত জঞ্জাল।
একবার মনে আছে একটি টপপার মধ্যে
উদ্‌ভাসিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমালয়
প্রাচীন বিশাল ভারতবর্ষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ আকাশ
মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে
আজীবন দীর্ঘ পরবাস—
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা, ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
সে থেকে একা একা, ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।

গানের বাস্তবে মাঝে-মাঝে এরকম ঘটে,
মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া শোনা কথা
দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে

কী দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,
গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে,
কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার,
বাইশে বা অন্য কোনো দিন হয়তো বা দোসরা শ্রাবণে
আকাশ যেমন মাতে অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে, তেমনি ধরণে।
আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জলদর্চি শিখা
বিশুদ্ধ স্মৃতির তীব্র প্রখর সংবিৎ,
সবকিছু অবান্তর কথা চিন্তা ধুয়ে গেল,
আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার—
কথা কও কথা কও অনাদি অতীত :
তুমি আর তুমি আর তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা
ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি ?
যা কিছু এখন নেই অতীতে বা ভাবীকালে সবই শুধু ছবি ?

এরকম আমাদের অনেকেরই ঘটে।
দুঃখের বিষয় ঘটনাটি প্রায়ই আমরা ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের ট্রাফিকে।
দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদীঘিতে এসপ্লানেডে,
মন চাই স্নানে কাজে আপিসে বাজারে চলে মিলে
দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তুহারা শেডে।

শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ নাকি অভিযোগ ক'রেছিলেন, বিষ্ণু দে-র কবিতা তিনি বুঝতে পারেন না। উল্লিখিত কবিতাটিকে কিন্তু এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবেনা। খুবই সহজ, সরল এই কবিতা। সর্বস্তরের পাঠকের কাছেই এর অর্থ বোধগম্য হবে।

শুধুমাত্র 'জলদর্চি শিখা' শব্দটির জন্য হয়তো কেউ কেউ অভিধানের সাহায্য নেবেন। 'জলদ' শব্দটির অর্থ 'মেঘ', 'অর্চি' শব্দটির অর্থ শিখা অথবা আলোকরশ্মি অথবা দীপ্তি। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের উত্তরণ ঘটে বর্তমানের ক্লেদ ও কালিমা থেকে এক স্বর্গীয় চিরসুন্দরের জগতে। গায়ক, শ্রোতা, গান, সুর, কথা—সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু এই অপার্থিব অভিজ্ঞতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির, কোলাহলসর্বস্ব নাগরিকতায় সেই একীভূত অভিজ্ঞতার অকালমৃত্যু ঘটে। যেহেতু বেসুরো জীবনে একমাত্র সঙ্গীতই আনতে পারে সুবিন্যাস ও সুসাম্য, সেহেতু গান আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যক, কবিতাটির মূল বিষয় এইটুকুই।

বিষ্ণু দে-র এলিয়ট প্রীতি আজ সর্বজন বিদিত। এলিয়টের অসংখ্য কবিতা তিনি শুধু অনুবাদই করেননি, এলিয়টের প্রভাব তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের সূচনাপর্ব থেকে সমাপ্তিপর্ব পর্যন্ত সুগভীর ছিল। আমি ভুলিনি, হপ্‌কিন্‌সের Send my roots rain' বিষ্ণু দে-র স্বরচিত কবিতায় হয়ে ওঠে একটি লাইন : 'জল দাও আমার শিকড়ে' কিংবা হপ্‌কিন্‌সের কবিতার আঙ্গিকেই বিষ্ণু দে রচনা করেন 'ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার', ভুলিনি ডে-ল্যুইসের 'For me there is no dismay/Though ills enough impend' বিষ্ণু দে-র কবিতায় হয়ে ওঠে 'আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই, / অথচ ডালে-ডালে শুকনো হাহাকার' অথবা পাউণ্ডের 'As cool as the pale wet leaves/ of lily-of-the valley / she lay beside me in the dawn' হয়ে ওঠে 'এই তবে ভোরবেলা! / হে ভূমিশায়িনী শিউলি', ভুলিনি এলুয়ার, লোরকা, আরাগঁ, নেরুদার প্রভাবও বিষ্ণু দে র কবিতায় কখনো কখনো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তবু বলবো এলিয়টই বিষ্ণু দে-র প্রথম ও প্রধান প্রেম। এরই ফলে, এলিয়টের দান্তে-প্রীতি বিষ্ণু দে-কে দান্তের রচনার প্রতি উৎসাহী ক'রে তোলে ; এলিয়ট রচনা করেন ড্রাইডেনের ওপর প্রবন্ধ, বিষ্ণু দে-ও রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওপর প্রবন্ধ ; এমনকি, এলিয়টের কাব্যভাবনা হয়ে ওঠে যেন বিষ্ণু দে-রই নিজস্ব কাব্যভাবনা। আলোচ্য কবিতার প্রথম চারটি লাইন ('ওরকম আমারও ঘটেছে, / যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা করে ওঠে গান কথা সুর, / আর শ্রোতা হয়ে যায় অথবা সে গানের বিষয়, / আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ') পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে প'ড়ে যাবে এলিয়টের এই লাইনগুলি : 'music heard so deeply / that it is not heard at all, bnu yot are the music / while the music lasts।' 'জন্মাষ্টমী' কবিতার 'তাহ'লে বিদায় বলি' এলিয়টের সুবিখ্যাত 'প্রুফ্রোক' কবিতার প্রথম লাইনের হুবহু বঙ্গানুবাদ : 'Let us go then, you and I'।

বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন কবিতায় গানের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে। সঙ্গীত প্রেমিক বিষ্ণু দে-র কাছে সঙ্গীত সংগতিরই নামান্তর। সঙ্গীত সবাইকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। মনে পড়ছে 'হেমন্ত' কবিতাটির কথা, সেখানে তাঁকে বলতে শুনি :

'এ-আকাশ মহাসভা পৃথিবীর কত না রঙের
শত শত বর্ণাভাসে এ যেন-বা অর্কেস্ট্রা বিরাট !
একত্র, সবাই এক সংগীতের সংঘে বদ্ধ,
তন্ময়, মননে এক'।

নির্বাচিত কবিতাটির শেষাংশে সেই একই বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। 'দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে' এবং 'শেয়ালদার বাস্তহারা শেডে' গান চাই, কারণ গানের মাধ্যমেই বিভিন্ন মতের বিভিন্ন পথের মানুষেরা একত্রে মিলিত হয়ে সম্মিলিত মানবজাতি গ'ড়ে তুলতে পারে। বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত কবিতা 'ওফেলিয়া'র মধ্যেও গানের প্রসঙ্গ এসেছে :

'সুরের স্রোত ব'য়ে চলেছে মাতাল অভিযানে—
স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ।
জীবনে সে কি পেয়েছে যতি ? শান্তি তার গানে।
আমার মন ভোলালে, ওফেলিয়া !'

পাঠককে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'ছত্তিশগড়ী গান', উরাওঁ গান', 'যেমন সংগীত পায়', 'আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের লাইন, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ বিষ্ণু দে-র অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কবিজীবনের সূচনাপর্বেও ছিল, পরিণত পর্বেও রয়েছে। তবে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পার্থক্য রয়েছে সূচনায় ও সমাপ্তিতে। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের রচনার উল্লেখ ব্যঙ্গাত্মক কারণে। কিন্তু পরবর্তী কালে বিষ্ণু দে মুখর হয়ে ওঠেন রবীন্দ্র বন্দনায়। প্রথম জীবনের রচনা 'বেকার বিহঙ্গের অন্তিম স্তবক :

'তার পরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা,
রেডিও-সচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নব-আশা-
তবু হে কুমার, খেলো না শকুনি-পাশা !
ইতিহ-ভাগ্য ছড়াক-না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ু পাখা ॥'

অথবা, 'শিখণ্ডীর গান' কবিতার কয়েকটি লাইন :

'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসি
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ !
মর্মিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি,
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ !'

কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠেছেন বিষ্ণু দে-র নিশ্চিন্ত আশ্রয়, নানাবিধ চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু :

'প্রাত্যহিক ফল্গু স্রোতে লাখে-লাখে হাজারে-হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দ ভৈরবী ॥'

আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট কবিতাটি তো প্রায় পুরোপুরি রবীন্দ্রনির্ভর। কবিতাটির উৎস রবীন্দ্রনাথ, বিষয় রবীন্দ্রনাথ, এমনকি দেশও এখানে রবীন্দ্রনাথের সমার্থক শব্দ:

'সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা, ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাস ভূমি এই পরবাস দেশ।'

রবীন্দ্র প্রীতির পাশাপাশি স্বদেশপ্রীতিও বিষ্ণু দে-র কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এই স্বদেশ প্রীতির পেছনে আরাগঁর পরোক্ষ প্রভাব তাঁর জীবনে কাজ করেছে ব'লে মনে হয়।

'আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জলদর্চি শিখা'

বিষ্ণু দে-র কবিতায় জল প্রতীকী তাৎপর্যে মূল্যবান। 'জল দাও' কবিতার শেষ পংক্তি 'জল দাও আমার শিকড়ে।' জল নবজীবনের উজ্জীবনের প্রতীক। আমাদের মনে প'ড়ে যাবে এলিয়টের প্রধানতম কবিতা 'ওয়েস্টল্যাণ্ডে'র কথা, যার শেষাংশে রয়েছে বজ্র ও মেঘের সংকেত। আসন্ন বারিধারায় শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে মানুষ, ঘটবে নবজাগরণ। বিষ্ণু দে-র কবিতায় বারবার বৃষ্টি নেমে আসে :

'তারপরে বৃষ্টি এল, মাটিতে সুগন্ধে, মনে দীর্ঘ অপেক্ষায়।'

ছবিরও উল্লেখ রয়েছে এই কবিতায়, যদিও ছবির প্রসঙ্গ এসেছে রবীন্দ্র কবিতার সূত্রে। গানের মতোই, চিত্রকলাও বিষ্ণু দে-র অত্যন্ত প্রিয়। চিত্রকর যামিনী রায়ের

সঙ্গে তাঁর আজীবন প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের কথা অনেকেই জানেন। বিদেশী চিত্রকরদের নামও তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

'একাই লাজুক শিল্পী সেজান্ এঁকেছেন শতাধিক
যেন বা শৈব কেলাসিত প্রিয় পাহাড়—'

অথবা,

'হিরণার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে
সবুজে ও লালে লাল।
বুরুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।'

ধূলি ধূসরিত নগরজীবনের অর্থহীন কোলাহল, অন্তঃসারশূন্যতা, এলিয়টের মতো বিষ্ণু দে-র কবিতারও বিষয়:

'দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে।'

এস্প্লানেডে, লাল দীঘি, শেয়ালদার উল্লেখ কবিতাটিকে অনিবার্য ভাবে নগরকেন্দ্রিক ক'রে তুলেছে।

'আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার'—

এখানে, নৈর্ব্যক্তিক শব্দটির ব্যবহার এলিয়টের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমরা জানি, এলিয়ট তাঁর কাব্যভাবনার কথা বলতে গিয়ে এই শব্দটির ওপরই সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ ক'রেছেন। এলিয়ট মনে করতেন, কবিতার প্রধান শর্ত নৈর্ব্যক্তিকতা ('an escape from personality')।

যে একীভূত চেতনার কথা বিষ্ণু দে বারবার বলেন, বোঝাতে চান, তারই কারণে তাঁর কবিতায় আসে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ, 'অর্ধনারীশ্বর' শব্দটির ব্যবহার সেই একই একীভূত চেতনার কারণে।

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতাটি একটি বিশেষ কারণে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় যেসব প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসে, তার অনেকগুলিই এই কবিতায় উপস্থিত: গান, রবীন্দ্র নাথ, দেশ, জল, নৈব্যক্তিকতা, ছবি ও নগরজীবন। সেদিক থেকে এই বিশেষ কবিতাটি বিষ্ণু দের সমগ্র কবিতাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান কবিতা।

সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়ন : বিষ্ণু দে-র 'নান্নুরে'

জাদুঘরে পরিষদে তর্ক চলে ছাতনা বা নান্নুরে
কোথায় চণ্ডীর পীঠ বা কোন চণ্ডীদাস !
বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে খেতাবে—
আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের অকাল দুপুরে,
পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কাহ্নুরে
প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ।

দেখছি গড়খাই-পারে দীঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী তাকিয়ে ভাস্বর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর।
এদিকে কাঁপন লাগে পাপড়ির আঙুলে সুরে সুরে,
প্রেমের ফাঁসিতে খুলে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে ॥ (রচনাকাল ১০।৮।৫৯)

বারো ছত্রের কবিতাটি পরিষ্কার দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ছত্র থেকে ষষ্ঠ ছত্রে ব্যঙ্গ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, বাসলী না বাশুলী কোন চণ্ডীর সেবক চণ্ডীদাস এবং তাই নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অসফল বিতর্ক, আষাঢ়ের সন্ধ্যায় বৈশাখের অকাল দুপুরে মিশে যাওয়ার বৈপরীত্য। আসলে চণ্ডীদাসের যে প্রবাদময় পদাবলী তা-ই ক্রন্দনময়, রাধা তার আপন কাহ্নুকে ভুলে যাচ্ছে, প্রেম ভয় দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। কবিতাটির স্বর পাল্টে যাচ্ছে দ্বিতীয় অংশে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ ছত্রে এখানে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নেই, কবিতাটি গঠনমূলক হয়ে উঠেছে এবং মুখ্য বার্তাটির সঙ্গেও সংযোগ সাধিত হচ্ছে। প্রবাদ-প্রবচন-কিংবদন্তীর চণ্ডীদাস আর তার উপরে সন্নিবিষ্ট কবির জাগ্রত রোমন্থিত স্মৃতি, বহুকালের ধরে রাখা সাংস্কৃতিক স্মৃতি যে সব বিবরণে কবিপুরুষটি জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাঁর কীর্তনের নক্ষত্রময় আখর শোনা যায় মেঘে, মৃদঙ্গ সহযোগে গীত গানে। এই গানে পাপড়ির আঙুলের স্পন্দতায় সুর ধরে, সুর আকাশ ও পৃথিবীতে

ছড়িয়ে পড়ে, চণ্ডীদাসের সুর ও স্বর। কিংবদন্তীর বাওবাব গাছটিতে প্রেমের ফাঁসিতে ফুল ফুটে ওঠে। পদাবলীর মতই আপাত সরল এই কবিতায় রয়েছে কবিতা-অতিরিক্ত-আকরণের (Structure) জটিলতা যা এক গভীরতায় নিয়ে যায়, সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক এক ভাষণ (Discourse) উঠে আসে। পদাবলীর ভাষিক স্তর নয়, পদাবলীর শব্দ ও ভাবের স্তর রয়েছে কবির ভাষিক স্তরের ওপরে, প্রেমের ছেদ নয় ফাঁসি, অক্ষর নয় আখর যার একটি অর্থ কীর্তনে সংযোজিত ব্যাখ্যামূলক ছোট ছোট বাক্য।

আসলে এই কবি বা পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস ঠিক কোথায় জন্মেছিলেন এটা কবিতার পক্ষে বড় কোনো বিবৃতি নয়, একজন চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন (অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ মনে করেন চণ্ডীদাস চারজন ছিলেন—বড়ু, দ্বিজ, দীন এবং সহজিয়া) এটাই ঘটনা। এই চণ্ডীদাস পদাবলীর যে পদাবলী কীর্তনে মধ্যযুগের বাংলা ছিল মুখর। কবিতাটিতে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত কতগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে 'গড়খাই-পারে দীঘি', 'ধোবানী পাথর', 'বিশালাক্ষী' ইত্যাদি, কবিতার যে ব্যাখ্যা বা অর্থভেদের চেষ্টা এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। সমকালীন এক কবি কীভাবে দেখেছিলেন মধ্যযুগের এক মহান কবিকে এবং কী ভাবে চণ্ডীদাসের বয়ান বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রবিষ্ট হয়ে আন্তর্বয়ান (Intertextual) সম্পর্ক স্থাপন করল সে সম্পর্কে কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করার চেষ্টা করব।

য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বিষ্ণু দে, বাংলার নিজস্ব সাহিত্যের ধারা যা বিশেষ ভাবেই লোকায়ত, তার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করে গেছেন তাঁর কবিতায় এবং বিভিন্ন সময়ে লেখা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি বিষ্ণু দে-র এই দিকটিই উত্তর-আধুনিক তরুণ কবিদের কাছে বিশেষ আকর্ষক। কী ভাবে দেখেছেন বিষ্ণু দে (দ্বিজ ?) চণ্ডীদাসকে ? 'লৌকিক ধারার শক্তি' এই তত্ত্বটিই বিষ্ণু দে-কে আকৃষ্ট করেছিল। আরেকটি কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন 'দেশজরীতির সুস্থ মনোবিন্যাস'। "কিন্তু বাক্য বিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা। কোনো কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা অবশ্য স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও রুচির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব। তার জন্য চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা ঐতিহ্যের কবিরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)। "বৈষ্ণব কবিদের মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের

আবেদনে, সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্‌ভেনশন্‌সের চর্চায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্ম বাস্তবিকতার তীব্রতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসের মধ্যে চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে, যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)।" এধরণের কয়েকটি ছত্র—

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।"

(বৈষ্ণব পদাবলী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পদ সংখ্যা ৮০)

চণ্ডীদাসের এই বয়ান (Text) বিষ্ণু দে-র বয়ানে এসে মেলে এই ভাবে

"প্রেমের ফাঁসিতে খুলে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে" লক্ষণীয় যে চণ্ডীদাসের বয়ান বিষ্ণু দে আত্তীকরণ করেছিলেন, দুটি কবিতার আধেয় এবং প্রসঙ্গ এবং ভাষাবিন্যাস ভিন্ন কিন্তু লোকায়ত যে শক্তির স্বরন্যাস চণ্ডীদাসে ছিল বিষ্ণু দে-ও সেই স্বরন্যাসকে নিজের মতো করে খুঁজে পান। পাঠক, হয়ত আপনার কাছে 'লোকায়ত সুর, স্বরন্যাস' এ স্বল্প পরিসরে পরিষ্কার হবে না, আমি ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের ব্যাখ্যার সাহায্য নিলাম, "বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের খাঁটিত্ব ভাবের দিক হইতে বাঙালী জীবনের মর্মে প্রবেশ—প্রকাশের দিক হইতে বাঙালীর সত্যকার মনের কথা এবং মুখের কথায় বাঙালীর মর্মে প্রকাশে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, বাঙালীর পল্লী জীবন-যাত্রা—সেই বিশেষ জীবনযাত্রার ভিতর হইতে উৎসারিত প্রেম-বাঙলাদেশের নারীর প্রাণ তাহারই একটি জীবন্ত প্রতীক হইল চণ্ডীদাসের রাধা। এই রাধাকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা—ইহার প্রত্যেকের ভিতরই সহজ বাঙালী জীবনের একটি অকৃত্রিম আভাস রহিয়াছে। এই কারণেই পল্লী-গাথাগুলির ভিতর দিয়া যে প্রেম-চিত্রগুলি দেখিতে পাইলাম, সেখানকার ভাব, সুর কথা—সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতে পাইতেছি চণ্ডীদাসের।···বাংলাদেশের বিচিত্র প্রেম—সেই প্রেমকে প্রকাশ করিবার বাঙালীর যে নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গি—তাহাকে অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক পদ একত্রে সমাবিষ্ট হইয়া বাঙালীর খাঁটি চণ্ডীদাসের কবি পুরুষটিকে যেন গড়িয়া তুলিয়াছে।··· আমাদের রাধা-প্রেম প্রাকৃত কোনস্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্যমূর্তিতে উদ্ভাসিত" (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ ৩৫২-৩)।

এই রাধাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় "পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কাহ্নুরে।"

কোন পল্লী সাহিত্যের কথা শশিভূষণবাবু উল্লেখ করেছেন— ?

"না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম।" (ধোপার পাট)

এই স্বরন্যাস চণ্ডীদাসে আসে

"তোমার চরণে বধূ শতেক পরনাম।
তোমার চরণে বধূ লিখ আমার নাম।"

এমনি করেই সমাজ-সংস্কৃতি থেকে উঠে আসে কাব্যিক বয়ান-সম্মত সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয় যেভাবে দেশী সঙ্গীত হয়ে ওঠে মার্গ। লোকধর্ম সম্মত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক বয়ানগুলিতে এই যাতায়াতের, গ্রহণ আত্তীকরণের চক্রটি বজায় থাকে, কালের সীমাকে ভেঙে সমসাময়িক কালেও মূর্ত হয়। চণ্ডীদাসের লোকায়ত স্বরন্যাস।

"শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও দুটি রাঙা পায়॥" আনুমানিক তিনশ বছরের ব্যবধানে ভিন্ন বর্গ এবং ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের কবি দ্বিজ হরিদেব-এ উঠে আসে এই ভাবে—

"শীতলা চরণ লইয়া শরণ
কবিতা রচিল হরি"

(শীতলা মঙ্গল, সাহিত্য প্রবেশিকা ৪র্থ খণ্ড, আনুমানিক রচনাকাল ১৭০০-১৭৩০)

চণ্ডীদাসের পদাবলীর বয়ান কী ভাবে চলে আসে শীতলা-উপাসক কবির বয়ানে ? লোকাশ্রিত স্বরই চণ্ডীদাসের মূল স্বর আর লোক দেবী শীতলা, শীতলা মঙ্গলের কবিও ভাষা খুঁজে পান সমকালীন লোকায়ত স্বরে। সংস্কৃতির একটি অর্থ বহুযুগের সংরক্ষিত সমষ্টিগত স্মৃতি। সেই সংরক্ষিত সমষ্টিগত স্মৃতিতে চণ্ডীদাসের পদাবলী ধরা আছে, চলে আসছে শীতলামঙ্গলে অন্যান্য লোককাব্যে। "লোকমানসের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু গ্রাম্যতা বা স্থূলতা ভাবলে ভুল হবে। এ মানস জীবনধর্মী, জীবন-ভোগী, প্রত্যক্ষবোদ্ধা মন, যা জনসভ্যতারই প্রাণময় লক্ষণ। এ এক জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গী, প্রাত্যহিককে স্বীকারের দর্পণ, তাই এতে পাই হাসিকান্নার মধ্যে এক বাস্তববিলাসের কর্মঠতা, সময়ে সময়ে অপরাজেয় জীবনশক্তির হাস্যোজ্জ্বল আভাস। এতে বিরুদ্ধে মেলে মানিয়ে নেওয়ার স্বাস্থ্যে, দেবদেবী হয়ে ওঠে ঘরোয়া মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে বিস্ময়কর" (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)। লোকসাহিত্য বিস্ময়করভাবে ধর্মীয়

সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ছিল ; তাই হিন্দু কবি পীরের গান লেখেন আর মুসলমান কবি লেখেন বৈষ্ণব পদাবলী।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র আন্তর্বয়ান সম্পর্ক আরো কয়েকটি কবিতায় স্থাপিত হয়েছে—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরান কাঁদে॥"—চণ্ডীদাস, পদসংখ্যা ৩১

"কিংবা যেন বধুঁয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীর দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতার"

—বিষ্ণু দে, "চৈতে বৈশাখে", 'সন্দীপের চর' ১৯৪৪-৪৭

এই কবিতাটিতেই সরাসরি চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ আছে

"ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গনে"

বিষ্ণু দে মেলাতে পারেন চণ্ডীদাস আর হপ্‌কিন্সের 'Send My Roots Rain' কে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতাটিকে—

"অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায়-শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।"

'একমুঠো', ১৩৪৬ (১৯৩৯)।

'চৈতে বৈশাখে' বা 'বৃষ্টি' কবিতা দুটির মধ্যে আবেগগত সাদৃশ্য থাকলেও দুই কবির কথন, প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আলাদা। অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি'-তেও ঠিক প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, গভীরে রয়েছে পদাবলীর সহজিয়া সুর। আর সমকালীন দুই দিকপাল কবির মধ্যে রয়েছে আন্তর্বয়ান সম্পর্ক।

বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর ইতিহাস ও সমাজ-মনস্কতার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই কবিতাটি, যেখানে আবার বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দ ও বর্গ (Genre জঁর) মিশে যাচ্ছে—

"স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে !
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে
বৃথাই দাঁড়ালে !
দন্তুর হাসি ছটা বিম্বাধারে বৃথা, বৃথা কামধেনুভুরু।
শ্রেণীভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী ! প্রসাদ বিতরে"

বিষ্ণু দে-র সমকালীন আরেক কবি জীবনানন্দ দাশও চণ্ডীদাসকে তাঁর কবিতায় এনেছন, ভাষায় বর্গে আন্তর্বয়ানে নয়, বাংলার লোকায়ত রূপটি জীবনানন্দের মানসে গভীর ভাবে গেঁথে ছিল

"কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার,
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।"
'দেশবন্ধু ১৩২৬-১৩৩২-এর স্মরণে', রূপসী বাঙলা।

বিষ্ণু দে-র 'নান্নুরে' কবিতায় সাংস্কৃতিক আন্তর্বয়ন সম্পর্কে আলোচনায় জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ এঁরা তিনজনেই বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত ধারা—সাংস্কৃতিক বয়ান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে যা প্রতি-স্বচলন (DEAUTOMATION) জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তা স্বচলন। জীবনানন্দের কথনে এই সমস্ত সুর ও স্বর আত্মস্থ হয়ে যায় যেখানে বিষ্ণু দে-র সংশ্লেষণ চলে মেধা ও পঠনপাঠনের সহযোগে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু দে-র মধ্যে পেয়েছিলেন, "তার বক্রোক্তি, যার প্রকৃতিই হল দ্বৈত সম্বন্ধে আত্মবোধের জয় ঘোষণা। তবু আমি বলতে বাধ্য যে বিষ্ণুর ব্যাক্তিত্ব প্রধানত আত্মসচেতন হলেও আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্লেষণ বুদ্ধি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে (রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৭)।

বাংলাদেশের ইতিহাস-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভূমিকাটি বিশাল। এক দিকে লোকায়ত সাহিত্য অন্যদিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত-মৈথিলী সাহিত্য—

প্রথম থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীতে এই দেশী আর মার্গের সংশ্লেষণ চলেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবেরও খুবই প্রিয় ছিল—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য/১০ম

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ"—জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল

পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাসের অসংখ্য বন্দনা পাওয়া যাবে—

'কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি
ভাবুকে ভাবুকমণি।
....
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে
উভয় অধীন যেন।
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল
প্রসাদগুণে ভরা ॥—কানুদাস

মধ্যযুগের কবি কানুদাস চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে সার কথা বলে দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী পরবর্তী সমস্ত পদকর্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। অনেক কবিই চণ্ডীদাস নামটি গ্রহণ করেছেন, সহজিয়া সম্প্রদায়ও তাঁদের চণ্ডীদাসকে পেয়েছিলেন, বৈষ্ণব সহজিয়া নিবন্ধকার হিসেবে 'চইতরূপা প্রাপ্তি' একজন চণ্ডীদাস (**চণ্ডিদাস**)-এর পুঁথি পাওয়া গেছে। কয়েকটি উপাদানের জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী এত ছড়িয়ে পড়েছে : (১) কাব্যগুণ (২) লোকায়ত সুর (৩) প্রেম (৪) সামাজিক ভাষ্য (৫) পূর্ববর্তী সংস্কৃত-প্রাকৃত মৈথিলী পদাবলী জাতীয় কাব্যের সঙ্গে সংশ্লেষণ (৬) ধর্মীয় মৌলবাদের উর্দ্ধে-চলে যাওয়া (৭) আপাত সারল্য।

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন বলে কথিত আছে, তাঁর সঙ্গে রজকিনীর প্রেম ব্রাহ্মণ্যধর্মে অসামাজিক হলেও বৈষ্ণব এবং পরবর্তী সহজিয়াদের উদার ধর্মীয় মতবাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল, অন্তত সাহিত্যে ধর্মীয় বৈষ্ণব নেতা এবং পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অব্রাহ্মণ এমন কী অন্ত্যজ শ্রেণীর এবং মুসলমানও। ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বৈষ্ণব মতবাদ অনেকটা লোকধর্মের মত হয়ে গিয়েছিল, সীমিত একশ্রেণীর মধ্যেই ষড়গোস্বামীর রক্ষণশীল মতবাদ সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মতবাদের সঙ্গে সুফি মতবাদের—দুই উদারপন্থী আউল-বাউল-সাঁই-মুর্শেদী সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরন্যাস (INTONATION) এবং

ভাষণ (DISCOURSE) পাওয়া যাবে, যেমন পাওয়া যাবে মঙ্গলকাব্য গুলিতেও।

"বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান। অবধৌত সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতিয়ে যবন। যুগ যুগ হই তার দাসীর নন্দন॥
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা করে উপহাস। গোলোকে রাখিয়া তার নরক নিবাস।

* *

মেখলা কিঙ্কিনী তায় সোনার নপুর পায়
পারিজাত মাল্য পরিধান॥
বাজুবন্ধ পরিসর শোভা করে কলেবর
দশ চাঁদ কান্দে রাঙা পায়।"

—রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' (আনুমানিক রচনাকাল ১৬৬০-৫৫)

"সৈয়দ মর্তুজা ভনে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি॥
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে
ভীষণ মরণ ভরি॥

—(পদ সংখ্যা ৭০, 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য)

* *

"মা বাশুলীর পূর্ণ কৃপায় / যেমন দ্বিজ চণ্ডীদাস,/ অপূর্ণ সম্পূর্ণ প্রেমে /
মিটলো প্রেমের আশ ; / প্রেমের রামী হয় গুরু, / কল্পতরু, /
প্রেম-ভাণ্ডার দেয় খুলে।"

—পদ সংখ্যা ৪৬৬, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৩৬৪।

এভাবেই চণ্ডীদাসের বার্তা, পদাবলীর বয়ান প্রাক্-ইংরাজ সমস্ত সম্প্রদায়ের বাংলা সাহিত্যে, লোকমনে ছড়িয়ে পড়ে। চণ্ডীদাস বাঙালির স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকেন।

ইংরাজ অধিকার পরবর্তী যুগেও বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যে বেঁচে ছিল, কবিওয়ালা-যাত্রাওয়ালা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই কোন না কোন ভাবে বৈষ্ণবপদাবলীর আধেয়, বর্গ ও শৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন '(বৈষ্ণব পদাবলী) চিরন্তন কালের জন্য আত্মকেন্দ্রিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা থেকে আমাদের প্রেম ও সত্যের রাজ্যে আনবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে' ("They eternally urge us to come out from the seclution of our self-centred life into the realm of love and truth.")

"সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, / কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি./
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম-গান / বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বৈষ্ণব কবিতা"।

বিষ্ণু দে-ও এই আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক জীবনের বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে গেছেন, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকসাহিত্য, রূপকথা, আদিবাসী সাহিত্য, আদিম লোককথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী ও চণ্ডীদাসের বার্তাকে, আধেয়কে নিজের কাব্যতন্ত্রে সংশ্লিষ্ট করে নেন, বিষ্ণু দে-র এই দিকটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত নয়, তেমন আলোচনাও চোখে পড়েনি। বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় ইউরোপ আমেরিকার কবিতা / কবিদের প্রসঙ্গ—এলিয়ট-ইয়েটস-হপ্‌কিন্স আরাগ-এলুয়ার-মায়াকফস্কি-প্রসঙ্গ বারবার এসেছে কিন্তু আসেনি পদাবলীর প্রসঙ্গ বাংলার লোকায়ত চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ। অথচ তিনি চেয়েছিলেন—

'সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা'

'রেখো না বিলাসী কোনো আশা, / নববাবু-ভাষা ছড়ো মন, /
অথবা মিলাও সে কূজন / সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে ঝনন্‌-রণনে /
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে, / সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ /
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা ॥—"ভাষা", 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'

"পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বারা খোলো বঁধু তাই দেখে।"

—"সপ্তপদী", 'পূর্বলেখ' রচনাকাল ১৯৩৭-৪১

এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিষ্ণু দে, তাঁর গদ্যে,—"প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ বৈষ্ণব কবি এটা আমাদের বিস্ময়কর ভাবে জানিয়ে দেন। খানিকটা অস্পষ্ট অবশ্য এই মানস। তবু এই মানসের ছাপ আমাদের য়ুরোপীয় যুগ অবধি মোটামুটি একভাবে দেখা যায়" (বাংলা সাহিত্যে প্র .তি)। "নরনারীর দেহ সম্বন্ধে, মাতৃত্ব, খাওয়া এ সবের প্রতি যে মনোভাব আদিবাসীদের, তাই কি আমরা পাইনা, বাংলার প্রাকৃত মনে ও জীবনে তথা মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীতে ? (লোকসংগীত)। এ ভাবেই চণ্ডীদাস ও ও বৈষ্ণব পদাবলী বিষ্ণু দে-র আকর্ষণের কারণ হয়ে ওঠে—

"সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
কৃতার্থ দোহার।
পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে
স্মৃতি আছে তার।

রৌদ্র-জলে সেই-স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
দুরন্ত লোহার।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যাথার স্নায়ুতে
মরচের ব্যবহার ॥ 'সে কবে', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' রচনাকাল ১৯৫৬)।

বয়ানের সঙ্গে সমগ্র সংস্কৃতি এবং তার সংকেত প্রণালীর অসম্পর্ক এই ঘটনার মাধ্যমে দেখান যায় যে বিভিন্ন স্তরে একটিই বার্তা একটি বয়ান একটি বয়ানের অংশ বা একশ্রেণীর সমস্ত বয়ান একটি বয়ানে উঠে আসে। বয়ান বলতে আমরা একটি বার্তাকে বুঝি যা গৃহীত সংস্কৃতির মধ্যে বয়নবৃত্তি (Textual Function) পালন করে। এভাবেই ধোপার পাট-এর বার্তা চণ্ডীদাসে চণ্ডীদাস থেকে দ্বিজ হরিদেব-রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র বয়ানে উঠে আসে। একটি কবিতায় কবির কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়, কবির নিজস্ব উক্তি থাকে সেই কণ্ঠস্বর-উক্তি-বার্তা মিলে বয়ান। কবির নিজস্ব বয়ানে অন্য কোনো বয়ান বা বয়ানের অংশ যখন সম্মিলিত হয়, তখন এই সমন্বিত বয়ানটিতে চূড়ান্তভাবে যা থাকে তা কবিরই কণ্ঠস্বর, কবিরই বয়ান, যেমন চণ্ডীদাসের সমস্ত পদাবলীর বয়ান বিষ্ণু দে-এর 'নান্নুর'-এ সম্মিলিত হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে সাঁওতাল ওঁরাও-ছত্তিসগড়ী, বিভিন্ন লোকসাহিত্যের বয়ানকে গ্রহণ করে লোকজীবনের প্রাণবন্ত ধারাকে তাঁর নিজস্ব শিল্পিত শৈলীতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'লোকসংগীত' নিবন্ধে বিষ্ণু দে আমাদের জানান, "এইসব চমৎকার গানগুলির তৈরি প্রতিমায় বাঁধা, তাই সঙ্গীতে যে একক প্রতীক বা চিহ্ন ভিন্নভিন্ন রাগবিন্যাসেরই মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট অর্থ পায়, সে অর্থের উদ্ভাসন এখানে দুর্লভ।...আদিম লোককাব্যে কেন এই তফাত বাস্তব তার কারণ আপাতবোধ্য। খানিকটা এটা নির্ভর করে আত্মসচেতনতার পর্যায়ের উপরে, তার গভীরতা ও স্থিতিকালের এবং তার শুদ্ধতার উপরেও।" এভাবেই লোককাব্যের আত্মসচেতনতার পর্যায়টি চণ্ডীদাসে গভীরতা পায় আর বিষ্ণু দে তাঁর আত্মবোধ দিয়ে অন্য একটি মাত্রা দেন।

চণ্ডীদাস আর দান্তেকে বিষ্ণু দে মিলিয়ে দিতে পারেন কবিতায় এবং আনেন এক স্বরসঙ্গতি বা হার্মোনি। কবিতায় বিষ্ণু দে এক মানবিকতার কথা বলে যান—

"বিশ্বেই বাঁচে চৈতন্যের প্রণয়—
মানবিক গানে, আমাদেরই দোতারায়।
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
নামকীর্তনে আত্মদানের প্রলয়।"
—বিষ্ণু দে, 'উত্তরে থাকো মৌন', ১৯৭৫

এই মানবিকতা চণ্ডীদাস-দাস্যের চৈতন্যের প্রণয়, মানবিক গানে ছড়িয়ে পড়ে। 'নান্নুরে' কবিতাটিও তাই চণ্ডীদাস সম্পর্কে এক বিবৃতি হয়ে থাকে না, একাত্মতায় ভরে ওঠে, সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা, চণ্ডীদাসের—বৈষ্ণব পদাবলীর লোকায়ত বার্তার সঙ্গে একাত্মতা।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রাধান্য, স্বকীয়তা আছে যাকে একটি ভঙ্গিমা বলে চেনা যায়। বিষ্ণু দে একজন আত্মসচেতন কবি তাই চণ্ডীদাসের বয়ান, সাঁওতালী কবিতা, গ্রাম্য ছড়া, রূপকথা সবই তাঁর ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়। তাঁর আত্মসচেতনতা সামাজিক বিশ্বাসপ্রসূত হওয়ায় কখনই তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে না। 'নান্নুরে' কবিতায় আমরা দ্বৈত সত্তাটিকে পুরোপুরি ধরতে পারি, ব্যঙ্গ-বক্রোক্তির প্রথম অংশ তার দ্বিতীয় অংশে চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আত্মবোধ—এটি বিষ্ণু দে-এর বিশিষ্ট শৈলী। বিশ্লেষণী শক্তি এবং পাঠজাত জ্ঞান তাঁর কবিতায় আরেকটি মাত্রা যোগ করে। এলিয়টীয় মননে বিষ্ণু দে-র কাব্যজগৎ খানিকটা পরিচিত হলেও এ শ্রেণীর আধুনিক কবির মতো লোকসাহিত্য, পুরাণ এবং প্রাক ইংরাজ বাংলা সাহিত্যকে গ্রাম্যতা বলে প্রাণহীন এক ছেঁদো নাগরিকতার মধ্যে ডুবে যাননি। বিষ্ণু দে বুঝতে পেরেছিলেন শুধু ইউরোপীয় আধুনিকতার জোয়ারে ভেসে চললে বাংলা কবিতা অনুকরণের পরাধীন কবিতা হয়ে থাকবে।

---

(১) আলোচনায় ব্যবহৃত বিষ্ণু দে-এর উদ্ধৃতিগুলি, 'জনসাধারণের রুচি' (কলকাতা, ১৯৭৫) বইটি থেকে নেওয়া।

(২) 'সাংস্কৃতিক বয়ান' বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধকারের নিবন্ধ "সাংস্কৃতিক বয়ান : উত্তর আধুনিকতা বা সংশ্লেষণবাদ" (একবিংশ ঢাকা ১৯৮৯) এবং কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে বিতর্ক (শারদীয় 'প্রমা', ১৯৮৯) দ্রষ্টব্য।

তাপস মুখোপাধ্যায়

'ধূসর কালসন্ধ্যার ছায়া' ঃ 'পদধ্বনি' কবিতা

তিরিশের দশকের সময়চেতনা এবং সমাজসচেতনার সাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে অর্জুনকে বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি,' কবিতার মধ্যে ফিরে পাওয়া গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জটিল ঘটনাবলীর দিকে সতর্ক অনুধাবনী দৃষ্টি মেললেই এই সংকটের ছবি পাওয়া যায়। তাই অতীতের আলোয় যে অর্জুনকে মহাভারত পাঠের সময় নিবিষ্টভাবে আমরা দেখি এবং সেই অর্জুন যিনি মহাভারতের মহাযুদ্ধের আগে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিলেন-'এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।' তাই এখনকার সময়কালীন প্রেক্ষাপটে অর্জুনের সেই বিবশ মানসিকতার ছবি কেবল অতীত অধ্যয়নেই সমাপ্ত হবে কিংবা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতকে বিচার করা— কোনদিকে তার মুক্তি তা সতর্কভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

অবশ্য বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতার আলোচনায় যে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে তা হল 'পদধ্বনি' কবিতাটি 'পূর্বলেখ' (১৯৪১) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ এর সময় সীমার মধ্যে কবিতাগুলি রচিত হলেও শুধুমাত্র 'সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত কবিতার উদাহরণ হিসাবে 'পদধ্বনি' কবিতাটিকে বিচার করা উচিত হবে না। তাই 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের দিকে তাকিয়ে বিষ্ণু দে-র কবি মানসিকতার অথবা কাব্যচর্চার কোন বাঁক বা বদলের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে কিনা এটা দেখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রাচীন কোন কাহিনী কিংবা পৌরাণিক কোন কাহিনী বিষ্ণু দে-র কবিতাতে প্রথম লিখিত হল তা নয় বরং অজস্র উদাহরণের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে মহাভারতের 'শকুন্তলা' কাহিনী, গ্যেটের ফাউস্ট কাহিনী কিংবা বাইবেলের একাধিক গল্প যা টেনিসন থেকে মার্লো, এলিয়ট, ইয়েটস্ নানা সময়ে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই সমালোচক যথার্থ-ভাবেই লক্ষ্য করেন যে হোমারের ইউলিসিসের যাত্রা দান্তের ইন ফার্নোর, দান্তের নিজস্ব যাত্রা কল্পনার তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই প্রশ্নটি দান্তে, টেনিসন, এলিয়ট ইয়েটস এর মতো বিরাট সাহিত্যরথীদের ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যেই ধৃত নয় বরং তাকে বিচার করা উচিত এই যুগ থেকে যুগান্তরের অভিমুখী কাহিনী গুলির তাৎপর্য এবং

অগ্রসরমানতার দিক দিয়ে। তাই বারংবার যে ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশনের কথা আমরা মান্য করে চলি তা নানা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের সহযাত্রী হয়ে চলে। 'পদধ্বনি' কবিতার মধ্যে আমরা যে কুন্তী নন্দন অর্জুনকে পাই সেই অর্জুন কেবল মাত্র তৃতীয় পাণ্ডব আখ্যায় বিভূষিত নন, সেই অর্জুন যিনি একাধারে মহাভারতের মহান শস্ত্রধারী নন, প্রেমের লক্ষ্য ভেদেও যিনি অক্লান্ত সেই বর্ণাঢ্য চরিত্র অর্জুন তার বর্ণময় সত্তার ছায়ায় পাঠককে বারংবার আন্দোলিত করে—সেই অর্জুনও মহাপ্রস্থানের আগে 'ব্যর্থ ধনঞ্জয়।' বীরত্বের চরম শিখরে যার অধিষ্ঠান ছিল সেই অর্জুনকে মহাভারতের শেষে আমরা দেখি ধ্বস্ত, অসহায়। গাণ্ডীব তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। সেই বীর অর্জুন আজ ইতিহাসের এক ধূসর অধ্যায়ের করুণ ছবি। ইতিহাস, পৌরাণিক কল্পনার বিরাট চরিত্রের এই ধাপে ধাপে অবনমন কবিদের এবং নাট্যকারদের উনিশ শতকের ভারতবর্ষে নানাভাবে অভিভূত করেছে তা অস্বাভাবিক নয়। নবীন চন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে তৃতীয় পাণ্ডবের অনিবার্য ও উজ্জ্বল উপস্থিতি তাই বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডবের সেই আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় পদক্ষেপের ছবি একালের বাঙালীর অর্জুনচেতনার মধ্যে কেন প্রতিফলিত হল না এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। 'পদধ্বনি' কবিতার শুরুতে যে জরাগ্রস্ত চরিত্রকে 'তিমির পঙ্কের স্রোতে' ভেসে আসতে আমরা দেখি সেই তৃতীয় পাণ্ডব যিনি অনেক রমণীর প্রার্থিত ছিলেন কিংবা সুভদ্রাহরণের সময় তাঁকে প্রেমের কোমলতার মাঝখানে দীপ্ত মহিমায় জ্বলে উঠে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সেই অর্জুন আজ শুধুমাত্র কি বয়সের ভারে অবনত? প্রেয়সী সুভদ্রার দাক্ষিণ্যভারে নিজে বারবার যে নত হয়েছেন অর্জুন তা স্বীকার করেছেন বারবার। তবু আজ এই দ্বিধা সংকট, পরাজয় ও শঙ্কার প্রশ্নে তৃতীয় পাণ্ডব বিব্রত। সেই আনন্দিত মুহূর্ত গুলির ছবি শুধু মহাভারতে নয়, পরবর্তীকালে অর্জুনের নন্দিত স্বীকৃতিতে বারংবার উচ্ছলতায় বর্ণিত :

> "সুভদ্রা, এ হৃদয় আমার
> তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়
> প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
> বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
> ঘুরে ফিরে আদিঅন্ত তোমাকে জানায়
> সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।" (পদধ্বনি)

সুভদ্রাহরণের পর পেছনে ধাবমান হলধরের ক্রোধের হাত থেকে নিজেকে এবং সুভদ্রাকে বাঁচানোর প্রয়াসের সেই দ্রুত চলমান ছবি আজ বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'স্থবির

বাসরে' ঠাঁই পায়। দেহাতীত তীব্র মিলনের আনন্দের মধ্য দিয়ে যে তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছিল তাকে একমাত্র বিরাট চৈতন্যের মধ্য দিয়ে স্বীকার করা যায়। তবু জীবনের এই বার্ধক্য বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মধ্যে যে সংশয় তা কি একমাত্র তারই জিজ্ঞাসা না এক আধুনিক বাঙালী কবি ক্রান্তিকারী যুগসন্ধির সেই ভয়ংকর আপৎকালীন ছবিকে পৌরাণিক পটভূমি থেকে সরিয়ে একালের সময় দর্পণে ধরতে চেয়েছেন —এই নেতিবাচক প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে।

"...আর সেই পদধ্বনি
ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্ পুরাণিক প্রাণী? অসভ্যবন্যের পিতৃকুল?
দানবজন্তুর পাল?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে?" (পদধ্বনি)

প্রথম পার্থের মনে কেন এই ভয়? গাণ্ডীবধারী অর্জুন আজ কেন সেই তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠতে পারছেন না। কৃষ্ণের অনুরোধে যিনি এলেন সেই অর্জুন আজ কি ভীত "এ যে দস্যুদল!" উদ্ধত বর্বর দস্যুদলকে প্রতিহত করার আনন্দে তৃতীয় পাণ্ডব কেন আজ অসহায় ভাবে সুভদ্রাকে বাধ্য হয়েছেন তাঁর ব্যর্থতার কথা অকপটে জানাতে।

কবিচেতনার সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে 'পদধ্বনি' কবিতায় মানব ইতিহাসের এক আদি সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন "এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদিসত্য বিরাজমান। মুষল পর্বের ঘটনায় তিনি দেখেছেন সভ্যতার উত্থান-পতন, ব্যক্তির আবির্ভাব ও বিদায়ের শৃঙ্খলাবৃত্ত। এখানে পুরাণ নির্বিশেষ সত্য প্রকাশের রূপকে নিহিত। কিন্তু বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' বিশেষ ব্যক্তিগত চিন্তার প্রকাশক এবং তার তাৎপর্য বিমিশ্র।" মহাভারতের এই মুষল পর্বের কাহিনী নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য নাটক 'কাল সন্ধ্যার' বিস্তার। বিষ্ণু দেও আধুনিক বাঙালী কবির জিজ্ঞাসা নিয়ে সেই একই কাহিনীর ভিন্নতর আঙ্গিক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে অন্য জিজ্ঞাসায় ব্রতী হলেন। তাই মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মের একটি উক্তির মধ্য দিয়ে এই কালসন্ধ্যার কারণটি জানা গেল: 'ভেদ মূলো বিনাশো হি গননামুপলক্ষয়ে।' বিভেদ গণরাষ্ট্রের ভিতকে নষ্ট করে। 'মুষলপর্বে' সেই পতনের, অন্ধকারের, ব্যভিচারের ছবি। তাই কৃষ্ণ যাদববংশ ধ্বংসের যে যে দুর্লক্ষণ আছে তার ছবি নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে

পারছেন—'শত্রুতা, লোভ, কর্তৃত্বাভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা আর উচ্ছৃঙ্খলতা' কিভাবে দ্বারকাকে গ্রাস করছে। ব্যভিচারী যাদবদের বিদ্রূপে অতিষ্ঠ মুনিদের অভিশাপে যাদবদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হল। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করল। মদ্য, মাংস, নারী নিয়ে ব্যভিচারে সবারই মত্ততা। শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন কারণ যা ঘটবে তা তাঁর অজানা নয়। তাই কৃষ্ণের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত তৃণ অসংখ্য মুসলের সৃষ্টি করল। তাই দিয়ে যাদবগণ একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করল! ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ছবি। বলরাম দেহত্যাগ করলেন। কৃষ্ণের প্রয়াণ দ্রুত হল ব্যাধের নিক্ষিপ্ত বাণে। অর্জুনকে এর আগে পুরনারীদের রক্ষাকরার জন্য কৃষ্ণ আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু এ কোন অর্জুনকে কৃষ্ণ দায়িত্ব সমর্পন করলেন। যিনি বেদব্যাসের আশ্রমে ভগ্নহৃদয়ে প্রবেশ করলেন এ কি সেই অর্জুন যিনি অভিমন্যুর মৃত্যুর পরেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন :

"পাপং বালবধে হেতুং সোহস্মি হন্তা জয়দ্রথম।

* * *

যদ্যস্মিন্নহতে পাপে সূর্যোহস্তমুপযাস্যতি।
ইহৈব সম্প্রবেষ্টাহং জ্বলিতং জাতবেদসম্॥"

(দ্রোণপর্ব, ৭৩/২২, ৪৭)

জয়দ্রথবধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জুন পরের দিন জয়দ্রথকে বিনাশ করলেন। কিন্তু মহাভারতের মুষলপর্বে সেই অর্জুনই ক্লান্ত, ব্যথিত কণ্ঠে ব্যাসদেবকে তাঁর ব্যর্থতার কথা জানালেন :

"দ্বারকা থেকে যখন আমি বৃদ্ধবালক ও নারীদের নিয়ে চলে
আসছিলাম, তখন পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, অকস্মাৎ
সমগ্র দ্বারকাপুরী সমুদ্রের তলায় ডুবে গেল। পথে লাঠি হাতে
একদল আভীর দস্যু যাদব রমণীদের প্রতি লুব্ধ হয়ে তাদের হরণ
করতে লাগল। ধিক আমাকে। আমি গাণ্ডীবধন্বা বীর অর্জুন,
কিন্তু আমার গাণ্ডীব তুলতে পারলাম না। কোন অস্ত্র আমার
স্মরণে এল না। দুর্বল হাতে আমি দস্যুদের বাধা দিতে
পারলাম না। আজ আমি শক্তিহীন অসহায় দিগভ্রান্ত।
এভাবে আর বাঁচতে চাই না।"

(মহাভারতের কথা / অমলেশ ভট্টাচার্য্য পৃঃ ৩৬৩)

একথা অনস্বীকার্য যে একধরণের সমাজমনস্কতাই মহাভারতের কাহিনীক্রম অনুসরণ করে নতুনভাবে কবি প্রেম সম্পর্কে নিজস্বভাবনা এবং কবির সমাজতন্ত্রে আস্থার কথা

ব্যক্ত করেছেন। 'পদধ্বনি' কবিতার শুরুতে, মধ্যভাগে এবং অন্তিম অংশে এই সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাস মহাভারত-কাহিনীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। অর্জুনকে শুধুমাত্র বহুবল্লভ নায়ক হিসাবে উপস্থাপিত করলে এত কথার প্রয়োজন হত না। বরং অর্জুন-উলূপী প্রসঙ্গে কবি তার মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বঘটিত এক অর্থবহ ভাষ্য রচনার সুযোগ তৈরী করে দেন। আবার সুভদ্রার সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ উভয়ের মধ্য দিয়ে কবি 'পরিপূর্ণ প্রেমের পরিণত ভাষাকে পেয়ে যান। তাই নতুন যুগে, নতুন কালের নতুন লুণ্ঠনকারীদের কবি বিষ্ণু দে চিহ্নিত করেন 'দস্যুদল' বলে। কবি আর পথভ্রষ্ট হতে চান না। তাই ফ্রয়েড, ইয়ুং এর মনোবিজ্ঞানের আলো-আঁধারি পথ থেকে সরে এসে বিষ্ণু দে সামাজিক চেতনাকে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবে নিজের মনোজগতে নির্মাণ করে নেন। মার্কস তাঁর সমাজবীক্ষণের ভাবনায় বারংবার যে কথাটিকে বলতে চেয়েছেন যে এই বৈষম্য এবং বিশৃঙ্খলা আজকের নয়, সভ্যতা শুরুর সময় থেকেই তা চলে আসছে :

"All history is the history of class struggles"

১৮৪৮ সালের বিপ্লব ঘটবার পর মার্কস তাঁর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে এই যুদ্ধের এবং শত্রুপক্ষের স্বরূপকে চিহ্নিত করলেন। 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের' ব্যাখ্যায় মার্কস লিখলেন যে একটা ব্যবধান বেড়েই চলেছে শোষণকারী মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে। শ্রমিকদের একমাত্র সম্বল তাদের শ্রম। মার্কস এই শোষণের ছবিকে আরো পরিষ্কার-ভাবে তুলে ধরে জানালেন যে কারখানাগুলি বঞ্চিত, শোষিত শ্রমিকের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং এইভাবে পুঁজিবাদের সঙ্কট ঘনিয়ে এলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্ভিক্ষ দেশকে ছন্নছাড়া করবে। ধনতন্ত্রের এই সঙ্কটের মধ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর জয় সুনিশ্চিত হবে :

> "What the bourgeoisie produces above all is its own gravediggers. Its fall and victory of the proletariat are equally inevitable.... The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workers of the world unite."

কার্লমার্কসের এই বক্তব্যের মধ্যে ধনতন্ত্রের সঙ্কট ও তার ভবিষ্যৎ সমাধানের পথকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সঙ্কট ঘনায়মান। অতএব শোষকশ্রেণী যত মুনাফার-পাহাড় বাড়াবে এবং তার ভিত ততখানি দ্রুত আলগা হয়ে একটা সময় ধ্বসে পড়বে। রুশো-মার্কস বিতর্কের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে মার্কস বিশ্বাস করতেন যে—

"...it was the industrial proletariat in advanced societies who would be the spearhead of the next revolution."

মার্কসীয় দর্শনের এই সারবত্তাকে মেনে নিয়ে এঙ্গেলস্ মার্কসের শেষকৃত্যের সময়ে বলেছেন,

"As Darwin discovered the law of evolution in organic matters, so Marx discovered the law of evolution in human history."

'পদধ্বনি' কবিতায় যে 'কাল প্রভাবের' কথা আমরা শুনি তা ব্যাসদেবের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল মহাভারতের সময়ের অনেক আগেই। কিন্তু কালের সেই দুজ্ঞেয় রহস্যের কথা জানিয়ে ব্যাসদেব অর্জুনকে দুঃখিত হতে নিষেধ করেছেন। মহাপ্রস্থানের পর্বে সেই আধ্যাত্মিক উৎক্রমণের ইতিহাস পাওয়া যায়। অষ্টাবক্র মুনির বিকৃত শরীর দেখে যে রমণীরা উপহাস করেছিল তারা স্বর্গের অপ্সরাত্ব হারিয়ে মর্ত্যের মানবী হবে এবং যাদববংশের পতনের সময় তারা দস্যুদলের দ্বারা উৎপীড়িতা হবে। ঋষির এই অভিশাপের সঙ্গে কালের অনিবার্য যোগসূত্রটি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। তাই দুঃখিত অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বেদব্যাস জানালেন যে :

"বৎস, ব্রহ্মশাপে বৃষ্ণি অন্ধকগণ বিনষ্ট হয়েছে। তাদের জন্য শোক ক'রো না। এ ভবিতব্য। শ্রীকৃষ্ণ সব জানতেন, তাই তিনি নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। ...অর্জুন, কাল অনুসারে মানুষ বলবান্ হয় আবার দুর্বল হয়। তোমার সকল অস্ত্র সার্থক ও কৃতকৃত্য হয়েছে। তাই তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। তোমরা দেবগণের মহৎকর্ম সাধন করেছ। তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে। এখন মহাপ্রস্থান।" [মহাভারত]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ্যণীয় যে ব্যাসদেব কাল বা সময়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃতকর্ম সমাপ্ত হলেই চলে যেতে হবে ব্যাসদেব অর্জুনকে তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাই শোকাহত অর্জুনকে উপদেশদানের মধ্য দিয়ে মহাভারতের 'বনপর্বের' সেই কথাই প্রমাণিত হল :

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনঃ
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥"

[(বীজ দগ্ধ হলে তা থেকে আর কোন অঙ্কুর জন্মায় না। তেমনি ত্রিবর্গের মধ্যে যে কামনার বীজ থাকে তাকে মোক্ষের আগুনে দগ্ধ করে নিলে আর দুঃখ থাকে না, শোক থাকে না)।]

মহাভারতপ্রসঙ্গে ব্যাসদেব অর্জুনপ্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বিষ্ণু দের 'পদধ্বনি কবিতায় অর্জুনের প্রেমের ইতিহাস ও পরিণতির মধ্য দিয়ে পরিস্কারভাবে আমরা দেখতে পাই এক নতুন যুগ, নতুন সময়ের সমাজ রূপান্তরের স্পষ্ট আভাস। বিষ্ণু দে-র রাজনৈতিক জ্ঞান ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা এই অর্থান্তরের আভাসকে স্পষ্টভাবে ধরতে সাহায্য করল।

অর্জুন-সুভদ্রার কাহিনী অন্যান্য কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ধনতন্ত্রের সংকট এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও বিকাশ 'পদধ্বনি' কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনীর খোলসের মধ্যে এই নতুন শ্রেণী বিকাশের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবনাকে কবি দক্ষতার সঙ্গে প্রবিষ্ট করতে পেরেছেন। তাই যে 'কাল প্রভাবের' কথা ব্যাসদেব বলেছেন তার অন্যতর ব্যাখ্যায় বলা চলে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় থেকে সমাজবাদে উত্তরণের মধ্যে ঐতিহাসিক খণ্ডাংশগুলি এক অখণ্ড সময়চেতনার মালার বৃন্তে পরপর সাজান থাকে। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও সমৃদ্ধির দিনগুলি, এর বিকাশ ও অস্তগামী চেহারা, নতুন শ্রেণী বিন্যাস এবং সমাজ শক্তির অভ্যুদয়ই 'পদধ্বনি' কবিতার আধুনিক ভাষ্য রচনা করতে সাহায্য করেছে। 'বিষ্ণু দে এ ব্রতযাত্রায়' সমালোচক তাই অর্জুনকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে পান। 'বিষ্ণু দে : কালে, কালোত্তরে'র গ্রন্থরচয়িতারাও 'পদধ্বনি' কবিতার আলোচনায় মধ্যবিত্তের এই শ্রেণী চেহারাটিকে স্পষ্টভাবে অর্জুনের মধ্য দিয়ে দেখতে পান। এই মধ্যবিত্ত মানুষ বা শ্রেণী কোথা থেকে এল। উনিশ শতকের নবজাগরণ এবং তার ফলাফল যতই বিতর্কিত হোক না কেন এই নবজাগরণের জোয়ার বাংলাদেশের তটরেখা ও সীমানাকে কেবলমাত্র স্পর্শ করেনি, এর মধ্যে একটা আলোড়নেরও সৃষ্টি করেছিল। তাই তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এল সমাজের উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবর্গের মানুষের মাঝখানে আর একটা শ্রেণী 'মধ্যবিত্ত।' চিন্তায়, ভাবনায়, অর্থকরী উপায় উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীর চেহারার মধ্যে এক ধরণের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। "The Indian Middle Class" গ্রন্থে বি. বি. মিশ্র মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের জীবনের norm বা স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রয়াসের কথা জানালেন। সংস্কারান্দোলন, ধর্মান্দোলন এবং নবজাগরণ সব কিছুর মূলে এই স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রেরণা কার্যকরী হল। কিন্তু "কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলার মধ্যবিত্ত মানসে এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত এবং সঞ্জীবিত হল বটে, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল। কালান্তরের প্রতিক্রিয়াকে মধ্যবিত্ত চেতনা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারল না। 'ইংরেজী শিক্ষাজাত মধ্যবিত্ত'

আসলে বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মসন্তুষ্টির একেবারে অবিকল প্রতিমূর্তি।

"এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, জাতীয় ভবিতব্য পরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষমতা তার হাতে নেই।"

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনতন্ত্রের আশীর্বাদ ধন্য 'মধ্যবিত্ত' অর্জুনের স্মৃতি রোমন্থনের সূত্র ধরে তার সুদিনের ইতিহাস কবিতাপাঠক অবগত হন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরকালই এক ধরণের দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের দ্বারা আলোড়িত, দীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত :

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত।
বক্ষে আঁকড়ি ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,
তেত্রিশ কোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
উষার আকাশে শ্মশান গোধূলি কুয়াশাহত॥" (বিভীষণের গান)

স্মৃতিভারাবনত অর্জুনকে 'পদধ্বনি' কবিতার শুরুতে সেই অতীতময়তার মধ্য থেকে উঠে আসতে দেখা যায়। ধনতন্ত্রের সেই স্বর্ণযুগে যখন আর্থিক সমৃদ্ধিতে ধনী ব্যক্তিরা তৃপ্তি বোধ করেছে—সেই সময়কে কবির মনে হয়েছে 'মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো"—কিন্তু সেই দিন অবসানের পর কেবলই স্মৃতিতে ভীড় করে আসে সেই পলাতকা ছবির দল :

কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত আধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্য বাসরে ?" (পদধ্বনি)

উলুপী নয়, উর্বশী নয় এই শেষবেলায় অতীতের সেই মুখ, আনন্দ যখন অবসিত তখন বারবার কেন ফিরে ফিরে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে বেলা হল শেষ এবং দিনেরও হল শেষ। পদধ্বনি বারংবার কেন স্মৃতির জালকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় অর্জুন তাঁর মধ্যবিত্ত চিন্তার আলোতে সেই গূঢ় রহস্যটিকে ধরতে পারছেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালী মানুষেরও আত্মচিন্তারও সংকট এখানেই লুকিয়ে আছে। 'বার্ধক্যবাসর ; 'মন্থিত স্মৃতির রাত্রে', 'ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে', 'স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার', 'প্রাক্তন পৃথিবীর স্মৃতি', 'স্মৃতি তার কদম্ব ছায়ায়'—আলাদা পংক্তি বা শব্দ তুলে আলোচনাটি ভারাক্রান্ত না করে কবির এই শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব কোন আলাদা তাৎপর্য বহন করে কিনা তা দেখার প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে বলা যেতে পারে যে অর্জুনের মধ্যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই

ধরণের ইতিহাস বর্ণনার মধ্যে যে 'ট্র্যাজিক—আয়রনির' আভাস আছে তাকে অতি সরল ইতিহাস ব্যাখ্যানের বিপদ থেকে বাঁচাতে তিনি এক ধরণের পক্ষপাতহীন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীর সাহায্য নিয়েছেন। শ্রী অরুণ সেন তাঁর গ্রন্থে এই দিকে যে ইঙ্গিত করে সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন তা যথার্থ। একথা মান্য যে "কবিতাটি রচিত হয়েছে ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েত আক্রমণের সময়ে—ঐ ঘটনার আপাত অসামঞ্জস্যই হয়তো তাঁকে এই ট্র্যাজিক জীবন বোধের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ ও জটিল আশাবাদে পৌছতে প্ররোচিত করে থাকতে পারে।" মধ্যবিত্ত নায়কের পতনের দৃষ্টি থেকে একদা বৈভবের মাঝখানে স্থাপিত উলুপির কাহিনী অর্জুনকে নাড়া দিয়ে যায়। চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে অর্জুনের পরাজয় ভবিষ্যত পতনের ছিদ্রের সূত্রপাত করেছে। মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায় যে বভ্রুবাহন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটিকে হরণ করেন এবং অর্জুনকে অভ্যর্থনা করতে আসেন।—

> "নিজ পুত্রকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে না আসতে দেখে। অর্জুন অত্যন্ত বিরক্ত হন। তখন উলুপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উলুপীর মায়াতে অর্জুন পুত্র হস্তে শরাঘাতে অচেতন হন। তখন উলুপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী মণি এনে বভ্রুবাহনকে সেটি অর্জুনের বক্ষে রাখতে বললেন এবং তারই প্রভাবে অর্জুন আবার নবজীবন লাভ করেন।"
>
> (মহাভারত)

মহাভারতের কাহিনী থেকে উলুপী বভ্রুবাহন প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে—কিন্তু একথা কি যথার্থ ভাবে বলা চলে 'এ কবিতার বিশিষ্ট প্রসঙ্গার্থে উলুপী অর্জুনের বিরুদ্ধে গুপ্ত বিক্ষোভ, যেন গোপনে সংগঠিত বৈপ্লবিক আয়োজনের সংকেত দিয়ে যায়।' 'পদধ্বনি' কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত উলুপীর প্রসঙ্গটি কবি যে ভাবে লিখেছেন তা কি উপরের উদ্ধৃতির বক্তব্যের সঙ্গে মেলে :

> "অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অস্থিয়ারে
> ছিন্ন করে দিতে আসে সর্পিল উলুপী
> তিমির পঙ্কের স্রোতে, রসাতল সঙ্কুল আঁধারে?"

মধ্যবিত্ত নায়ক অর্জুনের পতনের ছবি কবি আঁকতে চেয়েছেন একথা সত্য। ঐতিহাসিকতার সূত্র ধরে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং অবক্ষয়ের ছবিকে বিচার করার সময় ইংলণ্ডে সংগঠিত শিল্প বিপ্লবের সাফল্যের অন্তরালে যে মূল্যবোধহীন ব্যর্থতার ছবি চাপা পড়ে যায় তাকে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেই জানা যাবে :

"The Industrial revolution in turn only succeeded because

of the brutal exploitation of men, women and children. The consequence of that revolution is the more humane existence enjoyed by the 'Common' people of England today."

(Literature and the Crisis of Capitalism)

শুধু মাত্র ধনতন্ত্রের উন্নতি ও অবক্ষয়ের প্রতীক এবং মধ্যবিত্ত মানসের প্রতিভূ তৃতীয় পাণ্ডবকে বুঝতে গেলে ধনতন্ত্রের স্বরূপটিকে জানার প্রয়োজন আছে :

"Marxism, nevertheless, has always emphasised the fact that capitalism was a prodigious step forward in the development of human society, but it has never slurred over the tragic content of human development in class society. Marxism arose not out of capitalism but out of a perception of the tragic human Limitations imposed by it." (Love Poetry in the Sixteenth Century)

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ভাবে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ছবিটি উপরোক্ত রূপরেখার মধ্যে বয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

তাই কবি বিষ্ণু দে ঘুরে ফিরে 'পদধ্বনি' কবিতায় সুভদ্রা অর্জুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে ইতিহাসবেত্তা হিসাবে সেই ব্যক্তিগত জয় এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধির কাহিনীকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুভদ্রা বীরের পত্নী এবং বীরের জননী।

মহাভারতকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সুভদ্রাকে অর্জুনের উপযুক্ত করে তোলার বর্ণনা দিয়েছেন :

"রৈবতকে পূজার পর সুভদ্রা যখন দ্বারকায় ফিরছিলেন,
তখন অর্জুন তাঁকে হরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে নিয়ে যান।
এতে যাদবরা অপমানিত বোধ করেন বটে, কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক থাকেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের
সুভদ্রা-হরণ ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত বলেন।"

[পৌরাণিক অভিধান]

'পদধ্বনি' কবিতায় বিষ্ণু দে অর্জুন সুভদ্রা প্রসঙ্গকে এই ভাবে উপস্থাপন করলেন :

"মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুংকার টংকার
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি···" (পদধ্বনি)

এই পলায়নের আনন্দ অর্জুনের কাছে এখন অতীত স্মৃতি মাত্র। 'স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার' খুলে এখন সেই 'অতীত আনন্দের গচ্ছিত জীবনের জন্য হাহাকার। কালান্তরের পর্বে এই রকমই হয়তো ঘটে থাকে। অর্জুনের আর্তি কেমন যেন দ্বন্দ্বময় বলে মনে হয়। তাই বলা যায় যে "মোহ এবং মনীষা, অহমিকা এবং ভবিষ্যৎবোধ দুয়ের মিশ্রনে কবির নায়ক যেমন তাকিয়ে আছে তার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তির দিকে, তেমনি তার দৃষ্টি ন্যস্ত রয়েছে ভাবীকালে।" মোহ অতিক্রম করে মনীষার আলোতে পার্থের মনে সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—একি নব অবতার ? এ কি যুগান্তর ?" 'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর' পরের এই উক্তিটি অর্জুনের বীর সত্তার জগতে এক মোহের সঞ্চার করেছে। এই দস্যুদলের আবির্ভাব অর্জুনকে হতচকিত করে দিল। তাই ইতিহাসের পালাবদলের সেই সময়ক্ষণটিতে অর্জুন আর নায়ক হতে পারলেন না—সেই গাণ্ডীবধারী অর্জুন এখন তার নিজের প্রতিষ্ঠার সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। তার নায়কের বেদী থেকে সরে যাওয়ার সময় এসেছে—অর্জুন একথা বুঝতে পেরেই বারংবার অতীত কীর্তির মধ্যে নিজের আত্মাকে স্থাপন করে এক ধরণের তৃপ্তি পেতে চেয়েছে :

"আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !" (পদধ্বনি)

ধনঞ্জয়ের ব্যর্থতার স্বীকৃতি একান্ত ভাবে নিজস্ব হলেও ভবিষ্যতের পালাবদলের ইঙ্গিত তার উক্তির মধ্যে ধরা পড়ে। নতুন যুগের এবং নতুন কালের মানুষদের পরিচয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট না হলেও শ্রেণীস্বার্থের পুরাতন টানে ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে :

"কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে···" (পদধ্বনি)

'এরা দস্যুদল উদ্ধত বর্বর'-এই শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে মানসিকতার দোদুল্যমানতা ধনঞ্জয় প্রকাশ করেও নিজে থেকেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহীদের সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবনা প্রকাশ পায় :

"আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?" (পদধ্বনি)

'দৃপ্ত ভবিষ্য'-এই উক্তির মধ্য থেকেই ধনতন্ত্রের নিশ্চিত বিনাশ ঘটবে কাদের হাতে একথা স্পষ্ট। মার্কস এই কথাকেই ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

"At each stage of historical development, changes in the names of production caused a new class to take over. The feudal aristocracy made way for the bourgeosie and in time the bourgeoisie would make way for the people. Once the proletariat had gained power, a new era of social justice wuld begin and political authority of the state would die out, leaving Man free".

(Modern European History)

বারংবার বঞ্চিত হতে হতে ধনতন্ত্রের পরিচালকদের মুনাফা অর্জনের প্রবণতাকে শিল্প শ্রমিকেরা রোধ করতে পারবে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—কারণ ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা খুবই অল্প। অর্থনৈতিক সেই ধারাটিকে যাঁরা মুষ্টিমেয়দের স্বার্থে পরিচালিত করেন—তাঁরা কি আসন্ন বিপদের মুখোমুখি হতে অকুতোভয় :

"This would make the issues of the class struggle crystal clear to the working classes, how swelled by the discontented lower middle class."

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ তাঁদের নিজস্ব পথটিকে আর উন্মুক্ত করে রাখতে পারবে না কারণ বারংবার অর্থনৈতিক সংকট পুঁজিবাদীদের চলার পথটকে বন্ধুর করে তুলবে। একজন পুঁজিবাদী অন্য আর একজন পুঁজিবাদীর চেয়ে মুনাফা অর্জনের কৌশলকে উদ্ভাবন করতে গিয়ে নিজেদের সংকট ডেকে আনবে। তাই মার্কসের মতে—"the end of the capitalist system lay in the logic of history."

ইতিহাসের যে অনিবার্য গতির' কথা এবং ধনতন্ত্রের বিনাশের যে স্বপ্ন মার্কস তাঁর ধারণার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন—পৌরাণিক কাহিনী এবং মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের দৃষ্টিতে গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের বলার মধ্যে যেন অন্তরঙ্গভাবে

মিলে যায়—"দেবী, আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করবো, আমি তা বহুকাল ধরে পরিজ্ঞাত আছি। আমার যা অবশ্যকরণীয় আপনি আমাকে তাই বললেন।" যে 'কালপ্রভাবের' কথা ব্যাসদেব লিখেছেন তা অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন :

"কালোহ'স্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্ত।"

[আমি লোকক্ষয়কারী বৃদ্ধকাল, অধুনা লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়েছি]

মুষল পর্বের পরে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় রইল না, কিভাবে সেই লোকসংহারের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। পুঁজিবাদের সংকট, ধনতন্ত্রের বিদায় এবং সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সময়েও 'লোকসংহার' হয়েছে। আধুনিক কালে এবং বর্তমান সময়েও 'লোকসংহার' হয়েছে। আধুনিক কালে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'কালপ্রভাবের' কথা একজন বাঙালী কবি তাঁর কবিতার মধ্যে জানালেন :

"এই পদধ্বনি শোনা যায়
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীরদল,

চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল।
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।"

(পদধ্বনি)

"নবশক্তি', 'আত্মদানে উজ্জীবিত' মানুষগুলির শ্রেণীচরিত্র অনুধাবনে 'পদধ্বনির' তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ধনতন্ত্রের অবক্ষয় এবং পতনের গ্লানিকর অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করার জন্য যদি আর একবার মহাভারত রচয়িতার দ্বারস্থ হতে পারা যায় ! তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ। অবিশ্বাস্য কিন্তু ভয়ঙ্কর বহু ঘটনা ঘটে গেল। এখন প্রায় সব আগুন নির্বাপিত। নদী এখন মোহনার দিকে। অর্জুনও তাঁর ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেন। পরবর্তীকালে অর্জুনের বিদায় গ্রহণের পালা। 'নবশক্তির' কাছে পরাভব স্বীকার করে তৃতীয় পাণ্ডব বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। নতুন কাল, 'সময়ের পদধ্বনি' শুনতে পেয়ে বীর পার্থ রঙ্গমঞ্চের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার মানসিক প্রস্তুতিকে সবল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

(২)

আত্মসচেতনার সংকট ও রূপান্তরের চিত্ররূপ : 'জন্মাষ্টমী' কবিতা

'জন্মাষ্টমী' কবিতা পাঠের সময় বিষ্ণু দে-র নিজস্ব একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ে যায় যে " 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালির' পর 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন ধাপ, বাঁকবদল"। বিষ্ণু দে-র সচেতন রাজনৈতিক ভাবনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থটিতেই পাওয়া যায়—বিষ্ণু দে-র কবিতার ও কাব্যানুশীলনে যাঁরা যুক্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে—তাঁদের এই ভাবনাকে মেনে নিতে বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ নেই। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে ব্যক্তিচিত্রের চলমান মোহময় ছবি দেখতে পাওয়া যায়, 'চোরাবালি'র আবর্তে তা যুগের প্রেক্ষিতে স্বরবদলের সূচনা করল। রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার অস্ফুট উন্মেষ সামান্যমাত্রায় হলেও এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তবে কাব্যভাষায় সযত্নচর্চিত অনুশীলন এবং সুধীন্দ্রনাথের মতে 'নৈরাত্ম্য সিদ্ধি' 'চোরাবালি'তে যতখানি পরিস্ফুট হয়েছে রাজনীতির ছাপ কবিকে ততখানি বাঁকবদলের জন্য অনুপ্রাণিত করে নি। "রাজনৈতিক সংলগ্নতার চাপের মধ্যেও তিনি ক্রমশ ব্যক্তি ও ব্যক্তিনিরপেক্ষর সমন্বয়ের কঠিন জগতে পৌঁছলেন সেই চেষ্টারই ইতিহাস এখানে।" সমালোচকের এই মন্তব্যের মধ্যেই 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের নতুন ভাবে পাওয়া কবির সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার হদিশ তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। 'বিভীষণের গান', 'সপ্তপদী', 'পদধ্বনি' কবিতার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংলগ্নতা ও অঙ্গীকার খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই 'জন্মাষ্টমী' কবিতার মধ্যে পাঠক আরো দৃঢ় সংবদ্ধ ভাবে এবং তার ছড়ানো ব্যঞ্জনার মধ্যে তাৎপর্যকে আবিষ্কার করে :

> "'জন্মাষ্টমী'তে এই রাজনৈতিক মাত্রা, আরও সংবদ্ধ, আরো পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় নিশ্চিত। অর্জুনের ক্লান্তি, গ্লানি ও পরাজয়বোধ এখানে শহুরে জীবনের অতীত রোমান্টিক মায়ার উদগীরণে এবং বর্তমান অবক্ষয় ও খণ্ডতার মধ্যে ছড়িয়ে যায়—প্রেমের বদলে সামাজিক পটভূমির বিস্তারকে মুখ্য বিষয় করার ফলে।" (বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়)

'জন্মাষ্টমী' কবিতার শুরুতে বেঠোফেনের নবম সিম্ফনির সাংগীতিক বর্ণনা শুধুমাত্র

লেখকের সংগীত বিষয়ে প্রগাঢ় আগ্রহের পরিচয় বহন করে না। এর সঙ্গে আগেই কথিত 'সামাজিক বিস্তার বিষয়টি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়ে আছে। বেঠোফেনের নবম সিমফনি তাই বিচ্ছিন্ন কোন অলঙ্কারের শোভা নয় বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই একথা ঠিক যে "কবির অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে বড অভিজ্ঞতারই অনুবিশ্ব—তাৎপর্য পায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বৃহৎ মাত্রার আলোকে।"

বৃহত্তর স্বদেশভাবনা এবং বিশ্বপটভূমি সম্পর্কে কবির আগ্রহের মুক্ত পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি 'জন্মাষ্টমী' কবিতার মধ্যে। তাই নতুন ধরণের আঙ্গিকে, অনেকটা চলচ্চিত্রের মন্তাজরীতির সঙ্গে তুলনীয় 'জন্মাষ্টমী'তে ব্যবহৃত আঙ্গিকভাবনায় মহানগরীর নাগরিকের তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মূর্তরূপ গ্রহণ করে। এলিয়টের Gerontion-এর বৃদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে 'জন্মাষ্টমী'র যুবকের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে মিলসন্ধান কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন তা এক 'ঐক্যবিধায়ক মন্ময়তার জন্ম দেয়' এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত।

"এই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের বিভিন্ন মুডের সম্পাতে অথবা মন্তাজের সদৃশ এক রীতি প্রয়োগে 'জন্মাষ্টমী' কবির আধুনিক সংবেদিতার কবিতা।" এই 'আধুনিক সাংবেদিতা'-ই 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কে প্রথম 'জন্মাষ্টমী' থেকে পৃথক মাত্রায় উত্তীর্ণ করে। যদিও কলক'তার নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা তাৎপর্য নিয়ে উভয়ক্ষেত্রেই উপস্থিত। কলকাতা মহানগরী, মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বিস্তর সংকীর্ণতা কবির ভাবনায় ও উপলব্ধিতে মুছে যাবে—এমন ধারণা তাই অযৌক্তিক নয়। এই সূত্র ধরেই মনে পড়ে যায় বিষ্ণু দে-র কবিজীবনে এই ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত ভাবনা কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল: "কবিতা রচনা ব্যক্তিস্বরূপের আত্মপ্রকাশ নয়, আসলে ব্যক্তিস্বরূপের হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ"। 'জন্মাষ্টমী' শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির তাড়নায় মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ জগতের উদ্‌ঘাটন নয়, সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে তা পৌছে যায় একটা সময় আন্তর্জাতিক পটভূমিতে। বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতার শুরুতে কলকাতা মহানগরীর যে ছবি আঁকা হয়েছে তা খুব একটা পরিচ্ছন্ন 'মেট্রোপলিসের' ছবি নয়:

"সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পনজ্-হাতে।
পথে—পথে দুয়ারে—দুয়ারে
ঘরে—ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুমবায়ু কল্মষবিলাস" (জন্মাষ্টমী, পূর্বলেখ)

বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রথম স্তবকের মধ্যে যে ছবি পাওয়া যায় তা বিচ্ছিন্ন কোন ছবি নয় বরং এই ছবির মধ্য দিয়ে 'atomization of human relationships and the rigid indeed abstract terms in which Society as a whole is described—" ঔপন্যাসিক লরেন্স-এর যা মনে হয়েছিল এক আধুনিক নগরীর স্বরূপ তাই এক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক মেট্রোপলিস "as the arena for the life giving struggle between men—" বিষ্ণু দে ও এই ভাবনা এবং বিশ্বাসেই চালিত হয়ে লেখেন :

"এলোমেলো বাঁকা পাযে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা কার-এ
সারে সারে কাতারে-কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদ্গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ-শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !
লেক আর খাল-পার, এসপ্লানেড আর চিৎপুর !"

মানুষের অরণ্যের মধ্য দিয়ে কবি বিষ্ণু দে তেমন কোন আশাব্যঞ্জক ছবি আঁকতে পারেন না তাই 'অগণন মানুষের' ভীড় কবিকে ক্লান্ত করে—যেমন করে ছিল বিদেশী ঔপন্যাসিকদেরও—"Society is inhuman : an anonymous automatism regulates the superficial motions of people, encases their lives and renders them fragmentary." 'কিণ্বস্রাবী উদ্গারের' মতো শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে আধুনিক নগরজীবনের উচ্ছিষ্টের প্রতি তাঁর চরম অনীহাকে জানিয়েছেন।

কবিদের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকরা নগরায়নের দ্রুত অভিশাপ বিশেষ ভাবে যে উদ্বিগ্ন ছিলেন তার প্রমাণ : 'How can one resolve the problems of a society that has become a formidable machine grinding humanity to dust." ১৯০০ সালের পর থেকে দ্রুত যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের পেছনে যে মিথ প্রেরণা যুগিয়েছিল তার ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই ছিল। তাই ভালোর চেয়ে ছাঁচে ঢালা খারাপ মানুষের ভীড়ে সমাজ এবং শহর ভরে যাবে এই আতঙ্ক ঔপন্যাসিকদের বিব্রত করে ছিল :

Thus, to the night mare of history is added the nightmare

of industrial society which takes on the appearance of a clanking robot."

যন্ত্রমানুষের আবির্ভাব 'অগণন জনতার' ভিড়ে নতুন করে উপদ্রব সৃষ্টি করবে। তাই ঐ ন্যাসিকদের চিন্তার মতো যা 'Man without Qualities' এর রচয়িতা মুশিলকে বিব্রত করেছিলেন—বিষ্ণু দে-ও বোধহয় আগামী দিনে পণ্যবাহী সভ্যতা ও সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের ভয়াবহ চেহারাই তাঁর 'জন্মাষ্টমী' কবিতার প্রারম্ভে নিরানন্দময় ছবির মতো স্থাপন করেছেন। যেখানে লেখকের মনে হয় :

> In the city of the future, transversed by overhead monorail transport, moving pavements and aeroplane taxis, no one communicates any longer with his fellows, no one has any individuality, or any identity."

কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতার মধ্যে যে 'অস্তাচলের আঁধার'কে আবিষ্কার করেছেন সেখানেও এই দিকচিহ্নবিহীন, লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতের ছবি :

> "অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
> এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন
> হারালো চতুর উভচর দিশা তার।"

বিষ্ণু দে-র কাছে তাই কলকাতা 'মরা শহরের' অতিরিক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু অচিরেই কবি এই শহরের ভীড়াক্রান্ত রূপের রূপান্তরকে তাঁর মানসিকতার মধ্যে ঠাঁই করে দেন। এই ভীড়ের মধ্যে, নির্বোধের মদগর্বী চেহারা, স্বার্থপর, লজ্জাহীনতাকে যাকে দেখে কবি ব্যথিত, বিচলিত হয়েছিলেন তাকে নিয়ে কবি আর সময় নষ্টের জালে বন্দী হতে রাজী নন। কারণ কবির মনে হয়েছে :

> "অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
> পারিজাত কুরুবক শাখা
> মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে-হাজারে
> পাখা ঝাড়ে শত -শত মানসবলাকা।
> আনন্দ, আনন্দ বুঝি ! আনন্দ নিস্পন্দন আকাশ।
> আনন্দে শিহরে শূন্য
> লঘিমায় স্পন্দমান
> মর্মভেদী বাতাসের কান্নাহীন বেগে। (জন্মাষ্টমী)

এই পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব হল—একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ থেকে বৃহত্তর বিশ্ববোধের আনন্দময় জগতে উত্তরণের নেপথ্যভূমি কি? যে 'বাঁকবদলের' কথা শোনা যায় তার বৃত্ত 'জন্মাষ্টমী'তে কিভাবে পূর্ণতা পেল?

যে পরিবর্তন বা 'বাঁকবদল' 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তার কারণ একালের মানুষ 'self conscious age'-এর মধ্যে বাস করছেন। যে নাগরিক সভ্যতার অন্ধকার দিক কবিকে পীড়িত করেছিল—তার অন্তঃসার শূন্যছবি 'জন্মাষ্টমী' কবিতার প্রথমার্ধে এঁকেছেন। পরবর্তী স্তবকে এই মানসিকতার পরিবর্তন—মানুষের উপর অসীম বিশ্বাসে কবি আনন্দময় জগৎ-এর সন্ধান দিতে চেয়েছেন। 'আনন্দ নিস্পন্দন আকাশ'—এই পংক্তির মধ্যে সেই জটিল জীবনাবর্ত থেকে আনন্দময় পথপরিক্রমার দিকে কবির যাত্রা। তবু নাগরিকজীবনের মানসিকতাকে কবি একেবারে ফেলে দিতে পারেন না। তাই 'সিনেমায় শ্রান্তি', 'মালিনীদের আমন্ত্রণ,' ক্লোসআপ-আলিঙ্গন' 'মদালস চুম্বন'—সবই বৃথা যায়। কারণ কবি বুঝতে পারছেন এই প্রেম-ভালবাসা আগাম দেওয়া নেওয়ার মতো' পণ্যবিক্রয়ের মতো স্থূল বাণিজ্যিক সর্বস্বতায় পর্যবসিত। তাই 'শ্রোণিভারনিলীনবসনা'রা বৃথাই রূপ-বাণীর সন্ধান দেয়। প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এখন সিনেমার নটীর মতো চটুল বাণিজ্যিক আবেদনের সঙ্গে যুক্ত। আসলে মানুষ এখন একা বোধ করছে। সভ্যতা-শিল্প-সংস্কৃতি এখন নাগরিকজীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। মানুষ সমাজে ক্রমশঃ নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলছে। সমাজ শূন্যগর্ভ একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর মানুষে ভরে উঠছে :

> "Alienation as we find it in modern society is almost total; it pervades the relationship of man to his work, to the things he consumes, to his fellows, and to himself."
>
> (Man Alone)

চতুর্দিকে যেন পাহাড় থেকে পাথর পতনের দৃশ্য। মানুষ স্থির হয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। অদম্য, অদৃশ্য কোন শক্তির চুম্বক আকর্ষণে তার এই চলা। এই চলাচল কেবলই তার নিজের স্বার্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দাস মানুষ ধনতন্ত্রের পেষণযন্ত্রে নিজেদেরকে বলি হিসাবে আহুতি দিচ্ছে। সমাজ-তাত্ত্বিকের সঙ্গে কবিও পীড়িত বোধ করেন কিসের আকর্ষণে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই অন্ধকারের দিকে যাত্রী, অমোঘ আকর্ষণের জন্য। চারহাজার বছর আগেকার এক মিশরীয় ধারাবিবরণীকার (Chronicler) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে Karl Jaspec

লিখেছেন যে সেই সময়েও মানুষ নিশ্চিন্ত ছিল না। তারাও এক ধরণের অসহায়তা, অস্থিরতার দ্বারা পীড়িত হয়েছিল। নগর জীবনের বর্তমান অভিশাপ থেকে তারা তো মুক্ত ছিল, তবু কয়েকহাজার বছর আগে কথিত মানুষের সেই হাহাকার আজকের সভ্যতার বিস্তারের দিনে ও কেন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় :

> Impudence is rife ..oh that man could cease to be, that women should no longer conceive and gave birth. Then at length, the world would find peace"
>
> Introduction (Man Alone)

পঞ্চদশ শতাব্দীর এক ফরাসী কবি 'Eustache Deschamps' যা তাঁর কবিতার কয়েকটি ছত্রের মধ্যে বলেছেন :

> Deep gloom and boredom,
> Justice and Law nowhere to be found.
> I know no more where I belong."—

ফরাসী কবির এই বিলাপের সঙ্গে 'জন্মাষ্টমী'র কবি বিষ্ণু দে-র উপলব্ধি তো মিশে যায় একই সত্য উপলব্ধির মতো। বিষ্ণু দে-কে এই অন্তঃসার শূন্য জীবনের যে কয়েকটি বাছাই করা শব্দের আশ্রয় নিতে হয় তা হল, জগৎতৃণ দগ্ধমরু', 'যৌবনের গান ঝরে / সিরোকোর একঘেয়ে কলি', 'অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগর সন্তান', প্রাক্তন প্রমাদে কোল মুমূর্ষায় / হৃদয় 'বিষায়'। এই জীবনের ব্যর্থতা, পঙ্গুতা কবির বিশ্বাসের জগৎটাকে ধরে নাড়া দিয়েছে। নতুন সমাজ বিপ্লব বা রূপান্তরের ছবি 'পদধ্বনি' কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু 'জন্মাষ্টমী'তে বিশেষ একটি শ্রেণীর হাহাকার বা শূন্যতা বোধ কবিকে সরিয়ে নিয়ে এল পুরাণের মধ্য থেকে। তবু নাগরিক জীবনের সেই শূন্য গর্ভ ছবি আঁকতে কবি পিছিয়ে পড়েন না। খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি বিষ্ণু দে 'স্বর্ণমারীচের ডাকে' 'কস্তুরীযূথের পায়ে' আত্মসমর্পণকে নিরাসক্ত-ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কারণ কবি বিষ্ণু দে সমাজ রূপান্তরের আগে ভাঙনের এই ছবি সম্পর্কে ইতিহাসের অমোঘ ভূমিকাটি জানেন। তাই ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী চেহারার স্ফীতোদর স্বরূপটিকে বোঝানোর জন্য কবি সেই ছড়ানো মাকড়সার জালটিকে ব্যবহার করেন। যেখানে রমনীর কটিদেশকে ধরে রাখা 'নীবিবন্ধন' তার লজ্জা নিবারণ বস্ত্রের সঙ্গে তুলনাযোগ্য হয় না বরং 'মূলধন বা পুঁজি' এই অর্থ হিসাবেই কবির কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়। কবি তাই সংকীর্ণ অর্থে 'নীবি'কে ব্যবহার করেন না :

"পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিযত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানা অছিলায়
কস্তুরীযূথের পায়ে
উর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধুলায়।" (জন্মাষ্টমী)

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে কবি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে যন্ত্র-সভ্যতা মানুষকে তার চেতনালোকে বিসর্জন দিযে ক্রমশঃ মূলধনের দাম হিসাবে তার আলাদা সত্তাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। প্রথমে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, তারপর বিদ্যুৎ এবং পরবর্তীকালে পরমাণু শক্তির ব্যবহার উন্নতির পথ খুলে দিল। এর পশ্চাদ্ অনুগামী হয়ে এলো মূলধনের অপরিমিত সঞ্চয়। একদিকে অপরিমিত ধনসঞ্চয় যেমন দ্রুত হারে বেড়ে চলেছিল আবার পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহার বা পরিচিতির উপর তার নিয়ন্ত্রণকে গড়ে তুলেছিল। Karl Ployani মানুষের স্বাভাবিক সত্তাকে কিভাবে যন্ত্র নষ্ট করে দিযেছিল তার বর্ণনা করে লিখেছেন :

"To separate labour from other activities of life and to subject it to the laws of the market was to annihilate all organic forms of existence and to replace them by a different type of organisation, an atomistic and individualistic one." (*Introduction / Man Alone*)

'সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষা' মানুষকে কিভাবে নষ্ট করে দিয়েছে বিষ্ণু দে এই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাটিকে জানেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দাস মনোভাবকে বেড়ে ওঠার জন্য প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার হাত থেকে মধ্যবিত্ত মানুষেরও নিষ্কৃতি নেই। এইজন্যই মধ্যবিত্ত মানুষ তার দোলাচল মনোবৃত্তির দ্বারা বিশেষভাবে আন্দোলিত হয়। 'স্বর্ণমারীচের ছলনা'কে কখনও কখনও সত্য বলে ভাবার মতো ভ্রমও তাকে করতে হয়। কবি মধ্যবিত্ত মানুষের যন্ত্রণাকে জানেন, বোঝেন, উপলব্ধি করেন বলেই প্রশ্নজিজ্ঞাসুর মতো জানতে চান এই সীমাবদ্ধ মানুষের অন্তঃমূল কতখানি গভীরে প্রসারিত :

"ঠিক জানো, ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না ?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি।
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দেশের সেবায়।" (জন্মাষ্টমী)

'ব্যক্তিত্বহীন' মানুষের মধ্যবিত্ত মানসিকতা তাকে দোটানার মধ্যে রাখবে। এই ভাবেই সে 'সমিতি', 'কমিটি'র গোলকধাঁধায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু তার মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র বদল ঘটবে কিভাবে? জর্জ সিমেল আধুনিক নগরজীবনের সমস্যা অনুধাবন করে এর কারণটা জানিয়েছেন মানুষ শহর-জীবনের দ্রুত বর্ধমানতার মাঝখানে নিজের অস্তিত্বকে এবং ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তার চেষ্টার চেয়ে বৃহৎ শক্তিশালী অন্য তরঙ্গ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন সেই ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোর মতো যে বস্তুটি সামনে পায় তাকে আঁকড়ে ধরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করে তবে তার মানসিকতার মাঝখানে এক ধরণের দ্বিধা এসে তার ব্যক্তিত্বকে বেশ খানিকটা খণ্ডিত করে দেয়। এই খণ্ডিত মানসিকতাই মধ্যবিত্তের মানসিকতা। দ্রুত নগরায়নের জন্য ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে দুটি বিষয় ঘটে যাবে তার প্রথমটি হল : ১) a social dislocation of stupendous proportions এবং দ্বিতীয় কারণটি হল দারিদ্র বা Poverty ক্রমাগত সঞ্চয় বা বিত্তের প্রাচুর্য বৃদ্ধি এবং দরিদ্র মানুষের সংখ্যাহীন বৃদ্ধিতে পৃথিবী যেন ভরে যাচ্ছে। কবি বিষ্ণু দে এই ধনী সভ্যতার অর্থহীন, চাকচিক্যকে বোঝার চেষ্টা করেন :

> "আমি যেন গ্রাম্য জন
> বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
> সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
> বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
> শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।" (জন্মাষ্টমী)

এই 'শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর' সেই দানবের মুখ। যে সভ্যতা, সংস্কৃতি উৎপাদনকে গ্রাস করে তাকে জীর্ণ করে যেন ক্লান্ত। তাই কালের ছবি, সময়ের ছবি দ্রুত সরে যায়। কিন্তু একটি ছবি অনড়, অচল অবস্থায় ফ্রেমে আটকানো থাকে তা হল যে কোন ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠা শহরের অজগরগ্রাসী চেহারা। জীবনের ছবি কলকাতা কিংবা ম্যাঞ্চেষ্টার যেখানকার হোক না কেন খুব একটা পৃথক নয় তাদের ধূলি ধূসরিত ছবি :

> "Life in such a town brought no alleviation of the tyranny of the industrial system', it only made it more real and sombre to the mind. There was no change of scene or

colour, no delight of form or design to break its brooding atmosphere."

(*Man Alone*)

বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে 'গ্রাম্যজনের' কথা আমরা পড়ি আসলে সেই গ্রাম্য মানুষের ,ষ্টির সারল্য শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কারণ গ্রাম ও শহরের মধ্যে ফারাক বা ব্যবধান অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। এখন শহরের সেই মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় বিব্রত, একের পর এক তাড়নায় সে বিহ্বলতার শিকার হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের ছবির মধ্যে তাই বিশেষ কোন রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য কবি যে কয়েকটি পংক্তি ব্যবহার করেন :

সূর্যের সারথী নেই, অশ্বমেধ বইনাকো
বাজার সরকার,
বড়ো জোর. পাটকলে পদস্থ কেরাণী
জজকোর্টে উকিলই হয়তো-বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।" (জন্মাষ্টমী)

মধ্যবিত্ত মানুষটিকে তাই কোন ভাবেই উদ্বেলিত করে উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয় না তার জীবনধারণের প্রক্রিয়া। তাই 'মোহনবাগান'. 'য়ুলিসিস', হেক্‌টর' 'কুরুবক পারিজাত বনে'—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পৌরাণিক চরিত্র এবং ঘটনার প্রয়োগ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে না। এই মানসিকতার সীমাবদ্ধতা মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ জগতের মধ্যেই আবদ্ধ। তবু মাঝে মাঝে মনের উন্মোচনও ঘটে যায় :

"আশা করি সুরঙ্গমা, ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐক্যতান
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃত আধার
ভেসে যায় পক্ষিরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে।" (জন্মাষ্টমী)

উপরের উদ্ধৃতির শেষ পংক্তিতে ব্যবহৃত 'জটা' শব্দটি তাই কি মধ্যবিত্ত মানসিকতার জটিল স্থবিরত্বকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ? এই কারণেই মধ্যবিত্ত মানসের গ্রন্থকীটসর্বস্বতার মাঝখানে 'ডিয়োটিমা' যাঁকে 'a priestess Mantinea, reputed teacher of Socrates in Philosophy", বলে জানা যায়, কিংবা গ্যালাহাডের

কথায় জানা যায় Malory'-র 'Morte d' Arthur' নামক কাহিনীর একটি চরিত্র যিনি 'Predestined by his immaculate purity to achieve the quest of the Holy Grail'-কে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এমন চরিত্র এবং ঘটনার উল্লেখের মধ্যে তার গ্রন্থপ্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবি জানেন যে মধ্যবিত্তের যে অস্তিত্ব তার বিশেষ কোন মূল্যমানের হেরফের এর দ্বারা ঘটে না। তাই মধ্যবিত্তের বহু ব্যবহৃত জীর্ণ মানসিকতাকে ভেঙে ফেলার জন্য 'নাচিকেত মেঘের' শরণাপন্ন হন কবি। যে মেঘ এতদিনের জমে থাকা পাতালের মতো গভীরে প্রোথিত মানসিকতাকে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য সাহায্য করবে :

"ধুয়ে দিক, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ অঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক, বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে
বেঁধে দিক্ হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে।"

কিন্তু দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষতের প্রলেপ সুশ্রুতের পরিচর্যা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কারণ দৈনন্দিনতার জালের ঘেরাটোপ স্বর্ণমারীচের আকর্ষণের মতো মধ্যবিত্ত গৃহবন্দী মানুষটিকে উর্ণনাভের মতো একই জায়গায় জাল তৈরীতে বাধ্য করে :

"তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্‌ই ভালো, না-হয় তো ফ্লাশ্‌।
ঘোরতর উত্তেজনা ধূমপান আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপর বাড়ি
অম্লশূল আর সর্দিকাসি
এলো মেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেষি ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।"

(জন্মাষ্টমী)

তবু জীবনরথচক্র থেমে থাকে না। মধ্যবিত্তের গ্লানিময় জীবনযাত্রার মাঝখান দিয়ে সময়ের সূক্ষ্ম জীবনরেখাটি এগিয়ে চলে। যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব-এর মাঝখান দিয়ে জীবন চলে নানাবিধ স্বার্থ, লোভের মধ্য দিয়ে এবং এরপর 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে'। এখন কেবলই যে জীবন মন্থরতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল তারই স্মৃতিচারণ। 'Gerontion'-এর সেই বৃদ্ধের মতো :

"Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

I was neither at the hot gates

Nor fought in the warm rain.…"

এখন দিন কেটে যায় অবকাশ মন্থরতার মতো। বারংবার সময় মনে করিয়ে দিয়ে যায় :

"I an old man,

A dull head among windy spaces," (*Gerontion*)

বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষটি এখন যযাতির মতো জরাগ্রস্ত। এখন আর্তনাদের মতো শোনায় কোন এক শূন্যপ্রাসাদে মেঘের আলির মতো কেউ বলছে :

"Weave the wind. I have no ghosts,

An old man in a draughty house

under a windy knob." (*Gerontion*)

বিষ্ণু দের 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ যে দৃশ্যচিত্র রচনা করে তা শেষ পর্যন্ত মিলে যায় Gerontion-এর সেই বৃদ্ধের মানসিকতার সঙ্গে :

"অম্লশূল আর সর্দিকাসি

এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।"

যা 'Gerontion'-এ এলিয়ট লিখেছেন তা মিলে যায় :

"I have lost my sight, smell, hearing, taste and
touch."

How should I use them for your closer contact ?"

'জরিষ্ণু প্রহর' শেষের অপেক্ষা বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী'র প্রৌঢ় অপেক্ষা করে। দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত মানসিকতা যেন তার ব্যর্থতার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কিছুটা প্রৌঢ় মানসিকতার নিরানন্দময় জগত থেকে পরিত্রাণের আশায় শোনা যায় এক আর্ত চীৎকার :

"ক্ষান্ত করো, ক্ষান্তো করো, এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ,

তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা

হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ।"

বারংবার সূর্যের কাছে প্রার্থনা এই অন্ধকারের উপর আলো ছড়িয়ে যাক। প্রৌঢ়, বৃদ্ধের জীবন হিরণ্ময় আলোতে হয়ে উঠুক উদ্ভাসিত। কিন্তু নাগরিক জীবনের অন্ধ গলিপথ জীবনকে বেঁধে রাখে অটুটভাবে। তাই মনে কি পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশে পুত্রী বিয়োগ, শ্মশানের আগুন ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে : 'পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের

নিরানন্দ দ্বার।' কিন্তু কবি বিষ্ণু দে শুধু পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশের মধ্য দিয়ে ব্যাপৃত থাকবে কি? কারণ তাঁর ঐতিহাসিক সামাজিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের সময় মনে পড়ে এই দেশটাকে লুণ্ঠন, শোষণ করতে এসেছে সমুদ্রপারের বণিকেরা। জীবনের সারাংশটুকুকে ভক্ষণ করে সমাজ এখন সেই Gerontion-এর বৃদ্ধের মতো পরিত্যক্ত :

'অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসু সমান।" (জন্মাষ্টমী)

বিদেশীদের দ্বারা লুণ্ঠিত এবং রিক্ত এই দেশ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র ধারণা যে মার্কসীয় সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই :

"যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা জীবনের যে স্তরেই সূচিত হোক, 'পূর্বলেখ'-এর বিভিন্ন কবিতা শ্রেণীসমাজের শোষণ ও মানবিক অসঙ্গতিতে তার যোগসূত্র নির্দেশ করে। তারপর চারদশক ধরে বিষ্ণু দে তাঁর সমকালের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন।" [**আরম্ভ ও তার পরে (প্রবন্ধ) / অশোক সেন**]

নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণ করেননি 'জন্মাষ্টমী' কবিতার নির্দিষ্ট পাঠের মধ্য দিয়েই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে :

"চিন্তার দিক থেকে জন্মাষ্টমী বিষ্ণুবাবুর চরম রচনা। নানান ছবি,—এলোমেলো, অনেক সময়েই একান্ত খাপছাড়া। একেবারে আধুনিক মনের প্রতিচ্ছবি। শৃঙ্খলা দূরের কথা, একটা শান্তভাব পর্যন্ত নেই। প্রচ্ছদপটের ছবিটা জলজ্বলে হয়ে ওঠে, ভাঙাচোরা, বিশৃঙ্খলতা, বীভৎসতা। সেখানেও আধুনিক মনকে শিল্পী নগ্নভাবে এঁকেছেন। বস্তুত যামিনীবাবুর ছবির সঙ্গে আধুনিক কাব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; দুয়ের উৎস এক, প্রভেদ শুধু ভাষার।"

'পূর্বলেখ' / কবিতা ভবন ১৯৪১ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাগরিক জীবনের উপরকার চাকচিক্য দেখাতেই কবি ব্যবহার করেন চাঁপা ফুলের কথা প্রত্যক্ষভাবে না বলে 'কাকুটস্ গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা' এবং উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের কৃত্রিম জীবনের টুকরো ছবি কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। যেমন 'রাজাস্ পেগ, 'রিমার্কএবল ইনটারেস্টিং', স্টালিনের মতো রাষ্ট্রনায়কের উল্লেখ করার পরই কোন এক মহিলার টেনিস খেলার জুড়ি সম্পর্কে কবির সকৌতুক জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে নগরজীবনের ছবি বিশেষ একটি শ্রেণী সম্পর্কে

পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই জীবনের ছবির রিপোর্টাজ সংগ্রহই কবির একমাত্র লক্ষ ছিল না একথা জানিয়ে লিখেছেন :

'এলোমেলো ভাঙাচোরার মধ্যেও তাই আর একটা একটানা সুর পাই, কবির সুকুমার মন থেকে সে সুর উঠছে, সে মন সুন্দরকে চায়।"

এই সুন্দরের আহ্বান কবির অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসছে বলেই :

"অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুই হাতে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
চলেছে দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা
কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায় ?" (জন্মাষ্টমী)

আপাত বিচ্ছিন্ন এই ছবিগুলির মধ্যেও এক সংহতিসূত্র যুক্ত আছে বলেই কবি নাগরিক জীবনের ক্রটির কথা বলার পরেই মধ্যবিত্ত চেতনাকে জাগ্রত করার সংকল্পব্রত গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্য প্রীতির কথা বলার সূত্র ধরেই পাঠককে পৌঁছে দেন বিষ্ণু দে-র কাব্যজীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দানের মধ্যে :

"···Soon transformed himseif to an interpreter of contemporary social life and finally came out as a singular, serious and difficult poet."

বিষ্ণু দে দুর্বোধ্য কবি ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য সম্পর্কে সহমত পোষণ না করে বলা যায় বারংবার ঘষামাজার মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতাকে একটি জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন বৃহত্তর তাৎপর্য যার মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে :

"His poetic character is seen in the way he is constantly revising his work, rearranging earlier verses so as to give them an import not intended at the time of composition, joining fragments and occasional pieces in a wider significance···"

(An Acre of Green Grass-Page 63)

তাই 'কল্মষ বিলাস', 'কিণ্বস্রাবী', 'করকাধারা', 'ভগ্নতৃণ', 'সিরোক্কো', 'অরিঘ্নু প্রহর' 'অমাকৃষ্ণ তমিস্রা', 'নাচিকেত', 'কাংস্যরবা' ইত্যাদি শব্দার্থ বুঝতে গেলে এবং এর তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গেলে পাঠককে কিছুটা বিব্রত হতে হলেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টি জানা হয়ে গেলে তখন মনে হয় :

"...and the great virtue of Bishnu Dey's Poetry is ; I think, a haunting music which can come only from one who writes poetry because he must."

(An Acre of Green Grass-Page 64)

১৯৩৬ এর কলকাতার বিপর্যস্ত বর্তমান ও তার সঙ্গে স্বপ্নের সংঘাতের ছবি কবি আঁকার সময় ইউরোপীয় সিমফনির প্রসঙ্গ এসেছে কারণ, "নবম সিমফনির প্রেরণার স্বীকৃতি তো আছেই কবিতার শরীরে আর এ সময়ে প্রতীচ্য সঙ্গীতের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথা বলেছেন অনেকেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়।" অরুণ সেনের এই মন্তব্য যথার্থ ও চিন্তাউদ্রেককারী। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র মন্তব্য এবং চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি পাশাপাশি ধরলেই বিষ্ণু দে-র প্রতীচ্য সংগীত সম্পর্কে আগ্রহ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। বিষ্ণু দে লিখেছেন,

"...১৯৩৮ সালে মহা ব্যস্ত ঝোঁকে লেখা "জন্মাষ্টমী", তাতে চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানের বিরাট জ্ঞান নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, 'বেঠোফেনের নবম সিমফনিয়ার 'no more discord" এবং "Joy" থেকেই আমি মূল ভাবটি পাই, তার চেয়ে বরং আমি রূপগত ভাবে বেশি অনুপ্রাণিত বাখ, এর ফ্যুগে।"

'বিষ্ণু দে এ ব্রতযাত্রা'র লেখক অরুণ সেনকে চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন

"বিষ্ণু দে র প্রকৃত শক্তি তাঁর অনবদ্য diction, সংগীত নয়। তবে তাঁর কবিতা এমন জায়গায় পৌছতে পারে যেখানে সংগীতবোধের প্রয়োজন। একটা প্রতীচ্য সংগীতের ফর্ম বিষ্ণু দে বা এলিয়টের কবিতায় আছে বটে, এবং তা থাকার ফলে কী ধরণের একটা নতুন dimension এসেছে সেটাই বিবেচ্য। ফলে একটা aesthetics এর বিবেচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।...'হরি আমাদের রথস্ চাইল্ড, দেশের মাথা ও / মুখ উজ্জ্বল' পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে scherzo জাতীয় মুভমেন্টের মিল অবশ্যই আছে।..."দুটো মিলও চলে" এই Phrase টিও একটি সাংগীতিক inversion। কিন্তু বাস্তবিকই কি এই inversionটি সংগীত থেকে এসেছে, না diction এর অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের overtone থাকার ফলে এক অনবদ্য কবিতা সম্ভব হয়েছে।...আপনি যদি diction থেকে সংগীতের দিকে যান তাহলে aesthetics পুরোপুরি ধরা যাবে। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। "নিচে, বৈশ দশ-বারো হাত পিছু স্তরে"

"বেশ দশ বারো হাত" Phrase টি সংগীতের বশবর্তী হলেও আসলে এটাই হল diction। সংগীতের overtone আছে বলেই এক অপূর্ব কাব্য সম্ভব হয়েছে।" (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬)

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে 'জন্মাষ্টমী' অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্যকে ধরতে পারা আরো সহজ হল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কুৎসিত চেহারাটি স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ে। নাগরিক জীবনে বনিকের মানদণ্ড কি ধরনের ছায়া সম্পাত ঘটায় বিষ্ণু দে তা লিখেছেন :

"দুটো মিলও চলে ধর্মঘটের উপায় নেই ;
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার
খাদি প্রচারের মস্ত লীডার
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরনীয় তার বেয়াই।
বনিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই।" (জন্মাষ্টমী)

বিনয় ঘোষ তাঁর 'কলকাতার মন' নামে একটি প্রবন্ধে এই মেট্রোপলিটন জীবনের ধারক, বাহক, নিয়ন্তাদের সম্পর্কে বলেছেন 'Finance, insurance, advertising'- এই ত্রিমূর্তিরই আধিপত্য। "মহানগরের মর্যাদাপ্রতীকসর্বস্ব নাম গোত্রহীন সমাজে জমাটবদ্ধ জনতার মধ্যে তাই প্রত্যেক মানুষের নির্জনতাবোধ যত তীব্র হচ্ছে তত তার বিচারবুদ্ধিহীন গড্ডালিকাবৃত্তি প্রখর হচ্ছে।" (বিনয় ঘোষ)

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার তাহলে এই অপ্রতিহত জয়যাত্রা কি অব্যাহত থাকবে? Albert Camus কি তাহলে অন্তিম পরিণতির যে ছবি এঁকেছেন তা তাঁর মত বড়ো মাপের সাহিত্যিকের ধ্রুব উপলব্ধির মতো যা বলেছেন তাই সত্য হয়ে থাকবে : "At the end of the awakening comes, in time, the consequence : suicide or recovery." 'আত্মোদ্ধার না হয় আত্মবিলোপ' সভ্যতার এই কি শেষ কথা :

'না জানি কোটায় কত বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।' কিন্তু 'জন্মাষ্টমী'র কবি একেই শেষ কথা বলতে রাজি নন। কারণ :

"সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা,
রাঙা মুখ ফিরায় বুঝি-বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোক কাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তি স্নান লজ্জিত দর্বের

উচ্চৈঃশ্রব রক্তিম ধারায়

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশ।

আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বা বেগে।" (জন্মাষ্টমী)

শিলারের যে কবিতাটিকে বেঠোফেন নিজের মতো করে সাজিয়ে স্বরারোপ করেছিলেন, 'বিষ্ণু দে এ ব্রতযাত্রা' গ্রন্থে শিলারের সেই কবিতাটিকে উল্লেখ করে জানানো হয়েছে :

"O Friends, no more these sounds continue

Let us raise a song of sympathy, of gladness,

O Joy, let us praise thee। ·.....

O ye millions, I embrace ye।

Here's a joyful kiss for all."

বিষ্ণু দে কবিতার শেষ অংশে বেঠোফেনের রচিত সুরটিকে ব্যবহার করেন কিছুটা অর্থান্তর ঘটিয়ে অর্থবৈচিত্র্য এনে :

হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,

এ-সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে।

আনন্দের যে ভৈরবী যে মিড়ে মিড়ে

সুষুম্নার শিরে -শিরে

সাযুজ্য সংগীতে।' (জন্মাষ্টমী)

'এ-সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে' মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানে আস্থাশীল কবি জানেন সমাজের চেহারার পরিবর্তন করতে হবে। কংসনিধনের জন্য জন্মাষ্টমীর ঝড়-জলের মধ্যেই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। ধনতন্ত্রের কংসবধের জন্য 'জন্মাষ্টমী'তে গোকুলে যিনি বেড়ে ওঠেন ধীরে ধীরে তাকেই স্বাগত জানাতে হবে। পৌরাণিক কৃষ্ণকে কবি চকিতে স্থাপন করেন সমাজ বদল বা রূপান্তরের নায়ক রূপে। কিন্তু তা যতদিন সম্ভব হয় না—সেই প্রতীক্ষার প্রহর গুণে সময় কাটান কবি—কারণ তিনিও তো এই ধনবাদী সভ্যতার এক শিকার—

"অধমর্ণ জনতার উদ্গীথ-মুখর

এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,

কুম্ভীরক তাই॥ (জন্মাষ্টমী)

'জন্মাষ্টমী' কবিতার শেষ পাঠের পর আধুনিক কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা কবিকে অবশ্যই করতে হবে।'

॥ নির্দেশিকা ॥

['পদধ্বনি' কবিতার আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করেছি।]

১. মহাভারতের কথা—বুদ্ধদেব বসু (১৯৭৪)

২. মহাভারতের কথা—অমলেশ ভট্টাচার্য (১৯৮:)

৩. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮০)

৪. Modern European History—K. Perry (1982)

৫. The Communist Manifesto—Karl Marx and Friedrich Engels

. বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়—অরুণ সেন

৭. বিষ্ণু দে : কালে ও কালোত্তরে—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮২)

৮. কবিতাসমগ্র : বিষ্ণু দে—১৯৮৯ (আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করণ)

৯, Literature and the Rise of Capitalism—Raymond Southall. (1973)

১০. Literature, the Individual and Society—Raymond Southall (1977)

['জন্মাষ্টমী' (পূর্বলেখ) কবিতাটির আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

১. বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা (নাভানা সংস্করণ)

২. কবিতাসমগ্র বিষ্ণু দে (আনন্দ সংস্করণ, জুলাই, ১৯৮৯)

৩. বছর পঁচিশ বিষ্ণু দে (বিশ্ববাণী প্রকাশনী)

৪. T. S. Eliot : Collected Poems-(1909-1962)-(Faber and Faber, 1963)

৫. Yeats -Deris Donoghue (Fontama, 1971)

৬. Children of the Mire (Modern poetry from Romanticism to the Avant-Garde)—Octavio Paz (Harvard, 1974)

৭. Man Alone—Ed. by Eric and Mary Josephson-(Laurel edition, 1975)

৮. Modern Poetry and the Tradition—Cleanth Brooks (North Carolina Press' 1967)

৯. বিষ্ণু দে, এ ব্রত যাত্রায়—অরুণ সেন (অরুণা প্রকাশনী / ১৯৮৩)

১০. বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ—বেগম আক্তার কামাল (মুক্তধারা, ১৯৭৭)

১১. New Bcaiings in English Poetry—F. R Leavis.

১২. বিষ্ণু দে : কালে, কালোত্তরে—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (মৌসুমী, ১৯৮২)

১৩. Eliot : Stephen Spender (Fontana),

১৪. 'পরিচয়' (বিষ্ণু দের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি সংখ্যা জুলাই, ১৯৭৯)

১৫. An Acre of Green Grass—Buddhadeva Bose (Papyrus 1982)

১৬. Oxford companion to Literature—Paul Harvey.

জীবনই কবিতা—কবিতাই জীবন

প্রণতি দে

অর্ধশতাব্দীর অনেক পেছনে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে এই লেখা লিখতে! যদি তখন জানতুম এটি আমার কর্তব্য, তাহলে নিশ্চয় অন্যভাবে প্রস্তুত হতাম! এখন তাই অসহায়ভাবে—সমুদ্রস্রোতের মধ্যে যেন হাবুডুবু খাচ্ছি! মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ১৯৩২ সালে। বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলুম ১৯৩১ সালে, কিন্তু মায়ের অসুখ, মৃত্যু এবং ছোট ভাইয়ের অসহায় শোক ও অস্থিরতার জন্য আমার এম-এ পড়বার অনুমতি পেলুম মামা বাড়ী থেকে, লেট-ফি দিয়ে নভেম্বরে, ১৯৩২-এ। তখন নিয়মিত ক্লাস শুরু হতো জুলাই মাসে. পরীক্ষা হতো দু'বছর পর ঠিক জুলাইতে, ফলাফলও ঠিক সময় প্রকাশ হতো। আমাদের এম-এ ক্লাসে আমাকে নিয়ে হয়েছিল ১০টি মেয়ে আর আমারই বোধ হয় শেষ রোল নম্বর—১৭৫।

আমি তখন ব্রাহ্মসমাজ হোস্টেলে-বিডন স্ট্রীটে থাকতুম। ভর্তি হবার পরই আমি এক অসাধারণ বন্ধু পেলাম—সুলতা মুখার্জী তার নাম। সুলতা স্কটিশের মেয়ে আর আমি একেবারে পর্দানসীন লোরেটো—সেই ছোটবেলা থেকে বি-এ পর্যন্ত। জানি না, আমার চেহারায় কি এমন ছাপ ছিল যা অন্তত দু'জনের চোখে পড়বার মত—তবে একটা মজার গল্প আছে এ ব্যাপারে। আমার ঠাকুরদা দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর ('নব্য ভারত' পত্রিকা,) ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায় (তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, এখন বিধান সরণী) দুটো বাড়ী ছিলো। ১৯৩০ সালে আমরা তিন ভাই-বোন (আমার ওপরের দুই দাদা আগেই চলে গেছেন আর ঠাকুর্দা ১৯২১ তে এবং বাবা ১৯২২-এ) মায়ের সঙ্গে ওই দুট বাড়ি সারাবার ও সহজে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য সাময়িকভাবে বিডন স্ট্রীটে গিয়ে বসবাস করি। আর তখনই মা'র কঠিন অসুখ সুরু হয় (যদিও তখন তা বুঝিনি!) জীবনময় রায় (জীবনকা') বাবা-মা'র বন্ধু—আমাদেরও। উনি ভাড়া তুলে রাখতেন, আমি ওঁর বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে—আমার খরচা, ভাই বোনের খরচা চালিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে দিতুম। সুলতাও আমার সঙ্গে থাকতো, ওর বাড়ী ছিলো বাগবাজার—যামিনীদার পুরনো বাড়ীর কাছে। আমরা আমাদের হোস্টেলে যেতুম, বিডন স্ট্রীট থেকে সুলতা বাসে উঠতো। এক দিন জীবনকা'র বাড়ী গিয়েছি—

জীবন-কা টাকা বার করে দিয়ে বললেন— ওমলেট খাওয়াবি চায়ের সঙ্গে? সুলতা স্টোভ ধরাল, আমি ডিম ফেটালুম, ওমলেট ভাজা হোল, চায়ের কেটলি স্টোভে বসানো দেখে জীবন-কা বললেন—বস্—একটা বই হাতে দিয়ে বললেন—পড়। আমি মলাট খুলে জোরে জোরে পড়লুম—সফরী চোখের সরল চাহনি—একটু মজার সুরে নিশ্চয়ই—আমার ব্রাহ্ম ধর্ম ও বাংলা কবিতা সীমিত ছিল রবীন্দ্রনাথের গানে ও কিছু কবিতায়! ঠিক সেই সময়ে একজন ধবধপে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরণে ঘরে ঢুকলেন! আমিও বলে উঠেছিলাম—এই ছেলেটি আমাদের ক্লাসে পড়ে; জীবন কা যে কী তক্ষুণি বললেন—দাঁড়া আলাপ করিয়ে দি!—বিষ্ণু দে—প্রণতি রায় চৌধুরী—সুলতা মুখার্জী! আমার ঠিকই মনে হয়েছিল—ধরণী দ্বিধা হও।

ভদ্রলোক বসলেন না, তক্ষুণি চলে গেলেন। আমার মনের অবস্থা আমি জানি, কিন্তু খুবই লজ্জা পেলুম। কিন্তু এর উত্তর আমি পেলুম যামিনীদার ভাষায় অনেক পরে—'এর ধ্বনিই আলাদা'! সত্যিই তো আমার কানে ছিল বিদেশী কবিতার ধ্বনি, এবং অল্প যা কিছু পড়েছি অন্য কবির, মায়ের তাগাদায়। এবং স্বেচ্ছায় ও মায়ের ইচ্ছায়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা—তারও ধ্বনি আলাদা! রবীন্দ্রসংগীতও আলাদা, যদিও কবিতা হিসেবেও সেগুলি দারুণ। কিছু পড়েছি। আমার মা খুব ভালো গান করতেন, এবং ছোট বেলায় আমার দাদা ও আমি গান শিখতুম—ইন্দিরা দেবী সংগীতসঙ্ঘে'—এবং 'ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকা সম্মেলনীতে'; আর 'ছোটদের সমাজে'—গান করতুম ও কবিতা পড়তুম—বাবা মারা যাবার আগে ও আমার লক্ষ্ণৌ-এ কনভেন্টে বোর্ডার হবার আগে পর্যন্ত। মায়ের ইচ্ছায় গ্রীষ্মের ছুটিতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছেও কিছু বাংলা পড়েছি—কবিতাও—গ্রীষ্মের ছুটিতে যে বছর বাড়ীতে আসার অনুমতি পেতুম। [কেম্ব্রিজ পরীক্ষা তখন হতো, যে বছরে বাড়ী আসতে পেতুম না, পরীক্ষার পর ডিসেম্বরে এক মাসের জন্য ছুটি পেতুম।]

যাই হোক—এর কিছুদিন পরে একদিন বিকেলে ক্লাসের পর সুলতা আর আমি ফটক দিয়ে যখন বেরুচ্ছি, দেখি সেই ভদ্রলোক একটি বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে হাত বাড়িয়ে বইটি দিলেন—কিন্তু কাকে? সুলতা হাত বাড়ালো না, আমিও না। কিছুক্ষণ পর আমিই হাত বাড়িয়ে বইটি নিলুম। বললেন পড়ে দেখবেন? আমার খুব লজ্জা করছিলো—উর্বশী ও আর্টেমিস—পরে পড়েছিলুম—কয়েকটি কবিতা বিশেষ করে ভালো লেগেছিল—কিন্তু বলবো কাকে? সে সাহস কি আমার ছিল? দ্বিধায় আমি ছিন্ন ভিন্ন!

সে সুযোগ অবশ্য উনিই আবার ঘটিয়ে দিলেন। আমাদের একটা "পেপার" ছিল

Common-Foreign Classics in translation. আমাদের প্রফেসার K. C Mukherjee (কিরণ চন্দ্র মুখার্জী) আমাদের বলেছিলেন গ্রীক ড্রামা বুঝতে হলে—Dr. Verrall এর বইয়ের introduction-টা পড়তে হবেই। উনি লেকচারে বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু বইটিও পড়তে বললেন। একটি মাত্র কপি লাইব্রেরীতে—সে কী আমরা মেয়েরা কখনও পেতে পারি ? হঠাৎ একদিন দেখি, কলেজের গেটের সামনে আমি ঢুকতে যাচ্ছি—আমাকে হাত বাড়িয়ে কী যেন দিচ্ছেন ! অবাক হয়ে দেখলুম —Verrall-এর Introduction-টা—typed copy ! আমি নির্বাক হয়ে চেয়েছিলুম —তখন বললেন—Dr. Verrall-এর Introductionটা বাবার আপিস থেকে type করে এনেছি। আমি কি বলেছিলুম, মনে নেই—খ মেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম মনে পড়ে ! আমরা মেয়েরা যে ক'জন Greek Drama নিয়েছিলুম সেই নোটস্ পেয়ে কী যে উপকৃত হয়েছিলুম বলবার নয়। কক্ষনো তো ও নোটস্ পেতুম না, জানি ! তারপরেও অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের।

প্রফুল্লবাবু (ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ) প্রেসিডেন্সী কলেজে সেমিনার ঘরে ছাত্রদের extra class নিয়ে সব নাটক এমনকি Areopagitica পর্যন্ত পড়াবেন ঠিক করেছেন। আমরা যখন খবর পেলুম তখন তিনি অনেকগুলি বই শেষ করে ফেলেছেন। একদিন আমাকে উনিই (বিষ্ণু দে) জানালেন এ খবর। আমি তক্ষুনি প্রফুল্লবাবুর কাছে গেলাম—স্যার, আমরা মেয়েরা দাঁড়িয়ে ফেল করে যাব—আপনি ছাত্রদের সব পড়িয়ে দিচ্ছেন ! —প্রফুল্লবাবু, আমার মেজমামার সহপাঠী ছিলেন, যখন এম. এ পড়তে আসি মেজমামা আমায় চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, তাই আমি নিঃসঙ্কোচে প্রফুল্লবাবুর কাছে গিয়েছিলুম। উনি বললেন, উনি তো সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ছাত্রদের ক্লাস করেন—মেয়েরা কি করে আসবে ? আমি বললুম—আমরা দল করে আসবো, দল করে যাবো—আমরা তো সাবালিকা ! উনি কিন্তু মানলেন না —বললেন, ভোরে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ক্লাস নেবেন। —আমাদের তো কষ্ট হয় নি কোনো, কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সুরু হোত ১২ টায়—প্রফুল্লবাবুরই কষ্ট হোত নিশ্চয়ই, কারণ প্রেসিডেন্সীর ক্লাস তো আগে ! একদিন স্যার ক্লাস নিতে আসবার সময় পড়ে গিয়েছিলেন, মেডিকেল কলেজে ফার্ষ্ট এড নিয়ে ব্যানডেজ বেঁধে এসে আমাদের কাছে "ক্ষমা" চেয়ে নিয়েছিলেন। সেদিন সত্যিই আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু সব বইগুলি—অন্তত বেশীর ভাগ বই-এর—গদ্য পর্যন্ত প্রফুল্লবাবুর বক্তব্য ও মতামত শুনে যে কত সাহায্য পেয়েছি এবং উপকৃত হয়েছি সে তো লিখে বোঝানো যাবে না—নিজেরাই উপলব্ধি করেছি, এখনও কৃতজ্ঞ চিত্তে তা স্মরণ করি।

ঠিক এই ভাবেই জানতে পারলুম যে প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ metaphysical Poetry এবং অন্য বইও পড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা রবিবাবুর কাছে ওঁর ক্লাস করবার অনুমতি চাইলুম। উনি দ্বিধা করছিলেন—রিপন কলেজের ছেলেরা যদি কিছু বলে বা করে! আমরা বললুম—আমরা যাব সদলবলে, ক্লাস করে ফিরে আসব—এর মধ্যে তো কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়—যদি হয় তো সে দায়িত্ব আমাদেরই। —ফলে অনুমতি পেয়ে গেলাম। দল বেঁধে আমরা দশ জন যেতুম, ক্লাস করে ফিরে আসতুম। কেউ কখনোও আমাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন নি। তখন ওঁর সঙ্গে আরও খানিকটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো মেয়ে—কলকাতার মেয়ে—আমার নামে অনেক বাজে কথাই রটনা হোত। একদিন আমি ওঁকে বলেছিলুম সে কথা—এবং আমার একমাত্র অভিভাবক যিনি, আমার দিদিমার কাছে যাবেন কি না, জিজ্ঞাসা করেছিলুম। প্রায় কোপে দ্বিরুক্তি না করেই, উনি গিয়েছিলেন—এবং দিদিমাও বুঝেছিলেন, "ফাজিল" ছেলের সঙ্গে আমি ঘুরছি না!

"ওফেলিয়া"-র কয়েকটি কবিতা এম-এ ক্লাসে যখন পড়ি, দেখিয়েছিলেন—পদ্মদীঘির পাড়ে / আশ্বিনে গাঁথা গানেরে আমার কুচিকুচি করে ছিঁড়ে / ভাসালে নিথর জলে / আমারই হৃদয় নিথর নীলিম নীল সে পদ্মদীঘি। তারপর একটু বদল করেছেন। আরেকটা দেখিয়েছিলেন—নয়নে জ্বালাও দীপশিখা।

আমি বোকার মত (যেমন বরাবরই আমি!) বলেছিলুম, মনে পড়ে, "এতো অন্ধকারের কবিতা কেন লেখেন?" —আর বোধ হয় এতো অন্ধকারের কবিতা লেখেন নি। আরেকটাও দেখিয়েছিলেন—দেবযানী! তব সন্ধ্যা প্রণাম মাঝে / ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বারেক বাজে / শাপ মোচনের সুরভি সুরে—এ মোর সাধনা। পরে, এ লাইনগুলিও বদল করেছেন। আরেকটা আমার ছোট্ট নোটবই-এর পেছনে—উদ্ধত প্রেম উত্তোল হাতে আনো / সন্ধ্যাকাশে বৈশাখী হাসে / মরণের মায়া হানো। পরে এটাও বদলেছেন। পরের কথাগুলো আমি নিজে লিখতে পারবো না—ওঁর কথাতেই উল্লেখ করছি—"সেই অন্ধকার চাই" বইতে, কবিতার নাম "অঞ্জন ও রঞ্জনা (পৃঃ ২৫) এবং "চিনবে তুমি তাকে" (পৃঃ ২৯) নিজের মহত্ত্ব দিয়ে—আমাকে এঁকেছেন—এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার কি আর আছে? নানাভাবে আমাকে যে সম্মান জানিয়েছেন, তা আমি ওঁর জীবনে কোনো ভাবেই পাবার যোগ্য কিনা জানিনা, এতটুকুও প্রকাশ করতে পারি নি—এখনও পারবো না—সে ক্ষমতা আমার নেই—শুধু আমি জানি, অসহায় ভাবে একা একা আমি অন্ধকারে চলছিলুম—আমার জীবনটাকে হঠাৎ

আলোকময় সুন্দর করে তুলেছিলেন! এখন পলে পলে, তিলে তিলে এই উপলব্ধিটি ভালোভাবে বুঝছি!

"চোরাবালির" মলাট আমায় দিয়ে আঁকালেন, কত বড় সম্মান দিয়েছিলেন বুঝেছিলুম তখনই। কিন্তু কৃতিত্ব আমার কিছুই নেই—কি রকম করে আঁকবো সব বলে দিয়েছিলেন। চাইনিজ ইংক পর্যন্ত আমার দেওর কেশবকে দিয়ে আনিয়েছিলেন—আমি শুধু ওঁরই আইডিয়া ফুটিয়ে তুলেছিলাম। ওই ছবি আমার দেওর কেশবও এঁকে দিতে পারতো—কি দারুণ ও Silhouette (Sideface) আঁকতো, কাগজ পেনসিলে, বা স্লেটে! তখন তো জানিনা, যে সেও আর থাকবে না, তাহলে কত কত ছবি ওঁকে দিয়ে আঁকিয়ে রাখতুম। আমার ভাসুর (ওঁর দাদা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র দে) খুব ভালো ছবি আঁকতেন, শুনেছিলুম আমার শ্বশুর মশাই ওঁকে শেখাবার জন্যে শিক্ষক রেখেছিলেন। দিদিমনি—আমার বড় ননদও ছবি আঁকতেন—আমাদের একটা Sauce ও পেন্সিল দিয়ে বাবার Portrait এঁকে দিয়েছিলেন—রিখিয়ায় সেটা রাখা আছে।

'চোরাবালি' লেখা হয় ১৯৩৫-জুড়ে। কতক কবিতা আগেই লেখা হয়েছিলো, যে গুলি উর্বশী ও আর্টেমিসের ছাপার পরে লেখা হয়েছিল। আমাদের বিয়ে হওয়াটা আমাদের জীবনে—আমার জীবনে তো বটেই—প্রচণ্ড একটি ঘটনা। বিয়ের পর আমাদের যেতে হয়েছিলো শ্রদ্ধেয় বালানন্দ স্বামী মহারাজের কাছে, কারণ তিনিই এটা সহজ করে দিয়েছিলেন, এবং আমাকে approve করেছিলেন। আসলে ছোটবেলা থেকেই মহারাজ ওঁকে খুব ভালবাসতেন। কোলে বসাতেন, মাথার গড়ন হাতে টিপে মা-কে বলতেন—মাঈ তোমার এ ছেলে খুব ভালো হবে। আর উনিও মহারাজকে শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন না, ভালবাসতেনও। মা-বাবার কাছে শুনেছিলুম—ওঁর ছেলে বেলার একটি গল্প—মহারাজ মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে নিভৃতে চলে যেতেন, নিজের তপস্যার তপোবনে, ওঁর একটি গুহা ছিল। মা-বাবাকে বলে দিতেন ওখানে যেতে, ওঁর কাছে—ভীড় থেকে পালাতেন। একদিন গরুর গাড়ি করে (তখন ওটাই ছিল যানবাহন) মা-বাবা যাচ্ছেন, ছোট, ছেলে তখন ছুটেছেন কয়েক মাইল, এবং হাঁফাতে হাঁফাতে গরুর গাড়ীটা ধরতে পেরেছিলেন। মা বলেছিলেন, কেন এসেছো এত দূরের পথ ছুটে ছুটে? ওঁর উত্তর—আপনারা কখন ফিরবেন, তাই জানতে! আসলে, মহারাজের কাছে যাবার ইচ্ছা—তাই মা-বাবাকে বাধ্য করেন ওঁকে তুলে নিতে!

আমি না জেনে একটা প্রচণ্ড ভুল করেছিলুম যার জন্যে আমার সারা জীবন অনুতপ্ত থাকতে হয়েছে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। বড় দিনের ছুটি ১৯৩৫

সালে, আমাদের বিয়ের পর, আমরা মধুপুরে গেলুম, সেখান থেকে দেওঘরে, মহারাজের নির্দেশানুযায়ী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। দিনটা দেওঘরেই ছিলুম। বড়দিনের ছুটি ফুরনোর আগেই মা-বাবা, কেশব, মাধব, কানু (মার মামাতো দেবর—যার বাড়ীতে ছিলুম) সবাই কলকাতা ফিরলেন, আমরা ২৮শে ডিসেম্বর ফিরলুম। পরের দিন ২৯শে ডিসেম্বর—আমার মায়ের মৃত্যু দিন। দিদিমা ছিলেন কলকাতায় তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। এখানে আমি বলি—১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ এম-এ ক্লাসে, একদিনও ওঁকে ক্লাসে দেখিনি বলে মনে নেই! চিনতুম না ঠিকই, অনেক দিনই—কিন্তু ওই রকম সুপুরুষ—চেহারা তো চোখে না পড়েই পারে না—তাই মনে পড়ে যেন প্রতিদিনই দেখেছি। আমিও প্রায় ক্লাস মিস করিনি ভালো বা খারাপ, ফাঁকি দিইনি কোন দিনও। কিন্তু এই একটা ভুল করে ফেললাম—সারা জীবন যা নিয়ে ওঁকে এবং নিজেকেও ভুগিয়েছি—এখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না! সেদিন দিদিমার কাছে বসে, কত কথা গান আমরা করেছিলুম, আমার এক মাসীও—আমারই সমবয়সী, সেও গিয়েছিল দিদিমার কাছে, বলেছিল—কি সুন্দর চেহারা, কি অপরূপ চোখ দেখেছিলাম, আবার কথাগুলিও কি সুন্দর স্নিগ্ধ! দিদিমা আমাকে বলেছিলেন সে রাতটা ওঁর কাছে থেকে যেতে। আমিও থেকে গেলুম। উনি একা চলে গেলেন, বললেন—কলেজে যাব। St. Paul's-এ বি-এ পড়েছিলেন—ওখানে অনেক ইংরেজ প্রফেসর ছিলেন, যাঁরা ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমিও অনেককে পরে চিনেছি। জানিনা কোথায় গেলেন। তখন কলকাতায় walford বাস চলতো—অনেকগুলি ছাদ খোলা! আমরা তখন থাকতুম Russa Road-এর (এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড) একটা বাড়ীতে। কখন ফিরেছেন জানি না—এবং খোলা ছাদের বাসে গিয়েছেন কি না তাও জানি না! পরের দিন আমি যখন ফিরলুম—দেখি, উনি খাবার ঘরে একা একা বসে কি খাচ্ছেন। আমি কাছে গিয়ে দেখি দুধ পাউরুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম—এত দেরিতে এই খাওয়া কেন? বললেন—ভীষণ গলায় ব্যথা! আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখি প্রচণ্ড জ্বর। —জিগ্যেস করলুম মাকে বলেছো? বললেন—না। মা ছিলেন নীচে, রান্নার তদারক নিয়ে। জানাতেই, ওপরে উঠে এলেন, গায়ে হাত দিয়ে বললেন—আগে কেন জানাও নি?—ডাক্তার আনতে কাছেই পিসিমার বাড়ী পাঠালেন, ওঁদের জানা ডাক্তার। তিনি এসেই বললেন—ভীষণ Serious—rheumatic fever সন্দেহ করলেন—strepto—staphilo coccus infection, বললেন—বড় ডাক্তার ডাকতে, ওঁকে সমর্থন করে বললেন— ডাঃ সুনীল বসু—তখনকার সব থেকে বড় হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ।

নীলরতনবাবুকেও ডাকা হোল—উনিও সাবধান করে দিলেন—heart খারাপ করে দেয়। এবং ঠিক তাই-ই হলো। জানি না, কি করে এ infection এলো, walford bus-এ চেপে ঠাণ্ডা লেগে একদম সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিল—এ কী-রোগ ওঁকে ধরলো! আমি নিজেকে এখনও ক্ষমা করতে পারিনি।

ওই রসা রোডের বাড়ী থেকে আমরা ৩১শে ডিসেম্বর P 241 D, Rash-Behari Avenue-এর (এখন রাস্তার নাম হয়েছে দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট) বাড়ীতে উঠে গেলুম। কেশব, মাধব, কানু—ওঁদের মামাতো ভাই—সবাই সাহায্য করে ধরে ওঁকে তুলে দিলেন—কি জ্বর—মা এসে ঠিক ভাবে বিছানা করে শুইয়ে দিলেন। কি জ্বর—ডিসেম্বরের শীতে মাথায় ice-bag দিতে হয়েছে! সারা রাত কি কষ্ট প্রবল জ্বরের বেগ। কথা বলতে পারছেন না—Slate এ লিখে দিচ্ছেন—'জল'। আমি তো আমার কপালকে ধিক্কার দিচ্ছি—এ রকম একজন বন্ধু পেয়েও হারাতে চলেছি—আমার ভাগ্যটাইতো এ রকম! ২রা না ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৫-এর ভোরে slate-এ লিখে দিলেন—কাগজ কলম। আমার টেবিলে সব রাখা ছিল, ফাইল সমেত দিলুম। (এ কথা, উনি নিজে আমায় সমর্থন করে ওঁর বন্ধু শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে লিখেছিলেন—আমার কথা অনেকে অবিশ্বাস করতে পারেন!)—'ঘোড়সওয়ারের' প্রথম অংশ লিখে যেন আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি অবাক হয়ে লেখাটি পড়লুম। কোলরিজ আফিমের ঘোরে Kubla Khan লিখেছিলেন, পড়েছিলুম—এ তো আরও আশ্চর্য! আমার আরও মনে হোল—নিশ্চয় মাথায় অনেকদিন ঘুরছিল—কিন্তু অত জ্বরের ঘোরেও তো হারিয়ে যায় নি, কবিতাটি! এই প্রচণ্ড জ্বর—কি করে যে এটা সম্ভব হলো—আমি ভালো করে এখনও বুঝতে পারি নি। এমন সময় জীবন-কা (জীবনময় রায়—আমাদের পুরনো বন্ধু) ওঁকে দেখতে এসেছিলেন। খুব উত্তেজিত হয়ে—আমাকে খুব বকলেন—কি আশ্চর্য কবিতা লিখেছে—তুই কিছু বুঝিস না!! ইত্যাদি। সত্যিই তাই। হয়তো এটা আমার শাস্তিও—কিন্তু আনন্দও তো ব'টে—আমি যা পেয়েছি, সেদিন, এবং প্রতিদিন—সারা জীবনে! তার কোনো তুলনা হয় না! আমি পরে বলেছি, এবং বিশ্বাসও করি—যা কিছু ওঁর ভালো লেগেছে, বা দুঃখ দিয়েছে, কোনো ভাবে মন নাড়া দিয়েছে—সে ঘটনাই শেষে ওঁর কবিতা হয়েছে। ইংরিজিতে একটি প্রবাদ আছে,—আমি ওঁকে বলতুম, ঘটনাটি তুমি দেখে নেয়ার পরে মাথায় ঘোরে, মনে নাড়া দেয়—তারপর সেটা হয়ে যায়—কবিতা! Everything is grist to your mill.

১৯৩৫-৩৬-এ ওর সব থেকে কঠিন অসুখ গেছে—rheumatic fever, তারপরের জুলাই-এ gall-bladder-এ Stone—হার্ট খারাপ বলে operation করা যাবে না—ডাঃ সুনীল বসু 'বাবা' কে একজন ভালো নাম করা কবিরাজের কথা বললেন। বাবা তাঁর কাছে ওঁকে নিয়ে গেলেন—সে কি কষ্ট—চোখে দেখিছি কি অসম্ভব সহ্য শক্তি—কষ্টে বিছানার চাদর ঘামে ভিজে গেছে, কোনো পাখাতে 'সানাচ্ছে না'—মুখে কিন্তু রা-টি নেই—নীরব হয়ে শুয়ে আছেন! যাঁরা দেখেছেন, ডাক্তার-রাও অবাক হয়েছেন।

আমরা এপ্রিল-মে-জুন পুরীতে ছিলুম—কিছুদিন ডাঃ সুবোধ মিত্র (তিনিও সম্পর্কে ওঁর মামাতো ভগ্নীপতি) ছিলেন, কিন্তু ফিরে এসে অগাস্ট মাসে এ রোগটা ধরলো। আমি আসার পরই এ সব হল—তাই আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি "অপয়া" বলে—পিতৃমাতৃহীন দুই দাদাকে হারিয়ে এ বাড়ী এসে কি পোড়া কপাল আমার—আমি আমার পরম বন্ধুকে এ ভাবে আঘাত করলুম! জানি আমার দোষ নয়—তবু নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি—আজও পারি না। তবু এর মধ্যেই 'চোরাবালির' অসাধারণ কবিতা! আমাদের তখন কি অবস্থা লিখে আমি বোঝাতে পারব না—তার মধ্যে এক সন্ধ্যাবেলায়,একটু ভালোলাগতেই লিখেছিলেন 'দ্বিধা-দম্পতি'—আমাদের সে সময়ের খানিক বর্ণনা! এই প্রচণ্ড শরীর খারাপ কোনো চাকরী নেই, বাবার ওপর সব দায়িত্ব (তখন আমিও কাজ করি না)—অসহায় অবস্থায় বুঝিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি লাইনে: মন্বন্তরে বাস করি বটে, মনান্তরের কোনো / হয়নিকো অবকাশ। / সূর্য গ্রহণ নিত্য ঘটনা যে শীত কঠিন লোকে / আমাদের সেথা সূচ্যগ্রক বাস। /···অন্তরঙ্গ অবসাদ শুধু আমাদের পাশে ঘেষে। আমাদের কাজ ছোট জয়পরাজয়। / মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈত্রীর বিষটিকা / উদ্ধত উজ্জ্বল।"—ওঁর rheumatic fever-এর দুটি খারাপের উল্লেখ কি ইঙ্গিতে লেখা? চোরাবালির আরেকটি কবিতা—'টপ্পা-ঠুংরি' (সমর সেনকে দেওয়া) নিয়ে অনেক মতান্তর হয়েছে। ওঁর জীবদ্দশায়ও আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী'র কবিতার পাণ্ডুলিপি তুমি দেখেছিলে?—উনি ওঁর মিতবাক উত্তর আমায় দিয়েছিলেন—কোথায় পাবো?—(তবু বোধ হয় plagarism এর দোষ ওঁর ওপরে চাপানো হয়েছে!) তাই আমি পুরো সে সময়ের situation বা অবস্থার বিবরণ লিখছি।

সমর বাবু তখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—Dryden-এর All for love বইটি পাচ্ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় আমাদের প্রফেসর রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষের কাছে অশোকবাবু (পরে I. C. S) নিয়ে যান সমরবাবুকে—রবিবাবু বলে দেন—আমার স্বামীর কাছে একটি কপি আছে। তাই অশোকবাবু সমরবাবুকে আমাদের বাড়ীতে

আনেন—চঞ্চলবাবু নন—আমি ভেবেছিলুম চঞ্চলবাবুই প্রথম আনেন। ওরা সবাই, আমার দেওর কেশবও-সে বছর বি-এ পরীক্ষা দেন। তখন গদ্য কবিতা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছিল—সমর বাবুকে উপহার দেবার জন্যে 'টপ্পা-ঠুংরি'—আমার সামনেই বসে লিখেছিলেন, একটানা ১৮ই বা ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এ। আমাকে পড়ে শোনালেন—আমরা দুজনে খুব হেসেছিলুম মনে পড়ে, যখন পড়লেন—'আমার কাকা লিবিডোকে এখন চালাব / কোন বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে? কোন ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?" "চোরাবালি"-র "মহাশ্বেতা" কবিতাটিও ভোর বেলায় লেখা,—একটানা! তার পরে নীচে এলেন চা খেতে,—যেন "স্নিগ্ধ স্নাত"—মুখে আনন্দের-সাফল্যের-জয়ের মৃদু হাসি। কবিতা মাথায় এলে, দেখেই বোঝা যেতো—চোখ দুটি যেন সুদূরে, একটু অন্যমনস্ক, এমনিতেই স্বল্পভাষী, তখন যেন আরেকটু বেশী—নিবিষ্টভাবে তন্ময় যেন—বাড়ীতে সকলেই বুঝতে পারতেন। সেই সময়ই কিছু Eliot অনুবাদ করেন—Hollow menটা আমার স্পষ্ট মনে আছে—Prickly pear-এর বাংলা, বা সেই রকমের গাছের নাম খুঁজছিলেন। মা বোধ হয় বলে দিয়েছিলেন—বাবলাগাছের কথা—বড় বড় কাঁটা আছে বলে।

"পূর্বলেখ"—এর প্রথম কবিতা—"বিভীষনের গান" আরম্ভ "আহা" দিয়ে—"হাবলা-দা" (হিরণ কুমার সান্যাল) বলেছিলেন—'আহা' কথাটি কি আশ্চর্য লাগিয়েছ, বিষ্ণু! আরেকটি 'আহা'র কথা আমার মনে পড়ছে—রিখিয়ায়—১৯৭৫ সালেই বোধ হয়, সঠিক মনে নেই—জ্বর হয়েছিল, শরীর খুব খারাপ! আমাকে বললেন অমিতা সেনের রেকর্ড বাজাতে। গান শুনতে শুনতে বললেন—"কাগজ কলম"—কিন্তু ভাঙা হাতে একটু লিখেই বললেন—তুমি লেখ—তো—পারছি না বড্ড ব্যথা! অস্থির—এঘর থেকে অন্য ঘর—আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাই—ওঁর কথাগুলি শুনে লিখে ফেলতে পারলুম—"আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান"—নিজেই পড়লেন, দু'একটা বদল করলেন—আমিই বললুম—শেষ লাইনটা দেখো গানের লাইন—"চিনিলে না আমারে কি, চিনিলে না।—একটু haulting মনে হচ্ছে-কি?—তক্ষুনি বললেন আহা! আর সমস্ত কবিতাটি হয়ে গেলো নিদারুণ "করুণার" কবিতা (The poetry is in the pity)। অমিতা সেনও আমাদের সঙ্গে সংস্কৃততে এম-এ পাস করে। আমার বন্ধু ছিল। উনি জানতেন। ওর শেষ জীবনটাও বড় করুণ আমরা জানতুম।

'পূর্বলেখ'-এর কবিতার বই ছাপা হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৩৮এর ১লা ডিসেম্বর 'বাবা'—আমার শ্বশুরমশায় মারা যান। তারপর অনেক ওলট পালট হয়ে যায় আমাদের জীবনে। কিন্তু তখনই যামিনীদা এসে গেছেন আমাদের জীবনে—আর

বাবার মৃত্যুর পর, আমার মনে হয়, যামিনীদা ওর বিষয়ে একটু বিশেষ ভাবে সচেতন হন। তাই এই বইটির ছাপা, মলাট, মলাটের তুলট-কাগজ জোগাড় করা, ছবি এঁকে দেওয়া সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—মলাটের ডিজাইন দুরকমের হবে—অর্দ্ধেক বই নীল রঙে মলাট—বাকি অর্দ্ধেক লাল। মলাটের কাগজ যামিনীদাই জোগাড় করে দিলেন, বাগবাজারে—ওঁর বাড়ীর কাছেই অমৃতবাজার পত্রিকা অপিস থেকে। আমরা তখন পার্কের পাশের বাড়ীটা থেকে আরেকটু ছোট একটা বাড়ীতে উঠে এসেছি—১৯এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে।

'চতুর্দশপদী'—বুদ্ধদেববাবুকে নিবেদিত—'কবিতা' পত্রিকার জন্য নিশ্চয়ই। 'পিতা তার ছিন্ন-ভিন্ন'—কবিতাটি লেখা হয়, উনিই লিখেছেন নোট দিয়ে আরেকটা বই-এ "Originally written some time in the early twenties, after some of our journals বা newspapers had reported of Anatole France's statement- his offer to the new Russia of the money the Nobel Prize had brought him."

"পূর্বলেখ"-এ— অনেকগুলি ব্যক্তিগত (personal) কবিতা আছে। তার মধ্যে "আবির্ভাব"— প্রভাসচন্দ্র ঘোষকে দেওয়া, রবীন্দ্র ভক্ত Mysticism in Rabindranath লেখার জন্য 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' স্কলারশিপ পেয়েছিলেন—ইংরিজির অধ্যাপক বিদ্যাসাগর কলেজে, আমার মা-বাবার এবং আমাদেরও বন্ধু—অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের। প্রভাসদার বাড়ীতেই উনি আমাদের—সুলতা ও আমাকে প্রথম বেঠোফেনের Ninth Symphony শুনিয়েছিলেন—গ্রামোফোন ধার করে এবং St. Paul's-এর ওঁর প্রফেসর Christopher-এর ১২টি রেকর্ড ধার করে এনে! তাঁর কাছেই ওঁর বিদেশী সঙ্গীতের প্রথম আকর্ষণ এবং ইতিহাস পড়তে পড়তেই তাঁর কাছেই কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে জ্ঞান ও পরবর্তী শিক্ষা। প্রভাসদা আমাদের বিয়েতে একটা সুন্দর বেঠোফেনের মুখের Plaque দিয়েছিলেন—এখনও আছে।

অরুণ মিত্র তো অনেক দিনের বন্ধু। যুদ্ধের সময়ে শ্রদ্ধেয় সত্যেন মজুমদারের "অরণি" নিদারুণ উৎসাহ এনেছিল এঁদের সকলের মনে। বৈকালি—কবিতার 'সিরীস'—প্রথম কবিতা উৎসর্গ করেন অরুণবাবুকে। ঠাট্টা তো ওঁর সহজেই আসতো, তাই "সিনেমায় নরম শীতে/যদি বসে বাঁচি/নিনোচকার হাসি দেখে হাসি/আর শেষে হাঁচি।" "নিনোচকার" ভূমিকায় ছিলেন Greta Garbo। দ্বিতীয় কবিতাটি "কুমার স্কে"—ধূর্জটিবাবুর ছেলে—তখন ছোট ছিল, খুব সুন্দর,—উনি খুব ভালবাসতেন ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসতে, তাই "সূর্য—তোমার কোমল

শরীরে যত/ঢেলে গেছে তার ঋণ।" তৃতীয়টি ওঁর দেশী এবং বিদেশী মার্গ সঙ্গীত শোনার একান্ত সঙ্গী—তাঁকে আগে একটি র‍্যাঁবো লাইন উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, এখন ৩ নং—চঞ্চলবাবুর বিয়ের সময়ে। ৪ নং কবিতাটি "কাজলা"-কে—শিপ্রা—সুশোভনবাবুর মেয়ে—তাকে উনি খুব ভালবাসতেন, ছোটবেলা ও বড় বড় কঠিন শব্দ দিয়ে কবিতা লিখতো—তাই "বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির ..."। "সর জি-পি-র গান" সম্পর্কে ওর ভাইপো গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, ওঁর প্রায় সমবয়সী এবং ছেলেবেলার একান্ত বন্ধু—এবং বলতে পারা যায় পরীক্ষা ব্যাপারে অভিভাবকও। (লাজুক ছিলেন অল্প বয়স থেকেই, তাই পিসতুতো দাদার ছেলে গোবিন্দবাবুর (গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ) আর এক ভাগ্নে বিনুবাবুর (বিনয়েন্দ্র মুস্তাফী)—দায়িত্ব ছিল—পরীক্ষা কবে, কখন, জেনে নেওয়া, সীটে-এ বসিয়ে দেওয়া, ফলাফলও জেনে আনা ইত্যাদি)। এমার্সনদের জন্য 'বৈকালি'র ৬ নং কবিতাটি। "মিনি-র" সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল—আই-এ, বি এ এক সঙ্গে দিয়েছি, এম-এ পড়ার সময়ে পেছিয়ে পড়েছিলুম—মায়ের অসুখে মাকে দেখা শোনা করতুম—পরেইতো মারাই গেলেন। আমি যখন ফিফ্‌থ ইয়ারে ভর্তি হব-হব মিনি সিক্‌সথ ইয়ারে পড়তো। পরে, আমাদের বিয়ের পর—মিনি, ওর বোন শীলা ও অনিলা—(আইলীন) ওদের বাড়ীতে আমরা যেতুম—বিশেষ করে ওঁর সঙ্গে মিনির খুব ভাব হয়েছিল। লিনড্‌সে এমারসন Statesman-এ কাজ করতেন—গান বাজনার সখ ছিল, ভালো গ্রামাফোন ও রেকর্ড ছিল। থাকতেন Bristol Hotel-এ। বাংলা শেখবার অজুহাতে প্রতি বুধবার (লিনড্‌সের ছুটির দিন) বিকেলে যেতেন, বাংলা শেখা কত হতো জানি না—গান বাজনা—শোনা—খানা পিনা ভালোই হত। মিনি লিনড্‌সেকে বিয়ে করে। তখন যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। বাংলা শেখা সম্পর্কে মজার গল্প মনে পড়ে। ঠিক সেই সময় দিনেশ দাসের একটি কবিতার কটি লাইন খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, যুদ্ধেরই পরিপ্রেক্ষিতে—এখানে জাপানী আক্রমণের ভাবনায়:—

> বেয়নেট হোক যত ধারালো
> কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!—

আর,

> চাঁদের শতক আজ নহে তো
> এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!

সুধীনবাবুদের সঙ্গেও মিনিদের খুব ভাব হয়েছিল—অনেক সন্ধ্যায় সুধীনবাবু, লিনড্‌সে, উনি ও আমি ওদের বাড়ী গিয়েছি। একদিন মিনি, সুধীনবাবু আর

আমার স্বামীকে অনুরোধ করল—দুই কবি তাঁদের নিজেদের ধাঁচে (স্টাইলে) "এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে"-র ওপর কবিতা লিখতে। সুধীনবাবুও লিখে আনলেন, আর আমার স্বামীর হলো ওঁর (অনবদ্য) হাল্কা স্টাইলে লেখা—"আকাশে উঠলো ও কি কাস্তে না চাঁদ/এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে!" চাঁদের সঙ্গে এসে গেল জুঁই, বেলফুল (ওঁর প্রিয় ফুল) নেড়া ছাদ (কলকাতার), ঘাম, জ্যোৎস্না, যুদ্ধ লেগেছে, তাই শান্তি নেই, অনাচার, অনাহার, টরপেডো, বোমা, সাইরেন বিদেশী উপমায়—কাস্তে (Sickle) তো মৃত্যুর প্রতীক,—যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত, আবার কাস্তের সঙ্গে আসে হাতুড়ি —(Hammer & Sickle কম্যুনিষ্টদের প্রতীক) কাস্তে। মিনিরা দারুন খুসী হয়েছিল। মিনি আর লিনড্‌সের জন্যই বিশেষ দুটি লাইন—(লিনড্‌সে একটু লেফ্‌ট)—হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে ॥

(Love hammers in my heart)

৭ নং কবিতা ক্ষিতীশ রায়কে,—ওর পুরনো এম-এ ক্লাশের বন্ধু, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজে নিমগ্ন। ৮নং শ-অডেনকে—শীলা—মিনির বোন—বিয়ে করেছিল তখনই John Auden কে (ইংরেজ কবি Wystan Auden-এর দাদা)। ৯ নং—অ-বন্দ্যোপাধ্যায়কে—অনিলা—'মিনির তৃতীয় বোন, স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে যে বছর সমর সেন ইংরিজিতে প্রথম হয়, সে বছরেই অনিলা বা (Eileen) Economics-এ প্রথম হয়। এঁরা সবাই R. C. Banerjee'-র (ব্যারিস্টার) মেয়ে, W. C. Banerjee (প্রথম Congress President)-র নাতনী। অনিলা পরে Tom Graham কে বিয়ে করে বিদেশে চলে যায়। 'অডেনজা-কে' কবিতাটি হলো শীলা আব জন অডেনের মেয়ে অনিতার জন্যে। পরের মেয়েটির নাম উনিই দিয়েছিলেন মিলিয়ে—রীতা, শীলার অনুরোধে নাম মিলিয়ে দিতে।

"কোনো বন্ধুর বিবাহে"র মজার গল্প আমি জানি। বাবা মারা যাবার পর সংসারের দায়িত্ব ওঁরই ওপর—আমি একটি স্কুলে কাজ পেলুম—সামান্য টাকায়। উনি তখন রিপন কলেজে কাজ করেন, আর সন্ধ্যায় রিপনেরই Law Class-এ ইংরিজি পড়ান, অর্থের জন্য সপ্তাহের কটা বিকেল পড়াতেন বাকি কটা বিকেলে ছাত্র পড়াতেন —সব দিক সামলাতে! রবিবার ছাড়া বিকেলে সন্ধ্যায় বাড়ী থাকতে পারতেন না। রিপন কলেজে তখন প্রফেসর হীরেন মুখার্জী ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় হীরেনবাবু চুল উসকো খুসকো, আমায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কোথায়? আমি জানালুম—কলেজে। উত্তরে বললেন—বলবেন জরুরী কথা আছে, দেখা করতে। —উনি বাড়ী ফিরে আসতেই আমি বললুম—হেসে, তক্ষুনি বললেন—হীরেনবাবুর

বিয়ে! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি করে জানলে?—বললেন চুল উসকো খুসকো শুনে! মা বলেছেন বিয়ে করতে—মুস্কিলে পড়েছেন—মায়ের কথাতো ফেলতে পারেন না—ইত্যাদি। তারপরই কবিতা—কোনো বন্ধুর বিবাহে—"রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া/হৃদয় যদি তোমায় হারায়!" আর "তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,/হৃদয় আমার! হৃদয় যার॥" তারপর—রিণি—হীরেনবাবুর মেয়ের জন্মের পর—"কন্যাকাদানে ধরাকে করেছে ধন্য/পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে। থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য। / কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙবে,/রূপসীর মেয়ে চড়া জয়গান গাওবে / নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।" "সোনালী ঈগল" কবিতাটি দেওয়া—প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী—আমার ছোট একমাত্র ভাইকে। "চতুরঙ্গ"র চারটি কবিতা অশোক মিত্র—আই-সি এসকে দেওয়া। অশোকবাবু বিয়ে করেছিলেন আভা-কে। আভা তখন চট্টগ্রামের একটা স্কুলে কাজ করতেন। সেখানে যাবেন বলে শিয়ালদা স্টেশনে ওঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, আমাদের বাড়ী চলে আসেন ও কিছুদিন ছিলেন। তখন 'মা' আমার শাশুড়ী ছিলেন। রেজিস্ট্রেশন করে বিয়ে হয়, আমাদের বাড়ীতেই, তারপর ওঁরা চলে যান অশোকবাবুর বাবার কাছে। "পার্টির শেষ"—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—কামাক্ষীবাবুর ভাই—দেবীবাবু। ওঁরা তখন খুব আসতেন—কামাক্ষীবাবু এই সময়ে ওঁর একটি দারুণ সুন্দর ছবি তুলে দেন।

'পদধ্বনি' কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন হামফ্রি-হাউসকে। ইনি ইংরিজির অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন Presidency College-এ। কিন্তু নানা অন্যায় দেখে ছেড়ে দিয়ে রিপন কলেজে এবং Cal. University-তে ইংরিজির অধ্যাপক হন—সুধীনবাবু আর আমার স্বামীর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়। অল্পকাল পরেই দেশে ফিরে গেলেন, এবং কেন জানি, বেশী দিন বাঁচেন নি। ওঁর স্ত্রী—Madeleineও কলকাতায় এসেছিলেন, ১৯৩৭-এই বোধ হয়, তিনিও আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। "পদধ্বনি" উনি হামফ্রি-কে পড়ে শুনিয়েছিলেন, এবং বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। "জন্মাষ্টমী"—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে। উনি নিজেই লিখেছেন, (এবং বলতেনও) অনেক দিন ধরে কটি লাইন মাথায় ঘুরছিল "আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিস্পন্দন আকাশ! / আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বা বেগে!"—তারপর কিভাবে সমস্ত কবিতাটিই লেখা হয়ে গেল ১৩৩৬ সালের কয়দিনের মধ্যেই। সুধীনবাবুর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—শরীর ভাল থাকলে, সারা দিন, মানে দুপুর-থেকে-বিকেল-সন্ধ্যা পর্যন্ত সুধীনবাবুর বাড়ী, বা হামফ্রি-হাউসের বাড়ী কাটাতেন! সে সম্বন্ধেও অনেক মজার গল্প মনে পড়ে যায়।

"২২শে জুন" যেটা পরে বড় করে "সাত ভাই চম্পা" হল, যামিনীদার প্রচ্ছদ সহ,

antifascist Writers & Artists Association হবার পর। এ বইতেও অনেকের "জন্ম" কবিতা লেখা হয়েছে। একটি কবিতা—ভারতীয় বিমান বাহিনী (বেণুর জন্ম) লিখেছিলেন ১৯৪২ সালে—বালিযাতোড়ে—যামিনীদার গ্রামে। "বেণু"—আমার ২০/২২ বছরের মামা—আমার মায়ের মাসতুতো ভাই। খুব সুন্দর স্মার্ট দেখতে, এবং বাড়ীর অমতে pilot হয়েছিল। বেণুমামার সঙ্গে দেখা হয়, হঠাৎ। অশোক মিত্রের নিমন্ত্রণে আমরা ন্যানকিং রেস্তরাঁয গিয়েছিলুম—সেখানে।—বেণু মামা যুদ্ধের পাইলট পোষাকে নামছিল—হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকতে, মুখ তুলে আমরা ওর হাসি মুখ দেখি। তারপর আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যায যুদ্ধের জন্যে,—এপ্রিলের ১৪ই বেলেতোড়ে, যামিনীদার অনুরোধে, যাই। সেখানে উনি "ভারতীয বিমান বাহিনী" (বেণুর জন্ম) কবিতাটি লেখেন—প্রায এক নাগাড়ে। তাতে লিখেছেন: বেণু মামার চরিত্র অনুযায়ী—"মৃত্যুর স্বার্থের দ্বিধা / জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যত হিসাবির বিবিধ কৌশলে / ঠগ আর বণিকের দলে, তাকে তো টানে নি। / প্রাণের উল্লাসে / তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে, / সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা। / ·· সে কি জানে, কিশোর কুমার, / নবজীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায় / হয়ত বা অন্ধ অপঘাতে?"—বেণু ন্যানকিং রেস্টুরেন্টেই আমাদের বলেছিলেন—"রেঙ্গুনে জিতে এলুম—এবার এলাহাবাদ যাব, লড়তে।" এলাহাবাদে ওকে একটা খারাপ প্লেন দিয়েছিল, এবং সেটা crash করে ওকে নিয়ে। আমরা জানতুম না—কবিতাটি লিখেছিলেন বেলেতোড়ে—বেণুমামার দাদা গোরামামাকে আমি লিখে পাঠাই কবিতাটি—ও আমাকে উত্তর দেয—বেণু মারা গেছে—air crash-এ। কি করে আন্দাজ করেছিলেন, জানি না! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কি এ! কবিতাটি বেণুমামার মৃত্যুর আগেই লেখা হয়েছিল! জানি না আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা, কেউ! বেণুমামার চরিত্রটি ঠিক এঁকেছিলেন। আর আমার এই সুন্দর চরিত্রের মামা—ওঁর কবিতাটিতে অমর হয়ে রইলেন।

"এ জনতার" কবিতাটিও হঠাৎ লিখে ফেলা—নিশ্চয় মাথায় ঘুরছিল। "তানকা-সান" ছিলেন সেই সময়ের জাপানের প্রধান মন্ত্রী। "রুমি"-কে—বুদ্ধদেববাবুর ছোট মেয়েকে লেখা—"কন্যা, তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা।" "লোরকা"-র কবিতার অবলম্বনে—"হে কমরেড, মৃত্যু দাও স্বাভাবিক করুণ সুরে বাঁধা। বড় কবিতাটি "কোডা"—কবিতাটি ভোম্ভোবাবু-র (স্নেহাংশু আচার্য) সঙ্গে Coda কথাটির ইতালিয উচ্চারণ নিয়ে তর্ক হয—তারই প্রতিফল, যুদ্ধের সমযে! 'সাত ভাই চম্পা'—ও ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সময়ে, যার জন্য আমার মনে

আছে বলেছিলুম—Perfectionist—এমন ভালো লেগেছিল কবিতাটি (অবশ্য সবটা না বুঝেই)। 'সন্দীপের চর' কবিতাটিও লালমোহন বাবুর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই লেখা হয়ে যায়! তখন অনেক ছড়া-কবিতা লিখেছিলেন—বেশ মুখে মুখে চলতো যেমন জিষ্ণুর জন্মের পর—"ছড়া" : লালতারা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ের পর—১৯৪৩-এ ওর জন্ম বলে। ইরা—তারা মুখস্থ বলে যেত, যেমন চলত "মৌ ভোগ" বা ছড়া—"কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি।"

ওঁর নিজের কবিতার বিষয়ে কোন মমতা ছিল না। মাথায় কবিতা এলে চোখ দেখলেই বোঝা যেত—কাজ সব ঠিক করে যাচ্ছেন, কিন্তু মন অন্যত্র। অত্যন্ত গোছানো স্বভাব হলেও দেখতুম, কবিতা লিখে (উনি বলতেন, মজা করে 'পদ্য') ফাইলে রেখে দিতেন, আর কেউ এসে কবিতা চাইলেই দিয়ে দিতেন, কপি না রেখেই। আমার ধারণা এই ভাবে, বেশ কিছু কবিতা হারিয়েছে। ১৯৫৩-এর পর আমি অনুরোধ করে কবিতা কপি করি—হাস্কাচ্ছলে বলতেন—Not that important!—তবু আমি কপি করতুম—তবে পুরো যে সফল হয়েছি তা নিজেই বলতে পারি না! তাই এখন মনে হয় অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে—যে পত্রিকায় ছাপাতে দিলেন, সেটি যদি এসে না পৌছায়, তাহলে সে বিষয়ে চিন্তা ছিল না! আরেকটি ভুল—সেটি হচ্ছে, কবিতায় তারিখ না দেওয়া। এখন তাই বেশ অসুবিধা হচ্ছে মনে হয়।

'সন্দীপেব চর' আর 'অম্বিষ্ট'র কবিতাগুলি খুব কাছাকাছি—বইয়েতে উল্টো পাল্টা সাজানো হয়েছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থে। 'সন্দীপের চর' কবিতাটি মনে পড়ে, লালমোহন সেনকে হত্যা করার খবর পেয়ে, খুব বিমর্ষ হয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখেছিলেন, "মরণে প্রাণ নেই", "আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে / তবু স্থির জানি, তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি / এই রোগেতে মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে…আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন / আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি…"।

অনেকগুলি ছড়া লিখেছিলেন—অনেক মজার 'পদ্য'—"এক কষ্টে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান, / খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে অমান পেনসান।" বা "কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি—।" "মৌভোগ তো কত জনের মুখে মুখে চলত—"নীলকমলের আগে দেখি লাল কমল যে জাগে / তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল, / লাল তিলকে ললাট রাঙা উষার রক্তরাগে /—কার এসেছে কাল?"—শেষে "এদিকে 'ওড়ে' লাল কমলের নীলকমলের হাতে / ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।"

১৯৪৪-এ এই মেজাজেই লেখা (মিলটনের অনুসরণে)—'স্বর্গ হইতে বিদায়"—লুসিফরের দল, আমাদের দেশে কি করছে Paradise Lost-এর প্রথায় যেন।

১৯৪৪-এই "কে জানতো পোড়া দেশে এত বুলবুলি," লেখা হয়। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে, "লালতারা" জিষ্ণু-র জন্মদিনের সময়ে। ১৯৪৫-এ আমারই এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে—কি করে যে আমার ডাক্তার—ডাক্তার সুবোধ মিত্র—আমায় বাঁচিয়ে দিলেন, আমি জানি না! কপালে অনেক দুঃখ লেখা ছিল, সেগুলি আমার ওপরে ঘটবে বলেই হয়তো। নীরদ মজুমদার তখন ক্যালকাটা গ্রুপের একজন জোরালো কাজের আর্টিস্ট—যাঁর কাজ আমার স্বামী খুব পছন্দ করতেন—(তখন তো সমস্ত গ্রুপ-টি নিয়ে মেতেছিলেন—সকলকে Anti-fascist Writers and Artists Association-এ দলভুক্ত করলেন, সুভাষ মুখার্জী আর উনি সেক্রেটারি ছিলেন। অনেক কিছুই করেছিলেন—সুধীনবাবুর অনুবাদ Yeat's-এর Resurrection ওঁর বন্ধু-দল দিয়ে করান, জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর সুর, যামিনীদার তৈরী যীশুর মুখোস—খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বেবী গুপ্ত ও ধ্রুব মিত্র—লভ্যাংশ antifascist association-এর জন্য। ৪৫-র সেপ্টেম্বরে আমার যে কি হলো অপারেশনের পরে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না দেখে নীরদবাবু একদিন ওঁকে বললেন—আমি বৌদিকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে ওর শরীর একদম সেরে যাবে। উনি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলেন কোথায়—নীরদবাবু জানালেন—রিখিয়ায়। নীরদবাবুদের বাড়ী আছে—সেখানে পুজোর ছুটি কাটালে নিশ্চয় আমি সেরে উঠব। সেই ব্যবস্থা করা হোল—বিস্তর মালপত্র বিছানা, বাসন, হারিকেন, স্টোভ পর্যন্ত—বিরাট মালের বোঝা নিয়ে গেলুম—(তখন ও ভাবে যাওয়া যেত)। দেওঘর ষ্টেশন থেকে রিখিয়া গ্রাম—৪/৫ মাইল দূরে—টানা রিক্শ আমার জন্যে রাখা হয়েছে, মালপত্র, ইরা-তারা যাবে গরুর গাড়িতে—এই মাত্র ছিল অত দূরের যানবাহন। প্রথম-প্রথম বাড়ীর কাছাকাছি হাঁটতুম, আর খুব জল খেতুম কুয়োর—কদিনেই আমার জ্বর সেরে গেল। উনি নীরদবাবুর সঙ্গে লম্বা পাড়ি দিতেন, অপূর্ব দৃশ্যের সৌন্দর্য দেখতেন, আর পাতাগুলির নাম শিখে নিলেন—নামগুলিও কবিত্বপূর্ণ।

উনি কাজ নিয়ে এসেছিলেন—ভেরকরের L'e Silence de la mer-অনুবাদ কর ছিলেন, নিবিষ্ট মনে—'সমুদ্রের মৌন' নাম দিয়ে—আর নীরদবাবু ওঁর একটা তেল রঙে পোর্টেট আঁকছিলেন। হঠাৎ সকাল বেলা একদিন নীরদবাবু ওঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলে উঠলেন: 'বিষ্ণুদা, ক্রেসিডার মত কবিতা আপনি আজকাল আর লিখতে পারেন না বলে, মুখস্ত বললেন:

লাল মেঘ ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভীড়,
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হ'ল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈষাণবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা—
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

কোনো কথা না বলে ঘরে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই লিখে আনলেন—হিরণার টিলা লালে লাল হলো মেঘডম্বরুনীলে, / সবুজেও লালে লাল। / বারুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাসে শালে / একাকার প্রায় পিসারোই নাজেহাল /" রিখিয়ার পাড়ার সঙ্গে নাম মিলিয়েছেন নীরদবাবুর জন্য, মডার্ণ ফরাসী আর্টিস্টদের—যেমন পিসারো—এরকম কয়েক স্তবক লিখে আনলেন ফরাসী আর্টিস্টদের নামসহ, যেমন—চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো—ঘন গ্রাম্য গলির মায়া—এ রকম কয়েক স্তবক, তার সঙ্গে গ্রামবাসীদের দারিদ্র, দুর্দশা ও বীরত্বের কাহিনী—যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন তাও: "মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, এক গাঁটি জোটে ধুতি ! / তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বাহেঙ্গা প্রাণ—বাঁচে/অমর বাহুতে, আউশের খেদ আমনের আশা যাচে,/বাজরা ভুট্টা যা হোক, থাকুক হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,/চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।" "হিম্মৎওয়ালা প্রাণ" কথাগুলি পেলেন ওখান থেকেই :—এক চাষী তার বলদগাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল রবিবারের "হাটিয়া" থেকে—দারুণ জোরালো গলায় গান গাইতে গাইতে "এই সি বাঁচে হিম্মৎওয়ালা প্রাণ" তার মধ্যে ওই কথা দুটি ধরে কবিতায় লাগিয়ে দিলেন। —পরে একটু বাড়িয়ে শেষ লাইনটি আসে—"রক্তিম পটে—পিকাসোর পেশী সচ্ছল সাঁওতাল।" নীরুবাবু একদম হেরে গেলেন। রিখিয়ায় সেবার অনেক কবিতা হয়েছিল। —যেমন 'স্কেচ্'—"দুচোখ ধাঁধাঁয় বাঁধ জলে যায় লাল ঢলে জলে হীরা / দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা ইরা।" এই সময়ে 'নীরুবাবু' ওঁর বন্ধু গোপাল ঘোষকেও রিখিয়ায় আসতে নিমন্ত্রণ করেন, আর গোপালবাবুর যা রঙের হাত খুলে গেল—আশ্চর্য রকমের ! ছবি আঁকলেন এলবামের পর এলবাম। নীরদবাবুও অনেক ছবি এঁকেছিলেন, অনেকগুলি তেলরঙে।—প্রথমে একটা পোর্ট্রেট—নীলে, পরে আমার চশমা চোখে—কি কঠিন। অনেকগুলি তেলরঙে। —গোপাল ঘোষের জন্যে একটি কবিতা, আরেকটি সংগীত—এই 'স্কেচ' কবিতাটির শেষে একটি দারুণ আইডিয়া আনলেন: "মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া/ বিলায় হৃদয় দুর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে/ত্রিকালের মত কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া।"—মানে হরগৌরীর মোটিফ—ত্রিকূট-rugged অসমান তিনটি চূড়া নিয়ে পুব দিকে ওঠেন সূর্যদেব, শিব, আর ঢেউ খেলানো দিঘারিয়ার পশ্চিম দিকে অস্ত যান—যেন দুর্গার প্রতিমূর্তি। এই imageটি ছিল বরাবর ত্রিকূট দিঘারিয়ার

বিষয় ওঁর মনে। আরেকটি মজার কবিতা লিখেছিলেন—'রিখিয়ার জিষ্ণু দে'—তখন ছেলে সাড়ে তিন বছরের—যেটা দেবীবাবুর "রংমশাল" পত্রিকায় ছাড়া ওঁর কোনো কবিতার বইয়ে ছাপা হয় নি—ভুলক্রমে নিশ্চয়ই! সেটা এখানে দিচ্ছি, কারণ কবিতাটি মজার— (দু' বছরের সব দুষ্টুমী নিয়ে কি রকম মজার কবিতা হতে পারে)

রিখিয়ার জিষ্ণু দে

অসীম গুণ্ডামিতে সেটা একমদ্বিতীয়ম্
আমাদের কাজ কম্ম যে তার কৃপাহিকেবলম্।
লাল জুতুয়া পায়ে বেড়ায়, হাত দুটো যা দোলে!
"ধেই ধেই" সে ছুটে বেড়ায় আবার ওঠে—কোলে।
পরজাপতির ভয়ে পালায় বাগান ছেড়ে ঘরে,
আলে উঠে—ভাবে উঠছে দিঘ্‌রিয়া—শিখরে।
নালার জলে ধানের ক্ষেতে দেখছে সমদ্দুর,
লাল সেলামের লাল জামা তার আটকে যায় সুদূর
ত্রিকূট—কিম্বা দিঘ্‌রিয়াতে, রাতের নীলে ঘোর
বলে: পাহাড় হারায় কোথা, নিয়ে পালায় চোর!
রং নষ্ট করে বল্‌লে বলে হেসে বাঁকা:
রং নষ্ট করে যায় কোন ছবিটা আঁকা?
দিদি দুটো ভয় করে যা, উচ্ছে ভাজা প্রিয়,
গোপাল ঘোষের রং ঘষে সে, বাদশা নীরুর স্বীয়
চেলা সেজে রং চোষে সে, জামায় মেখে খুদে
দিন-রাত্তির নেচে বেড়ায় রিখিয়ার জিষ্ণু দে।

(সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রংমশালে—আশ্বিন, ১৩৫৩ এ আরেকটি ছোটদের জন্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল—যুদ্ধের সময়েই—কোনো বইতে এটিও অন্তর্ভুক্ত হয় নি—

॥ একটানা বর্ষা ॥

কয়দিন একটানা বর্ষা
কবে যে আকাশ হবে ফর্সা!
মনে হয় খুব কষে।
আকাশেও গরু পোষে
গলির মোড়ের ঐ গয়লা,

আকাশে গোয়ালে সে কি ময়লা !
সূর্যের ভাঙা জীপ
সারাদিন টিপটিপ
আকাশের রেশনিং যন্ত্রে
চলে কানা বাহাদুর
কেঁদে কেঁদে আহা দূর
আমেরিকা হিংটিং মন্ত্রে

অনুবোমা ফেটে যদি
শুকোয় শূণ্য নদী
চাল ডাল ঝরে রাজতন্ত্রে।
এদিকে যে গয়লা
চাল ডাল কয়লা
দুধ ও কাপড় পোরে অন্ত্রে !

একটানা চলছেই বর্ষা,
আকাশ না কপালটা ফর্সা
গরু আর গরু নয়
মোটা আর সরু নয়
বাঁকা সোজা সব বুঝি একাকার !
সূর্য বিনা তো আর টেঁকা ভার ॥

"সন্দীপের চর"-এর শেষ কবিতা ১৫ই আগষ্ট—"মুক্ত বর্ষ ভোগ্য শাপ মুক্ত হল কলকাতায় বেড়ি"—এই কবিতাটির বিষয়ে প্রশ্ন জাগে—এটা লেখা হয়েছিল কি আগে মানে ১৯৩৬ এর আগে—আরেকটা দাঙ্গা হয়েছিল হয়তো বা ১৯৩৫এ—সেটা আগেই মিটে গিয়েছিল। হয়তো বা তাই—আমার সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে এক বছর ধরে কলকাতার অস্বাভাবিক অবস্থা হয়েছিল—এক বছর ধরে—(যেমন হয়েছিল ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ আগষ্ট ১৫ই পর্যন্ত)—তাই জেগে ওঠে দেশ, জেগে আমাদের বিদ্যুৎ শহর / আশ্চর্য শহর, প্রাণের তুঙ্গীতূর্যে শহর শহরগুলি হাতে হাত পাতা / কোটি লোক মাটির মানুষ বিভেদের নেই অবসর / জানাব কসুর / মৃত্যুর সে

থাই / ভুলে যাও ভাই শ্রাবণের প্রাণ সূর্যে /"..."আশ্চর্য শহর এই আমাদের প্রাণ / অলিতে গলিতে এর ধুলা জানি, প্রাণের সন্ধান / মেলে এই জীর্ণ দীর্ণ নোংরা এলো মেলো, / ভয়ঙ্কর থেকে থেকে দেয় মাথা চাড়া" / ... "এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে / নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান /... লক্ষ লক্ষ কী দরাজ প্রাণ এ তীর্থ শহরে দরগায় / আশ্বিন পূজার মিল হল বুঝি ঈদ মুবারকে / আনন্দ নিস্পন্দন প্রাতে বিরাট ঈদগাতে।"—ঈদমুবারক হল "শ্রাবণের প্রাণ সূর্য"—আশ্বিন পুজোর মিল মানে কোলাকুলি—যা হিন্দু মুসলমান সকলের আনন্দের মিলন চিহ্ন! "উনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই / মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে"...আবার "রাস্তায় সড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে"। উনত্রিশে জুলাই এরপর কি দাঙ্গা শুরু হয়েছিল? ঈদে কি থেমে গেল?—"শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে / লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান, / গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে / ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ / হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ।" শেষ দুটি লাইনে "দেশব্যাপী ইমারত রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ সচ্ছল আকাশ / সাগর সঙ্গমে দিন ভোর বিনিদ্র নির্মান।" "স্বাধীন" কথাটি এসে গেছে—আগেই, এই আনন্দেই? এই কবিতাটি দিয়ে "সন্দীপের চর"-এর অবসাদ কি কমানো গেল?

'সন্দীপের চর'-এর অনেক কবিতাই বিভেদ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ে লেখা—"ছড়া"—"কে জানতো পোড়া দেশে এত বুলবুলি"—বা 'মৌভোগ',—"জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে" কবিতাগুলি ১৯৪৪ / ৪৫-এ লেখা, খুব মুখে মুখে চলতো—"নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে / তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল, / লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে /—কার এসেছে কাল?" বা "এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে / ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।"—সে দিন গুলিই যেন ছিল ভিন্ন!

নিজের কবিতা বিষয়ে বেশ উদাসীন ছিলেন। একটা ফাইল ছিল, কবিতা লিখে তাতে রাখতেন। অনেক সময় বড় কবিতাগুলি এক নাগাড়ে লিখতেন না, ছোট স্তবক লিখে রাখতেন—আবার পরে অন্য পঙক্তি লিখে নিজের মনোমত জোড়া দিয়ে বড় কবিতা করতেন। আগেও দেখেছি, ছোট কবিতারও তারিখ দিতেন না—অনেক পরে বারবার বলার পর, তখন দিতে আরম্ভ করেন। অসুবিধা হয়, যেমন 'সন্দীপের চর'—গ্রন্থে একটা কবিতা আছে '১৫ই আগষ্ট' আবার 'অনিষ্ট' বইতেও আছে ১৪ই আগষ্ট, কিন্তু কোন সাল! "১৫ই আগষ্ট"—"মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল, কলকাতার বেড়ি" আমার মনে হয়েছিল—এই কবিতাই "জল দাও" (১৯৪৬-৪৭) এর

কলকাতার দাঙ্গার পর এ পাড়া ও পাড়া যাওয়ার মুক্তি! কিন্তু হয়তো বা নয়। আরেকবার আগে দাঙ্গা হয়েছিল, আর সেটা ঈদ মোবারককে ছেড়ে গেল—"রাস্তায় সড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে (১৫ই আগষ্ট, সন্দীপের চর)। ওঁর ওই কবিতা লেখার ফাইলের জন্য যামিনীদা লাইন দিয়ে একটি মেয়ের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, আমার এক আত্মীয় সেটার কপি করে ওঁর ফাইলটার একটা চামড়ার মলাট করে দিয়েছিলেন। সেটাতেই কবিতা রাখতেন,—আমি বা মেয়েরা বা ছেলে কপি করতুম। আগে, আমার ধারনা, অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে, কোন কপি না রেখে, যিনিই চাইতেন তাঁকে কবিতা দিয়ে দিতেন। ১৯৩৫ থেকে আমি কপি করতে চেষ্টা করি—কিন্তু সব সময় পেরেছি বলে জোর করে বলতে পারি না। কপি রাখো না কেন?—বললে, হেসে বলতেন—It's not that important! অত জরুরি নয়!—ওঁর এক গুরুজনের "উর্বশী ও আর্টেমিস"—এর উপহারের কপিতে লিখেছিলেন—"মাইনর কবি হবার আশায়"—এ রকম একটা কিছু।

১৯৪৫-এ আমরা নীরদবাবুর সঙ্গে রিখিয়া গিয়েছিলুম, কিন্তু ১৯৪৬-এ কোথাও যাওয়া হয়নি। ১৯৪৭ এ আমরা, আমার ছোট ননদ-ননদাই-এর কাছে মুঙ্গেরে গিয়েছিলুম—আমার ছোট ননদাই ডঃ কালীপদ মিত্র খুব ভালো ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন। 'অন্বিষ্ট'-র প্রথম ও অনেক কবিতাই ১৯৪৮ সালে আমরা যখন রিখিয়া যেতে পারলুম পুজোর ছুটিতে—সে সময়ে লেখা। কিন্তু 'অন্বিষ্ট'-র শেষ কবিতাটি "জল দাও" শুরু হয় একটি ১৯৪৬-এর ঘটনা থেকে—এবং শেষ হয় ১৯৪৭ বা ৪৮-এ—আর 'অনিষ্ট'র '১৪ই আগষ্টে' শুরু হয় দেশবিভাগের সমসময়ে (মানে ১৯৪৬-৪৭) শেষ হয় আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর। "দেখছি মেলায় এক"—এটি এই লম্বা কবিতারই একটি অংশ—আমার প্রথম edition-এর (সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) বইটিতে আছে। এই দুটি কবিতার বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ সব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিবিড় ভাবে, অতি কাছে কাছে, ছিলুম, বিশেষ করে ওঁর এত শরীর খারাপ হয়েছিল বলেই এবং ১৯৪৮-এও অনেক কষ্ট করে ওঁকে রিখিয়া নিয়ে যেতে পারি—ওঁর এত শরীর খারাপ সত্ত্বেও রিখিয়া যাবার ইচ্ছের জন্য।

'জল দাও' কবিতাটি ১৯৪৬-ই আরম্ভ হয়—জিষ্ণু ছোট্ট তখন। আমাদের ঠাকুরের আবার অনেক গাছ করার সখ ছিল—দোতলার ছাদে একটা গোল বড় টবে খুব সুন্দর বেল্ ফুলের গাছ পুঁতেছিল—শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বড় বড়—দারুণ সুন্দর ফুলে গাছটি ভরে গিয়েছিল। জুঁই, বেল, মালতী রজনীগন্ধা—সাদা ফুল খুব পছন্দ করতেন—(সব রকমের ফুল ও গাছই ভালোবাসতেন) "জল দাও" কবিতা আরম্ভ এই দিয়ে

—প্রকৃতি আর মানুষের তফাৎ!—যে বছরের কথা আমি লিখছি—মুসলীম লীগ সরকার তখন এখানে, ১৪ই আগষ্ট ছুটি দেওয়া হয়েছিল—"Direct Action Day"। আমাদের বাড়ীটা ঐতিহাসিক টিপুসুলতানদের প্রাচীন কবরখানার পাশে—তখন খুব সুন্দর ছিল—প্রকাণ্ড পুকুর, দক্ষিণে অনেক নারকেল ও এক জোড়া তালগাছ, ঘাটের কাছে—পাতাবাহার ও বুনো গোলাপ, অজস্র মহুয়া, কদম, আম, নিম, নানা রকমের গাছ ছিল। একটা ডালিম গাছ যাতে ডালিম ফলতে দেখেছি ; বারোটা জামরুল গাছ ছিল আমাদের পাঁচিলের পাশেই—পরে ১৯৬০ সালে একদিন এক প্রচণ্ড ঝড়ে অনেক গাছ উড়িয়ে নিল।

১৩ই আগষ্ট কি হয়েছিল জানি না, সতীশ মুখার্জী রোডের দিকে কবরখানার ফটকের কাছে ক'টি মুসলমানদের বাড়ী ছিল—সেদিন সকালে কেন জানিনা ওঁরা বন্দুকে ছর্‌রা ছোড়েন—ফলে গয়লারা ও লোকজনেরা ভীষণ ক্ষেপেছিল! টালিগঞ্জ থেকে একটা মিছিল বেরিয়েছিল—"আল্লাহো আকবর! লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তান"—আওয়াজ দিয়ে। আমার এক সহকর্মী রাত্রে ফেরে নি, তার খবর আনতে বেরিয়ে ছিলুম—রাস্তায় লোকেরা আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন—ভীষণ বিপদের ভয় দেখিয়ে। আমি এসে দেখি চেনা অচেনা লোকে ভর্তি আমাদের ঘর। আমার এক ভাসুর আমাকে এসে বললেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওঁদের বাড়ী চলে যেতে, আমাদের বাড়ীটা নিরাপদ নয়। ঠিক তখনই একজন অচেনা ভদ্রলোক এলেন আমাদের ঘরে, হাতে একটি বাঁশি, আমাদের একটা চেয়ারে বসলেন। আমি ছেলেমেয়েদের স্নান করিয়ে খাইয়ে নিয়ে যাব বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—দেখি ২ তলার সিঁড়ির জানলায় আমার ছোট দেওর দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছেন আর জোরে কি বলছেন। আমি দেখলুম—ভীড়ের মধ্যে ছ'ফুটের ওপর লম্বা তিনজন সাদা পায়জামা-পিরান পরা খোদাই খিদমদ্‌গার হাতে সাদা পতাকা নিয়ে জোরে জোরে বলতে বলতে এগুচ্ছেন—শোনা যাচ্ছিল—বাবুলোগ—এই সি মৎ—কীজিয়ে!" বয়স্ক দুজনকে ওখানেই কারা যেন ধরে ফেললেন, পরে দেখলুম শেষ! ছোটটি তবু এগিয়ে আসছিলেন, আমাদের ঘরে যে ভদ্রলোকটি বাঁশি নিয়েছিলেন, বেরিয়ে এসেছেন—দেখলুম বাঁশি থেকে সরু লিকলিকে ছোরা বার করে খোদাই খিদমদ্‌গারের পেটে ঢুকিয়ে দিলেন—তাই মাধব, আমার দেওর চেঁচাচ্ছিলেন—ও রকম করবেন না। কিন্তু ওঁর কথা কে শোনে, তখন? ছেলেটি ছোরার ঘা খেয়ে লাফিয়ে সামনের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন—কিন্তু পাড় থেকে ঢিল পাটকেল ছোড়া হচ্ছিল! তাই আবার উঠে আসেন।—তখন আমি আবার নীচে নেমে আসি কি হচ্ছে দেখতে। নীরদ মজুমদার আমাদের বাড়ী

এসেছিলেন খবর নিতে। ওঁকে বলেন—বিষ্ণুদা, চলুন আমরা ওকে কংগ্রেস আপিসে—১০, জনক রোডে—নিয়ে যাই—ওকে তো এখানে মেরেই ফেলবে।—এই টুকুই শুনেছি—ওঁরা কি করে নিয়ে গেলেন আমি দেখিনি—আমি ছেলেমেয়েদের খাওয়া দেখতে ওপরে চলে আসি। উনি খানিক পরে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলেন—বললেন—'ভীষণ গরম, স্নান করব—আমার পাঞ্জাবীটা খুলে দাও তো, বাঁ হাতে দারুণ ব্যথা।—আমি ভাবলুম—লম্বা শরীর তো ছেলেটির, নিয়ে যেতে তো কষ্ট হবেই, কিন্তু উনি তখনই আমায় জানালেন—"গয়লাদের বাঁশে মানুষের প্রাণ কি করে হারায়, বুঝেছি।" (কথাগুলি যেন আমার কানে এখনও বাজে।)—বুঝলুম গয়লার বাঁশ ওঁর কাঁধে পড়েছিল—ওঁকেই আঘাত করতে, না ছেলেটিকে, জানি না!—খুব কষ্ট করে ডান হাত খুলে, গলার দিক খুলে, বাঁ হাতটা খুলতে পারলুম—একদম নাড়াতে পারছিলেন না ব্যথায়। ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠালুম—উনি দেখে বললেন X-Ray করতে হবে—হাড়ে আঘাত লেগেছে, শির ও nerves-এও খুব ক্ষতি নিশ্চয়। মিসেস দে, এর অনেক toll নেবে—আমায় দুঃখিত স্বরে বললেন। সব লিখে দিলেন, কি করাতে হবে, কোথায় ইত্যাদি। X' Ray রিপোর্ট বেরুলো বাঁ কাঁধের হাড় ভেঙেছে—যা কখনো জোড়া লাগবে না, বরং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কষ্ট বাড়বে, আরো ক্ষতি হতে পারে। এখন তো শুনি, এবং বুঝেছিও—ওঁর শেষ অসুখ—মাথায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়া—এই আঘাতের জের। হাতের ব্যথার জন্য ড: মিত্র Cancer Institute-এ electrical therapy এবং অন্য কি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, প্রতি সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন অমল সেনের কাছেও হোমিও ওষুধের জন্য যেতেন। অসম্ভব সহ্যশক্তি বলে কারুকে কিছু জানাতেন না—কিন্তু কাঁধের ব্যথাটা সব সময় ভোগাতো। বাঁ হাতে পাঞ্জাবী গলিয়ে পরে ডান হাতটা পরতেন, খোলার সময়ও তাই। ওঁর পরের ভাই আমার দেওর—কেশবেরও এই সময়ের কষ্টে, দিনে রাতে শরীর খারাপ হয়ে গেলো, কিছুকাল পরে সেও তো চলে গেল।

'জল দাও' কবিতাটি আরম্ভ হয়—এই সব ঘটনার শুরু থেকে—অনেক মাস ধরে—১৯৪৭ পর্যন্ত—তাই "হয়তো বা নিরুপায় / হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রনাই বর্তমানে ইতিহাস" / আবার "আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ / একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে"—'কর্মিষ্ঠ যন্ত্রনা' অথবা "হয়তো বা যন্ত্রনাই সার / দেখে যেতে হবে মাজ ঠেকে শির্ষে / সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে / অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান / নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে / কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে / অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান"..."তোমাতেই

বাঁচি প্রিয়া / তোমারই ঘাটের গাছে / ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে / জল দাও আমার শিকড়ে ॥" এবং এরই sequel" "অম্বিষ্ট"রই ১৪ই অগষ্টে, যার অংশ "দেখেছি মেলায় এক" (যেমন ছিল প্রথম সংস্করণ 'অম্বিষ্ট'তে (নবযুগ আচার্য-র প্রকাশ-সেপ্টেম্বর ১৯৫০) ।

তারপর যা ঘটেছিল—সে ঘটনাতেও প্রমাণ আছে। আমরা ছেলেমেয়েরা ১৫ই ভোরে-বেরিয়ে গিয়েছিলুম—প্রভাত ফেরীতে—দেশপ্রিয় পার্ক থেকে আরম্ভ—ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে শুনি—বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক অনেক-কে নিয়ে এসে ছিলেন—বাবুকে ডাকতে.—বাবু তাঁদের সঙ্গে গেলেন। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করবাবু—অনেককে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিনও ঈদ্—উনি তাঁদের সঙ্গে গেছেন—ফিরে আসতে সব আনন্দের কথা বললেন :—"স্বপ্নে কাটে শ্রাবণ ঘন রাত / প্রভাত ফেরী, ক্লান্তি শেষ নেই, / স্বপ্ন বুঝি দিনকে করে মাৎ, । তোমার দেশ আমার দেশ এই ;/ জীবনই গান প্রাণের প্রতিপাত ।....সোনার দেশ কোনই ক্লেশ নেই / মরনপণ প্রেমের জয়জয় /....আমাদের যে অবাক দেশ এই । / জানেনা হার কাঁটায় ফুল তোলে ··প্রভাত ফেরী চলে প্রাণের বোলে / মৈত্রী আর ঐক্যে রাত জ্বালা / রাত্রি শেষ নবজীবন রোলে /···কি আনন্দ আনন্দ অসীম / রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ / প্রথম ভোরে অবাক করে দেশ / মেতেছে মিলে হিন্দু—মুসলিম / জলে স্থলে অসীম তার রেশ ।"

আমি একটু ওঁর নিজের কথা লিখি—এখানে প্রয়োজন বলে। ১৯৪৬-এ যে মার খেয়েছিলেন, অনেক দিন তার জের চললো—কষ্ট কমাবার জন্য চিকিৎসাও। আমারও শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছিল, হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, ক'দিনের জন্য। তাই ৪৬-এ কোথাও যাওয়া হয় নি, '৪৭ এর গরমের ছুটিতে আর ক'দিনের জন্য বোধ হয় পুরী যাই—পুজোর ছুটিতে মুঙ্গের যাই—ছোট জামাইবাবু কালীপদ মিত্র ডাক্তার,তিনি আবার পরীক্ষা করে দেখলেন। তবু '৪৮-এ খুব শরীর খারাপ হয়—কোমরে দারুণ ব্যথা—উঠতে পারছেন না। আমার এক বন্ধু রিখিয়া গিয়েছিলেন—আমায় লিখলেন—আমাদের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করে দিতে পারেন। নীরদবাবু বিদেশে চলে গেছেন—ওঁদের বাড়ীতে অন্য আত্মীয় স্বজন গেছেন। অনেক কষ্টে, আমরা উচ্চপদস্থ একজনকে ধরে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে, বিরাট মালপত্র নিয়ে ঠাকুর-পো সঙ্গে, আমার ভাইয়ের এক বন্ধু মধু রাণে ও তার বিদেশী স্ত্রীকে নিয়ে খুব কষ্ট করেই দেওঘরে পৌছানো গেল। ইরা-তারা-পপা, মধু আর ঠাকুরের সঙ্গে গেল ঘোড়ার গাড়িতে, আমরা দুজনে গেলুম গরুর গাড়িতে—উনি উঠে বসতে পারতেন না। খড়ের ওপরে বিছানা বিছিয়ে বলদ-গাড়ি চলল নদীর অল্প জলের ওপর ছপ্‌ছপ্‌ করে—ক'ঘণ্টা পরে বাড়ী পৌছলুম। ইরা

ঠাকুরের সাহায্যে অনেকটা ব্যবস্থা করে রেখেছিল, সবাই মিলে ঘরদোর পরিষ্কার করে ওঁর বিছানা করে রেখেছিল, কষ্ট হলেও খুব বেশী হয় নি! এই আমাদের দ্বিতীয়বার রিখিয়ায় দুঃসাহসিক যাত্রা! রিখিয়ায় আগেরবারই অনেক বন্ধুও চেনাজানা করে দিয়েছিলেন নীরদবাবু—ধীরে ধীরে উনি ভালো হতে লাগলেন। আমাদের কাছে সেবার প্রাণকৃষ্ণ পালও গিয়েছিলেন—তখন আমরা আবার ওদের বাড়ীতে উঠে যাই। —প্রতিমা, আমার বন্ধু, ভালো গান করত—তাই, "তুমি করো গান, / তুমি আঁক ছবি,/ কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ, / তুমিই তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দ ভৈরবী।" প্রতিমার ছোট বোন নমিতা রিখিয়ায় অনেক বছর ছিলেন, আর বোধ হয় "মুখিয়া"-ও হন—অনেক ভালো কাজ, যেমন "ধর্মগোলা" চাষ উঠলে পর-ইত্যাদি করেছিলেন—রাস্তা মেরামত, বাস চালানো, দেওঘর থেকে রিখিয়া ও আরো দূর পর্যন্ত—চালাতে পেরেছিলেন। নমিতা রিখিয়ার লোকেদের নিয়ে ওদেরই বিষয়ে একটি নাটক লিখে ওদের দিয়েই অভিনয় করেন! তাই দারুণ কবিতা সব হয়েছিল সে সময়ে—উৎসাহের আনন্দের—"জ্বালাও দীপাবলী, আমার বেশ / স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল। আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ / আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে / খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা / বিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ।" অথবা "ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগল / সে আলো কি আজ দিগিরিয়া বেয়ে সন্ধ্যা? নীল পশ্চিমে ফেরার মেয়েরা জাগল / জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্ণা।" পরে নমিতা ওখানে একটি ছেলে মেয়েদের জন্যে স্কুল করেন সেটা এখনও চলে।

তারিখ লিখে না রাখায় "অন্বিষ্ট"র কবিতাগুলি ঠিকভাবে সাজানো হয়নি—বইটি নবযুগবাবু ১৯৫০-এ তোড়জোড় করে, খরচ দিয়ে ছাপান, নিজেরই উৎসাহে। হয়তো আমার সঙ্গে অনেকের মতে মিলবে না—আমার একটু অভ্যেস আছে—পাশে পাশে লিখে রাখা বইয়ের! কয়েকটি ঘটনা তাই মনে পড়ে—'অন্বিষ্ট'—বইতে স্থান পেয়েছে—একটি হচ্ছে "এক জলসায়।" তখন জ্যোতিরিন্দ্র বাবু বম্বে থেকে কলকাতা চলে এসেছেন। "গীতবিতানে" রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন—আমি যে স্কুলে কাজ করতুম তার প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় ৺চারুচন্দ্র বিশ্বাস—আমাকে একটা কীর্তন শিক্ষালয় চালাতে অনুরোধ করেন। আমি চালাতে রাজি হয়েছিলুম যদি কীর্তনের সঙ্গে ছোটদের জন্য নৃত্য, বড় ছাত্রীদের জন্য মার্গসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতও শেখানোর ব্যবস্থা থাকে। তাই কীর্তনে শ্রী রত্নেশ্বর মুখার্জী ছিলেন, মার্গ সঙ্গীতে শ্রীমতী দীপালী নাগ ও আরও অনেকে শিখিয়েছেন—তখন আমরা দিল্লী থেকে একটা গ্রান্টও পেতুম। সুচিত্রা মিত্রও কিছু দিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারপর জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এলেন। আমার এক

বান্ধবীও ছোটদের গান শেখাতেন। শ্রী রত্নেশ্বর মুখার্জী কীর্তন শেখাতেন। তখন আমাকে বলা হয়েছিল—red aid হাসপাতালের জন্ম (দুর্ভিক্ষ এবং পরেও ওঁরা খুব দেশের গরীব লোককে সাহায্য করছিলেন) কিছু অর্থ তুলে দিতে। সেজন্য আমরা সময়উপযুক্ত একটি স্বদেশী গানের জলসা করেছিলুম। নানা রকম স্বদেশী গান — নজরুল, জনপ্রিয় স্বদেশী গান ও কীর্তন দিয়ে খুব সুন্দর একটি আসর হয়েছিল—তাই "বন্দেমাতরম বলে যায় যাবে জীবন চলে।" বেশ কিছু অর্থও আমরা তুলে দিতে পেরেছিলুম—"জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন"—তারিখটিও ভুলেছি, মনে হয় ১৯৪৭ সেপ্টেম্বর। কিন্তু যে আনন্দ হয়েছিল —" ৪ই আগষ্টে"র শেষে—১৫ই আগষ্টের ভোরে -"আনন্দ আনন্দ অসীম"—সেটা কেটে—গেল "অবিচ্ছিন্ন কাব্যতেই। তখনই 'ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায় / রাত্রি আজকে মধ্যদিনের আগুন।"··· "শুধু রাজপথ / পথের মানুষ / পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা। / পথে পথে চলে অসহায় চোখ। মরা মুখে জলে সাদা কালো চোখ / নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালা ভরা চোখ, মরীয়ার চোখ / স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ /··· ভিখারীর চোখ, গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধ আর / বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকাল দর্শীর শিশুদের চোখ / ঘরহারাদের, কারখানা ছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের / যেন লাখো লাখো চোখে, অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত আকালের ভিড়। দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীন ভারত ট্রেড মার্ক ভিড় / আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড়, ছাঁটাইয়ের ভিড়, ধর্মঘটের। ধর্মধ্বজের প্রতিবাদী ভিড়, দুস্থের ভিড় / স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে /··· দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের / স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।" এর মধ্যে আগেই বৃটিশের কারসাজির কথা: "ওরা তো জানে না ওরা যে কার পুতুল / ত্রিভুবনে আজি ওদের রাজার বাজি। কতো সাধুকথা বেভিনের কারসাজি, / ট্রু্মানের যত সত্যাসত্যে ভুল। বুঝি না আর যে তাও কি বোঝ না মূঢ় ?" কিন্তু আবার, "হারিয়ে সে তো যায় না, সে তো / কোনোমতেই মানে না হার / দিগ্‌বিদিকে আঁধি ঘনায়— / কোথায় এখন গেল কুমার !"···এবং "হারিয়ে সে যে যায় না জানি / কোনদিনই সে মানে না হার। / ঘুমের দেশে দানোয় হানে, / ভাবছে তারা ঘুমিয়ে কুমার।"

আর একটি কবিতা অনেক আগেই লেখা ১৯৪৩ বা ৪৪ সালে—"গুণুনিয়া" আমরা যখন যামিনীদার গ্রামে বালিয়াতোড়ে গিয়েছিলুম তখন দেখা—রাস্তায় হাঁটতে গেলেই দেখা যেত—কঠিন পাহাড়—শুনেছিলুম পাথুরে বলে পাহাড়ে ওঠা শেখানো হয় ওই পাহাড়ে।

"অম্বিষ্ট" কবিতাটির প্রথম অংশটি রিখিয়াতেই লেখা, আবার শেষ অংশটি—"আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিয়ের দিনান্ত ছটায় / দীর্ঘ শালবন / তবু লাল কাঁকরে মাটিতে / আস্বাদ ফুরায় নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।··· অস্তিমের অমর পাথরে / খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে, যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে। / তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়, / মানুষ। এই বড় 'অম্বিষ্ট' কবিতায় উনি অনেক ধারা এনেছেন—সাধারণ ঘটনা যেমন "ঘুমাও ঘুমাও তুমি" —আবার গভীর চিন্তা আসে : "শ্রাবণের সে সাতরঙা আবেগে আবেগে / পিকা-সোর তুলিতে আঁকা রঙে রঙে রূপান্তর / রঙের সে মুক্তি কে বা রোখে / মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে / পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায় /" ···"মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে / গ্রামান্তরে শহরের বিদ্যুৎ মন্থনে /" "আশ্বিনের সন্ধ্যা জলে / পাকাধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে ··আমার অনেক দিনে হাতে হাতে দিন গুণে যাওয়া" / "প্রাণভরে গান করে অনশনে গান শুনে যাওয়া"··· "তাইতো অমরলোক রূপনারায়ণের পারে এই মর্ত্যলোকে"।

কিন্তু তার পরের কবিতাই ভিন্ন—লেখা ২৯শে এপ্রিল ৪৯ সন্ধ্যায়—বড় করুণ অবস্থায়। আমার এক স্কুলের সহকর্মী বাড়ী যাবার সময়ে আমায় হঠাৎ এসে বললো—প্রণতদি কাল আমি স্কুলে আসতে পারবো না—একেবারেই আর দেখা হবে কি না জানি না, তাই বলে যাচ্ছি। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ? সুধা রায়, আমার সহকর্মী, আমায় যা বললো—মেয়েদের জেলে আরেকটু ভাল ব্যবহার করার জন্য অনেক আবেদন করা হয়েছে, কোনো ফল হয় নি, তাই মেয়েরা কাল একটা মিছিলে যাবে। লতিকা সেন সাধারণত পতাকা নিয়ে পুরোভাগে যায়, কিন্তু কাল ও পারছে না !—ওর "পিছু টান" 'আছে—ওর ছেলে··· তাই আমার বন্ধু, সুধা, মিছিলের সামনে ব্যানার নিয়ে যাবে, ঠিক করেছে। কারণ কাল, ওরা খবর পেয়েছে পুলিশ গুলি করবেই। তাই সুধা যাবে, ওর সব কর্তব্য সারা হয়ে গেছে, বাবা-মা নেই, ভাই কাজ করে—বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।

আমি খুব ভয়ে পেয়ে ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ওর সঙ্কল্প বদলাতে পারলুম না। খুব মন খারাপ করে বাড়ী এসে ওঁকে বললুম সব বৃত্তান্ত। সত্যিই, পরদিন সুধা আসেনি। ওর কাজ বিতরণ করে নিজের কাজ বিমর্ষচিত্তে শেষ করে, বাড়ী ফেরার সময়ে দারোয়ানকে বলে এলুম—সুধাদিদির বাড়ী গিয়ে ওর খবর আমাকে জানাতে। একটু পরে, সুধা নিজেই এলো। আমাকে বললো—ও ঠিকই ব্যানার নিয়ে গেছে, কিন্তু পুলিশ গুলি করেছে, পিছন দিকেই—যেখানে লতিকা ছিলো !! সে এবং

আরো তিনজন রাস্তায় গুলি খেয়ে পড়ে তক্ষণি মারা যায়। তারিখটি ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৯!, আমার মনের অবস্থা বোঝাতে পারবো না—অন্ধের মতো, বাড়ীতে এসে, আমার স্বামীকে সমস্ত কথা বললুম! সেই রাত্রেই এই কবিতাটি লেখা হয়: "তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একছত্র প্রাণ। / মেলাও আজও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচীতে /"…"আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট ভ্রুকুটিতে / পথের ধূলায় পড়ে? বরনীয় তনু হিম প্রাণ / হীন প্রাণ-হীন পড়ে' পথের ধূলায় পড়ে' রক্তময় বসন্তের প্রাণ? / এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে? / ওড়াও উর্মিল বীজকল্প্র হাহাকার, স্মৃতি পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ-সম্বিতে / তোমার নিথর দেহে প্রেয়সী সখী সহকর্মী! সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।"

(২) নম্বর "অন্বিষ্ট"-র কবিতাটিও আমাদের রিখিয়া থেকে ফেরার পরের দিনই লেখা—১৯৪৮ এর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। আমাকে বললেন কলেজ থেকে ফিরে—আজ একটা খুব impressive procession দেখলুম, কলেজ যাবার পথে—অনেক মজুর কি দারুণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাস্তায় হাঁটছিল—দেখে খুব ভালো লাগল: "এক ঘেয়ে দুপুরের পথ / ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ী বাড়ী দোকান ফেরির ডাকে / সাধারণ রোজকার রোজগারের…" এই কবিতাটিএ লেখেন "এক নিঃশ্বাসেই যেন! রিখিয়ার কদিন থাকার পর তো কলকাতার জীবন মনে হয় "Stale, flat, and unprofitable"—সত্যিই! আমি কোথায় পড়েছিলুম G. S Frazer—Left Poetry (Communist) লিখেছেন—"left poetry কি রকম হওয়া উচিত: It requires the use of symbolism of the great suffering masses, rather it does not require symbolism or allegory at all but a direct appeal to the masses, a direct praise of them and a tone of practical exhortation, a direct description of their activities of suffering. And it must not be cryptical or allusion or obscure—it must make no cultural demands on them in the struggle."

আমার নিজের ত্রুটির কথাও আমি এখানে মানি। রিখিয়ার সুন্দর রঙিন দিনগুলির পর কলকাতা ফিরে এসে, যা বাজে লাগতো, বলে বোঝানো যাবে না! কিন্তু আমকে তো ঘোড়ার মতো লাগামে জিন দেওয়ার মতো চলতে হত—এতদিন স্কুল বন্ধর পর—কত কাজ, চিঠি, পরীক্ষা, প্রমোশন, নতুন বছরের রুটিন—মাথা খারাপ হবার কথা! আমি কাজের চাপে হাবুডুবু খেতে খেতে দেরীতে বাড়ীতে গিয়ে ক্লান্তিতে কি করেছি, বলেছি—ভুলেছি এখন কিন্তু তার প্রমাণ তো থেকে গেছে ওঁর

কবিতায়—আমার লজ্জায় ! তবু আজ মানছি আমার অকর্মন্যতা।—"আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান / চোখে আনো সমুদ্রের মানসের নীল / তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ / দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।" "আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে / বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে / আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে / আপন হাতের মাঝে আপন সময়। /… আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ / আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান / বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় সম্পূর্ণ কূজন / রোমাঞ্চে দুহাতে করে তুলে নেবে আমার অঘ্রাণ ? / …তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝনঝনা উপহার / আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।" কি করেছি বা বলেছি কিচ্ছু মনে নেই, কিন্তু যা করেছি সেটা যে শালীন নয়, সে জন্য আমি প্রগাঢ় ভাবে লজ্জিত এখনও ! তাই কবিতাটি উদ্ধৃতি করেই সকলকে জানাচ্ছি, এবং তার কাছে এবং সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবুও একটি ভালো এর থেকে বেরিয়েছে আমার শিক্ষা খানিকটা হল, এবং তিরস্কারের একটি দারুণ-কবিতা ! কবিতা সব কিছু নিয়েই হয়, তাহলে ! তাই নিজের আদর্শ বিষয়ে বলেছেন "শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব কবিতাতে, নিজের আদর্শের কথা : খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত ! দেখা যায় / সেই মন সেই চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে। / সেই সাধ্যে গেথেঁছি সাধনা। কাব্য সে সন্ধান জীবনের।" "অম্বিষ্ট" গ্রন্থটির আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে—কবি আর্টিষ্টদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন, এবং তার উপহার পেয়েছিলেন—অসহ্য গালিগালাজ এবং তার জবাব —শালীন জবাব দিয়েছিলেন—আমি এখনও গর্ব বোধ করি এই সময়ে Roger Garaudy-র লেখক আর্টিষ্টদের স্বাধীনতা চাই (arteste sans uniforme) নামে লেখাটি অনুবাদ করেন "উর্দিহীন শিল্পী"—তারপর ওঁকে অসম্ভব আক্রমণ করা হয়। তারই প্রত্যুত্তরে অসাধারণ কবিতা লেখেন 'অম্বিষ্ট' কবিতা ২য় ও ৩য় স্তবকে :— আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি, / তুমি জানো নাকে আছি / তোমার হাওয়ার শ্বাস টেনে কাছাকাছি। /…"তোমার নাজানা আমার নিত্য আত্মদানে বটে, / হাটে-অঙ্গনে হৃদয়ের সঙ্কটে। / তুমি জানো নাকো তোমার পাশে কে সে। হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে, / তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিংবা নদীর তীরে / পাশে পাশে চলে আলোর মতন / হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে / তোমার না জানা সহচর, দিন গোনে / কবে যে তাকাবে জনতা কিম্বা খুশি হয়ে নির্জনে।" অথবা "আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে / …পড়োশীরা হাসে, জানে ভিন্ গাঁয়ে লোকে / কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে / কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউবা নদীর তীরে" / আবার

"তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে / তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি / প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি / তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে। …/ বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল, বলে অসৎ স্বপ্ন দেখা চাল। /… পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে, / হৃদয়ে নীল ঢেউ বল কে রোখে? / কুৎসা শুধু কুয়াসা, হবে ভোর / উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর। … / আমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে / বিজ্ঞ বলে কতো কি মূঢ় রাগে : / তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি / অন্ধকারে উষার ভৈরবী / তোমার দানে আমার অভিযান / তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান / তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল … / বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।"

আমি জানিনা আমার নাম দিয়ে লেখা উচিত কিনা এই কবিতা টি বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের কাজ দেখে লেখা : কারণ উনি নামটা লেখেন নি—কিন্তু এ কবিতার দুটি অংশ "তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্দ্ধশ্বাস রথে" /, এবং "দেখ দেখ / তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বারবার / মরিয়া আবেগে / চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে / মাথা কোটে-প্রাণের আশায় /সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ঐ / তোমার আমার।" …শেষ হয় "এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমারও / পাষাণে পাষাণে / চোখে দিই এ অন্ধ আবেগে। মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্ব পাষাণ / কিশোরকুমার পাক প্রাণ / আমাদের ও পরিত্রাণে।"

রবীন্দ্র ভক্ত অল্প বয়স থেকেই—বছরের শুধু দু' একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হৈচৈ পছন্দ হতনা কিছুতেই। "তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখের," কবিতাগুলি অনেক দিন ধরে লেখা হয়,—ছাপা হয় ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫। "বামী" কবিতাটি এক সন্ধ্যায় লিখে ছিলেন—আমি কপি করে কিচ্ছু পাবিনি—মনে পড়ে—আশ্চর্য সত্য। ২৯শে নভেম্বর এসেছিলেন, এনেছিলেন—রুশের পৌরুষ—খুব ঘটা—সকালেই লিখে ফেলেন। "জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন"ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপরে লেখা। একটা মজার কবিতা জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে,মানুষের নাচে-গানের ইঙ্গিতে : "নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোষ" "হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক, / তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে / মিলিয়েছি তার সুষমা।" "শুনেছি সিন্ধু মুনির হরিণ আহ্বান। / চিতা চলে গেলে লুব্ধ হিংস্র ছন্দে / বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে। / কোথায় সে বন, বসতিও কই বসেনি, / শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার। / জঙ্গল সাফ; গ্রাম মরে গেছে, শহরের / পত্তন নেই ময়ূর মরেছে পণ্যে। কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়? কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ? / সারা দেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব? পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে?" দিল্লী যেতে হতো মাঝে মাঝে কাজে—ছবি বাছার ইত্যাদি

কাজে—সেবার ফিরে এসেই এক কবিতাটি লিখেছিলেন—"রাজধানী"। "জ্ঞানপীঠে"-র সময়ও কিছুতে যেতে চাননি—শরীরও খুব খারাপ ছিল। আর, দিল্লী কিছুতেই ভালো লাগতো না। পরেও দেখেছি, শরীর খারাপ হয়ে যেতো—১৯৭৩ এ বাংলা দেশ যুদ্ধ যখন সুরু হয়, তখন তারা-সঙ্গিতের কাছে গিয়েছিলুম—ভালো লাগেনি, শরীরও খারাপ হয়ে যেতো। তাই "এখানে মৃত্যুর রাজ্য···" "বিলেতী চাউস মৃত্যু রেখে গেছে কবন্ধ বণিক / দিল্লী আজও সে নির্বোধ-শ্মশানের খুঁজে মরে দিক॥" "গান" কবিতাটি লেখা হয়, রবীন্দ্রনাথের নাটক—"শাপমোচন"-এর পর। তখন আমি কমলাস্কুলে কাজ করছিলুম—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু চলে গেছেন—দেবব্রত বিশ্বাস গান শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। "মালতী ঘোষাল"—এর রেকর্ড বার বার শুনতেন "এ পরবাসে রবে কে"। "শাপমোচন"-এর একটি গান—"তুমি কি কেবলই ছবি"—আশ্চর্য প্রাণ দিয়ে গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। তাই জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর গান মনে পড়ে যায়—"ধ্যান ভাঙো"—"দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে, / অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদীঘিতে এসপ্লানেডে / মন চাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারে কলে মিলে / দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই / প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার শেডে॥"

—

উজ্জ্বক প্রকাশনী

৪০, মহারাণী ইন্দিরাদেবী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬০

তারিখ—

MEMORABILIA

Vishnu Dey As I Knew Him

By Sachi Routroy

I knew Vishnu Dey quite well. I came in contact with him and sometimes closely, during my stay in Calcutta extending over a period of 20 years—ie from 1943 to 1962. I was then the Chief Labour Welfare Officer of Kesoram Cotton Mills Ltd., at Matiaburuz, Calcutta. Later on I Worked as the Executive Officer of the Mills for about ten years. I am staying in the Mills quarters at 42, Garden Reach Road, Calcutta-24, situated just in front of the Mills.

Vishnu Babu was a lecturer in English in the Surendranath College, Calcutta. We often used to meet in the various literary and cultural functions including the meetings held under the auspices of the Progressive Writers Association of Calcutta. We were also sometimes meeting in the preview sessions of Film Censor Board.

Vishnu Babu was elder to me by 7 or 8 years. I always deemed it a proud privilege to have an opportunity to discuss with him on matters of common literary interest.

Even prior to joining Kesoram Cotton Mills in 1942, I had an occasion of listening to his speech in a literary meeting held in Albert Hall. I was then a student of the City College at Amherst Street, Calcutta and an inmate of the Raja Rammohan Roy Hostel attached to it.

The early forties were for all of us quite hectic and alarming year. The great Bengal famine claimed a toll of millions of human lives. Countless people were dying of hunger and epidemics caused by famine. Calcutta was being bombarded almost every night by Japanese bombers. After the war came the partition and on its wake Calcutta witnessed the worst communal riot in India. Matiaburuz was the worst-hit area. But despite these disturbing factors, the writers of Calcutta used to meet frequently and discuss the situations. Our favourite meeting

place was 27, Alipore Road the house of Snehanshu Acharya who is no more.

Vishnu Babu was the master of a unique poetic idioms where its the spoken word was fused into the literary speech. Often Urdu, Hindi and Persian words were made use of making his poetic speech more effective and meaningful. His imageries were fresh and bright-creating almost a visual sensation in the readers' mind. He wanted to bring in the unification of sensibility amidst all diversity and discord and fragmentation and his poems could equally be termed as 'unrhymed cadence' although he did not spare interim rhymes at places.

According to discerning critics his prose style was brilliant and unique. I have gone through his book, 'Ruchi - O - Pragati' containing his critical studies of Richards and others. They bear eloquent evidence to his critical perspective.

I pay my homage to the great poet and critic, Vishnu Dey who has left behind a rich legacy of literary achievements creative excellence for us.

Homage to Bishnu Dey

By Amar Bhattacharyya

In Bishnu Dey's death on December 2, 1982, Calcutta lost its greatest citizen-poet and Bengali - Indian - literature, one of its modern masters of poetry. Dying at the age of 73, Dey had used his nearly half-a century's life exercising himself ceaselessly creatively, in verse as well as prose, except for the last few years when, a long-drawn spell of illness compelled him to live through a phase of unproductive life, fearful in its inanity and silence. The last decade, in most part, of his life was a gloomy physical hang, due to an odd tangle of ailments, following a minor accident that he had had He was deprived, among other things, of the use of his right hand—a privation, comparable to an astronomer's loss of eye-sight. This physical discomfiture must have meant for him what it would have done with any poet, who didn't speak his poetry into a dictaphone. An injured leg restricted his movements. The poet, agile, itinerant, used to strides, was taught to sit still. How must have he resented the stasis thus imposed ; And the sullen submission to the body's dictates helped the ramification of the ailment that gradually claimed other parts of his body. What remained of the physical man,—the mangled, undevoured remains of a whole, to use a Baudelairean image, remained to be preyed upon by ennui. This telling handicap of an affliction, reminiscent, in its nature, of Joyce's blindness and Nijinsky's amnesia, a sure irony of fate, imposed on Bishnu Dey a terminating muteness, as if to balance the exhaustion through utterance that he, as a poet, had made for. Judging merely by the bulk of his poetry, he wrote profusely enough which marks such a remarkable variation in poetic practice for an Eliotophile that he was—ever so gallantly making his 'raid upon the inarticulate'—to speak.

As a modern poet and particularly one, schooled, primarily, in Eliot's precision and incisiveness, Bishnu Dey wrote much, perhaps, too much. His was a festival of poetic expression, lent

to ideas, images, objects, persons, having a wonderfully wide coverage. He had a poetic mind, notable for its agile seizure of subjects, ranging from the Santhal life, the Easter and the Id, a marriage anniversary to Kankalitala and Konark, Mallarme' and Lalmohan Sen, from Elsinore, Eurydice and 'the horseman' to Champa, Paul Robeson and Chandidas; from *tappa-thumri*, Dolu's coquetry and the reverberating footfalls of the past to blood pressure, class-struggle and Jamini Roy. And yet, his growth and maturity as a poet, a citizen-poet at that, has been uniformly single-track, registering no detectable change of artistic creed, or, world-view (in the most positive sense of the term), in the course of an enduringly sustained poetic journey, gathering the expanding completeness of a great musical composition. It was to be a modish, segmented, intermezzi-ridden composition, even not without brief divertissements and extemporization, permitting a prelude or a desultory fugue to realise; but, still taking on the monumentality of a symphony. Its polyphonic colour is unmistakable, in despite of what motto it did have to serve,—to take the musical analogy further, but the deeper tissue of harmony is unaffected, an unfailingly 'cousinly relationship' being ever maintained with the *Totalidee* of the main theme and the secondary themes. For here is a poet, who has inherited a direct activism from Art—his art, so to say, which is neither Gautieresque aesthesia, nor, the vitalism of a Stefan Georg, nor, still, bland utilitarianism, in being one with the complex of experience. Experience, Tennyson's "Dirty Nurse", who, however, undomesticated buys "costly wisdom", as felt people from Tacitus to Roger Ascham :-

> And so, there's Art to count on : if it'd build the unceasing
> Bridge between reality impassable and the heart :
> Experience, bereft of which the days turn unfriendly
> In reckless time-killing and teasing rights press upon your chest.
>
> *(So in Art I find)*

This worked-out stress on experience acted, first, as a safety-valve to hold in check the gush of the primary lyrist-individual in Bishnu Dey,—his withdrawal from, or, leap into, an alluring personalistic refuge, which, for example, Surre'alisme would offer.

to Louis Aragon, or pro-Fascism to Ezra Pound. Secondly, it conditioned his 'observations' (in Eliot's sense), by loading them with a notion of social onus and correlation, in the exteriorized world of alienated perceptivity.

The variety and the range that Dey's manner of ideation got used to, did not betray a sense of fanciful dissipation. They were indicative of the exceptional quality of emotional accommodation his poetic genius could profitably utilise in the creative way. Co-operative, in a sustained manner, with the leftist ideology, and frank in his taking the analytic cue from dialectical materialism *a' la* Karl Marx, Dey seldom agreed to don himself in a garishly red strait-jacket, but moved in the flowing freeness of his white dhoti, worn very Bengali style. And this, when a major limb of his creative corpus did have its assured nourishment from his studied and accepted leftist notions, not unoften without their intrinsic pomp and fury.

In his long poetic journey, Bishnu Dey, first writing in the atmosphere of that lukewarm modernism of the pseudo-new wave Bengali literature of the 1930's, started as a romantic with a social awareness—or, shall we say, a realist with giving romantic *frissons* ?—Who made for a lyricism, differentiating itself from Rabindranath's and ended as a Communist poet. Alert, from the very outset, of the inescapable magic of the rabindrik idiom and versification, Dey, in fact, a longer in the urgency of his search for a new diction, gradually came to attain one, as he brought out his second book of poems, *Chorabali* (Quicksand). Followed by *Purbalekha*, (Anteriorities), its very rewarding sequel, *Chorabali* contained, among several notable lyrics in the maturing Dey manner, his now famous *Ghorswar* (Horseman) which sets, on a poignant, emotional level, the limpid conflict of the lover's ego, jostling with the clamorous world without and capturing a romantic-egoistic equipoise, where the horseman, Amor, would rather take himself for a ride for, well, the tremulous desire's self-seeking release :

Won't you, dearest mine, lend,
While desire shakes my embrace's torpor,
Fruition's testament to my flesh ?

(Ghorswar)

Purbalekha testifies to a legitimate standardization of Dey's art, no doubt a complex of writerly noesis, in which language, diction, technique, imagery and music were to play their respective roles. And here, Bishnu Dey is a spectacular adventurer, wholesomely come into his own, who can afford to liberate himself in lengthier verses, done in a strikingly original diction and on themes of a widening range of psychic and intellectual acceptance. The primary lyricism, Dey's artistic *forte*, had not withered (and, for the matter of that, it did not ever), but thematic seriousness, permeated with a speculative density, at once colourful and dignified, was to mark a number of poems, appearing in this collection. Dey seems to have jumped the pale of *vers de socie'te'* and reached out right into where he needed to be :

> Ah, it's a serene advent, that, a god's generous endowment ;
> Had is the new prowess in timid fatigue's awakening to
> sacrifice
> And yet, why is such a clamour now ! Footfalls ! a procession turbulent !
> While the city is asleep, every door bolted,
> The *Yadava* youths; indolent, malingering, following the
> ruthless fete,
> All gone-wrong, lost-in-sleep under the weight of the self-
> seeker's
> Discovery of slothing jouisance distracted, in the past's earning
> of happiness,
> Alas, the age demanding,
> Gets lost, after a schedule, even the might of Partha's
> Charioteer.
> *(Footfalls)*

The least given to the abstruse, Bishnu Dey, who would make only a scurrilous reference to the existentialism notion of absurdity and *Angst* ("The search for the crow's droppings of existence made in Algerian weariness". *Memory, Existence and the Future)* generally kept metaphysics away, concentrating on materiality often in its visually colourful and no less, in its substantially functional, dimensions. The operative attitude bore the mark of a candid orientation and therefore, needed not impose any

psychic ostracizm ; or, for that matter, any curtailment of creative movement. Lyricism, virtuosity, craft, artifice, execution—the so-called raw materials of poetry, when it is being a word-picture, were never unattended to by him. While mainly exercising himself in his particularized manner of the *vers libre*, would allow himself to be playfully various by writing a sonnet, or, a villanelle, heroic couplets, triolets, verses, employing the Homeric hexametre or, the Dantean *terza rima*, with, no doubt, complimentary shiftings, and rearrangements, made in the seizable *mise-en-scene* of the owned world of creativity. It was a world, endearingly chequered, a carpet with baroque, even rococo designs, traversed sometimes accross the visual, sometimes accross the speculative, plane, that the poet used as an unfailing referent, notwithstanding whatever his especial disposition might have more authentically chartered.

Such a world is the back-drop, the stage and the actors that Bishnu Dey envisages, with an assimilated sense of involvement which makes his observations and commitments on its score touched up with a redeeming humour, tinged with a humane irony. His *e'tude* of a pensioner, for example, can be a sympathetic projection of a community's self-pity, explored in a frolicsome first-person narration :

Lest do the pension cease, I'm in the park, living
long, taking
My round of walk ; have some chit-chat to do with : some
Believing in God, some in the English believing,......

(In the Park)

With all his caring for social sanity and the mind's unifying health, he can bring himself to consider, with no hint of a malice, the drive of the schizophrenic city-man—

......looking for death
In his dark haze of bad nerves......
Walking his way for hours,
With the colossal speed of the distracted.

(In a Dark Drive)

He can, at the same time, launch himself upon a psychogenic probe, himself being the analysand, in a dream image, picturesque enough to tempt a Salvador Dali :

"......the naked heart's bones and marrow, laid
In Eros's fire upon the Himalaya of waste

(Terzarima)

or, sing of a pastoral *affaire*, with the determined big gal, teasing her fussy chaperon :

"Auntie, keep thy tale wound-up in thy coiffure,
I'd I had that, my black blanket, sure
Fast-colour 'tis, won't fade with washings given

(Nature-poetry)

The images and symbols, statements, reflections and critiques that compose Bishnu Dey's poetry are exponent of a taking-in of the human scene at large. They do not indicate an easy dilation in that they have a valid stamp of an 'essential' construction and are, perhaps, approached with a measure of intention. They are the verbal avowals of one, who can afford to be so pervasively 'engaged' to resort (much to the poet's dislike, as it happens) to an existentialist interpretation of this engagement, that it can not have been a fortuitous intake without a salient pull of choice and premeditation. As Husserl would explain it—"Toutes les 'Erlebnisse' qui ont en commun cette proprie'te' d'essence s'appellent aussi 'Erlebnisse intenionelles' : dans la mesure ou' elles sont conscience de quelque chose on dit qu'elles se'rapportent intention-ellement' a' ce quelque chose." (J. P. Sartre in *L'imagination*, P. 144)

That is, the multitudinous, disparate, even contrarious ingredients of Bishnu Dey's poetry are the *donne'e* of an intentional participation with the very adulterous me'lange, called human life, with or, without the sanction of whatever ultra-artistic regimentation he professed to be under.

And yet, leftism, as a conscionable impetus did count most with this poet, truly indwelt, as he seems, with a near-anarchical sense of psychic absorption and melic transmutation of the facts and dreams of life, not to be directly under its purview. But it is

the leftism-oriented, anti-establishment vantage-ground he recurrently returns to and most inhabits. A symbolic, albeit overt, montage of the decadence of the capitalistic society, where belligerent fangs are only too many to cope with and which is so remarkably without an omnipotent custodian-leader—as in the quoted lines from *Footfalls*, is the built-in world of his revolt and perplexity. There is only the hearkening-back to footfalls, far-off and yet so near, that nevertheless strikes terror into what inevitably alert listeners they happen to have Bishnu Dey contemplates what may purport to be an anti-Wasteland for its protagonist lives in the certitude of an onslaught—of an inroad of a cataclysmic re-ordering of the bartered world of existence.

If Dey had learned observational incisiveness from T. S. Eliot, his inveterate lyrical propensities, so natural to a countryman of Tagore's, pushed him more congenially into the domain of melody. His artistic ethos, with its well-nigh formulated coda, was as good as a formed affair with him, in the '40's. His two collections of poems, belonging to the period in question,—*Sat Bhai Champa* (The Seven-Brother Champa) and *Sandwiper Char*, (The Shoal of Sandwip) incorporating poems, in which verse, blank, or, redeemed, or, free, was unleashed, wtth both care and abandon, to be suited to a poetic purposiveness. For by then, Bishnu Dey was frankly committed to the communistic world-view and writing observations, critiques as well as songs, to propound his leftist ideational says. He was, as already pointed out, not given to a trenchancy of utterance, often to be associated with a promoter of the leftist cause. His essential lyricism made him more like the French poets of the Resistance, such as Paul E'luard and Jules Supervielle than like Myakovsky and Pablo Neruda, though he did have some of Neruda's violence, in points of virtuosity and imagery. In a poem like *Kankalitala*, for example, Dey evokes a tonal music of an urban *aporia*, in which the leftist assumption of the capitalistic decay is laid bare ;

There is no end to the pain, there being the sky all blue,
Inebriate with life's death, and keeping guard at gates and towers.
It's the pain of death that is the hunter, open-eyed, who pricks his ears

There're eyes at every window, street-corner, land, portico
and court ;
Tremulous in pain, with secret decisions taken, and yet
every moment ;
The air leaps to the cerulean vacuity upwards, its breathing
choked.

The beggar-heart, keeping aside an imminent crisis,
Reaches out to time past and future.

In his next collection, *Anvishta*, (The sought-after) Dey's lyricism, employing itself to tackle his ideological prose, purposive and edifying, to some extent, goes ahead with an undaunted freedom of expression. Picturesque and, at once, stirringly deep, naturalistic, or political or, even inlaid with a staying romanticism, as they are, the "saught-after" images return and return, with a surer touch of brush-strokes. The poet, now "colourful in the sunset's liberation, in a multi-colour consciousness", "alerted and sharply instantaneous in a sun-rise", keeps on mapping the movements of his roused, creative soldiery; pregnant, indeed, with a real host of gathered-up comments and opinions, sentiments and impulses, studied, or, just allowed to have their way, into the mind of a man, whose awareness of the self, in the perspective of a dimly tumultuous national uprising, is near-complete. Dey knows that he, not alive in Eliot's "Death's dream kingdom" is harnessed to create "Not dreamily, but after a treck to an inferno".

Dey's prolificity as a writer, releasing himself with an assimilated confidence of technique and phraseology, in verse as well as prose, stood him in an enviablv good stead, throughout his literary career. An introducer and, partially, a follower of T. S. Eliot, whom he translated, displaying his unique capacity for transformation, Dey must have, at least, half-heartedly, accepted the Eliotean tenets or impersonality and tradition. He was, at the same time, more deeply enmeshed in the idealistic lyricism of Rabindranath, in despite of what *avant-garde* opposition to Tagore he might have once cultivated. His prose essays, having quite a rangy coverage of subjects, including the French Surrealistes, Pablo Picasso, Ishwar Gupta, the Chhattisgarh songs, Jamini Roy and Rabindranath, reveal his intellectual eclecticism

and a keen sociological insight, not unrewardingly coached in the Marxian school. The later collections of Dey's verses, contained in *Alekhya* (Portraits), *Tumi Shudhu Panchise Baisakh* (Thou art but the 25th. of Baisakh) and *Smriti Satta Bhavishyat* (Memory, Existence and the Future) mark the culmination of Dey's great poetic art, utilisinß its inherent lyrical resources, cogently merged into a toughening idiom of choice, assertive commissions. The themes and subject-matters, tackled by him, are varied, without being desultory ; national and international, urban and rural, political and philosophical and broadeningly human, they compose a wonderful suction of the treasurable bricabrac of life, objective as well as theoretical, that can have occurred to, and creatively instigated, the open mind of a major poet. Dey can afford to talk about a cloudy day the *raga ashabari*, a neo-Muchiram, Edgar Allan Poe, Manik Bando-padhyaya, the aged crane, Boris Pasternak, Andromeda, Lakhindar and 'what particular piece of Rabindranath had moved him most'. Iddeed, a scintillating galaxy of seizures, projections and makings, some of them undoubtedly having the hardness and luminosity of stars.

Bishnu Dey's growth and evolution as a poet is the story of how a man, Aristotle's 'political being', after all, (more so in the case of a citizen-poet, with polis, meaning 'city') and duly tutored in the sophistry and extroversion of Occidental lineage, actualizes himself towards a unification, linkable, finally, to his native ethos of life. Intellectually *avant-garde* and at heart, lyrical and expansive, he has had the right sort of social inclination to be in the left-wing ferment, even if his romantic-lyricist heart would make him restlessly insecure as an active combatant. The mainstream of his poetry is that arising from what may be defined as his ideological commitment, but the tributary rills that run in to it have a beauty and significance of their own. Naturally, there is often a merging of the latter with the former, as for example, where Nachiketa, a mythic personal sacrifice to fatality, told of in the *Kathoponishat*, who is out on his uncanny journey, accompanied by Yama, the lord of Death, passes through the inferno of the city of Calcutta : a Nachiketa, forbidden to delve into the mystery of Death as a phenomenon. There is a merging of the

mythopoeic-spiritual with the banal, physical commonplaces of a corruption-ridden city, with its background of brazen-faced capitalism at work.

> Nachiketa keeps moving undaunted, through the tangle of alien thieves,
> Circulating in lanes and by-ways ; faceless ogres at every junction
> Squatting here and there, their eyes shot with blood, or, deftly slipping out.
> Demons of looters all, getting settled in palatial citadels,
> With courtesy goods of trades on display, before the royalty ; lightening
> Death's flaming fire, from one country to another. Smiling,
> Not without a gladness, to turn mother Earth into a potsherd...
>
> *(Janmashtami, 1954)*

But the full gush of the mainstream has all the wealth of an oceanic strength behind it, and a keen and crafty symbolisation, charged with an extra load of violence, would fashion the demeanour of a poem, such as *The Circus Tiger* : an amazingly telling portrayal of dislodged imperialism, grown only vengefully more subtle in its depredations and with its hide-outs :-

> Even tigers, untamed since birth, have dread of him.
> And so, unending is our living-in-the-jungle. For
> We, too, obdurate and dashing, are pledged to uproot this pest,
> Therefore, we some, disguised, lie wide awake,
> Watchful night after night, as had done
> Lenin and Stalin in October, 1957, aware, perplexed...

Bishnu Dey's art sprang from, and was sustained by, a naturalism, coexistent with an acute social awareness (somewhat, it seems, like that of Louis Aragon of the Resistance but undoubtedly more consistently than with the French poet) and the consequent discounting of individuation. It is interesting to note how often and how effectively does he, urban and remote, refer to Nature, as an unendingly lyrical counterpart of life. And how often the natural man changes places with the political man, in the area of enchantment his poetry encloses But this amounted to no

dualism with him, no psychic split had ensued. On the contrary, the natural-lyric context, lent to his historically processed prose of socio-political maladjustments, has furnished him with an astute speculative modus of entangling the total reality, involved in the miracle of living. With him, art is the meeting-ground and resolution of what Coleridge, I think, called heart-knowledge and head-knowledge : which also substantiates its creative dialectics and its productivity. And if the said interaction had cost the poet some shedding of his self-love, he must have bolstered himself up with an idealistic dream of some good to come out of it all—what Joseph Needham would humour as Millenarianism.

> স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি
>
> sa yathema nadyah syandamanah samudrayanah samudram' prapyastam' gacchanti.

Before concluding this very inadequate assessment of Bishnu Dey's poetry, I am led to think about what with some of his best admirers, as also with some of his worst detractors, may have provided a natty standardization of his poetic practice and position, in terms of, naturally, the available jargon of socio-literary criticism. That is, Bishnu Dey is a People's Poet. I, as both a student of his poetry and a respector of his creative stand, have felt perplexed in accepting him as one ; a straightaway rejection of his like credentials had, I fear, perplexed me no less. Not knowing if an artist's intellectual co-operation with the ideologies of leftism is, in itself, a closed conditioning of his art, and being, in fact, largely unsure of the import of the mouthy *genre* of "people's poetry". I would not hazard upon any formulation, positive, or, negative, of the status in question, on Bishnu Dey's part. Was Bishnu Dey a People's Poet ? Was he *not* one ? That Bishnu Dey, in his strikingly lyrical, *ergo*, individualistic (so rampant the prose of life without !), and no less aesthetically informed, world of being was far from averse to the ingress of the people, in person, or, in the abstract, is more than well testified to by his poems. Why, scores of his poems have personal dedications. That he was anti-capitalism, drew upon the historiscity of the class-struggle and built extensively upon a thorough-going social dialectics are

well-proved by the content of his poetry and sufferably ostensibly, by that of his prose eassys. But, even so, was Bishnu Dey being a People's Poet all the while, or, did he grow into one ? The enquiry, if worthwhile, strikes me as similar to "Was T. S. Eliot a Christian poet"? (that is, in the same sense as Lancelot Andrews was so) ?, or, "Was Paul Eluard a Communist poet ?" Or, more tangibly, "Was Rabindranath an Oriental mystic poet ?" (that the West so encouragingly made him out to be).

—

A Poet's Reminiscences of Bishnu Dey

By Samar Sen

[Like Bishnu Dey, who died few years ago, Samar Sen had left a distinctive imprint on post-Tagore Bengali poetry in spite of his small output over a brief period. In this personal sketch, he recalled an old association and gave a few hints of his reaction to both the personality and work of the older and more celebrated poet]

Bishnu Dey was one of the five who contributed five rupees each in 1935 to start Kabita, a poetry quarterly which was the brainchild of Buddhadeva Bose. This journal, along with Parichaya, founded earlier by Sudhin Datta, published some of his major poems.

Dey was not among those who prided themselves on their revolt against Rabindranath, later returning to his fold. He was mature enough, at an early age, to recognize the role of tradition in the development of individual talent. But it is odd that Tagore, who became indulgent to the erstwhile rebels and even patronized a writer widely known for his scurrilous comments, which did not spare "Gurudev", left Dey out of an anthology of Bengali poems which came out in the late thirties. Perhaps the early poems of Dey were too eclectic for Tagore.

It was about 1935-1936 that I first met Bishnubabu. The poet then had some serious stomach trouble and relied on ayurvedic treatment. The concoctions were as strange as some of his early poems. He had a bilious temperament and a sharp caustic tongue which made one rather uncomfortable. But soon he got over his bile and made people feel at ease, despite, or perhaps because of his impish interest in and comment on the personal lives and foibles of his contemporaries.

One of his sustained passions was music, both Western and Indian. The other was painting—Jamini Roy, in particular.

remember long hours spent at his house with Ashok Mitra and Chanchal Chattopadhyay. Once the three of us decided to wear him down by our daily presence on the pretevt of listening to his priceless collection of Bach, Mozart, Beethoven and others. At first we were treated to afternoon tea and snacks, besides cigarettes. The snacks soon cdased to uppear, and we had to smoke our own cigarettes. A few weeks passed and we three found ourselves almost on the verge of a nervous breakdown while Bishnubabu was as sedate as ever. This stability saw him through his poetic career (often giving it a staid character), rich in variations on a theme but unmarked by restlessness. (The war of nerves took place before he moved to Prince Ghulam Muhammad Road where I became a next door neighbour, still unaware that this proximity was a rare privilege.)

Among the poets of the thirties there was a silent struggle for supremacy. Tagore was a towering presence and there was no question of replacing the giant despite his shortcomings. The younger poets had each a distinctive style. Jibanananda Das with his magic world and idiom. Sudhindranath with his combination of logic and passion. Buddhadeva with his undiluted romanticism, Premenda Mitra with his awareness of slums and the working class, and Bishnu Dey with his social satire and a vision, still forming of a changing order.

For a time, the violent international situation generated by the Fascists and Nazis brought them together in a sort of united front of progressive and Fascist writers. Sudhindranath and Buddhadeva were not ardent admirers of the Soviet Union like Bishnu De—or Subhas Mukhopadhyay and Sukanta Bhattacharya who came later. But they were all aware of the threat to civilization which Fascism and Nazism posed, a threat which tormented Tagore too in his last days.

The Soviet-German non-agreession pact came as a disillusionment to men like Sudhindranath. Buddhadeva was unnerved, in course of time, by the millitancy of the first "leftist" poets, Bishnu Dey held the fort. He had been trying to come closer to the people and evolve a simpler diction through his masterly craftsmanship, but whether the people came closer to him is another matter. They worked and struggled and Bishnu Dey

loved them, but there developed an above-the-battle air in his poetry, an apparent conviction that he had reached an inner peace of mind, a still centre, despite the turbulence of the times. This seemed rather unreal to many a reader. However, his originality is beyond question, and his influence will be enduring.

An internationalist—as a reporter calls him—Bishnu Dey never went abroad, declining numerous invitations, and allurements ; and one never saw him in Western clothes. A near perfect Bengali in manners, his knowledge of the wide world was enviable. It is tragic that such a man of intellect and imagination was slowly reduced to immobility and speechlessness by a cerebral disease.

(Collected from the Statesman, dated 7. 12. 82)

Shakespeare : With or Without Tears

Would you think our long acquaintance with Shakespeare has had any permanent impact on our attitudes at any time.

Elizabethan extravagance and vigour had some impact on the ways of the Young Bengal group in the last century. But it was not really deep because they were not interested in Elizabethans other than Shakespeare. Their next interest was Milton, and then they took a long leap on to other poets. There is, in fact, no real significance in our enthusiasm for Shakespeare.

Great teachers created interest in Shakespeare men like Richardson, a great Shakespeare enthusiast and Percival and Prafulla Chandra Ghose who, unlike most teachers of his time, had great enthusiasm for all the Elizabethan dramatists, though not being interested in poets like John Donne, he missed the rich ironic use of language by the metaphysical poets.

What do you think is the best method of teaching Shakespeare ?

For us the method should be to try to convey some sense of the wildness of his imagination and his use of language. The trouble is that we have no visual image of his plays.

What about Shakespeare plays and films ? And long playing records ?

They are too few and too infrequent in this country to be of great help to many. As for LPs. the British records sound rather dead. The Americans do it much better, perhaps because they have some Elizabethan qualities call it vigour dash or even crudity, which the British have lost.

You have mentioned P. C. Ghose. What made him a great teacher ?

His method was to concentrate on the text. No reference to any critic or criticism. A great expert in textual scholarship, he would go to the trouble of getting a copy from Britain of Colet's Grammar which was mentioned in Lamb, although that

had not been reprinted for years. All the versions of the Bible lay enconced in his bookshelves, always handy for checking up the minutest points of detail.

I still remember my first lesson with P. C. Ghose. On entering the classroom he announced that he would take up "this book" and immediately started reading the first line. The tremendous rest he had combined with a meticulous concern for the meaning of words. To him teaching Shakespeare was great fun as well as a moving experience of tragedy. He would laugh, rave, even weep. He was not in the least squeamish, either about the so-called obscenities or emotional breakdowns. Even Percival did not have his enthusiasm, his capacity for tears and laughter.

He used to take extra 4-hour classes on Saturdays and Sundays when he ranged from Chaucer to Pope. Teaching was a dedication with him. Once we were wondering why the always-punctual professor was late, when he appeared, all bandaged up, his clothes and umbrella torn. Trying to get on to a running tram, he had an accident, was taken to the Medical College Hospital, from where, after first aid, he made straight for the college. On another occasion, he came barefoot. His father had died. P. C. Ghose wept for his father but took his class. He almost broke down when Percival died, he cried like a child in the classroom.

With his cherubic face and fiery temperament he was so helpful to students he liked. Once I asked him for the meaning of a Greek word which I had not found in the dictionary. P. C. Ghose checked through for one whole night and told me the meaning.

I still remember those evenings at his residence in Prem Chand Baral Street, when he would tell me as soon as I walked into his room that he was too busy to give me much time and then would go on chatting with me on the door-step for hours on end.

And it was always a pleasure to hear him talk about his great teacher Percival. He told me how after many years in his class, he had summoned up enough courage one day to go up to Mr. Percival as he was climbing into his carriage and ask him nervously if the word vulgar was in any way connected with the Latin 'Vulgate'.

So confident about his knowledge of Shakespeare texts, he also had the humility to admit openly that unlike his friend and colleague, Rabindra Narayan Ghosh, he had no personal taste or judgment. I also remember how he once read out a letter from Percival where the latter had said that of all his pupils. Rabindra Narayan Ghosh had the finest understanding of Shakespeare.

What about the present level of Shakespeare teaching ?

Teachers know more about different interpretations of Shakespeare than before, the vast bulk of Shakespearean criticism of the last thirty years is at their disposal. Critics like Dover Wilson, Wilson Knight and T. S. Eliot laughed at and ignored even by men like P. C. Ghose. are now in currency. But it is a pity that older names like Coleridge and Hazlitt find pieces of criticism by Goethe. Victor Hugo, Georg Brandes, Anatole France and Bernard Shaw are little cared for these days. This perhaps makes our teaching rather dry and academic. Perhaps onr sensibility as teachers has dulled.

Has there been a decline in the quality of Shakespeare students with the declining influence of English ?

Not really. In fact, many students show considerable excellence both in language and in interpretation. But perhaps they are much more cynical about their studies than we were, which gives the impression of a decline in quality. In any case, serious students of Shakespeare are always few, and these can today draw on a much larger body of criticism, However, it is hard to see how any Indian student can be genuinely interested in Shakespeare alone, if he has no interest in modern plays and poetry. One is inclined to think that the preference for Shakespeare can only be a mere convention. Students from lower-income group families seem to be more serious about their studies than those coming from the upper classes. And fluency in English speech which some upper class students acquire because of their home background, does not make for sensibility or understanding of poetry.

It is, however, true that the average student of English tends to have a rather misguided approach to literature. They regurgitate volumes ot verbiage on the philosophy of poets, their bio-

graphical details and such things which they mug up from the "bazaar notes" but when asked about the meaning of words, they flounder As a result of this mechanical, unappreciative attitude of the students, teaching Shakespeare can sometimes become really frustrating. I remember one occasion when a student, asked why he did not find certain funny parts of *Midsummer's Night Dream* amusing literally broke into tears. I have sometimes found that pre-Medical students show better understanding of literature in their examination papers than my Honours students which seems to suggest that genuine love of English literature can grow only when English ceases to be a compulsory subject. But I have never held with the advocates of "utility" English. That will further lessen students' interest. It is only the beauty of language especially the richness of images that can arouse real sensibility

Will appreciation of Shakespeare be affected when English goes as the official language ?

There will be purer appreciation of Shakespeare then. Only people who are genuinely interested in Shakespeare will study him, and with smaller classes, it will be easier to teach Shakespeare. For example there is much better appreciation of Shakespeare and research in France, Germany or Soviet Russia than there has ever been in India where English has dominated for so long.

It is a pleasure to listen to Bishnu Dey in the quiet of his little room lined with books, hung with a "clutch" of vintage Jamini Roys. A teacher of English literature, Bishnu Dey is one of Bengal's major poets. Few who have followed him have escaped the influence of his early poems few have attained his significant brevity. Translator of Eliot and Pound, he has also translated some Shakespearean Sonnets.

(This interview has been taken by Samar Sen the famous poet and editor).

বিষ্ণু দে'র কবিতার শব্দার্থ

'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন, "আমি অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না (কোলের পুতুল)। রবীন্দ্রনাথও একবার বুদ্ধদেব বসুকে বিষ্ণু দে সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এর কবিতা যদি বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেব" (সব পেয়েছির দেশ)। তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবিদের, বিষ্ণু দে'র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মিথের ব্যবহার, দেশী বিদেশী ইতিহাস-ভূগোলের, রাজনীতির, খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি বা স্থানের নাম ব্যবহার, সংগীতের রাগ-রাগিনীর যথেচ্ছ উল্লেখ, চিত্রশিল্পের টেকনিক্যাল নাম কবিতায় ব্যবহার, দেশী বা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার, সম্ভবত বিস্মিত করে থাকতে পারে। বিষ্ণু দে স্বকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি। তাঁকে পড়তে হয়েছে বিস্তর এবং জানতেও হয়েছে বিস্তর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মেধা ও মনন তাঁর কবিতাবলীকে নানা বিষয়ের আধার করে তুলেছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পর সম্ভবত বিষ্ণু দে-ই আমাদের বহুমাত্রিক (ডাইমেনশনাল) কবি। এমন কবির কবিতায় তাই নানা অনুষঙ্গ আসতে পারে। কিন্তু আমাদের হয়েছে মুশকিল। কবিতা পাঠের, বোঝার আগ্রহ আছে আমাদের, কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত শব্দরা আমাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রে বাধার পাঁচিল তোলে। তাই বিষ্ণু দে'র কবিতার শব্দার্থ তৈরীর একটা রোখ্ চেপে যায়। অক্ষমের সেই চেষ্টার যৎকিঞ্চিৎ। প্রাজ্ঞ পাঠকবর্গের কাছে অনধিকার চেষ্টার জন্য ক্ষমা চাইছি।

আমার এই কাজে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি—অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী, অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক রবিন পাল এবং শ্রীমতী প্রণতি দে—তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্বশী ও আর্টেমিস

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
উদ্যাপন	হাশিশ্‌	ভাঙ নামক নেশার দ্রব্য / ক্লান্তিনাশক দ্রব্য।
প্রেম	নেব্যুলা	নীহারিকা, মেঘের মত স্বর্গীয় দীপ্তি / চোখের তারায় ছোট দাগ।
প্রত্যক্ষ	মরুভূ	মরুভূমি
বজ্রপাণি	ড্যানায়ে	পার্সিয়াসের অপর নাম। গ্রীকপুরাণে আছে স্বর্ণবৃষ্টির মাধ্যমে এক কুমারীকে জিউস ভালবাসত। তাদের পুত্র পার্সিয়াস।
সাগর উত্থিতা	ফিরোজা	নীলাভবর্ণ
পর্যাপ্তি	এথিনা	গ্রীক পুরাণে প্রজ্ঞা, যুদ্ধ, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক দেবীকে এথিনা বলা হত।
"	নেয়াড	প্রাচ্য পুরাণে উল্লিখিত জলজ পতঙ্গ
"	মেরুক্রমা	মেরু প্রদক্ষিণ
উর্বশী ও আর্টেমিস	ওরায়ন প্রিয়া	গ্রীক ও রোমান পুরাণে উল্লিখিত আছে ওরায়ন ছিলেন একজন মহান শিকারী যিনি ডায়ানা কর্তৃক নিহত হন। ডায়ানা ওরায়নের প্রিয়া। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে কালপুরুষ
	ট্রিস্টান	মধ্যযুগীয় উপকথায় আছে জনৈক নাইট তাঁর কাকা মার্ক কর্ণওয়ালকে রাজকুমারী সুন্দরী ইসিউল্ট-এর বর হিসেবে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইসিউল্ট এবং ট্রিস্টান উভয়েই ঐন্দ্রজালিক প্রেমের বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
উর্বশী ও আর্টেমিস	ইসোলড্	ইসিউলট-এর আর এক নাম ইসোলড্, তিনি ট্রিস্টানকে বিবাহ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় প্রণয় কাহিনীমূলক উপকথায় উল্লেখ্য।
”	ম্যামন মলিন	ধনী ব্যক্তি / পার্থিব লাভ / প্যারাডাইস লস্ট-এর নিক্ষিপ্ত দেব।
”	এ্যরস মাতার	গ্রীক পুরাণের সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ প্রেমের দেবতা। এফ্রোডাইস ও জিউস এ্যরস অথবা হারমেসের পুত্র।
”	হিপোলিটসেরে	গ্রীক পুরাণের থেসাস ও হিপো-লিটারের পুত্র! ইনি বিমাতা ফ্রেডার-এর স্নেহ ভালবাসাকে উপেক্ষা করেছিলেন। এর ফলে পিতার অনুরোধে ফ্রেডার-এর বিরূপ মনোভাবের ফলে পসিডন হিপো'লটসেরেকে হত্যা করেছিল।
”	উর্বশী	ভারতীয় পুরাণে কথিত সুন্দরী শ্রেষ্ঠা অনন্ত যৌবনা অপ্সরা
”	আর্টেমিস	গ্রীকপুরাণে কথিত আপেলোর দুই যমজ বোন—শিকার ও চন্দ্রের দেবী রূপে কল্পিতা। রোমান ডায়ানা হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর প্রতিহিংসা বাসনা অতি প্রবল।
প্রজ্ঞা পারমিতা তাকে করে আশীর্বাদ	উৎক্রোশ	ঈগল জাতীয় পাখী / কুরল পাখী
ভয়	নোজ্‌গে	(Nose-Gay) সুমিষ্ট ঘ্রাণ বিশিষ্ট ফুল।
সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি ১।৪।২ বৃঃ উপনিষদ		সেই প্রজাপতি ভয় পাইলেন। এই জন্য আজও লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়।

চোরাবালি

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
ঘোড়সওয়ার	আধি	মানসিক পীড়া / দুশ্চিন্তা।
ঐ	গ্লেসিয়ার	হিমবাহ / বরফের ক্ষেত্র
ওফেলিয়া	রুদন্ত	রোদন / কান্না
ঐ	হেডিস	গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত মৃত্যুর ও নরকের দেবতা জিউসের ভাই প্লুটোর শাসিত রাজ্য
ঐ	খামকা খুশি	অকারণ খুশি
ওফেলিয়া	ওফেলিয়া	শেকসপীয়রের হ্যামলেট নাটকের চরিত্র পোলোনিয়াসের কন্যা, হ্যামলেটের প্রেমিকা
ঐ	অপ্সুদীক্ষা	ধর্মান্তরিত করা বা মাথায় জল ছিটিয়ে দীক্ষা দেওয়া
ঐ	প্রসার্পিণা	পাতালের রাণী হেডিসের স্ত্রী। সৌন্দর্য্য ও মোহের প্রতীক (যুদ্ধের দেবী)
সন্ধ্যা	এফেসাসি	অভীষ্ট ফলদান
ঐ	উলূপি	যে মৎস্য দিগকে বিনাশ করে (জলজন্তু বিশেষ) পাতালের নাগরাজকন্যা। উলুপির ছিল অর্জুনকে বাঁধার মত আকর্ষণী শক্তি।
পঞ্চমুখ	কুম্ভীরক	চোর / কুমীর
ঐ	অশনায়ী	ক্ষুধিত / বুভুক্ষিত
ঐ	শশকবিষাণ	হাতির দাঁতের নির্মিত বাদ্যযন্ত্র
ঐ	সিমুমরুক্ষ	মরুভূমির বিষাক্ত ঝড়ের নিষ্ঠুরতা
গার্হস্থ্যাশ্রম	প্রতীপগতি	প্রতিকূল গতি
ঐ	বুর্জোয়া	পরশ্রমজীবি

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
গার্হস্থ্যাশ্রম	শোপ্যা	পোলিশ গীতিকার ও পিয়ানোবাদক প্রখ্যাত সংগীতকার (১৮১০-৪৯)
ঐ	আধিদৈবিক	দৈবজাত
ঐ	শৃঙ্গেণ চ স্পর্শা নিমীলিতাক্ষিং মৃগীম্ কুণ্ডুয়ত কৃষ্ণসার ঃ (কুমারসম্ভব ৩য় / ৩৬)	আর কৃষ্ণসার হরিণ যখন প্রেম ভরে শৃঙ্গ দ্বারা হরিণীর গাত্র ঘসে দিতে লাগল তখন প্রিয়শরীরী স্পর্শের আনন্দে হরিণীর দুটি চোখ বুজে এল।
ঐ	ক্যাফিন	কফির পাতা থেকে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, তৈরী সামান্য তিক্ত ক্ষার বিশেষ
ঐ	বেয়াত্রিসে	শেকসপীয়রের Much Ado About Nothing নাটক-এর নায়িকা/দান্তের ডিভাইন কমেডির নায়িকা
ঐ	মধু যামিনী	বসন্ত রাত্রি (যৌবন উপভোগের রাত্রি)
ঐ	কনডিশন্‌ড রিফ্লেকস	আগে থেকে শিক্ষা পাওয়ার বা অভ্যাসের ফলে নিজের স্বভাববহির্ভূত ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া
ঐ	প্রাকৃতরাসে	নীচ প্রকৃতির কামলীলা / স্বভাব সিদ্ধ খেলা
,,	টাহিটি	সর্ববৃহৎ দ্বীপ, ৬০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। ফরাসি ও সানিয়ার অন্তর্গত টাহিটির রাজধানী পাপিতি
কবিকিশোর	আর্কেডিয়া	গ্রীসের এমন একটি অঞ্চল যেখানে গ্রাম্য সরল সুখী জীবন পাওয়া যায়।
,,	এলসি ও বব	রবার্ট ব্রাউনিং ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ ব্রাউনিং
,,	হেলেনিস্ট	গ্রীকচর্চা বিশারদ
,,	জ্যোকন্দা	প্রফুল্ল / মনোরম (বিখ্যাত ফরাসী ছবি La Gioconda)

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
”	মোনালিসা	দা ভিঞ্চি কর্তৃক অঙ্কিত নিওপলিটান নারীর প্রতিকৃতি
”	সাইনারা	জাপানী কোন সুন্দরী নারী / ইংরাজ কবি আর্নেস্ট ডাওসনের কাব্যের (১৮৬৭-১৯০০) কল্পিত নারী
”	পেটার	ওয়াল্টার হোরাসিও পেটার (১৮৩৯-৯৪) প্রাবন্ধিক ও সমালোচক
	রুডেল	বাউল গাইয়ের মত গায়ক
	জরতী সন্ধ্যা	জরাগ্রস্ত সন্ধ্যা
	লিসি	কল্পিত নারীর নাম
”	ওঅলটস-ধ্বনি	(নৃত্যের ধ্বনি) রুমানিয়ার একটি নদী দক্ষিণ পশ্চিমে ৩৪৮ মাইল প্রবাহিত হয়ে দানিয়ুব নদীতে মিশেছে। এ নদীর ধ্বনি তরঙ্গ
”	খোঁয়ারি	মদের নেশা কাটার পর অবসাদ
”	Rosa Alchemica	ফুল, যে বর্ণ পাল্টায় এমন
যযাতি	অশনায়োগ্র	আহারের ইচ্ছায় উগ্র
অপস্মার	অপস্মার	অপগত স্মরণশক্তি / মূর্চ্ছারোগ
”	বেগানা	অনাত্মীয়া, নিকটসম্পর্কহীনা
”	গোরোচনা গোরী	উজ্জ্বল গৌরবর্ণা
”	জরৎকারী	মনসা / বাসুকীর বোন
”	শিথানে	মাথার বালিশে
”	জায়ুজ	রোগনাশক ওষুধ থেকে তৈরী দ্রব্য
দ্বিধাদম্পতি	তনুমানসা	শরীরী
”	ক্রিশ্চিয়ান	বানিয়ানের Pilgrim's Progress-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র
”	ভবিষ্যতের যবন প্লাটিনমে	যবন অর্থে প্রাচীন গ্রীক জাতি বা ম্লেচ্ছ আর প্লাটিনম হচ্ছে এক ধরণের সাদা রঙের ধাতু বিশেষ।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
বেকার বিহঙ্গ	ইতিহভাগ্য	বিরল ভাগ্য
প্রথম পার্টি	ল্যাভেণ্ডার	বিশেষ এক ধরনের সুগন্ধী ফুল
”	স্বরদ	কণ্ঠস্বর দিয়ে যা বের হয়
”	ম্যাকেঞ্জি লায়ালে	এক কালে কলকাতায় অবস্থিত বিভাগীয় বিপনী
”	লাজারসে	চৌরঙ্গীতে ইংরেজদের বিভাগীয় বিপনী
”	মরীয়া লিবিডো	মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় যে আবেগীয় ইচ্ছা যৌনতা যার উৎস, জীবনী শক্তি
মহাশ্বেতা	অচ্ছোদ নীরে	নির্মল জলে
শিখণ্ডীর গান	দেবুত্যাঁৎ	সুরা/সমাজে কোন তন্বী নারীর প্রথম আবির্ভাব
”	বত্তিচেল্লি	আলেসান্দ্রো বত্তিচেল্লি (১৪৪৭-১৫১৫) আসল নাম ফিলিপেপি ! ফ্লোরেনটাইন চিত্র শিল্পী
”	কামারাদেরি	বন্ধুত্ব, আনুগত্য, সহমর্মিতা
”	ডনজুয়ান	প্রখ্যাত স্পেনীয় অভিজাত ব্যক্তি, নারী প্রলুব্ধকারী, বহু কবিতা, নাটক, অপেরায় অঙ্কিত নায়ক
”	এটাকসিয়া	শারীরিক ক্রিয়ার বৈষম্য
”	সাবলিমেশানে	পরমানন্দে/উর্দ্ধে বা মহৎ কিছুতে স্থাপন
”	শেরি	শ্বেতবর্ণ মদ
”	রিফ্লেকস	প্রতিবর্ত্ত
”	দার্শনিক বেন্‌লিনসে	বেন্‌জামিন বার-লিণ্‌-সে (১৮৬৯-১৯৪৩) ব্যবহারজীবী ও সমাজ সংস্কারক
”	বুদো আর (Boudair)	মহিলাদের খাসকামরা বা গোঁসাঘর
”	শ্লেগেল	আগষ্ট ওয়েলহেম ভন শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) জার্মান রোমান্টিসিস্ট শেক্সপীয়রের নাটকের জার্মান অনুবাদ করেছিলেন।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
শিখণ্ডীর গান	ভিদাল (vidal)	বাউল ধরণের গায়ক
,,	হৃদয় স্বসা	প্রাণের ভগিনী
,,	হ্যারিয়েট	জেন অস্টিনের 'এম্মা' উপন্যাসের নায়িকা
,,	এমিলিয়া	শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের দেসদেমোনার সঙ্গিনী এবং ইয়াগোর স্ত্রী
,, কথকথা	অরফিউস	গ্রীকপুরাণে উল্লিখিত জনৈক গায়ক তার বাঁশির সুরে জীবজন্তুদের এমনকি পর্বত ও বৃক্ষরাজিকে মুগ্ধ করত। অরফিউস তার নাম।
,,	পেনোলোপি	অডিসি মহাকাব্যের অডিসিয়াসের বিশ্বস্ত স্ত্রী
,,	ইথাকা	৩৬ বর্গমাইল লম্বা গ্রীক দ্বীপ। হোমারের অডিসি মহাকাব্যে অডিসিয়াসের পৌরাণিক বাড়ী হিসেবে অঙ্কিত।
,,	ব্রুনহিল্ড	ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক অজ্ঞাত-নামা কবি মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য নিবেলানগেনলিড নামে একটি মহা-কাব্য লিখেছিলেন। এই মহাকাব্যে বর্নিত আইসল্যাণ্ডের ব্রুনহিল্ড গানথারকে বিবাহ করেন।
	ভালহালায়	জার্মান নর্সপুরাণে উল্লিখিত এক বিরাট প্রকোষ্ঠে ভালহালায় মৃত বীরদের দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল।
,,	বিরিক্ত	বহুমলত্যাগী (পেটখারাপ)
	সীগ্‌ফ্রীড	জার্মান মহাকাব্য নিবেলানগেনলিডের বীর নায়ক।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
শিখণ্ডীর গান কথকথা	ফ্রানচেস্‌কা	ইতালিয়ান নারী এবং তার প্রেমিক পাওলো, স্বামী গিওভান্নি কর্তৃক নিহত হন। দান্তে তাঁর কাব্য, ডিভাইন কমেডিতে তাঁকে অমরতা দেন।
শিখণ্ডীর গান	জীন্‌স	এক রকম মদ
"	স্টোপস	মেরী স্টোপস্‌
"	লর্ড রসেল	আর্ল রসেল / বার্ট্রাণ্ড রসেল
"	হাকিম লিনসে	লিণ্ডসে এণ্ডারসন, ইংরেজ প্রশাসক
"	কুয়ে	ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ এমিল কুয়ে (Coue) (১৮৫৭-১৯২৬)।
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	ইক্‌রা	পড়া (হজরত মুহম্মদের নিকট সর্বপ্রথম যে ওহীনাজিল হয় তার প্রথম শব্দ।
"	টিম্‌বকটু	ফরাসী অধিকৃত মধ্যসুদানের একটি শহর। দাস ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।
উন্মনা	প্রপঞ্চলয়	পৃথিবীর লয়/ছলনার শেষ
"	অস্মা	অহঙ্কার
টপ্পাঠুংরি	পিদ্‌সিকাতোর	তারের যন্ত্রে ছড় না চালিয়ে আঙুল দিয়ে বাজানো
"	ঝিলহা	ভারতীয় সংগীতের রাগ রাগিনী
"	পিলুবারোয়াঁ	প্রসিদ্ধ মিশ্র রাগিনী
"	লাগডাঁট	যে সংগীতে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিবিষ্ট থাকে। রাগপদের সুললিত পারম্পর্য। সেই সংগীতেই লাগ ডাঁট নামক গুণ বর্তমান
ক্রেসিডা	ক্রেসিডা	মধ্যযুগীয় পুরাণে, চসারের ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডে এবং শেকসপীয়রের ট্রয়লাস ও ক্রেসিডায় এক ট্রোজান কন্যা প্রেমিক ট্রয়লাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
ক্রেসিডা	ক্রতুকৃতম্	যাগযজ্ঞ / জ্ঞান ও কর্মকে যুক্ত করা
"	প্যাণ্ডার	প্যাণ্ডার ট্রয়লাসের জন্য ক্রেসিডাকে ছিনিয়ে এনেছিল। ইলিয়াডে উল্লিখিত লিকেয়নের পুত্র।
"	জেবলী	ছোট ব্যাগ
"	জবা সঙ্কাশে	ফুলের লালরঙের সমান কান্তিময় সূর্য
"	সোৎপ্রাশ পাশে	পরিহাসযুক্ত কথার বাঁধনে
"	জিজীবিষু	বাঁচার ইচ্ছা
"	অপাপবিদ্ধমস্নাবি	নিষ্পাপ এবং স্নায়ুহীন অবস্থা
"	ট্রয়লাস	গ্রীকপুরাণের প্রিয়ামের পুত্র এচিলেস কর্তৃক নিহত হয়। তাছাড়া শেক্স-পীয়রের নাটকে ট্রয়লাস ক্রেসিডার প্রেমিক হিসেবে অঙ্কিত।

পূর্বলেখ

বিভীষণের গান	ভর্গে	শিবকে / জ্যোতিঃ পদার্থে
চতুর্দশপদী	চংক্রমণ	বক্র ভ্রমণ
"	কেলাসিত	স্ফটিকীভূত / দানাবাঁধা
"	অগ্নিকুক্কুট	জলন্ত খড় / শুষ্ক তৃণের আঁটি
হাইকোর্টপাড়ায়	অবীচি	যেখানে তরঙ্গ নেই
ডালহৌসীর দিকে	ঢিমা	ক্ষীণ / নম্র
লায়ন্সরেঞ্জ	বেবেল্‌শিখর	বাইবেলের উল্লিখিত চূড়া যেখানে গোলমাল হয়েছিল (Old Testa-ment-এ আছে)
"	নহুষেরা	চন্দ্রবংশীয় পুরুরবা-উর্বশীর পুত্র আয়ু নামক রাজার পুত্র। নহুষের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ যযাতি।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
সায়ন্তনে	উলুক	ইনি দুর্যোধনের মামা শকুনির পুত্র। আঠারো দিনের মাথায় সহদেবের ভল্লের আঘাতে নিহত হন।
রেড রোড	অজাচার	ছাগীর ন্যায় আচার বা ব্যবহার
	অতিকশ	যে অশ্ব কশাঘাত ভয় করে না।
	অকল্কায়	জ্যোৎস্নায় / নিষ্পাপ
ফারপোর সামনে	নির্বিদ্	মন্ত্রের পদ বিশেষ
চৌরিঙ্গি	স্যন্দন	ক্ষরণ / রথ / তিনিসবৃক্ষ / জল
সন্ধ্যা	অপস্মার	অপগত,স্মরণশক্তি / মূর্চ্ছারোগ
হাওড়ায়	পন্টুন	ভাসমান সেতু / ভেলা
খিদির পুর	স্লুপ	চট্টগ্রামে নির্মিত একপ্রকার শালকাঠের জাহাজ/মাস্তুল যুক্ত একধরণের ক্ষুদ্র রণ-পোত
মাণিকতলা খাল	স্বয়ম্বশ	নিজের প্রতি বশীভূত
„ ১৩	চুনট	সঙ্কোচন / বস্ত্রাদির কিনারা / জামার হাতা
	জগৎ পূষা	জগতের সূর্য
„ ১৪	বলভী	ছাদ/তোরণ/গৃহচূড়া
মুদ্রারাক্ষস	মৌরসী পাট্টা	পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করবার স্বত্বদান-কারী দলিল
চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়কে	Oisive Jeunesse	অলস যৌবন (র‍্যাঁবোর কবিতার একটি লাইন)
	বারণাবত	বর্তমানে প্রয়াগ বা এলাহবাদ
নিরাপদ	নৈমিষকাল	ক্ষণিক
আবির্ভাব	নবসাম নব্য সংহিতা	নতুন সামবেদ এবং নতুন বেদের কর্ম-কাণ্ডমূলক শাস্ত্র
	সবিতুর্বরেণ্যম (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)	সবিতার অর্থাৎ সূর্যের বরণীয়

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
আবির্ভাব	ধীমহি প্রচোদয়াৎ (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)	যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণাদান করেন।
"	পদ্মভুক	ব্রহ্মা
রসায়ন	টাইমন	শেকস্‌পীয়ারের Timon of Athens নাটকের নায়ক
"	মাতিস	হেনরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) ফরাসী চিত্রকর
বৈকালি	ম্যাকাডামে	ভাঙাপাথরের টুকরো দিয়ে বানানো রাস্তা
"	নিনোচকার	ডেনমার্কের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী
"	ব্যাজহাস্যে	কপট হাসিতে
" কুমারকে	ন।।চিকেত	মহর্ষি গৌতমের পুত্র নচিকেতা
কাজলা	গড্ডল	গাড়ল/ভেড়া/মেষ
"	রিষ্টি	অশুভ/পাপ/অকল্যাণ
"	ইরম্মদ	মেঘ/বাড়বাগ্নি
"	পূষণ	সূর্য
"	দম্ভোলি	অশনি/বজ্র
"	পৈশুন্য	খলতা
সব্‌-জিপির গান	সব্‌জিপি	স্যার গোবিন্দ প্রসাদ (কবি বিষ্ণুদের আত্মীয়)
"	বেগোনিয়া	বাঘ সদৃশ
"	আলহামব্রার	স্পেনের গ্র্যানাডায় মুরিশ রাজাদের মধ্যযুগীয় প্রাসাদ
"	টোলেডো	এরি হ্রদের কাছাকাছি ওহিওর উত্তর পশ্চিমের একটি শহর / তরবারি
"	গ্রেকো	স্পেনীয় চিত্রকর। প্রকৃত নাম ডমনিকো থিয়োটোকপুলি
"	ক্ষামা	শক্তিমতী

কবিতার নাম।	শব্দ	শব্দার্থ
সন্-জিপির গান	হাবসি-মেঘ	কালোমেঘ
শ-অডেন	শ-অডেন	বার্নাডশ এবং কবি অডেন
"	সিরিঙ্গা	উত্তর প্রদেশের দেশোয়ালী মহিলা পসারিণী
"	ভূর্জে	বল্ক প্রধান বৃক্ষে
"	লাইম-ছায়ায়	নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এক প্রকার ছোট ছোট গাছ। ছোট ছোট টকফল হয়। সেই গাছের ছায়ায়।
অ-বন্দ্যোপাধ্যায় কে	অ-বন্দ্যোপাধ্যায়	অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়; যিনি আইনিল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত
"	তরবে	তরে যাবে / অতিক্রম করে যাবে
পদধ্বনি	ব্যাজরোষে	কপট ক্রোধে
"	জরিষ্ণু	বার্ধক্যভারে পীড়িত
বঞ্চনা	পেশোয়াজ	নর্তকী বা নারীদের এক প্রকার পায়জামা
সপ্তপদী, ৫	ভিয়োলা	বেহালার মত এক প্রকার বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র
" ৬	গথিক ক্যাথিড্রাল	পূর্ব জার্মানীর প্রাচীন একটি গোষ্ঠী হচ্ছে গোথ। তাদের ব্যবহৃত শিল্পকে বলা হয় গথিক। এই গথিক শিল্পের কারুকার্যে নির্মিত গীর্জা
" ৭	স্বনিত	শব্দিত/ধ্বনিত
জন্মাষ্টমী	কল্মষ	পাপ/কলুষ
"	কিণ্বস্রাবী	মদের তলানির ক্ষরণ
"	করকা	মেঘজাত শিলা
"	দন্তুর	দাঁতাল / বৃহৎদণ্ড বিশিষ্ট
"	শ্রোণিভারনিলীন বসনা (গীতগোবিন্দম্ থেকে উদ্ধৃতি)	নিতম্বদেশে বস্ত্রাচ্ছাদনে ভারযুক্ত নারী

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
জন্মাষ্টমী	অখণ্ডতৃণ	তৃণভোজী
”	সিরোক্কো	মরুভূমিতে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে বালি উড়ে আঁধি হওয়া
”	কৌল	বামাচারী / সদ্‌বংশে যাদের জন্ম
”	সিমুম	মরুভূমির ঝড়
”	নীবি	নারীর কটিবস্ত্র গ্রন্থি
”	কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (ঋগ্বেদ ১০/১২১/২)	কোন দেবতাকে হবি দেব ?
”	ডিয়োটিমা	গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশের প্রেরণা-দাত্রী রমণী
”	কচঙ্গনে	নিঃশুল্ক বেচাকেনার হাট
”	গ্যালাহাড,	স্যার গ্যালাহাড। আর্থ্যরিয়ান রোমান্সে সৎও মহান নাইট হিসেবে বিখ্যাত। ল্যান্সেলট ও ইলেনের পুত্র।
”	বিষঘ্ন	বিষ নাশক
”	সুশ্রুত	প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থকার / বেদবিশারদ
”	উচ্চৈঃশ্রব	সপ্তমুখ শ্বেতবর্ণ অশ্ব / ইন্দ্রের অশ্ব / বধির
”	পুন্নাম	নরক
”	রৌরব	নরক
”	অনিকেত	মূলহীন উদ্বাস্তু/নিয়ত বাসশূন্য
”	কাকটুস-গ্রাণ্ডিফ্লোরা	ফুলবিশেষ (চাঁপা)
”	রাজাস্ পেগ	শ্যাম্পেনের সঙ্গে ব্রাণ্ডিমিশ্রিত ককটেল
”	প্রজ্ঞাপারমিতা	জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেবীরূপে কল্পিত
	খসরুবেগ	জনৈক চালিয়াত এক ভদ্রলোক, কাল্পনিক নাম
	অসিধারব্রত	যুবক যুবতীর অবিকৃত চিত্তে একত্রে বাস
	গাণ্ডোরিরাম	শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড পরশুরামের গল্পের একটি মজার চরিত্র

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
জন্মাষ্টমী	ছালায়	বস্তা / থলে
„	অনড্র সেল	গোপন প্রকোষ্ঠে
„	বীণকার	বীণাবাদক
„	রথস্চাইল্ড	ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কারপরিবার। মেয়োর আমসচেল রথসচাইল্ড ফ্রাঙ্ক ফোর্টে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্রেরা যথাক্রমে জেমস্ প্যারিসে, কার্ল নেপলসে, নাথান লণ্ডনে এবং সলোমনে ভিয়েনায় ব্যাঙ্কের শাখা খোলেন।
„	শিরাস্ফোটে	মস্তকে সর্পাঘাত
„	দিতিজ	দৈত্য বা দানব তার পুত্র
„	শীকর বিজনে	জলকণাবাহিত বাতাস
„	সম্মোহকলিল	বিমোহিত মাঘীপূর্ণিমা
„	দর্ব	হাতা / ফনা
„	মাতরিশ্বাবেগে	বায়ুবেগে / ঝড়ের গতিতে
„	সুষুম্না	মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী নাড়ী / সূর্যরশ্মি
„	অঘমর্ষী	পাপনাশী
„	কুম্ভীরক	চোর

সাতভাই চম্পা

২২শে জুন, ১৯৪১		নাৎসী বাহিনীর রাশিয়ায় আক্রমণের তারিখ
ভারতীয় বিমান বাহিনী	চেতনা চৈত্য	শারীরিক পারিভোগিক ও ঔদ্দেশিক চেতনা
এ জনতার	তাবাকা-শান্	জাপানের প্রধানমন্ত্রী

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
Cinna the Poet	Cinna the Poet	শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের চরিত্র
লোরকার ছায়ায়	নির্বিত্ত	দরিদ্র, নির্ধন
অঙ্গি	অ্যাক অ্যাক	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে anti aircraft gun, অ্যাক অ্যাক নামে পরিচিত হয়
"	প্রাণায়ামে	প্রাণবায়ুর সংযম
খারকভ	খারকভ	সোভিয়েতের একটি শহর
"	কাফুন	কফিনের বানানভেদ
"	পন্‌টুন	ভেলা
৭ই নভেম্বর	৭ই নভেম্বর	অক্টোবর বিপ্লবের তারিখ, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুসারে
কোডা	কোডা	সোনাটার (সংগীত) শেষ লয়
"	আলকেমি	রসায়ন শাস্ত্র, যাতে ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার ছিল লক্ষ্য।
"	ইরা	কবি বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা / পৃথিবী / সুরা / জল / অন্ন / কশ্যপের স্ত্রী
"	প্রণবছন্দে	বেদের মূল ছন্দে
"	পুরোডাশে	আগে দান করা হয় যাহা / যবের রুটি / মালপো / যজ্ঞের ঘৃত

সন্দীপের চর

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
সন্দীপের চর	গোল্ডেন রক	মাদ্রাজের ত্রিচিনোপল্লির রেলওয়ে ইয়ার্ড। এখানে শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয়েছিল।
"	কবন্ধ জাবেদা	আইন / রাজাবিধি
"	খেউড়নাট্য	অশ্লীল নাটক
"	খেদা	হাতি ধরবার ফাঁদ / বিতাড়ন
সন্দীপের চর	ভার্গব	শুক্রাচার্য, দক্ষের পুরোহিত

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
„	রড়	দৌড় / ছুট / পলায়ন
„	মুদ্রারাক্ষস	সংস্কৃত নাটক, রচয়িতা বিশাখা দত্ত
„	আন্দ্রমিদা	গ্রীকপুরাণের নায়িকা সিফাস ও ক্যাসি-পিত্তর কন্যা, পার্সিয়াসের স্ত্রী উত্তর আকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ
„	ভয়রোঁর	প্রভাতের সংগীতের রাগ
„	মস্তি	খুব খুশীতে থাকা
„	সির্‌দরিয়ার	রাশিয়ার নদী এরেল সমুদ্রে পড়েছে
„	আমদুরিয়ার	রাশিয়ার নদী কৃষ্ণসাগরে পড়েছে
„	আরাল	রাশিয়ার আরাল হ্রদ / সমুদ্র
বৈশাখী	কাণ্ট	জার্মান দার্শনিক, ইমানুয়েল কাণ্ট
„	স্লাভ	উত্তর বা পূর্ব ইউরোপে আর্থাৎ রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের জনগণ যে কথ্য ভাষায় কথা বলে তাকে স্লাভ বলা হয়।
আইসায়ার খেদ	আইসায়া	বাইবেলে আছে হিব্রু রাজ্যের প্রবল নৈরাজ্যের মুহূর্তে ইহুদি ঋষি আই সায়ার-এর কণ্ঠে খেদ এবং আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছিল
„	লোহু	রক্ত
„	বুওর	দক্ষিণ আফ্রিকার হুগনট বা ওলন্দাজ বংশজাত মানুষেরা
„	এমডেন	জার্মানীর একটি সমুদ্রবন্দর
৮ই আগষ্ট		
	আউওল	আদি / শ্রেষ্ঠ/ প্রথম / প্রারম্ভ
	হেলেন	গ্রীক পুরাণে ট্রোজান যুদ্ধে যে সুন্দরী নারীকে নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল। জিউস ও লেডার কন্যা।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
মধ্যবয়সী	অ্যাকিতেনে	মধ্যযুগের এক সুন্দরী ফরাসী মহিলা যাকে ট্রুবাডোরের গান গেয়ে প্রেম নিবেদন করা হয়েছিল
„	এলেওনোরের	হেলেনের অপর এক নাম
„	ত্রবাদুর	মধ্যযুগের ফরাসী চারণ কবি
মৌভোগ	পইছে	নারীর মণিবন্ধের অলঙ্কার
„	কঙ্কালী	দুর্গার মূর্তি / কালী
সহিষ্ণুতা	মাৎস্যে	পুরাণ / মৎস্য সম্বন্ধীয় / নৈরাজ্য
কঙ্কালীতলা	দুও কনচের তাস্তে	ঐকতানে কোনো এক বিশেষ বাদ্য-যন্ত্রের প্রাধান্য
„	শীকরে	জলকণায়
স্বর্গ হতে বিদায়	লুসিফর	ভেনাস / প্রভাতী তারা/গ্রীক পুরাণের দেবতা, এখানে স্বর্গচ্যুত শয়তান
„	বেলিওল	পূর্বাহ্নের রাগিনী বিশেষ
„	ইঁটাইটি	ইট ছোড়াছুড়ি
সমুদ্রস্বাধীন	টেনেসি	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নদী
„	ভলগা	সোভিয়েত রাশিয়ার সব চেয়ে বড় নদী এবং ইউরোপেরও।
„	নীপার	রাশিয়ার নদী
„	কুম্ভীপাকে	হিন্দু শাস্ত্রীয় একটি নরকের নাম
„	জীবিকামাৎস্যে	জীবিকার নৈরাজ্যে
„	হামাম	স্নানাগার / গোসলখানা
„	কপিলগুহা	অগ্নিগুহা / কুক্কুট গুহা / কপিল গুহা
„	চূড়ালা	জ্ঞানীব্যক্তি
চৈত্রে বৈশাখে	মহাশ্বেতা	দেবীপুরাণে আছে দেবী দুর্গা মহাতাপ আশ্রয় করেও শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে এর এক নাম হয় মহাশ্বেতা / বাণভট্ট ও ভূষণভট্টের কাদম্বরী কাব্যের নায়িকা

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
চৈত্রে বৈশাখে	মাইকাল	আদম ও ইভকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করেন ইনি।
"	অবীচি কর্কশ	তরঙ্গহীন মসৃনহীনতা
"	মামল্ল পুরমে	তামিল নাড়ুর একটি শহর
"	ওদেসা	কৃষ্ণসাগরের ওদেসা গালফে অবস্থিত বন্দর
"	মার্তাবানে	দক্ষিণপূর্ব বার্মায় 'আন্দামান' সমুদ্রে ত্রিভুজাকৃতি আন্তর প্রবাহিনী উপসাগর
"	বাটুম	তুরস্ক সীমান্তে কৃষ্ণ সাগরের বন্দর
"	বালখাসে	চীন সীমান্তের পশ্চিমে দক্ষিণ পূর্ব কাজাকে অবস্থিত লবণ হ্রদ
"	কারাকোল	ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় সওয়ার শরীরের সামান্য মোচড়ে ঘোড়াকে ডান বা বামে ঘোরানোকে কারাকোল বলে
"	আণোরণীয়ান্	অণুর অনু / সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
"	উদারায়	সংগীতে নিম্ন সপ্তকের স্বর
"	ডায়ার	জালিনাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক
"	ডনোভন	আমেরিকার আইনজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ উইলিয়াম যোশেফ ডনোভন
"	ডায়ারকি	ডায়ার ডায়ারারকি ইয়ারকি এবং এনারকি শব্দ যোগে নতুন শব্দসৃষ্টি
আমরা	জুলে স্যুপেরভি	(Superville Jules) (১৮৮৪-১৯৬০) ওয়ালটার ডি-লা মেয়ারের মতই ফ্রান্সের অন্যতম বড় কবি
নীরদ মজুমদারের জন্য	পিসারোই	ক্যামিলো পিসারো (১৮৩১-১৯৪৩) ফরাসী চিত্রকর
"	চিৎকাটে	বিহারের রিখিয়ায় একটি অঞ্চল খুব পুরোনো বাঙালী পল্লী

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
নীরদ মজুমদারের জন্ত	উত্রিল্লো	মোরিস উত্রিল্লো (১৮৮৩-১৮৫৫) ফরাসী চিত্রকর
”	দিঘারিয়া	সাঁওতাল পরগণার অঞ্চল, ত্রিকূট পাহাড়ের নিকটবর্তী
”	বাহেঙ্গা	দেশীয় রাজ্য
”	আমরুয়া	সাঁওতাল পরগণার অঞ্চল
”	ভেড়োয়াটাঁড়	সাঁওতাল পরগণার একটি বিশেষ স্থান

অম্বিষ্ট

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
অম্বিষ্ট	কপিল সাগরে	অগ্নিময় সাগর
ঐ	পাখ সাটে	পাখীর ডানার ঝাপট
”	কাওয়াজে	যুদ্ধের ব্যায়াম ও রণকৌশল সৈন্ত বাহিনীর জন্ত
”	কমিশারিয়াট	খাদ্য ও অন্তান্ত জিনিসের সরবরাহ দপ্তর
”	জামেয়ারে	ফুলের কাজকরা কাশ্মীরীশাল
”	আল হামব্রা	রক্তবর্ণ পাথর / স্পেনের গ্রানাডায় মুরিশ রাজাদের বিখ্যাত মধ্য যুগীয় প্রাসাদ
”	গের্ণিকা	পিকাসোর বিখ্যাত ছবি
”	সাতনরি	যে কণ্ঠহারে সাতটি প্যাঁচ আছে
”	তেমরুসে	রাশিয়ান লোক গাথার ওপর গানের সুর
”	নেরুদা	পাবলো নেরুদা চিলির বিখ্যাত কবি (১৯০৪-৭৩)

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
দেখেছি মেলায় এক	সদরালা	সাব্ জজ
"	দিলরুবা	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
যুযুৎসুর খেদ	কুরুমণ্ডুক	ভীষ্ম, বিদুর ইত্যাদি
রামধনু	রং রেজিনি	কাপড় চোপড়ে রংকারক স্ত্রীলোক
অবিচ্ছিন্ন কাব্য	বেভিন	আর্নেষ্ট বেভিন (১৮৫৪-১৯৫১) ইংরাজ শ্রমিক নেতা ও রাজনীতি বিদ
"	ট্রুমানি	হ্যারি এস ট্রুম্যান (১৮৮৪-১৯৭২) আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (১৯৪৫-৫৩)
শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব	আর্তেসীয়	Artisian well ইঁদারা বিশেষ। এর জল সর্বদা মুখের কাছে থাকে।
প্রতীক্ষা	কারারায়	রিখিয়ায় নুড়ি পাথর দিয়ে ঘেরা একটা সুন্দর জায়গায় নির্মিত ফোয়ারা।
এলসিনোরে	এলসিনোরে	জিল্যাণ্ড দ্বীপে অবস্থিত একটি বন্দর শেকসপীয়রের হ্যামলেট নাটকের রাজপ্রাসাদ
"	দানেমার্ক (ডেনমার্ক)	উত্তর পশ্চিম ইউরোপের একটি রাজ্য
"	হোরেশিও	শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটের অন্তরঙ্গ বন্ধু
"	দিনেমারে	ডেনমার্কের অধিবাসী
জলদাও	চেলিউসকিন	এশিয়ার উত্তর দিকের একটি অন্তরীপ
"	গোলমোর	গুলমোহর বা কৃষ্ণচূড়া
"	লেবার্ণমে	এক ধরনের গাছ এতে হলুদ ফুল হয়। এই গাছ থেকে ওষুধ তৈরী হয়।
"	কৃষ্ণ কাস্তপ সাগরে (Black sea)	কাস্পীয়ন সাগর

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
বাইশে শ্রাবণ	বাইশে শ্রাবণ	১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস
”	দুয়ো	নিন্দা
আশ্বিনে	আঁজি	রেখা/ডোরা
বহুবড়বা ১৯৪৬-৪৭	বহুবড়বা	সামুদ্রিক অগ্নি
”	জঙ	মরচেধরা
”	মাস্তোভানি	স্ট্যালিন এই নামে পরিচিত
”	শমী	বাবলা গাছ
”	নির্চেরাগ	নিষ্প্রদীপ
”	মশান	শ্মশান
”	জাঠা	জঙ্গী মিছিল
”	শোথমত্ত	জল সঞ্চার হেতু দেহের ফোলা রোগের মত্ততা
সন্ধ্যারাত্রি ভোর	নেবুলা	নীহারিকা
বিল আর্চার কে	বিল আর্চার	দুমকায় থাকতেন / সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ
”	কাংস্য	কাঁসা / কাঁসি
কালের রাখাল শিশু-২১ শে ডি :—		স্ট্যালিনের জন্মদিন
”	দিউগাসভিলি	স্ট্যালিনের নাম
”	দান্ত	শান্ত/ জতেন্দ্রিয়/শাসিত
শিশির	তাঞ্জাম	ডুলি
কাসান্দ্রা	কাসান্দ্রা	গ্রীক পুরানে উল্লিখিত অশ্রুত ধ্বংসের ভবিষ্যৎবক্তা/প্রিয়ামের কন্যা
”	পাঙাশ	পাঙটে/এক ধরনের মাছ

কবিতার নাম	শব্দ	
কাসান্ড্রা	প্রিয়ামস্	গ্রীক লোককাহিনীতে আছে, লাও-মেডনের পুত্র, হেকুবার স্বামী, পঞ্চাশটি পুত্রের জনক। হেক্টর ও প্যারিস অন্যতম পুত্র হয়। প্রিয়ামস্ হলেন ট্রয়ের শেষ রাজা। ট্রোজান যুদ্ধের শেষ পর্বে নিহত হন।
,,	হায়াসিন্থ	লিলিফুলের অন্তর্গত / গ্রীক কবিরা তাঁদের কাব্যে এই ফুলের নাম ব্যবহার করেছেন
,,	পার্থেনস্	এথেনা পার্থেনসের নামের মন্দির পেরিক্লিসের রাজত্বে ফিডিয়াসের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়।
,,	অরুনাশ্ব	সূর্যের ঘোড়া
,,	ঈনিয়স্	গ্রীক ও রোমান উপকথা অনুসারে এনচিসেস ও ভেনাসের পুত্র ঈনিয়স্। ট্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে ল্যাটিয়াম পৌছানোর আগে সাত বছর ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে সেখানে নগর স্থাপন করেন
তিনটি কন্যা	পেপস্থ	আম্বাক্কর, পাতিয়ালার প্রভৃতি শহরের প্রথম অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ
,,	লিঅর	শেক্সপীয়রের কিংলিঅর নাটকের প্রধান চরিত্র
,,	রিগান-গনেরিল	শেক্সপীয়রের কিংলিয়র নাটকে লিঅরের মধ্যম কন্যা
	এডমণ্ড্	কিং লিঅর নাটকের অন্যতম পুরুষ চরিত্র

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
টাইরেসিঅস	টাইরেসিঅস	গ্রীক পুরানের অন্তর্গত থীবস, নগরীর এক গণৎকার যিনি এথেনাকে নগ্নরতা অবস্থায় দেখার ফলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর খেসারত হিসাবে সে টাই-রেসিঅস-কে ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা দিয়েছিল।
”	হালালি	বিশ্বাসঘাতকতা
”	সেসিল রসেল	বার্ট্রাণ্ড রসেলের ভাই
”	ইলেক	চিহ্ন
”	ক্রীট	ভূমধ্য সাগরীয় একটি দ্বীপ
”	মেদিচি	ক্যাথলিক ধর্মযাজক / ইতালীয় ব্যবসায়ী
”	শাতোয় কাস্লে	ফরাসী দুর্গ
”	পম্বলে	ডোবা / ক্ষুদ্র জলাশয়
হাওড়া ব্রিজ	শোথে	এক ধরনের ফোলা রোগ
আমিতো গাঁয়ের লোক	কটাল	ভরা জোয়ার
এ একজন দুঃস্বপ্ন	আরিজোনা	দক্ষিণ আমেরিকার একটি নদী
”	এলাতে গেরিতে	এলা ও গেরুয়া রঙ
”	ভিয়োলা	বেহালা জাতীয় বীনা বিশেষ
”	বেয়ালা	বাদ্যযন্ত্র
”	চেলোয়	বেহালা / বাদ্যযন্ত্র
”	কুলথি	কলায় বিশেষ
তিনটি ছোট কবিতা, স্টেটসম্যানিকিনি		কূটনীতিক
জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেট গুচ্ছ	প্রেকশাস	অসময়ে প্রস্ফুটন ও তার বৃদ্ধি
বালাদঃ লুই আঁরাগের জন্য	বালাদ	লোক গাথা
”	লুই আঁরাগ	বিখ্যাত ফরাসী কবি, কমিউনিস্ট
”	বুরিদান	অশিক্ষিত গ্রাম্য

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
ভিলানেল	ভিলানেল	ফরাসীদের ব্যবহৃত ছন্দরীতি মূল ফরাসী ভাষায় রচিত উনিশ লাইনের কবিতায় দুটি করে মিল থাকে
আত্মীয় সওগাত	সওগাত	উপঢৌকন
,,	কিয়েফে	good humour
,,	ফেরগানা	এশিয়া মাইনরের ফেরগানা থেকে বাবর ভারত বর্ষে এসেছিলেন
,,	বোখারা	মধ্য উজবেকের একটি বিভাগ ৪:৬০০ বর্গ মাইল-এর বিস্তৃতি
,,	আহবে	যুদ্ধ / যজ্ঞ
,,	ভেরেশ চাগিন	রাশিয়ান চিত্রকর (১৮৪২-১৯০৪) সাধারণ মানুষের জীবনধারার ওপর ছবি এঁকেছেন।
বারোমাস্যা	চক্রাস্তি	চক্রান্তকারী
,,	পুর বৈঞায়	পুবালী
,,	হিমকরকার	ঠাণ্ডা শিলাবৃষ্টি
,,	পাল্‌সি	অনুরণন
,,	বাখ্‌	জোহান সেবাষ্টিয়ান বাখ্‌ (১৬৮৫-১৭৫০) জার্মান স্বরকার
,,	সোনাটা	একটি কি দুটি বাদ্যযন্ত্র সহ রাগ সহযোগে গান
,,	হিরণার	রিখিয়ার একটি টিলা
বারোমাস্যা	খোদা নিরঞ্জন	খোদাঅর্থে আল্লাহ এবং নিরঞ্জন অর্থেও আল্লাহ আবার হিন্দু মতে বৃক্ষ শূন্য দেবতা/শূন্যপরাণে খোদা নিরঞ্জন দ্রষ্টব্য
	তুষার করকা	তুষার শিলা

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
	জুডাস	ম্যাকাবিয়াস জুডাস একজন ইহুদী দেশপ্রেমিক সম্ভবত ১৬০ খৃঃপূর্বে হত হয়েছিলেন সেলিউসিডের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য
দিনগুলি রাতগুলি	ইয়াংচি	এশিয়াও চায়নার দীর্ঘতম নদী
„	পিয়োঙ্গয়াং	উত্তর কোরিয়ার রাজধানী
বেয়ালা জন্মদিন প্রতিদিন	বেয়ালা	বাদ্যযন্ত্র
„	আতুল	তন্দ্রালস
„	তুন্দ্রায়	গড়ানে বৃক্ষবিরল সাইবেরিয়ার সমতলভূমি
„	তাই গায়	রাশিয়ার উত্তরদিকে একটি অঞ্চল যেখানে খুব ফুল ফোটে
	করকায়	তুষার শিলায়
	দিনীপারে	রাশিয়ার নদী
আষাঢ়েরই জয়গান	ন্যগ্রোধ	সুবিশাল বটগাছ
পাঁচ প্রহর	ষড়জেরেখাবে	ভারতীয় সঙ্গীতের সম এবং রে সপ্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় বার
„	কোয়াটেট	চারটে যন্ত্রের সংগীত
„	গ্রোসে ফুগের গান	বেঠোফেনের সঙ্গীত
প্রখর শাস্তি খর উজ্জ্বল	কসাক	রুশদেশের এক জাতি / তলস্তয়ের উপন্যাস
নদীর উৎস যদি জানা থাকে	প্রতিন্যাস	প্রত্যর্পন
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	মিঁয়াকি	তানসেন সৃষ্ট রাগ, বর্ষাকালীন রাগ
„	কাটামারান	দুটি কাঠের গুঁড়িকে বেঁধে ভেলা তৈরী হয়
	মাসুলা	ভারতমহাসাগরের তীরবর্তী একটি শহর

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
আঁখি	কনীনিকা	চোখের তারা বা মণি
২৯শে নভেম্বর	২৯শে নভেম্বর	ক্রুশ্চভ ও বুলগানিন ঐ দিন ভারত সফরে এসে কলকাতায় এসেছিলেন
একটি মেঠোকাহিনী	ঝিঁঝিট	বিশেষ ধরনের রাগ রাগিনী সমন্বিত সংগীত
বোহিনিয়া	বোহিনিয়া	ফুলেরগাছ (মিমোজার মত ফুল)
দশমিক	অশনায়া	অনাহারী নারী
জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন	রুমের-নীরো	রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস সীজার ড্রাসাস জারমানিকাস নীরো নামে পরিচিত
সনেট	ফস্ফর	শুকতারা / ভেনাস / অন্ধকারে দীপ্তি মান পদার্থ বিশেষ
একটি কাফি	কাফি	সংগীতের বিশেষ একটি রাগ
আশাবরী	তেলানা	গান স্থরুর আগে গানের বোল ভাঁজা
”	তেহায়ের	তাল বা সম শেষ করবার আগে তবলায় তিনবার ঘা মেরে ধ্বনি স্বষ্টি করা
রাজধানী	ঘোরীরা	মহম্মদ ঘুর বা ঘোরী
”	তুগলক	মহম্মদ বিন তুঘলক
”	খিলিজি	আলাউদ্দীন খিলিজি
”	লোদীরা	ইব্রাহিম লোদী
এবারের বর্ষা	সাইক্লোট্রনে	নিক্ষিপ্ত পরমাণু প্রভৃতির চক্রাকার পরিক্রমনের তড়িৎ-চুম্বকীয় বেগবর্ধক যন্ত্র বিশেষ
দান	জলদর্চি	প্রজ্বলিত শিখা / প্রচণ্ডরূপ জ্বালা

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
চিরঋণী	আশাবরী	রাগিনী বিশেষ
„	যোগিয়া	রাগিনী বিশেষ
„	টোড়ি	প্রভাতের রাগিনী বিশেষ
„	খিদ্‌মদগার	সেবক ভৃত্য
„	মৈহারী	আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্র সংগীত শিল্পী দল
শতমুখনদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়	গাৎসিয়া	রোমা রোঁলার বিখ্যাত উপন্যাস জাঁ। ক্রিস্তফ উপন্যাসের নায়িকা
„	পরাবর্তে	বিনিময় / অদলবদল

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ	টিরানোসরাস	উত্তর আমেরিকার মাংসাশী অধুনালুপ্ত সরীসৃপ বিশেষ। বিশাল আকৃতি, বিশাল চোয়াল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে সক্ষম
„	করিন্থীআয়নডোরীয়	স্থাপত্য শিল্পে তিন ধরণের করিন্থীয় গ্রীকরীতি, ডোরিক, আয়োনিয়ান, করিন্থীয়ান
„	কেলসন	জাহাজের মাস্তুলের ওপর বিম
„	গাঁওয়ারের	গ্রাম্য / গাঁইয়া
„	নীটশে	জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক উইলিয়াম নীটশে (১৮৪৪-১৯০০)
„	হোয়লডেরলিন	জার্মান কবি
„	বাগনার	জার্মান সংগীত শিল্পী
„	ফরাসীস্‌	ফ্রান্স দেশীয়
„	মান্দারিন	চীন সম্রাটের অধীনস্থ রাজ কর্মচারী ছোট চীনা কমলালেবু

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
আকাশে তাকাও	আলোনা	লবনাক্ত নয় এমন / আলুনি
ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে	আস্বায়	স্পর্ধা / বড়াই
অভিন্ন স্বস্তিতে	গম্‌হার	গামার গাছ
বস্ত দোল	মাতোয়ালা	বিভোর / আত্মহারা
মুখতো দেখিনি	বেনেডিকটুস	গীর্জারগান/লাতিন ভাষায় মহিমান্বিত
দিবা নিশা	ঈশা	লাঙ্গলের দণ্ড/সীতা
কৌনিকে নয়	মণ্টাজে	চলচ্চিত্রের একটি প্রক্রিয়া আইজানস্টাইন প্রথম ব্যবহার করেন
চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা	রুশতী	রাত্রি কালীন উষা রুশদেশ
"	পাইলেট	যীশুকে যে হত্যা করেছিল
"	হেরডেরা	Judea'র রাজা। এদের বলা হোত Herode the Great যথা হেরোড, হেরড এগ্রিপ্পা, হেরড এন্টিপাস
"	সালোম	হেরডিয়াসের কন্যা
"	মৎসার্ট	উলফ্যাং আমাদি উজ মৎসার্ট, অষ্ট্রীয়ান সংগীত স্বরস্রষ্টা
রাত্রি স্তোমংন জিগুষে রাত্রি সূক্ত	১০।১২৭।৮	হে আকাশের কন্যা রাত্রি তোমার যাত্রাকালে এই স্তব
একটি বৈঠকি নাটক	আলজীর	হোরাসিও আলজীর, আমেরিকান শিশু সাহিত্যিক (১৮৩৪-৯৯)
"	মাউ মাউ	১৯৫২ সাল থেকে কেনিয়া, কিকয়ু আফ্রিকার উপজাতিরা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল। তাদের বলা হোত মাউ মাউ
"	কেনিয়াট্টা	কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও কৃষ্ণ আফ্রিকার নেতা জোমো কেনিয়াট্টা
ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব	টারমাক	পথ বাঁধানোর জন্য আলকাতরা মাখানো নুড়ি

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
মেঘলা দিন	চন্দ্রাপীড়	শিব/বানভট্টের কাদম্বরী কাব্যোক্ত তারাপীড়ের পুত্র
দেখেও ভালো লাগে	মেজাজ ফের	মনের হালের ফেরে
”	কাসানোভা	ইটালির দুঃসাহসিক অভিযাত্রী তাঁর স্মৃতিকথার জন্য বিখ্যাত
”	বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য	গবেষণাকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক প্রদত্ত ডক্টরেট ডিগ্রী
”	বাওয়াবে	নিয়ে যাবে
সেও এরা	মননের লুনিক সংবিত	মনের অপূর্ব সংবিত
উজ্জীবনের স্বপ্ন সত্যচক্ষে	তদু নাত্যেতি কশ্চন কঠোপনিষদ, ২।৬।১	কেবল তাকেই কেউ অতিক্রম করতে পারেনা
”	পবমান	ক্ষরণশীল
”	সেজান	পল সেজান, ফরাসী চিত্র শিল্পী (১৮৩৯-১৯০৬)
এ আর ও	স্বস্থ	উদ্বেগরহিত / নিশ্চিন্ত
”	তৎসৎ	সেই-ই নিত্য
অয়রিডিকে	অয়রিডি	নায়িকা ইউরিডিসের নাম
লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা	লুসিয়া	Wordswoth এর Lucy
”	রুশদ্বৎসা ...চরিত আমিনানে ১।১১৩।২ ঋগ্বেদ	দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্যের মাতা (২) উষা এসেছেন, কৃষ্ণবর্ণা রাত স্বীয় স্থানে গিয়েছেন, রাত ও উষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়েই অমর। একে অন্যের পর আসেন এবং এক অন্যের বর্ণ বিকাশ করেন, এরূপে তাঁরা দীপ্তিমান হয়ে বিচরণ করেন।
	সবিতা.... দীর্ঘমায়ুঃ	পশ্চিমদিকে, কি পূর্ব দিকে, কি, উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে সূর্যদেব আমাদের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদের দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করুন।

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
প্রবীণ সারস	রভসে	আবেশে/ঔৎসুক্যে
গ্রীষ্ম নিসর্গ	বর্তুল চৈত্য	গোলাকার পূজার স্থান
চেনাপাথর	হিলিঅমে	গ্যাস
,,	সুব্বা	নবাব
শতবার্ষিকী	প্যারানইয়ার	বদ্ধমূল ভ্রান্তি জনিত মস্তিষ্ক রোগ

সেই অন্ধকার চাই

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি পুত্রাসো···		ঐ সময় পুত্র পিতা হল
,,	পুষন্	সূর্য
তাকাবে জাগাবে	বাওবাবে	গাছ বিশেষ
এ কেবল ভাষার যন্ত্রণা	জরিষ্ণু	বার্ধক্যভারে পীড়িত
,,	শীধুর	মধুর
কোন পেত্রফ, যেন পেত্রফার জন্য পেত্রফ,		রাশিয়ার কোন পুরুষের কাল্পনিক নাম
এদের যেন মনে হওয়া	ক্যান্টিলিভার	বৃহৎ খিলান
ধুলো পড়ে	সমুদ্রের গণ্ডোয়ানা	সৃষ্টির প্রথমে দক্ষিণ গোলার্ধে যে আদিম অঞ্চল ছিল তাকে গণ্ডোয়ানা বলে
শীলভদ্র পঞ্চমুখ	শীলভদ্র	বিখ্যাত জ্ঞানী
,,	ভূতপত্রীর দেশ	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বই।
,,	শিব সদাগর	লোকসাহিত্যে উল্লিখিত কাল্পনিক চরিত্র
,,	কল্মষ	মলিন / পাপযুক্ত
এই দ্বন্দ্বে	সন্নিপাতাতুর	বিনাশের ভয়ে কাতর
তুমিই বুঝি পাথর	ব্রানক্যাসি	রুমানিয়ার স্থাপত্য শিল্পী কনস্ট্যান্টিন ব্রানক্যাসি (১৮৭৬-১৯৫৭)
,,	মূরের রচনা	স্পেনদেশীয়
,,	এ-গাজি	সুন্দরবনের ব্যাঘ্র দেবতাকে মুসলমান সম্প্রদায় এ-গাজি বলে থাকে

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
"	দক্ষিণ রায়	মধ্যযুগের রায় মঙ্গল কাব্যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র দেবতাকে দক্ষিণরায় বলত।
ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার	চৈত্যচ্ছদ	নির্মল চৈত্য / বৌদ্ধমঠ
"	বিভীষা	ভয় দেখান
"	তুণ্ডপত্রময়	তেলাকুচ গাছের পাতায় ছাওয়া
"	স্ব ব্যাবৃত্ত	আপন নিবৃত্তি
সত্যেন দত্ত যদি থাকতেন	তথত-ঈ	
	তউসে	ময়ূর সিংহাসন
"	কমলবদন	পদ্মের মত মুখ যার
অনেক ঠেকে		...ল
উত্তরে থা...		
শ্রাবণের দৃষ্টি...		
ছন্দে পঁচাত্তর...		
যেখানেই বা...		
সকলেই পর...		...ক্ষ অঙ্গের অর্থাৎ ... মৈথুন প্রয়োজন
মধ্যে যা গর...		
বৃষ্টির পরে ব...		...নেকগুলো ছবি
এলিয়টের প...		...ন যেখানে ব্রাহ্মরা
"		
নিতান্তই পি...		কবির দৌহিত্র)
"	ফাবর	Fabre
"	বেটস	মার্কিন কবি Bates
	পাউণ্ড	মার্কিন কবি এজরা-লুমিস পাউণ্ড (১৮৭৫-১৯৭২)

আলেখ্য

কবিতার নাম		শব্দার্থ
অন্মাঃ		য় পুরুষানুক্রমে জমি াবস্তের দলিল
অন্মা		। ইহা খৃঃ পূঃ যুগে ধর্মান্তরিত না হওয়া আর বাসস্থান
"	পুরীষস্রোত,	
স্বরক্রান্তি	হবিষ্মতী	
একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা	মাটিআরা	নদীর নাম
"	হর্লাজুড়ি	কাছি রিখিয়ার একটি
রাগমালা	কুমুদকহ্লারে	ও শ্বেত পদ্ম
"	বিরহগুরুণা	[illegible] র অংশ
হোমারের ষটমাত্রা	সাফো	গ্রীক মহিলা কবি
কোনার্ক	মাকাড়া মুগনী	সাঁওতালী বাদ্যযন্ত্র
"	নিয়াখিয়া	উড়িষ্যার কোণার্কের খুব কাছের একটি নদী / এই নদীতে জল থাকে না।
"	ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাক্ (কেনোপনিষৎ)	সেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না।
পরিক্রান্ত	সাংপোর	তিব্বতের একটি নদী
জন তিনেক ভগ্নহৃদয়	মিমোসা	লজ্জাবতী লতা গাছ
আলেখ্য	সোরাব	সোরব রোস্তমের বিখ্যাত কাহিনী

সংবাদ মুলত কাব্য

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
সুতরাং নৈঃ সঙ্গ্যও নেই	গার্ডেনিয়া	গন্ধরাজফুল
যার শিল্পে	পুনর্নবা	এক প্রকার শাক / নদী
ভিক্ষুক	আত্মহা	আত্মঘাতী
মৃত্যুর বিশ্রাম চাই	জন-রিচার্ডেরা	শেক্সপীয়রের নাটকের দুটি চরিত্র
"	মিরাণ্ডা	শেক্সপীয়রের দি টেমপেস্ট নাটকের নায়িকা
স্বর্গ নরক	লুনিক	চন্দ্রাভিমুখে গমনকারী মহাকাশযান
কোনও যুক্তি নেই	অম্বুবাচীছন্দে	বর্ষা আরম্ভে ব্রত উদযাপনের এক বিশেষ ছন্দে
ত্রিবেণী সঙ্গমে	লুকসরে	ঔজ্জ্বল্যে
এ নদীকে চেনো তুমি	মননের আতসি	মনের স্বচ্ছতা
বয়ঃ কৈশরকং বয়ঃ	বয়ঃ কৈশরকং বয়ঃ (বিদ্যাপতি)	কিশোর বয়সে
ভালেরির অজগর	ভালেরি	পল এমব্রোস ভালেরি (১৮৭১-১৯৪৫) ফরাসী কবি ও দার্শনিক

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে

গ্রাৎসিয়া	গ্রাৎসিয়া	রমাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ, উপন্যাসের নায়িকা
"	ফুগের	এক ধরনের পাশ্চাত্য কণ্ঠ সংগীতের একটি প্রকার
"	মধুস্রবা	মূর্ব্বালতা
"	স্তোমে	যজ্ঞ / স্তব / স্তোত্র / মস্তক

কবিতার নাম	শব্দ	
আত্মহত্যা চৈতন্তে	বর্ত্ম	পথ / রাস্তা / আচার / চোখের পাতা
পিতার মত মা	[illegible]	এশিয়ায় ভিয়েতনামে একটি সমুদ্রবন্দর
	স্বমাগ	তুমিই
পুনরালেখ্য	আলতামিরা	প্রস্তরযুগে প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত চিত্র স্পেনের সানতানদার-এর গুহাচিত্র
	বর্ণিকা	লেখিকা / স্ত্রী চিত্রকর / কঠিনী / খড়ি
〃	মৎসর	ঈর্ষাকাতর
সাজানো বাগান থাক	অস্মায় বিলাসী	প্রাতিষিক আমিত্ব বোধ / জনবিচ্ছিন্ন
〃		
তবু জলে ফেলা ভালো	কর্মাটাঁড়	সাঁওতাল পরগণার একটি স্থান। বাঙালীর কাছে কার্মাটার নামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর এখানে শেষ বয়সে বসবাস করেন।
বৃষ্টি সাবিত্রিক গান করে	সাবিত্রীক	বৈদিক সূর্যসম্বন্ধীয়
	অঘমর্ষ	বেদজ্ঞ ঋষি
〃		
আবিশ্ব···	নীলরতন	ডঃ নীলরতন সরকার। কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন
অকাল মেঘে সূর্যাস্ত	আলারিপ্পু	দক্ষিণ ভারতের নৃত্যের একটি শ্রেণী
ডিকুনশ্ট্ ডের ফুগে	ডিকুনশ্ট্ ডের ফুগে	বিখ্যাত জার্মান সংগীত রচয়িতা বাখের বিখ্যাত প্রবল কীর্তি ফুগের শিল্প কর্ম
জীবনের চেয়ে শিল্পে	ইফিজেনি	গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়িকা
〃	আলসেস্ত	গ্রীক নাটকের চরিত্র সোফোক্লিসের একটি নাটক
〃	ভৈরবী	ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ভোর বেলার রাগিনী
〃	তোড়ী	ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাতের রাগ
	গ্লুক	জার্মান সংগীত রচয়িতা (১৭১৪-১৮৭৮)
	বাখ্	জার্মান সংগীত রচয়িতা (১৬৮৫-১৭৫০)

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
কিবা গ্রীস কিবা টয়	নহুষ	নহুষ অর্থে বৈদিক সাহিত্যে মানুষকে বোঝান হত। এছাড়া পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী রাজা যযাতির পিতা। পুণ্যবলে ইনি ইন্দ্রত্বলাভ করেন কিন্তু চরিত্র নষ্ট হওয়ায় স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন।
”	প্যাণ্ডারস	চসারের ট্রয়লাস এবং ক্রেসিডার ট্রয়লাসের জন্য ক্রেসিডাকে তুলে আনার জন্য প্যাণ্ডারস প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ইলিয়াড মহাকাব্যে ট্রোজান যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল লাইকেয়নের পুত্র প্যাণ্ডারস
ছিন্নসত্তা	দক্ষজা	দক্ষের স্ত্রী (সতী)
বৈরূপ্যে বিধুর	অর্জেয়ান	রাশিয়ার জর্জিয়ার এক বিশেষ ধরণের চিত্রশিল্প
সুতরাং পিতার মতো মাতার মতো	কেন্টিশ কুমারস্বামী	প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও নন্দন-তত্ত্ববিদ
	ধ্বন্যালোকে	কাব্যের অন্তর্গত ধ্বনির দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা নিয়ে যে তত্ত্বের আলোচনা গ্রন্থ রচয়িতা অভিনব গুপ্ত
আমিও তো যেতে চাই	I have desired to go Hopkins	আমি ও তো যেতে চাই
এবারের গ্রীষ্মে	দেশী লেবার্ণমে	দেশী বিষবৃক্ষ বা তার ফুল
পশলা পশলা বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে	সদগময়	সত্তে, শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞানে লইয়া যান
আশা যেন মাতৃভাষা	অশ্রুস্মিতা	কান্না ও ঈষৎ হাস্যময়ী নারী

আমাদের কবিতা আশা	গেহেনায়	নরক / বাইবেলে উল্লিখিত জেরুজালেমের নিকটবর্তী উপত্যকা। এখানে মৃত জীবজন্তুর নাড়িভুড়ি ছুঁড়ে ফেলা হত।
	গোমোরা	ডেড্‌সী। মৃত সমুদ্রের তীরবর্তী শহর। দুষ্টো শহরবাসীকে বধ করার জন্য শহরটি সোডম্‌ ধ্বংস করেছিল
৭ই নভেম্বর রোজনামচায়	অস্নাবি	স্নায়ুহীন

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

নর লোকে লগ্ন সমাহৃত	আদম্‌-উদ্যান	স্বর্গোদ্যান
অসম্পূর্ণ বর্তমানে	এশানী	রাত্রির প্রথম যাম (স্ত্রী)
নয়নাভিরাম নীলে ভিন্ন		
প্রতিক্রিয়া	শ্রোণিভারাদলসশয়না	গীতগে শিন্দ থেকে
সময় খারাপ	ইয়ংকিডুড্‌ল	প্রাক্‌ বিপ্লব যুগে আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রে ব্যঙ্গকবিতা দিয়ে গান রচিত হয়েছিল
	পিসিঙ্গার	সম্ভবত আমেরিকার সমর সচিব হেনরি: কিসিঙ্গারকে ব্যঙ্গচ্ছলে পিসিঙ্গার বলেছেন
	পিগ্‌সন	সম্ভবত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসনকে ব্যঙ্গ করে পিগ্‌সন নামকরণ করেছেন
কোটি কোটি জন প্রত্যেকে		
সংনেতা	'প্রতিলোমা	বিপরীত বিরুদ্ধবাদিনী
সত্য আজ লেনিনেরই	অসাররুদিন	(রুদ্‌+ইনি) রুদিন : কান্না অপ্রয়োজনীয় তুর্গেনিভার একটি উপন্যাস

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
কেন স্বপ্ন তন্ত্রে থামে	ক্রকচ	করাত
"	লেনা	রাশিয়ার সাইবেরিয়ার পূর্ববাহিনী দীর্ঘতম নদী (২৬৪৮ মা) লাপটেভ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে
কিরিয়েল	কিরিয়েল	কবিতা গানের ঢঙে গাওয়া হয়
"	জামরুয়া	কাল্পনিক শব্দ
"	বর্কলি	প্রখ্যাত দার্শনিক /
"	খিদ্‌মদ্‌গার	সেবক/ভৃত্য/পরিচারক
"	ট্যাঁশ গরু	এই শব্দটি কবি সুকুমার রায়ের কল্পিত শব্দ
"	রামগরুড়	এই শব্দটি কবি সুকুমার রায়-এর কল্পনা প্রসূত শব্দ

ঈশাবাস্য দিবানিশা

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
দক্ষ স্মৃতির বাগান	ইরায় ও পুরোডাশে	অন্ন ও যজ্ঞের ঘৃত
কেবা যাত্রী কেবা পাটনী	কনচের্তো	এক ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান যাতে একটি বাদ্যযন্ত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়
"	আদাজ্যো ফুগ	অপেক্ষাকৃত ধীর লয়ের গান
"	দাংগে সাং (Danke Schon)	আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
"	শিলের	জোহান্ ক্রিস্তফ, ফ্রেড্‌রিক ভন্ শিলের (১৭৫৯-১৮০৫) জার্মান কবি ও নাট্যকার
উনচতুর্দশপদী	বিশ্বজননী সন্নিভা	বিশ্বজননী সদৃশা
ফ্রানৎস্ শুবের্ট	ফ্রানৎস শুবের্ট	অস্ট্রিয়ান গীতিকার (১৭৯৭-১৮২৮)
সুখের সহজ মুখ	সাহানা	ভারতীয় রাগ / রাত্রিকালীন রাগ

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
সুখের সহজ মুখ	আহীর ভৈরবে	ভোরের একটি রাগ (সংগীতের)
”	সাঁত ভিক্তোয়া	মধ্যযুগীয় জনৈক সন্ত
দেখে অন্ধ বিশ্ব	মিঞাকী দীপক	তানসেনের কণ্ঠে গীত / রাত্রিকালীন (দীপক) রাগিনী
তোমাকে দেখেই স্পষ্ট হয়		
	ডীসে টোয়নে নিখ্‌ট্‌ (Nicht diese To″ne)	এই শব্দ লহরী নয়
অসম্পূর্ণ কবিতা বাংলায় বাংলায়		
	তে হি নো দিবসা গতা	সেই দিনও অতিক্রান্ত
	হামের ক্লাভিয়ের	পিয়ানো / বাদ্যযন্ত্র
”	কষ্টি	স্বর্ণাদি যাচাই করবার পাথর / নিকষ পাথর
”	ইনফেরনো	নরক / পাতাল
”	পুর্‌গাতোরিও (Purgatory)	মৃত্যুর পর ছোটখাট পাপ থেকে মুক্ত হওয়া
” , লোরকা	পুন্নাম	পুত্রহীন
”	কামরাদা	জার্মান ভাষায় কমরেড্‌ / সহযাত্রী
”	সাক্কো ভাঞ্জাত্তি	হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাসের চরিত্র
”	ভানৎ সেত্তি	জার্মানীতে নাৎসী হত্যার কেন্দ্রস্থল
”	আউসবিট্‌জ	”
”	বুখেন বালড্‌	”
মানুষ খেকোর চেয়ে ভয়ানক	শেরজঙ্গ	বাঘের মত যোদ্ধা / ঐ নামে এক শিকার কাহিনীর লেখক ছিলেন
স্নায়ুতে চৈতন্যে মিলে এক নীরাজনে		
	নীরাজনে	আরতিতে
ষোড়শোপচারে	ধন্বন্তরি	দেব চিকিৎসক / অত্যন্ত ভালো চিকিৎসক / রোগনির্ণয় ও নিরাময়ে অতুলনীয় চিকিৎসক

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
নৈঃসঙ্গ্যকে সঙ্গীত উৎসব	বঙ্কিম মুখুজ্জে	পরলোকগত, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য/মহেশতলা, বজবজ বিধান সভা কেন্দ্রের নির্বাচিত বিধান সভার প্রতিনিধি, বিরোধী দলের নেতা
”	হীরেনবাবু	অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, ঐতিহাসিক, লোকসভা ও রাজ্য সভার সদস্য, সাহিত্যরসিক, প্রাবন্ধিক
”	আলি আকবর	বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আল্লাউদ্দীন খাঁর পুত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদ-বাদক
”	নিখিল	নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রখ্যাত সেতার বাদক
ত্রিকাল তার মোছায় মুখ	অঘোরপন্থী	শিবের উপাসক সম্প্রদায়
এর চেয়ে ডুব দেওয়া ভালো	অর্ঘ্যকে	অর্ঘ্য সেন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী
মহৎ শিল্পের শ্রম	ফাউনটেন	ঝর্ণা
”	Vera Incessupatuitdea ভার্জিলের ইনিড থেকে ল্যাটিন ভাষায়	প্রকৃত ঈশ্বরীর মত তার চলার ভঙ্গী The true goddess was revealed by her gait
”	ইমানের ভক্ত	ধর্মের ভক্ত / ধর্মবিশ্বাসী / ধর্মীয় ভক্ত
এতদিন পরেও কি বর্ণচোরা থাকি	বীজকম্প্র	বীজের কম্পন
ঈশাবাস্য দিবানিশা	ঈশাবাস্য দিবা-নিশা	দিন ও রাত পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়
”	বৃক্ষ ইব স্তব্ধ	বৃক্ষের মত স্তব্ধ
”	এ উষরে	এ অনুর্বরতায়
”	ভূর্ভুবস্ব	সপ্রাপক ভূর্লোক, সপ্রাপক অন্তরীক্ষ-লোক সপ্রাপক স্বর্গলোক্-সপ্তলোকের অন্তর্গত এই তিনটি মন্ত্র

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
কেন ভয় ধর্ম ধরি	কূর্মধর্মে	কচ্ছপের দেহের শক্ত আবরণ
খরতোয়া	গোবিতে	বিখ্যাত মরুভূমি
,,	খরতোয়া	খরস্রোতা
দৃশ্যাবলী	পাটলীগন্ধ	ইঁটের রঙের গন্ধ
,,	শচীশ	রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক
,,	দামিনী	রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়িকা
,,	ললিতা	রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নারী চরিত্র
ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বহু বছরের প্রশ্ন		
	ওয়ার্ডসওয়ার্থ	বিখ্যাত ইংরেজ কবি রোমান্টিক যুগের
,,	মৎসর	অসূয় / হিংসা / পরশ্রীকাতরতা
জার্মান গণতন্ত্রের জন্য	এডেল জাই	
	ডের্‌, মেনশ	Noble man (মানুষই সত্য মহীয়ান)
,,	জাই হিলফ্রাইখ্‌, উন্‌ড্‌, গুট	Be benevolent and good
,,	জাই উন্‌স্‌ আইন্‌ ফরবিলড্‌,	আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হও
,,	য়েনের গে আনে টৈন্‌ হেবেজন্‌	Being condition
,,	মুস্‌ এস্‌ জাইন্‌	Has it to (must it) be ?
,,	জীট্‌ মান্‌ ইঃ রে ফানেন হেবেন	Sights one their flag to whom ?
,,	জী ইম্‌ কর্‌ ডের্‌ এঙ্গেল ষ্টৈন্‌	They stand in the choir of the angels
,,	কার্ল এবং লুড্‌ভিখ্‌,	মার্কস ও এঙ্গেলস
,,	য়োহান এবং ভুল্‌ফগাং	বাখ্‌, এবং মৎসার্ট
,,	সেবাষ্টিআন	বাখের নাম
,,	বের্টোল্ট্‌,	বিখ্যাত নাট্যকার ব্রেখ্‌ট

কবিতার নাম	শব্দ	শব্দার্থ
জার্মাণ গণতন্ত্রের জন্য	হাইনরিখ, মান	হাইনরিখ ব্যোল ও টমাস ম্যান। ব্যোল ১৯৭৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন যুদ্ধ বিরোধী কথা সাহিত্যিক। টমাস মান জার্মানীর অগ্রগণ্য কথা সাহিত্যিক
”	মিলিওনেন	Millions
”	জাইড, উস্‌শ লুংগেন	Be embraced ! Joy !
”	উন্‌ডের্‌ ডের লিন্‌ডেন্‌	বাতাবী লেবু গাছের নীচে
”	মাইন্‌গুটের কামেরাড,	My good Comrade !
”	আনডের্‌ হাইডের্‌	At the health